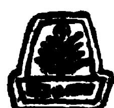
তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৮৯ (৩৩০০)

— পঁয়তাল্লিশ টাকা

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকচিত্র :

শ্রীমোনা চৌধুরী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীবংশীধর সিংহ কর্তৃক বাণী মুদ্রণ,
১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥



শুকসারী-কথা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

পূর্বকথা

কোপাই নদীর হাঁসুলীবাঁকের নসুবালাকে এ অঞ্চলে সবাই চেনে। বেটাছেলে হয়ে জন্মে চিরটাকাল সেই ছেলে-বয়েস থেকে এই পঁয়ষট্টি সত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত মেয়েছেলে সেজে জীবনটা শেষ করতে চলেছে। ছেলে-বয়েসে মা তাকে মেয়ে সাজিয়েছিল, নাক ফুঁড়ে নোলক—কান ফুঁড়ে মাকড়ী—হাতে কাচের চুড়ি পরিয়েছিল—চুল না কেটে লম্বা চুলে বেড়া-বিনুনী বেঁধে দিত, পরিয়ে দিত একখানা গামছার মত খাটো তাঁতে বোনা 'ফেরানী' বা ফিরানী, অর্থাৎ যাতে নাকি কেবল কোমরে জড়িয়ে একটা ফেরতা দেওয়া যায়। সেই থেকেই তার মেয়েলিপনা এবং মেয়ে-জীবন আরম্ভ। লোকে ভেবেছিল বয়েস হলেই যথা নিয়মে ছেলেটা ছেলেই হবে, বিয়ে করবে, সংসার হবে এবং তখন এই ছেলেবেলার মেয়েলিপনার জন্যে সে লজ্জা পাবে। কিন্তু তা হয় নি। ছেলে তার মেয়ে সেজেই থেকে গেল। ছেলেবেলা মেয়ে সাজাবার আরেকটা কারণ ছিল—ওদের মনসার ভাসানের দলে ও সাজতো বেহুলা, ছিপ্‌ছিপে দীঘল চেহারার কালো ছেলেটিকে মানাত বড় ভাল, আর গানের গলা ছিল চমৎকার, সরু মেয়েলি! 'ভাঁজো পরবে' মেয়ে সাজিয়ে ওকে সকলে নাচাত, এবং চৈত্রমাসে 'ঘেঁটু পরবেও' সে মেয়ে সেজে নাচত। কোথা থেকে পাড়ার মাতব্বরেরা সলমা চুম্‌কি দেওয়া একটা ঘাগরা এবং ঢিলে একটা বডিস্ পরিয়ে হাতে রুমাল দিয়ে নামিয়ে দিত। মাথার লম্বা চুলে বেণী তৈরী করে ঝুলিয়ে দিত, ঠোঁটে রঙ মাখত এবং গানের সঙ্গে ও নাচত গাইত—

তাই ঘুনাঘুন বাজে লো নাগরী—
চরণে নূপুর হায় থামিতে যে চায় না।
তাই ঘুনাঘুন তাই ঘুনাঘুন।

এসব গান ওদের বেঁধে দিত মুকুন্দ ময়রা। বছর বছর এক এক রকম। যে বছরে যা বিশেষ কিছু ঘটত তাই নিয়ে গান। প্রথমবার নসুবালা যেবার নাচে—তার আগের বার উঠেছিল ধূমকেতু, এবং সেবার মড়ক হয়েছিল। মুকুন্দ গান বেঁধে দিয়েছিল—

ছেলেপিলে এবার উঠে ধূমতারা—
বুড়োধাড়া সব গেল মারা
এবার উঠে—।

ধুয়ো সেই এক।—তাই ঘুনাঘুন—তাই ঘুনাঘুন। নসুবালাই ওটা গাইত এবং পায়ে তার নূপুর থাকত—সেটা বাজত—ঘুন—ঘুন—ঘুনাঘুন—ঘুনঘুনাঘুন।

বেউলার ভাসানে—লখিন্দর সাজতো করালী। বাপমরা ছেলে, মা তাকে ছেলেবেলায় ফেলে পালিয়েছিল—পাড়ার পাঁচজনের বাড়ী কুড়িয়ে খেয়ে মানুষ—তবে একটু-আধটু স্নেহ পেত নসুর মায়ের কাছে—সে নসুকে বলত নসুদিদি। ওই করালীই বেউলোর দলে সাজত

লখিন্দর। খেলাঘরে নসু সাজত মা—করালী ছেলে, কোনদিন বা নসু বউ—করালী বর। এইভাবে বড় হল। করালী হল ডাকাবুকো। নসু করালীর নসুদিদিই থেকে গেল—মেয়েদের সঙ্গেই ওঠাবসা—কথাবার্তা, হাসিখুশি, মনের কথা আর তার সঙ্গে তাকে পেয়ে বসল নাচ আর গান। ভাদ্র মাসের এবং চৈত্র মাসের মুখ চেয়ে বসে থাকত, কবে আসবে। বেউলো আর ভাঁজো আর ঘেঁটু। পাড়ায় গাওয়াই রেওয়াজ ছিল, নসুবালা মূলগায়েন আর নাচকরুনী হয়ে গাঁ-গাঁওলায় দল নিয়ে বেরুতে সুরু করল—গোটা মাস। সঙ্গে থাকত করালী আর জন চারেক। গাঁ-গাঁওলায়—মণ্ডলদের বাড়ী মিস্তিরদের বাড়ী ঘোষদের বাড়ী—ঠাকুরদের বাড়ী গিয়ে দাঁড়াত। জয় হোক গো মা ঠাকরুণ, ভাঁজো এয়েছেন। তারপর গান। মেয়েরা নসুর গান আর নাচ দেখে মুখটিপে হাসত। বলত, মরণ!

নসুর মনে আছে চন্দনপুরে বাবুদের বাড়ী নতুন কলকাতার বউ তার বড় জায়ের মুখে ওই 'মরণ' কথাটা শুনে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করেছিল—মরণ বলছিলে কেন দিদি?

—মরণ নয়? বেটাছেলের মেয়ে সেজে নাচের ঢঙ দেখ দেখি।

বউটির বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না—সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কে বেটাছেলে? যে নাচছে? তুমি ঠাট্টা করছ দিদি?

বড় জা বলেছিল—ঠাট্টা? যা না ওর গালে হাত বুলিয়ে দেখ না। হাত ছড়ে যাবে দাড়ির খোঁচায়!

নসুর রাগ হয়েছিল—সে সামলাতে পারে নি, বলেছিল—কি যে বলেন বউদিদি! ভারী!—ভারী না বেরুক—মেয়েদের মোচ বেরোয় না? হ্যাঁ। মরণ আমার ভারীর! বলে গান ধরেছিল; তাদের ভাঁজোর গান—

কেষ্টো বেড়ায় পাতায় পাতায় ডালে না দেয় পা—
ও রাধে লো, পাতার ডগায়
ফুল হবি তুই যা! (ও মন রসনা আমার)

এর পর ঢোল বেজেছিল জলদে—তাং তাং তাং তাং বোলে—আর নসু নেচেছিল ঝম্‌ঝম্—ঝম্‌ঝম্—করে নূপুর বাজিয়ে। ভাঁজো থেকে সে এনেছিল ভাদু। তার কারণ ভাঁজোতে পাড়ার হৈ হুল্লোড়—মদের নেশা তার ভাল লাগে নি।

বর্ধমান গিয়ে সে ভাঁজো এনেছিল। বলে—বর্ধমানের মহারাণীর কাছে সে প্রথম গি:য়ছিল—তার ভাদু নিয়ে। মহারাণী তাকে না কি ডেকেছিলেন—ভাদুর মা বলে। সেই 'ভাদুর মা' নামটিই তার সব থেকে প্রিয় নাম। এবং সে সেই ভাদুর মা হয়েই থেকে গেছে মেয়ে সেজে।

এখন বাস তার চন্দনপুরে। হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবাদি গাঁ—যুদ্ধের সময় শেষ হয়েছে মড়কে-দুর্ভিক্ষে—তারপর এসেছিল সর্বনেশে ঝড়, নসু ত বলে 'চাইকোলোন'। 'চাইকোলোনে'র পর কোপাইয়ে ক্ষ্যাপা বান। যুদ্ধের কি কাজে বাঁশ লাগে—সে জানেন ভগবান আর জানে যুদ্ধ যারা করতে এসেছিল—সেই তারা—সেই রাঙাওলমুখোরা; সেই ডাকাবুকো করালীর

'ম্যানেরা'। বাঁশবাঁদির সেই পাঁচীরের মত বাঁশের ঘের কেটে ফাঁক করে দিলে; কোপাইয়ের ক্ষ্যাপা বান—কলকলিয়ে খলখলিয়ে এবার ঢুকল সন্ধ্যের মুখে; দোর খোলা ঘরে, হেরে-রে-রে করে ডাকাতের মত। সব লুটে-পুটে, ভেঙে-চুরে, প্রাণে মেরে দিয়ে চলে গেল। আর চেপে গেল বালি।

বাঁশবাঁদির কাহাররা হল হা-ঘ'রে। দিগদিগন্তরে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে চলে গেল। সে, পাগল আর সুচাঁদ এসেছিল চন্দনপুর। সুচাঁদ চন্দনপুরের ইস্টিশানের ধারে বটতলাতে বসে বলত—হাঁসুলীবাঁকের উপকথা। এ শুনত ও শুনত—মুচকে মুচকে হাসত। চলে যেত। শুনত শুধু ঠায় বসে চন্দনপুরের শিবদাদাবাবু। খাতাতে লিকে নিত। নসু আর পাগল দুজনে গাঁয়ে-গাঁয়ে গান করে বেড়াত।

হাঁসুলীবাঁকের কথা বলব কারে হায়
চন্নপুরের টেরীকাটা বাবুরা মুখ বেঁকায়।
জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই
বিধেতা বুড়োর খেলা দেখে যারে ভাই।

তারপরে সুচাঁদ পিসি ম'ল—পাগল সাঙাত ম'ল—থেকে গেল নসুবালা—ভাদুর মা। এই চন্দনপুরেই থেকে গেল। লোকের তখন দুঃখের শেষ নাই সীমা নাই—শুধু বাঁশবাঁদি নয়, সব গাঁয়েরই তখন বাঁশবাঁদির দশা। ভাঙা আর ভগ্ন; মাটির ঢিবি—নয় পড়-পড় দেওয়াল—নড়বড়ে চাল। পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, হালের বলদ গরু নাই, পুকুরে জল নাই, মজে গেছে, যে জলটুকু আছে তা কাদার গোলানি। দু-চার জনা বেনে-বাস্তি—যারা দোকানদানী করে—তাদেরই বাড়বাড়ন্ত। জমিদারেরা ঘায়েল, মহাজনেরা দেউলে, চাষীরা মরমর। গরীবগুলোর কথাই নাই। চন্দনপুরে জমিদারদের পাকাবাড়ী ছিল অনেকগুলি—তার ওপরে ধুলো লেগে এমন দশা হয়েছে যে মনে হয় গায়ে মাথায় ধুলো মেখে কোন বড়-লোকের কন্তে কি বউ ক্ষেপে গিয়ে হাতে লাউয়ের খোলা নিয়ে পথের ধারে বসে আছে; সাড়া নাই—নড়া নাই, মরা কি জ্যান্ত ধরতে সময় লাগে। তবু সে সময়ে লোকের কি হৈ-হৈ আর রৈ-রৈ। ধ্বজা আর পতাকা—আর মিটিং আর মিটিং। আর চীৎকার! চীৎকার বলে চীৎকার! সে আবার একটা চোঙার ভেতর দিয়ে গগনফাটা চীৎকার। কি ব্যাপার? বুঝতে পারত না নসু। জিজ্ঞাসা করত—বলি হ্যাঁ গো—এ সব কি হচ্ছে মশায়রা? এ সব চেঁচামেচি হৈ চৈ—অঃ হ—কানের পর্দা ফেটে গেল! যেন গ্রাম জুড়ে নোকের বেটার বিয়ে নেগেছে!

এখন নসুর কথাবার্তায় বাঁশবাঁদির সেই কাহারদের কথা এবং সুরের সঙ্গে চন্দনপুরে শহর থেকে আমদানী করা কথা ও সুর মিশেছে। কেউ কেউ ঠাট্টা করলে বলে—এখন শহরের মানুষ হনু যে! সে বেশ সুর করে। কখনও কখনও ভাঁজোর পুরনো গান গেয়ে নেচেও দেয়।

কালো-জলে, কটা-জলে, মিশেও মেশে না—

কালো কানাই—পায়ে ধরে—ও মন রসনা আমার—রাধা হাসে না।

ঢোলের অভাবে মুখেই ঢোলের বোল আউড়ে শুধু পায়েই নেচে একপাক দিয়ে দেয়। তাং-তাং-তাং-তাং-তাং—ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু—! তারপর বেশ নারীসুলভ ভঙ্গিতে হাত দুলিয়ে অঙ্গ দুলিয়ে চলে যায়।

যাই হোক—এই নতুন এক তাজ্জব দেখে সে প্রশ্ন করে—এ-সব কি? এই চেঁচামেচি—হৈ চৈ! যেন ছাশ জুড়ে নোকেদের বেটার বিয়ে নেগেছে! কি বেপার?

—ব্যাপার যে ভয়ঙ্কর—চরম, নসু।

—সে কি রকম?

—দেশ স্বাধীন হল।

—স্বাধীন হল?

—হ্যাঁ।

—তাতে কি হল? কি রকমে হল?

—সায়েবরা রাজা ছিল—তারা তল্পীতল্পা গুটিয়ে দেশে চলে গেল।

—বাবাঃ। সেই রাঙাওলমুখোরা? করালী ডাকাবুকোর ম্যানেরা! হেই বাবা!

—হেই বাবাই বটে নসু—হেই বাবাই বটে!

—তা পরেতে?

—কি তা পরেতে?

—এইবার কি হবে?

—কি হবে? দেখবি কত কি হবে। খাবার কষ্ট থাকবে না, পরবার কষ্ট থাকবে না, দেশে মুখ্যু কেউ থাকবে না।

—ওরে বাবা রে! আমি কোথাকে যাব রে!

উত্তরদাতা হাসতে থাকে। নসু হঠাৎ বলে—তা হলে বল—মরি।

—কেন, মরবি কেন?

—মরে আবার মায়ের কোলে ছোট হয়ে ফিরে আসি। তবে তো ইস্কুল যাব। নতুন জামা কাপড় পরব!

উত্তরদাতা এবার চুপ করে যায়। কি বলবে এতে?

বিচিত্র নসুবালা বলে—তা হ্যাঁ গা—এ সব হল ক্যানে? পরক্ষণেই সংশোধন করে বলে—কেন? বুঝেচ! মুখ ফস্‌কে ক্যানে বেরিয়ে যায়। চামড়ার মুখ তো! তা হল কেন বল দিকি?

—কেন? তার উত্তর আমি জানি না।

—হুঁ। কি করে জানবে? বটে। তা যাই আমি শুধিয়ে আসি গা।

—কাকে?

—আদারবুড়ীকে। ফুলরাকে। খেলোয়াড়ী লইলে তো খেল্ হয় না! গদারামকে মনে

আছে? ফাং গঙ্গারাম! ময়রার বেটা মা কামিখ্যের থানে গিয়ে খেল্ শিখে এয়েছিল। সেই একটা হুঁকো বসিয়ে দিত অনেক দূরে—তা পরেতে বলতো—ফেলা বেটা জল ফেলা। আর নলচের মুখ থেকে গাড়ুর নলের মত জল পড়তে লাগত। বলত আউর জোরে—আরও জোরে জল পড়ত। আবার বলত—থাম যা। থেমে যেত। আবার বলত—ফিন পড়—আউর থোড়া—আবার পড়ত। মনে আছে। খেলোয়াড়ীর খেল্। তা সব খেলার মূল খেলোয়াড়ী তো আদারবুড়ী, তাকে শুধিয়ে আসি—বলি গা—আদারবুড়ী এ খেলের মানে কি মা?

আদারবুড়ী ফুল্লরা দেবী এখানকার শ্রেষ্ঠ দেবস্থান। এখানকার লোকে বলে একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। এখানে দেবীর অধরোষ্ঠ পড়েছিল—স্থানের আসল নাম অট্টহাস; তারপর নাম হয়েছিল শ্যামলাবাদ, শ্যামলাবাদ ধ্বংস হলে নাম হয়েছিল চন্দনপুর, কারণ তখন অট্টহাসে দেবীর অস্তিত্ব কেউ জানত না। গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল। শুধু গন্ধ উঠত চন্দনের। তাই নাম হয়েছিল চন্দনপুর। তারপর এখানে কোপাই নদীর ঘাটে একটা উঁচু ঢিপিতে নৌকো লাগত বর্ষায়—আশপাশ থেকে আসত গন্ধবণিকেরা, বেচা-কেনা চলত, চাল ধান গুড় কলাই লঙ্কা কুমড়ো। তাই ঢিপিটার নাম হয়েছিল বন্দর ঢিপি। পরে কাশী থেকে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এক সন্ন্যাসী এসে ওই জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা করে দেবীর দর্শন পান। তিনিই মা ফুল্লরাকে প্রকাশ করেন। এই মা ফুল্লরাই নসুবালার আদারবুড়ী—অর্থাৎ আদাড় বা জঙ্গলে থাকেন যে বুড়ী তিনিই আদারবুড়ী। বুড়ী বই কি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মা; কত তার বয়েস—সে বুড়ী বই কি। আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো যে—তারও মা—বুড়ী বুড়ী মহাবুড়ী।

চন্দনপুরে এসে সুচাঁদ ও পাগলের মৃত্যুর পর এই মায়ের স্থানের কাছাকাছি ঘর তুলেছে একখানি। ছোট্ট ঘর, এক টুকরো দাওয়া, তার কোণে একফালি উঠোন, তার সামনে একটি বুনো ফুল গাছের তলায় একটি বাঁধানো বেদী। আর একটি জবা, একটি অপরাজিতার গাছ। জবাগাছের ফুল—অপরাজিতার ফুল গ্রামের প্রৌঢ়ারা ফুল্লরা দেবীর স্থানে যাবার সময় তুলে নিয়ে যায়। নসু বলে—একটি দুটি রেখে নিয়েন মা। ফুলের গাছ ফুল বিইয়েছে—ওর তো ছেলে—সব নিলে পরাণে লাগবে। আর শোভা? মা শোভা হারাবে। তা আমার লেগে মাকে বলেন। বলেন—নসুকে ভাদুর মাকে পার করো।

ওই বুনো ফুলের নাম কেউ জানে না। থোকা থোকা নীলাভ সাদা যুঁই ফুলের মত—গন্ধ তার খুব। নসু তার নাম দিয়েছে 'দিলপিয়ারা'। হাস্নুহানা নামটি থেকে এই নামটি তার মনে এসেছে। রোজ সকালে উঠে নসু ওই আদারবুড়ীর দরবারে যায়—প্রণাম করে এবং হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে আসে। বোবার কথা কালার কাছে। কথাটা বলে একজন পাণ্ডা। অর্থাৎ নসু বোবা—ফুল্লরা কালা। মধ্যে মধ্যে রহস্য করে প্রশ্ন করে নসুকে—নসুবালার কি খবর?

নসু মাথার ঘোমটা টেনে নতজানু হয়ে প্রণাম করে বলে—এই মাকে বলছিলাম।

—কি বলছিলে?

—বলছিলাম?—একটু চুপ করে থেকে বলে—সে শুনে কি করবেন?

—কি করব ? আমি মাকে বলব তোমার হয়ে। মনে পড়িয়ে দেব।

—দেবেন ? বলবেন ? সত্যি বলছেন ?

—নিশ্চয়, সত্যি বলছি। মায়ের সামনে মিথ্যে বলতে আছে ?

—আমাদের নাই—আপনাদের আছে। আপনারা যি বলেন।

—আমরা মিথ্যে বলি ?

—সেই দিন যি বললেন—আমার ছামুতে।

—কাকে ?

—সেই যি—আমি পেনাম করছিলাম। একজনা এসে ঠং করে রুপোর টাকা একটা আর একখানা নোট দিলে, আপনি কুড়িয়ে নিলেন ; আপনকার শরীক এসে শুধালে, কি দিলে—আপুনি রুপোর টাকা দিয়ে বললেন—এই। নোটটা দিলেন না। মিছে বলা হল না ?

চটে যাবার কথা, চটে যান পাণ্ডাঠাকুর। কিন্তু কি বলবেন ভেবে পান না।

নস্যুবালা বলে—তা আপুনি তো সত্যি বললেই পারতেন—মায়ের হুকুমে উ টাকাটো নিয়েছেন আপুনি।

অবাক হল পাণ্ডাঠাকুর—নস্যু বলেই যায় ;—আপুনি মাকে জানেন, মা আপনকাকে জানেন ! সেবা পুজো তো সবই আপুনি করেন। ওরা তো করে না। শুধু ভাত পাঁঠা খায়, মদ খায়—হারে-রে করে। আমি দেখি, আদারবুড়ীকে শুধিয়েও দেখিছি। সি দিনে যখন টাকাটি ট্যাঁকে গুঁজলেন তখন আমি হেই মা করে বাঁচি না। বাবা রে, আপনকার মতন লোক চুরি করলে ! তখন মাকে বললাম—মা বেপারটি কি বল ! মা বললে—উদিকে লুকিয়েছে, কিন্তুক আমি—আমি তো ড্যাবডেবে চোখ মেলে চেয়ে সব দেখেছি। আমাকে লুকিয়ে তো চুরি করে নাই। তা হলে না হয় চোর হত ! মনে হল 'তা বটে।' মাকে তো লুকোয় নাই ! বুয়েচেন বাবা, তবু সন্দেহ যায় না গো। তখন বললাম—আমার মনে মনে বললে হবে না। তোমাকে বলতে হবে মা ! হঁ্যা। তা কি করে বলবে ? কথা কয়ে বললে অপর নোকে শুনবে। তা—। এই দেখেন এই খিলেনের মাথার ওপর থেকে থপাস করে পড়ল—এই বড় টিকটিকি। পড়ে আমার মুখের পানে—বাবা—সে কি ড্যাবড্যাবানি চাউনি গো ! এই কালো মটরের মত দুটো চোখ। একদিষ্টে চেয়ে রয়েছে আমার পানে। আমি আর ভয়ে বাঁচি না। বলি, এমন করে চোখ দিয়ে গিলে খাস না মা। তখন বলে কি—ঠিক-ঠিক-ঠিক। হাত জোড় করে বললাম—কি ঠিক মা ? পাণ্ডাঠাকুর পাপ করেছে ? তা আর রা কাড়ে না। চুপচাপ। তখন বললাম—তবে কি বলছিস—চোর লয় ?—তু ওকে দিয়েছিস ! অমনি বলে—ঠিক-ঠিক-ঠিক। বাস্, বলেই দে ছুট।

পাণ্ডাঠাকুর এবার হেসে বলেন—তোকে ফাঁকি দেবার জো নাই ! তোর ভক্তি আছে—চোখ আছে।

—থাকবে না ? চিরকাল তো ওই করেই এলাম গো। ঘর নয়, সংসার নয়, শুধু আমার ভাতুমণি, আর আমার মা ওই আদারবুড়ী। এই দেখেন—ভাতুমণি তো আমার মাটির—তা

আমি মুখের পানে চেয়ে থাকি—ঠিক বুঝতে পারি খিদে লেগেছে কি না, ঘুম পেয়েছে কি না। মধ্যে মাঝে বকি—তা মুখটি শুকিয়ে যায়। আমি দেখতে পাই। ওই থেকেই আদারবুড়ীর ইশেরাও বুঝি খানিক আদেক। কিন্তু আপনি। ওরে বাবা! মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাম কাজ আপনার। আপনার মিছেতেও পাপ নাই, সত্যিতেও পুণ্যি নাই। তাই তো বলছি বাবা, আমার কথা শুনে আমার মন রেখে বলবেন—হ্যাঁ ভাদুর মা, মাকে বলব তোর কথা। তা পরেতে ঘরে গিয়ে হাসবেন। বলবেন—মরণ দেখ দিকি—ছোটনোক ভাদুর মায়ের কথা দেখ দিকি। ওর কথা নাকি মাকে বলা যায়?

—না—না। তিন সত্যি করছি মায়ের কাছে—বলব—বলব—বলব।

—বেশ, তবে শোনেন।

'শোনেন' বলেও কিন্তু থেমে যায় নসু। একটু থেমে বলে—যেন হাসবেন না।

—না—না, হাসব কেন?

হাত জোড় করে মাকে বলি—মা আদারবুড়ী বল মা, আমার যাবার সময় হল কি না?

—হুঁ। তা কি বললে মা?

—রা কাড়ছে না গো। এই দেখেন কতক্ষণ 'ভাঁড়িয়ে' আছি। তা আমার ঠেকন তো ওই টিকটিকিটা, তা একবারও টক্‌টকালো না। বললাম—হইছে মা সময়? টক্‌টকিয়ে বল! তা চুপচাপ। তা বাদে বললাম—তা হলে বল হয় নাই? তাও চুপচাপ। রাও নাই সাও নাই!

—সে জেনে আর কি করবি? যেতে তো হবেই। আজ আর কাল!

—এই কথা বাবা, আজ আর কাল, কিন্তু আজ যেতে হলে উয্যুগ চাই। কাল হলে কাল। সেইটি জানতে চাইছি। তা হলে উয্যুগ করে বসে থাকি। মায়ের নাম করি—মা-মা-মা-মা-মা—। তা না হলে হঠাৎ সেই যমদূত—। বাবা গো!

বলে শিউরে ওঠে নসু। তারপর বলে—মশায়, আচমকা মাথার চুল খামচে ধরে টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাবে। মা-বাক্যি মুখে বেরুবে না—বেরুবে—না-না-না-না। মা-মা আগে থেকে বলতে লাগলে বেটা যমদূত এসে পিছু হটবে; হাত বাড়িয়ে—হাতে খিল ধরবে। তখন শিবদূত আসবে। এসে হাত ধরে বলবে—চল্ গো ভাদুর মা—মা তোকে নিতে পাঠিয়েছে। কোথা যাবি বল? কৈলেসে না বৈকুণ্ঠে না ইন্দরাজার স্বগ্‌গে। যমদূত পালাবে।

হাসেন পাণ্ডা। বলেন—তা কোথা যাবি তুই?

—আমি বাবা স্বগ্‌গের চন্নপুরে যাব।

স্বর্গের নতুন ঠিকানা শুনে অবাক হতে হয় পাণ্ডাঠাকুরকে। প্রশ্ন করেন, স্বগ্‌গে চন্নপুর আছে নাকি?

—নাই? নিশ্চয় আছে। তা নইলে এ গাঁয়ের বাবুরা সেই সব এই—এই বাবুরা—সব সাধকরা—সব নোকজনেরা গেল কোথা? আমার মা, সুচাঁদ পিসী, পাগল ভাভাত, পাখিমণি,

বসনদিদি, বেনোয়ারী সব গেল কোথা? কোথা কাজকাম করে খায়?

পাণ্ডাঠাকুর হাসলেন নসুর এই অদ্ভুত পরিকল্পনা শুনে। হেসে নিয়ে বলেন—তা আমি বলব। মাকে জিজ্ঞেস করব। যদি বলে—দেরি আছে—তা হলে কি বলব? বলব দেরি কর না মা—বড় কষ্ট দুঃখ—

—হেই মাগো। বাধা দিয়ে নসু বলে—তা আবার কখন বললাম! আমার কষ্ট দুঃখ—বলেছি আমি?.

—বলিস নাই, কিন্তু দুঃখ কষ্ট তো বটে নসু।

—বটে বটে। দুঃখও বটে কষ্টও বটে। দেখ, চালে কাঁকর, চাল মেলে না, কাপড় নাই, তেনা পরে দিন কাটছে। আজ এ মরছে—কাল সে মরছে। দুঃখও বটে, কষ্টও বটে। কিন্তু সুখ নাই? অনেক সুখ। কত দেখলাম বাবা—তা বল! 'যা দেখি নাই বাবার কালে—তাই দেখালে ছেলের পালে।' বাবা—মানুষে কি চেঁচানি চেঁচাচ্ছে বল দেখি নি। সাহেবরা—সেই ওলমুখোরা পালাল বাবা! এই দাঙ্গা হল বাবা! এ সব? এ কি কম ভাগ্যি—কম সুখ গো!

—তা হলে বলব, এখন কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখ?

—তা—। তা—বলবে? তাই বলো। হ্যাঁ—এ সব দেখে শুনে তাক নেগেছে বাবা। আকাশে জাহাজ উড়ছে। দুমাদুম বোমা ফেলছে। মানুষ মারছে। রাঙামুখো সাহেবরা পালাচ্ছে। নদী বন্ধন হচ্ছে। বাবা, এ সব দেখে তাক লেগেছে। তা বলো—আর দু দিন দেখতে দাও ভাদুর মাকে। তা পরেতে ও-পারে চন্নপুরে গিয়ে গান বাঁধব, নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে বেড়াব সবাইকার দুয়োরে দুয়োরে। বুয়েচেন বাবা—ধুয়োটা বেঁধে রেখেছি।—

বলেই আর অনুমতির অপেক্ষা করে না—ধরে দেয় ধুয়ো—কোমরে হাত দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নেচে নেচেই গায়।

স্বগ্‌গপুরের বাসী শোন মত্তপুরের কথা—
মধুর চেয়ে মিষ্টি সে যে নিমের চেয়ে তিতা—
ও সে মত্তপুরের কথা।

তার পরই থেমে যায়। আর নাই। বলে—বটে কি না—বল বাবা। —বল। অঃ। যত তেতো, তত মেঠো। না পারে কেউ উগলে দিতে, না পারে কেউ গিলে ফেলতে। আঃ। তা লইলে মরতে বসে লোকে বলে—বাঁচাও গো বাঁচাও! 'মর' বললে সবাই ক্যানে বলে—গাল দিলি আমাকে! হায় রে—হায় রে! হায় রে!

বলতে বলতেই নসুবালা চলে আসে। বেলা অনেক হয়েছে। মাগুনে বের হতে হবে।

চলে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ায় নসু। দেখ, পোড়া মনের করণখানা দেখা! বলা হয় নাই। সব কথা তো বলা হয় নাই বাবাঠাকুরকে! ফিরল সে।

—বাবা গো! ঠাকুর মশাই!

—কি? ফিরলি যে!

—ফেরলাম বাবা। সব কথা তো বলা হয় নাই।

—আবার কি ?

—অজয় ঠাকুর যে বললে—সব ঝুটা—সব ঝুটা—সব ঝুটা। এ্যাই মুঠো বেঁধে ছই আকাশ বাগে ঘুষি মেরে বলছে—সব ঝুটো। আর কি বলছে—ইনাপ কিলাপ—জিন্দা-বাদী। সায়েবরা গেল তো কি হল ? ও লোক দেখানো যাওয়া। আসলে বাবুভাইদিগে গমস্তা রেখে আমাদের বাবুদের কোলকাতা যাওয়ার মত। বেলাতে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে মুনাফা মারছে। তা আমি বললাম, তা মারবে না ? এত বড় রাজ্যি-পাট—লাভ না নিয়ে ছেড়ে দেবে ? ও বাবা ! অমুনি বলে, চোপরাও ! সব ঝুট, এঁটো এঁটো এঁটো ! ইয়ের কি মানে বলো।

বাবাঠাকুর বললেন—উ সব আমিও জানি না ভাদ্র মা। আমাকে আর জ্বালাস না। বাড়ী যা। আবার কাল শুনব।

—কাল শুনবে ?

—হ্যাঁ—কাল।

—আজ রাতে যদি মরে যাই !

—তা যাবি। আর তাই যদি যাস, তবে এর জবাব শুনে কি হবে ?

—তা 'মন রসনা বলে'—মন্দ বল নাই। যদি যাইই তবে শুনেই বা কি হবে ! কিন্তুক—

—আবার কি ?

—সি দেশ কেমন বটে ?

—কোন্ দেশ ?

—যেথাকে যাব।

—আমি জানি না। এবার তিক্ত হয়ে—রূঢ়ভাবে জবাব দেন পাণ্ডাঠাকুর। ওদিকে কোথা থেকে যাত্রী এসেছে। ওই উত্তর দিকের শিবমন্দিরের ওপাশে জুতো খুলছে। এখুনি এসে দাঁড়াবে। নিশ্চয় প্রণামী পড়বে। তিনি হন হন করে এগিয়ে গেলেন।

নসু ফিরল। এবার সত্যি সত্যিই ফিরল।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ-এসে পড়েছে মাঠের ওপর। জঙ্গলের ভিতর অন্ধকার। আলো-ছায়ার খেলা। আগের কালে সে কি ঘন জঙ্গলই না ছিল। থমথম করত অন্ধকার। চলতে চলতে একজনে আর একজনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হতে হতে—দাঁড়িয়ে বলত—কে ?

অন্তজনও বলত—কে ?

লোক চেনা দায় হত !

ও পায়েও নাকি তাই। অন্ধকারে পাগল সেভাত গাইত—সে গান সেভাতের সঙ্গে সেও গেয়েছে—

ওরে আমার ভাইরে ?
ও তোর—আলোর তরে ভাবনা কেনে হায়রে ?
অন্ধকারেই পরাণ পাখি সেই স্মাশেতে যায়রে !

লক্ষ পিদীম চন্দ সূয্যি তাইরে নাইরে নাইরে।

তাই বটে। তাইরে নাইরে নাইরে! তা হোক।—

না থাক, আছে একজনা ভাই

এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়—

দুই চোখ তার দুইটি পিদীম—সে কি সে রোশনাইরে।

সেই জনা মোর মনের মানুষ এইখানে খোঁজ পাইরে!

—তা—আরও কিছুদিন বাদে, মা আদারবুড়ী, আরও কিছুদিন বাদে। নয়ন ভরে দেখতে দে মা। দেখতে দে! আঃ—যত তেতো তত মেঠো—এ উগলে কি ফেলা যায়? গিলতে না পারি গলায় নিয়ে—গরুর মতন জাবর কাটছি। তাই আর কিছুদিন কাটি।

১

—ব্যাই হে ব্যাই! ও ব্যাই! অর্থাৎ—বেয়াই হে—বেয়াই! ও বেয়াই!

ঘর থেকে 'মাগুনে' বের হবার পথে নিত্য নসুবালা বড় রাস্তার ধারে একখানা নিতান্ত ছোট, প্রায় তাসের ঘরের মত একখানা ঘরের সামনে ওই বেয়াই বলে ডাক দিয়ে উঠোনে দাঁড়ায়। ঘরখানা ছোট, উঠোনটা ছোট কিন্তু নিকানো তক্‌তকে, ঝক্‌ঝকে, পাশে পাশে ক'টি ফুলের গাছ। সবই বেল ফুলের গাছ—দাওয়ার সিঁড়ির দু-পাশে দুটি করবীর ঝাড় আর বাড়ীর পিছনে একটি মধুমালতীর লতা—সেটি উঠেছে বাড়ীর পিছনদিকে একটি আউচ গাছকে জড়িয়ে। আউচের সব ফুলগুলি সাদা। শুধু মধুমালতী ফুল সকালে সাদা হয়ে ফুটে—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লালচে হতে সুরু করে সন্ধ্যেবেলা টক্‌টকে রাঙা হয়।

ঘরখানি ফটিক বৈরেগীর বাড়ী। নসুবালার মতই বিশ্বসংসারে ছন্নছাড়া গোত্রছাড়া গোষ্ঠীছাড়া যা বলা যায় তাই। বৈষ্ণবী নেই। ছেলেবেলা বার দুই বিয়ে বা মালাচন্দন করেছিল—কিন্তু তারা ফটিকের ঘর করে নি। নিজেরাই পালিয়েছে। বলে গেছে—মুখে ঝাঁটা! অর্থাৎ—ফটিকের। দুই বৈষ্ণবীই বলে গেছে। এর পর আর সে বৈষ্ণবী আসে নি।

বৈরাগীর ছেলে তিলক কাটে না, ফোঁটা কাটে না, গান গায় না, ভিক্ষে করে না; পুতুল গড়ে। আগে দু-চারখানা প্রতিমা গড়ত এখন তাও গড়ে না—গড়ে শুধু পুতুল—তাই বিক্রী করে দিন চালায়। ঘাড়নাড়া—তামাক খাওয়া বুড়ো, দাঁত ফোঁকলা বুড়ী, টিক্‌টিকি, ব্যাঙ—এই তার পুতুল।

বৈষ্ণবত্বের মধ্যে বাড়ীতে তার নিজের হাতে গড়া একটি রাখাল বালক কৃষ্ণমূর্তি আছে, তার পুজো মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে করে না, তবে ফুল দিয়ে সাজায়, নিজে যা খায় সে তাকে ভোগ দিয়ে নিয়ে খায়, চা, ভাত সবই আগে তার সামনে নামিয়ে দেয়। শুধু রাখালবেশী কৃষ্ণ। রাধা বা গোপিনী এ সব নেই।

নসুর সঙ্গে এই কৃষ্ণটিকে নিয়েই তার বেয়াই বেয়ান সম্পর্ক।

নসু হল ভাদুর মা। নসুর ঘরে আছে মাটির গড়া ভাদুরাণী। যারা ভাদু পুজো করে—তারা পুজোর শেষে ভাদু ভাসায়। নসু ভাসায় না।

ভাদুর গল্পটা বাংলাদেশে মানভূম থেকে এ অঞ্চলে অনেকে জানে কিন্তু কলকাতা এ অঞ্চলের কোন শহর নয়, এ অঞ্চলের কাছাকাছি হলেও- এ দেশে হলেও, কলকাতার আসল ফটক হল জাহাজঘাটায়, এখন হয়েছে দমদমে, হাওড়া স্টেশনে যে ফটকটা ওটা হল খিড়কী—পাচ দরজা। সুতরাং কলকাতার লোকে অনেকে জানে না হয় তো।

প্রবাদ আছে—বাংলাদেশের বন অঞ্চলে এক রাজা ছিলেন। ভাদু তাঁরই কন্যা—ভাদ্রমাসে জন্ম বলে ভাদু, সে মেয়ে ছিল অপ্সরীর মত রূপসী। রাজার বাড়ীতে ছিল যুগল বিগ্রহ।

মেয়ের ছেলেবেলা থেকে এই ঠাকুরে অনুরাগ। ক্রমে সে বড় হল, যুবতী হল। বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল, কিন্তু কোন সম্বন্ধই মেয়ের পছন্দ হল না, কোন না কোন ছুতো করে খুঁত ধরে ফিরিয়ে দিল। জোর করলে কাঁদতে লাগল—আহার নিদ্রা বন্ধ করলে। ক্রমে লোকে কানাকানি সুরু করলে যে, তা হলে মেয়ে কাউকে ভালবাসে। যার কথা বলতে পারছে না বাপ-মাকে। বাপ-মায়েরও সন্দেহ হল। এর পর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে গিয়ে দেখা গেল, রাজকন্তা ভাদু—গভীর রাত্রে ঘরে থাকে না। দাসীরা সভয়ে রাজাকে জানালে কথাটা। রাজা সেদিন প্রায় গোপনে পুলিসের মত নজর রাখলেন। ঠিক দু'পহর হল, ঘড়িতে দু' পহর বাজাল প্রহরীরা, মাঠে ডাকল শেয়ালেরা, গাছে ডাকলে পেঁচারা; রাজা দেখলেন, মেয়ে বেরিয়ে এল রাজবাড়ীর খিড়কী দিয়ে। চলল সে ঠাকুরবাড়ীর দিকে। রাজা আশ্চর্য হলেন—তখনও মন্দিরদরজা খোলা, ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। কন্তা ঘরে ঢুকল, দরজা বন্ধ হল; রাজা এসে সতর্ক পদক্ষেপে—দরজায় কান পেতে দাঁড়ালেন। ঘরে—খিল-খিল হাসিতে ভেঙে পড়ছে মেয়ে। তার সঙ্গে পুরুষের কণ্ঠের হাসি। তারপর সুরু হল নাচ গান, মেয়ে গাইছে, নাচছে।

রাজা দরজায় ঘা দিলেন। সব স্তব্ধ হল।

রাগে রাজার দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না, তিনি ভেবেছিলেন—পাপিষ্ঠ পুরোহিত আগে থেকে ঘরে লুকিয়ে আছে। প্রেমালাপ চলছে তার সঙ্গে। রাজা ক্রোধে অস্থির হয়ে—ছুতোর ডেকে দরজা ভাঙালেন। দেখলেন ঘরে আছে বিগ্রহ—আর তার সামনে বিগতপ্রাণা কন্তার দেহ।

রাজবাড়ীতে যুগল বিগ্রহের পাশে ভাদুরাণীর মূর্তি গড়ে স্থাপন করেছিলেন ভাদুর রাজা বাপ, সে আজও আছে। সেই সঙ্গে ভাদুর পুজোরও প্রচলন হয়ে গেল সারা দেশে। ভাদু ভালবাসতেন নাচ গান। এই নাচগানেই নাকি ঠাকুর ভুলেছিলেন।

নসু ভাদুর মা। তার ভাদুরাণী আছে। কিন্তু তার তো প্রেমাস্পদ ঠাকুর চাই। দেশে বামুন কায়স্থ সদ্গোপ মশায়দের ঠাকুর আছে। কিন্তু তারা সদ্জাতের বাড়ীর কৃষ্ণ। তার ভাদু—তার কন্তে—সে তো নীচকুলের ঘরের ভাদু কন্তে—তার সঙ্গে সদ্জাতের বাড়ীর কৃষ্ণঠাকুরেরা প্রেম করবে কেন? করতে পারে অবিশ্যি—যেমন বাবুদের বা বামুন কায়েতের ছোকরারা দু-চারজনে—তাদের ঘরের কন্তেদের সঙ্গে গোপনে রাত্রিকালে দেখাশুনো করে। তাতে নীচকুলের মেয়েদেরই সর্বনাশ হয়—বাবুদের ছোকরারা হাত পা ধুয়ে বাড়ী ঢোকে। দিনে চিনতে পারে না, বাড়ীর দোরে গিয়ে দাঁড়ালে—লোক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ছোটতে বড়তে, রাজাতে প্রজাতে, ধনীতে ভিখীরিণীতে প্রেম হয় না; করতে নেই। তাই সেদিকে সে তার ভাদুকে নিয়ে যায় নি। চন্দনপুরে এসে—আলাপ হল ফটিক দাসের সঙ্গে। সংসারে একা মানুষ। ভালমানুষ। কারুর ভালোয় নেই, মন্দতে নেই; পুতুল বেচে খায়। বাড়ীতে বিড়ি টানে—পুতুল গড়ে। ও-ই ওর বাড়ীতে এসেছিল ভাদু নিয়ে গান গাইতে।

ফটিক বলেছিল—তোমার ভাদুমণি আছে—আমার যাদুমণি আছে। দেখবে?

বলে সে বের করে এনেছিল মাটির রাখালকৃষ্ণ, এক হাতে পাঁচনি—অন্য হাতে বাঁশী।

নসুবালা বলেছিল—হায় হায় হায়—আমার ভাদুমণির কি কপাল গো, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল। আঃ ছুঁড়ির যৈবন বয়ে যাচ্ছিল—কালাচাঁদ আসে নাই। মা গো· তাই কি জানি যে এই বাড়ীর দোরে দাসের ঘরে বাসা বেঁধে লুকিয়ে বসে আছে? লে—পেনাম কর। ভাদু—পেনাম কর। শোনা নাচ গান।

সেদিন নাচগান সেরে যখন বাড়ী ফিরেছিল—তখন তাদের বেয়াই বেয়ান পাতানো হয়ে গেছে; তার ভাদুরাণী সেদিন ফটিকদাসের বাড়ীতে যাদুমণির কাছে থেকে গিয়েছিল। রেখে এসেছিল নসুবালা।

এই বেশ হয়েছে। মেয়ের মা হিসেবে যা চেয়েছে—তাই পেয়েছে। "গরীবের মেয়ে ছোটজাতের মেয়ে,"—সে তার ভাদু পুতুলের মুখের কাছে হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—মা, —বামুন কায়েত সদ্‌গোপ—এদের ঘরের ছেলেপুলের দিকে তাকাস না মা। তাকাতে নেই। ওরা সব টিয়েপাখি। সবুজ রং লাল ঠোঁট বাহার অনেক—কিন্তুক মা—ওরা আসে ধানের সময়, ধান খায়—তার পরেতে ধান ফুরুলে ফুরুৎ ধা। তার চেয়ে আমাদের শরক শালিক ভাল। আমি যা বাছলাম—এ শরক শালিকের চেয়েও ভাল—কালো কোকিল। হুঁ। মন পাতিয়ে থেকো। ন্যাই (ঝগড়া) করো না। নাচ গান শুনিয়ো। হোক।

পুতুলটিকে এই কথাগুলি বলে, এসেছিল নিজের বাড়ী এবং পরের দিন সকাল হতে-না-হতে গিয়ে ডেকে তুলেছিল ফটিকদাসকে।

—বেয়াই হে—ওঠ—ওঠ! শুনছ, ওঠ!

বিরক্ত হয়েছিল ফটিক।—কি? অঃ এখনও কাক কোকিল বাসা ছাড়ে নাই—। কি ব্যাপার? ভাদুকে রেখে ঘুম হয় নাই বুঝি?

—তুমি বেরসিক। আমি জানতাম তুমি রসিকজনা!

—ক্যানে? বেরসিক তুমি! ভাদুর যাদুর ভোরের ঘুম ভাঙাতে এসেছ!

—এসেছি সাধে! কোকিলে কি বলছে শোন!

—কি বলছে?

—'কত মিছে যাবে ভাদু কালো মানিকেরই কো-লে!' ওহে লোকজন উঠলে তাদের ছামনে ভাদু আমার তোমার যাদুমণির ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে কি করে, কোন্ মুখে। বলে— "পিরীতি করিবি—গোপনে রাখিবি—তবে তো থাকিবি সুখে।" ওর সব রস সব সুখ—ওই তো ওইখানে! নাও—নাও। কুঞ্জভঙ্গ কর। আমি চাদর ঢাকা দিয়ে ভাদুকে নিয়ে পালাই! তুমি দেখ যাদুমণির গালে—কি কপালে কি বুকে সিঁদুরের দাগটাগ লেগেছে কিনা। লেগে থাকলে মুছে দাও, নয়তো নীল রঙে তুলি দিয়ে ঢেকে দাও।

দুটি সৃষ্টিছাড়া মানুষের এই সৃষ্টিছাড়া খেলা। পাগলই হোক আর বর্বর হোক আর কুসংস্কারাচ্ছন্নই হোক—মরণ যতদিন না হয়—ততদিন ওরা থাকবে এবং ততদিন ওরই মধ্যেই ওদের পরম আনন্দ। পুতুল নিয়ে খেলে দিন কেটে যায়। হয়তো বিধাতার সৃষ্টির অপব্যয়,

হয়তো পৃথিবীর –দেশের—এই অঞ্চলের জমাখরচের হিসেব-নিকেশের খাতায়—ওরা অমার্জনীয় বাজে খরচ।

ওদিকে কাল চলেছে—দ্রুততম গতিতে। মোটরের চাকায় রেলগাড়ীর চাকায় ঘণ্টায় অন্ততপক্ষে তিরিশ মাইল বেগে। এরা পুরনো কালের পুরনো ক্ষয়ে-যাওয়া বাঁশের লাঠি ধরে কোনরকমে পায়ে হেঁটে ঘণ্টায় দু মাইল গতিতে চলেছে। সব থেকে আশ্চর্য লাগে নম্বুর—পাশের গাঁয়ের চক্রবর্তী বাড়ীর গেছো মেয়েটা বাইসিকিল চড়ে ইস্কুল আসে। এ গাঁয়ে নিত্য দত্তের আইবুড়ো ধিঙ্গি দস্যি মেয়েটা বাইসিকিল চড়ে বাজার যায়। এই মেয়ে দুটো পাশ কাটিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে চলে যায়। যাবার সময় আচমকা ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়—ঠিনি-নি-নি। চমকে উঠে নম্বু হাত দুই সরে গিয়ে বলে—হেই মা গো! মেয়ের এত বাড়! তারপর খুব হাসতে আরম্ভ করে—বাবারে বাবা—এতও দেখালে হরি।

বেয়াই ফটিক দাস বলে—হয়েছে কি বেয়ান এখন ; এই তো কলির সন্ধ্যেবেলা।

নম্বু বলে—না ভাই, সকাল বেলা বল। রাত দোপরে বুড়ো বয়েসে দেখবার তরে জেগে বসে থাকতে পারব না। আর রাত্রি বেলার খেল্ তো চিরকালের খেল্ হে! যা ঘটবার দিনের বেলায় ঘটুক, দেখে শ্যাব করে সন্ঝে বেলা ঘর যাব।

—তা তাই বলছি। সকাল বেলাই হল। দিনের বেলাতেই সব ঘটবে। ঘটছে। দেখতে তো পাচ্ছ গো।

—'তা দেখছি। কিন্তু বেলা বেড়ে যেছে—' বলেই নম্বু বলে—এই দেখ জিভখানার কাণ্ড দেখ দিকিনি। ফস্‌কে বলে ফেলিয়েছে—'যেছে' ; যাচ্ছে—যাচ্ছে। কেমন কিনা, "চন্নপুর ছিল বাঁশের বন—পাতা পড়লে কুলো হত, ডাল পড়লে ঢেঁকি হত, ছিল শেয়াল সাপের বিচরণ। কে জানে কি হল—মন আমার হরি বলো—সেই চন্নপুর হয়ে গেল সিংহাসন।" দুখের মধ্যে রাজা নাই ; রাণীমা নাই ; গিন্নীমা নাই—আছে শুধু ফতোবাবু—আর বিবির দল। এখানে হচ্ছে-খাচ্ছে-যাচ্ছে-গেচ্ছে বলতে হবে!

মুহূর্তের নিশ্বাস নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেসে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—এখন চল। বেলা হয়ে "যা-চ্ছে"—বেরিয়ে পড়। তুমি লাও পুতুলের ডালা—আমার ঝুলি কাঁধে। চল পালা সেরে আসি আর নতুন কালের খেলা দেখে আসি নয়ন ভরে।

সপ্তাহে দুদিন হাট—সোমবার আর শুক্রবার ; এ দুদিন হাটেই কাটে একটা বেলা। ফটিকদাস চ্যাটাই বিছিয়ে পুতুল সাজিয়ে বসে। নম্বুবালা হাতে ঘুঙুর বেঁধে ডুবকী বাজিয়ে গান গায়। বাকী পাঁচ দিনের একদিন গাঁয়ে, বাকী চার দিন চারপাশের গ্রামগুলিতে পালা করে চলে যায় তারা। কোন কোন দিন এতে ছেদ পড়ে যায়। হঠাৎ চোখে পড়ে চারপাশের গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করেছে—বি. ডি. ও আপিসের ধারেকাছে। উত্তর দিকে বাজারের প্রধান রাস্তা, চওড়া রাস্তা—এখন আবার পিচ পড়েছে ; দুপাশে দোকান পশার ; মিষ্টির দোকান, মণিহারির দোকান, দর্জির দোকান, সিমেন্ট লোহা-লটকোনের দোকান তো অনেক। দত্ত

মশায়দের ধানচালের গদী, মণ্ডলদের গদী, দাসদের গদী—একটু ভিতরে সাহা মশায়ের ধানচাল লটকোনের কারবার, বড় সাহার গাঁজা মদ আপিংয়ের সঙ্গে কাপড়ের দোকান ; এরই ভিতরে মধ্যে মধ্যে চায়ের দোকান—চেয়ার টেবিল সমেত ; তার মধ্যে গোটা দুয়েক চুলকাটা সেলুনও হয়েছে ; দস্তুরমত ঘাড়ে পাউডার মাখিয়ে ক্লিপ দিয়ে চুল ছাঁটাই হয়। স্টেশনের ধারে গোটা চারেক কয়লার ডিপো। পূর্বে পশ্চিমে-দক্ষিণে ত্রিভুজের মত আকার দিয়ে তিনটে রাইস মিল, একেবারে পশ্চিমে, পশ্চিম কোণের-রাইস মিলটা ছাড়িয়ে ছেলেদের স্কুল-বোর্ডিং, তারও ওদিকে—আগে ছিল চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী, এখন হয়েছে হেল্‌থ সেণ্টার, পঁচিশটে বেড আছে—দরকার হলে বাড়িয়ে তিরিশটাও করা হয়। তারও পশ্চিমে গ্রামটা আরও খানিকটা বেড়ে গিয়েছে সড়কের পাশে পাশে। সড়কটা গিয়ে মিশেছে একটা বটগাছতলায় আর একটা আরও বড় সড়কের সঙ্গে—যেটা গ্রামের দক্ষিণ দিক বেড়ে বাইরে বাইরে মাঠের বুক চিরে চলে গেছে নদী পার হয়ে—এ জেলা থেকে বর্ধমান জেলার প্রান্তভাগ দিয়ে অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমঘাট পর্যন্ত। আবার গঙ্গার ওপারে অগ্রদ্বীপ থেকে—চলে গেছে—মুর্শিদাবাদ। নতুন এই বসতি শুরু করেছিল সাঁওতালরা, দুমকা জেলার জুতাসেলাই যারা করে—সেই সব আধা হিন্দুস্থানী মুচিরা—তারপর তাদের বসতি কিনে বসেছে ব্যবসায়ীরা। এরা বড় ব্যবসায়ী নয়, ছোট। খুচরো ধানচাল কেনে। খান দুই চায়ের দোকান—একটা মিষ্টির দোকান আছে। কয়েকখান লটকোনের দোকান। একজন কামার এসে কামার-শাল খুলেছে। জন দুয়েক দুমকার কাঠমিস্ত্রী কাঠের কারবার করেছে। গাড়ীর চাকা, ঘরের দরজা জানালা তৈরী করছে দুমকার ডাঁসা শাল থেকে। এর মধ্যে আবার আটঘড়া গাঁয়ের সেখেদের ছেলে—হাফিজ সেখ করেছে চেয়ার টেবিল তক্তাপোশের কারখানা। আবার রকমারি যত ফ্যাসানের 'বেরাকেট' তৈরী করছে জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখবার জন্তে ; দেওয়াল-আলনা, তাও তৈরী করে। কেনে প্রায় সবাই। সবাই অর্থে নস্তুদের পাড়ার মানুষেরা—ফটিকদাসের মত মানুষেরা বাদে সকলে, গরীব গেরস্ত যারা—যাদের কাপড়জামা ময়লা এবং ছেঁড়া সেলাই করা তারাও কিনেছে।

আরও যে কত কারখানা হবে—সে নস্তু ফটিক জানে না। তবে গুজব তাদের কান এড়ায় না। শুনছে নাকি কলেজ হবে, আর গেরামের দক্ষিণে যে বড় সড়ক চলে গিয়েছে গঙ্গার কূল—তার দক্ষিণে হবে সারি-সারি সরকারী আপিস।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল নস্তুবালা।—ও বেয়াই।

ফটিকদাসও দাঁড়িয়েছিল—সে বললে—তাই তো হে! এত ভিড় ?

দূরে ভিড় জমেছে।—কি বেপার ?

বি. ডি. ও. আপিস থেকে ওদিকে ইস্কুল, সাবরেজেষ্ট্রী আপিস হাসপাতাল পর্যন্ত ভিড় থাকেই। এখান থেকে ওখানে রাস্তাটা মাপে বড় জোর সিকি মাইলের কিছু বেশী, এই সিকি মাইলে দেড়শো দুশো লোক ছড়িয়ে থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। দশটায় ভিড়টা বাড়ে। আবার চারটে থেকে কমতে সুরু করে। আজকের ভিড়টা বি. ডি. ও. আপিস পার হয়ে

একটু আগে আশু সিংয়ের ডাক্তারখানা হতে ওদিকে থানা পর্যন্ত জমে রয়েছে।

ফটিকদাসের অনুমানের পরিধি নসু থেকে বেশী। সে বললে—খুনখারাপী বটে!

—খুনখারাপী? হেই মা গো!

—হুঁ।

—কি করে বুঝলে?

—ইদিকে আশু ডাক্তারের ডাক্তারখানা—উদিকে থানা। ডাক্তার বেঁধেছেঁদে দিচ্ছে—আর উদিকে থানাতে নালিশ হচ্ছে। বুঝেছ?

—পালিয়ে এস। উ মুখে যেয়ো না। চল বাঁয়ে ফিরি। ইস্টিশানের দিকে যাই। এস!

—চল কেনে, দেখে আসি!

—না। কাজ নাই।

শান্ত কণ্ঠে মৃদুস্বরে কথা বলে ফটিক—কোন খোঁচাতেই—কোন বাতাসেই তার জীবন এতটুকু বেশী উত্তপ্ত হয় না, সে তেমনিভাবেই বললে—তুমি যাও। আমি তো আপিসের ছাম্‌নে বসব—তাই বসি গে, রথ দেখা কলাবেচা দুইই হবে।

নসুর থানাকে যত ভয়—রক্তারক্তিকে তত ভয়। সে সত্যিই মোড় ফিরল।—হরিবোল—হরিবোল, ভাদুর মা—তোর দেখে কাজ নাই; চল ভিন্ দিকে চল।

আপন মনেই বলতে বলতে চলে—মা মনসা বেনে বেটাকে বলেছেন—সব দিক চেয়ে দেখো মা—দখিনদিক পানে নয়ন ফিরিয়ো না। যেদিকে খুনখারাপী রক্তারক্তি লালপাগড়ী—সেই দিকই দখিন দিক। পালা ভাদুর মা—পালা।

২

ব্যাপার বা ঘটনা একটি নয়, দুটি।

আশু সিংহীর ডাক্তারখানায় চন্দনপুরের উত্তরপাড়ার বড়বাড়ীর বড় তরফের গোপাল চৌধুরীকে নিয়ে এসেছে। চৌধুরীর মাথা ফেটেছে। কপালের ঠিক উপরেই প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ক্ষত। মুখ থেকে বুক পর্যন্ত রক্তে ভেসে গেছে। সঙ্গে তার ছেলে শুভেন্দু। ম্লান মুখে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে, ডাক্তারখানার দরজার বাজুতে ঠেস দিয়ে। ভিতরে আশু সিংহী গোপালবাবুর মাথাটা ড্রেস করছে।

সামনে রাস্তায় লোক জমে আছে। টুকরো টুকরো কথা এখান ওখান থেকে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

—নিজেই।

—নিজেই?

—হ্যাঁ, একখানা কাঠ নিজেই মাথায় মেরেছে।

—কি ব্যাপার ?

ভিতর থেকে চৌধুরীর আর্ত চীৎকার ভেসে এল—না—না—এমন করে মরার উপর খাঁড়ার ঘা মেরো না! জলে যাচ্ছে। ছেড়ে দাও।

বাইরে লোকজনের মধ্যে থেকে কেউ বলে উঠল—আরও জলবে। এখন হয়েছে কি ?

—কে—রে ? প্রশ্ন করলে এদিক থেকে অন্য কেউ। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে—নীরবে প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলে। শুধু শুভেন্দু ফিরেও তাকালে না। এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিলে না। কিন্তু কয়েকজনই মাটির দিকে চেয়ে রইল। হয়তো বা,—তারা মুখ তুললে তাদের মুখে চাপাহাসির একটি সূক্ষ্ম রেখা দেখা যেত।

—এই এই সর তো হে। পথ দাও তো!

কণ্ঠস্বর শুনে পিছনে তাকিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিল। ওপাশ থেকে কথা উৎক্ষিপ্ত হল—এই, এলেন।

—হুঁ। চাই।

—উঁহু—কংগ্রেসী মোড়ল।

—দূর—রায়বাহাদুর। কংগ্রেসী রায়বাহাদুর।

চন্দনপুরের ভবানী মুখুজ্জে—অনেককালের কংগ্রেসী। জেলখাটা লোক। স্বাধীনতার পর থেকে অবশ্যই মাতব্বর লোক। ভবানীবাবু একবার সেদিকে ফিরে তাকালে—কিন্তু বললে না কিছু। উঠে গেল ডাক্তারখানার বারান্দায়।

শুভেন্দু এতক্ষণে নড়ল—সে হাত বাড়িয়ে ওপাশের বাজুখানা ধরে বললে—যাবেন না আপনি।

ভবানীবাবুর কপালে কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠল—বিস্মিত হলেন—প্রশ্ন করলেন—যাব না ?

—হ্যাঁ। উনি খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন। আপনাকে দেখলে হয়তো বিশ্রী কাণ্ড করবেন।

—মানে ? আমার দোষটা কোথায় ?

—ঘটনার পর উনি চেঁচাচ্ছিলেন—এর চেয়ে যে ইংরেজ ভাল ছিল।

থমকে গেল ভবানীবাবু। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বোধ করি কথা খুঁজে পেলে, বললে—থানায় ডায়রী করেছ ?

—না।

—করবে না ?

—না।

—হুঁ। তা হলে কি করবে ?

হেসে শুভেন্দু বললে—বাবা বলছিলেন—ডায়রী ভগবানের কাছে লেখা হয়ে গেছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভবানীবাবু নেমে চলে গেল।

ঘটনাটা বিস্ময়করও বটে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বলতে হয়—বিস্ময়েরই বা কি আছে এতে।

চৌধুরীবাড়ী এখানকার দ্বিতীয় সম্পদশালী বাড়ী ছিল। গোপাল চৌধুরীর বয়স এখন বাহাত্তর চুয়াত্তর, তাঁর বাপের আমলে ওঁদের প্রতাপে বাঘে বলদে একঘাটে জল না-খাক—চোর এবং গৃহস্থ শান্তিতে পাশাপাশি বাস করত। চোরকে খেতে দিতেন—গৃহস্থকে চুরি হলে থানায় ডায়রী করতে দিতেন না, এবং মাল তিনি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করতেন চোরকে। জরিমানা নিজে আদায় করতেন। তাঁর আমল বলতে পঞ্চাশ বছর আগেকার আমল—উনিশ শো সাত আট সাল; সে আমলে কেউ তাঁর বা গ্রামের সম্মানিত বাবুদের সামনে দিয়ে যাবার সময়—কম হেঁট হয়ে প্রণাম করে গেলে—ধরে এনে মাথাটা মাটিতে ছুঁইয়ে প্রণাম শিখিয়ে দিতেন। বছরে দুটি পার্বণে গ্রামের ব্রাত্যসমাজ থেকে সপ্তগ্রামী ব্রাহ্মণ-সমাজকে নিমন্ত্রণ করে—পরম সমাদরে খাওয়াতেন—হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করতেন পেট ভরেছে কিনা। আবার বেগারও নিতেন। ব্রাত্য সমাজের বধূ কন্যাদের নিয়ে উচ্চ সম্প্রদায়ের যুবকেরা সে-কালে ব্যভিচার করত—এটাকে তিনি দূষ্য মনে করতেন না। সে ক্ষেত্রে ব্রাত্যেরা ক্ষোভ প্রকাশ করলে—তিনি ডেকে তাদের ধমকে দিতেন—না, এসব নিয়ে গোলমাল কর না। নিয়ে গিয়ে টাকা যদি না দিয়ে থাকে তো বল। না-দিয়ে থাকলে টাকাটা দিয়ে দিতেন।

তিনি মারা গেলে তাঁর ছোটভাই পেয়েছিলেন অধিকার। সে অধিকারকে তিনি তাঁর কালের উপযোগী করে সংশোধন করে নিয়েছিলেন। তাতে বাঁকা তলোয়ারের চেহারা পাল্টে সোজা তলোয়ারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তলোয়ারের স্বভাব পাল্টায় নি। তিনি এই অধিকারের উপর একটা সরকারী অধিকার পেয়েছিলেন—প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎগিরির অধিকার।

তাঁর মৃত্যুর পর—সেটাও এখন থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে—বাইশ তেইশ সালে—অধিকার এসেছিল এই গোপাল চৌধুরীর হাতে। গোপাল চৌধুরী লেখাপড়া শেখেন নি—সেই হেতু কুনো লোক; তবুও প্রথম প্রথম আধুনিক হবার চেষ্টা করেছিলেন, ইউনিয়ন বোর্ডে—গ্রামের পাঁচটা কমিটিতে সভ্য ছিলেন, থিয়েটারও করতেন, সভা হলে যেতেন, কিন্তু কোনটাতেই সফল হন নি, নিজের পায়ের ছাপ ফেলতে পারেন নি। অধিকার আপনি গেল, তিনি ঘরে ঢুকলেন, কেবল ঘর থেকে যতটুকু হাত যায় তাঁর সম্পত্তির অধিকারের বলে—ততটুকুই আঁকড়ে রইলেন প্রাণপণে। ঘর থেকে কাছারী, কাছারী থেকে গোয়ালবাড়ী, মাঠে যেখানে তাঁর জমি আছে সেখান পর্যন্ত এবং বছরে মাস দু'তিন—মহালে মহালে—নিজের গণ্ডী নির্দিষ্ট করে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই গণ্ডীর মধ্যে পূর্বপুরুষের ধারায় এবং তাঁদের প্রতাপের স্মৃতির প্রভাবে—শাসন করেছেন, পালন করেছেন, কখনও কখনও হুঙ্কারও ছেড়েছেন যতটুকু পেরেছেন। ক্রমে তিরিশ সাল থেকে দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে তিনি পাল্টালেন কতটুকু ভগবান জানেন—তবে সভয়ে হাতের মুঠো আলগা করলেন। এই পরিবর্তনে সব জমিদারের অবস্থা খারাপ হল। তাঁরও খারাপ হল। তিনি মন্ত্র দীক্ষা আগেই

নিয়েছিলেন—এখন তাই নিয়েই মগ্ন হতে চেষ্টা করলেন। বিরোধ তিনি কারুর সঙ্গেই করতেন না। করলেও দেওয়ানী মতে আদালত মারফৎ। তারপর দেশ হল স্বাধীন। সব লোক নাকি হল সমান। হতচকিত হয়ে তিনি আরও ঘরে ঢুকলেন—হে ভগবান! সব সমান! চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, বেগার জমিদার, পায়ে মাথায়, সব সমান! পরিত্রাণ কর মা জগজ্জননী, আর নয়।

তারপর এই সম্ভ গেল জমিদারী। সব জমিদারী গভর্নমেণ্ট নিলে। তিনি তাঁর গোয়ালবাড়ীর বাইরের এলাকায় পা-দেওয়াই ছেড়ে দিলেন। গোয়ালবাড়ীর পাশেই একটি বড় পুকুর, ভাল জল, সকল লোকে স্নান করে আর এই পুকুরের উত্তর পাড়ের উপর ব্রাত্যদের বসত। বাউড়ীপাড়া। এ পাড়া চৌধুরীবাড়ীর হাতের মুঠোর আমলকী। এই পুকুরে তিনি কিছু কাঠ চিরিয়ে ডুবিয়ে রাখিয়েছিলেন—পাকা কাঠকেও পাকা করবার জন্য। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন—কাঠ চুরি যাচ্ছে। নিজের সীমানায় দাঁড়িয়ে চাকরবাকরকে বেশী-ই একটু তম্বি করলেন। কিন্তু তাতেও বন্ধ হল না। কোন সন্ধান পেয়ে আজ ভোরে তিনি উঠে গোয়াল-বাড়ীতে এসেই দেখলেন—একজন বাউড়ী একখানি কাঠ কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসে পিছন থেকে ধরলেন তার চুলের মুঠোয়। হারামজাদ!

ধপ্ করে কাঠখানা ফেলে দিয়ে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে মালিককে দেখে থমকে গেল।

গোপালবাবু চুল ছেড়ে দিয়ে হেঁট হয়ে নিজের পায়ের চটি তুলে নিলেন—চোট্টা কাঁহাকা—।

অঘটন ঘটল। লোকটা খপ করে হাত বাড়িয়ে চটিটা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরই মাথায় বসিয়ে দিয়ে ছুটে পালাল।

বজ্রাহতের মত স্পন্দনহীন হয়ে গেলেন গোপালবাবু। তারপর যা হল সে কল্পনাতীত। হয়তো বা গোপালবাবুর কল্পনাতেও তা ছিল না, বোধ হয় একান্ত আকস্মিকভাবে ঘটে গেল, সেইখানে পড়েছিল একটা টুকরো কাঠ। হ্যাড়া বাউড়ী বিক্রী করবার জন্ম চেরাই কাঠখানা নিয়েছিল কাঁধে এবং ঘরে পোড়াবার জন্ম টুকরোটা নিয়েছিল হাতে, বা দুটোই ছিল কাঁধে—ফেলবার সময় দুটোই পড়েছিল পাশাপাশি; গোপাল চৌধুরী মিনিটখানেক পর স্তম্ভিত-ভাব কাটতেই নিদারুণ ক্রোধে বা আত্মগ্লানির ক্ষোভে কাঠখানা কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে নিজের কপালে, যেখানে হ্যাড়া তাঁকে তাঁর চটি দিয়ে আঘাত করেছিল—সেইখানটাতে আঘাত করে-ছিলেন এবং চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন—এই নে!

কপালটা গেল ফেটে এবং তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে গেলেন পড়ে। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে খবর পেয়ে ছুটে এল শুভেন্দু, তার ছোট নবেন্দু; গোপালবাবুর খুড়তুতো ভাই নেপালবাবু এবং তার ছোট ভূপালবাবু। তাঁরা এলেন—দেখলেন রক্তাক্ত মুখে গোপালবাবু পড়ে আছেন—সমস্ত বাউড়ীপাড়ার লোক দূরে দূরে আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে নি।

শুভেন্দু কাকাদেরও ছুঁতে দেয় নি গোপালবাবুকে। ওদের ঘরে ঘরে মনোমালিন্য মর্মান্তিক। বলেছিল—না। সংসারে আমাদের কেউ নেই, আমরা একা। দয়া করে

আমাদের ব্যবস্থা আমাদের করতে দিন।

তারপর গাড়ী করে নিয়ে এসেছে আশু সিংয়ের ডাক্তারখানায়। হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায় নি। আশু ডাক্তারকে বাড়ীতেই ডাকত—ডেকে ফি দেবার মত অবস্থা আছে, কিন্তু তাতে দেরি হত ডাক্তারকে পেতে। ডাক্তারখানার রোগীদের ফেলে কলে আসা সহজ নয়। কেমন করে এমনটা ঘটল—সে কথা শুভেন্দু গোপনে ডাক্তারকে বলেছে, কিন্তু প্রচার হয়ে গেছে, বাতাসে ভেসে এসেছে।

"আরও জলবে। জলার এখন হয়েছে কি ?"—কথাটি যে বলেছে—তাকে অন্য কেউ না চিনুক শুভেন্দু চিনেছে। সে হল সোনাডাঙার সতীশ আচার্যি। একদিন সে শুভেন্দুদের বাড়ীতেই রান্না করত, ঠাকুর ছিল। সতীশদের সমাজে কন্যার জন্য পণ দিতে হয়—বা হত। অবশ্য অবস্থা ভাল যাদের—তাদের ছেলের এবং লেখা-পড়া জানা ছেলের কথা আলাদা, এবং বামুনঠাকুরের বৃত্তিধারী পাচক ছেলের কথা উল্টোদিকে আরও আলাদা—পণ দিয়েও সেখানে কন্যা মেলে না। সতীশের সম্বল ছিল একটি—পুরুষালি চেহারা। ওই মূলধনে এক অব্রাহ্মণ বাড়ীর একটি ভ্রষ্ট চরিত্রা মেয়েকে নিয়ে এসেছিল—ঘর বাঁধতে। গোপালবাবুর সঙ্গে তাঁদের মহালে গিয়ে সেখানেই হয় প্রেমের সূত্রপাত এবং সে-দফা নিরীহের মত বাবুর সঙ্গে ফিরে আসে। কিছুদিন পর একদা রাত্রে সেই গ্রামে গিয়ে তাকে নিয়ে এসে চন্দনপুরেই লুকিয়ে রেখেছিল। কথাটা প্রকাশ হলে—গোপালবাবু রাগে কাঁপতে কাঁপতে তার গালে একটি চড় মেরে তৎক্ষণাৎ বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। এ সতীশ সেই সতীশ। সতীশ এখন যাত্রার দলে ভাত রান্না করে। সেই মেয়েটি এখনও তার কাছে আছে, এবং যাত্রার দলে ভাত রান্না ছাড়া সতীশ সভাসমিতিও করে বেড়ায় ঝাণ্ডা উড়িয়ে, লোকে বলে, ঐ চড়ের আক্রোশে।

সে লজ্জা সঙ্কোচ কাউকে করে না। নিজের মনের কাছে যেটুকু লজ্জা, তাও ঐ ঝাণ্ডার ঝাপটায় উড়ে গেছে। ভয়ও সে কাউকে করে না। তবু আজ ঐ কথাটা বলে সে মুখ নামিয়েছে। সেটা বোধ হয়—অনেকদিন ওদের বাড়ীতে ছিল বলে। অথবা অন্য কিছু ? হয়তো অন্তরে সমর্থন করলেও সতীশও আজকের ঘটনাটি প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করতে পারছে না।

আশু সিংয়ের ডাক্তারখানার ওদিকে আর একটা ভিড় জমে আছে। সে ভিড়টায় জমাট বেশী। অনেক লোক।

ওখানে বিস্ময় আছে, কৌতুক আছে। এতটুকু আহা উহুর কোন কারণ নাই। কৌতুক রসের পাকটা ওখানে প্রবল উত্তাপে ধরা গন্ধ ছড়িয়েছে। মধ্যে মধ্যে একজন হেঁকে উঠেছে—বাহা রে বাহা রে কলিকাল !

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মত দু-চারজন ধ্বনি তুলছে—তাঁহুরে তাঁহুরে।

অনেককাল আগে এখানে একজন চানাচুরওয়ালা আসত পূজার সময়। ছ'মাস থেকে গেঁজলে ভর্তি টাকা নিয়ে ফিরত। তার হাঁক ছিল—বাহা রে, বাহা রে ভাজা! তারপর ছড়া

বলত। সে সব ছড়ায় চল তো আর নেই, কিন্তু—'বাহা রে বাহা রে' শব্দটি এ অঞ্চলে শব্দমালা স্থায়ীভাণ্ডারে স্থান পেয়ে গেছে! কৌতুক রস কোনক্রমে গেঁজে উঠলেই—এই 'বাহা রে' শব্দটি জনতার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। আর তাঁহুরে শব্দটি এখানে প্রচলন করেছিল কোন এক লাজুক যুবক। কথাটা অর্থহীন। যুবকটি মাঠে ঘাটে একা হলেই আপন মনে চীৎকার করত—'বাহা রে'র সঙ্গে তাঁহুরের ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে বলেই বোধহয় একটা বললেই আরেকটা বেরিয়ে আসে।

আরও অনেক রকম কথার বুদ্বুদ উঠছে। উঠছে ফাটছে।

অর্থহীন কথা।

—শালা মারে ডাণ্ডা!

—ভো—কাট্টা!

—হুঁ!—হুঁ! কাটা ঘুড়ি লাট খেয়ে পড়ছে থানার বারান্দায়!

—গোঁত্তা খেয়ে পড়। দে পাক।

—সাত পাক। এক আধ পাকে হবে না!

কে একজন অতি উৎসাহ বা উৎসাহের মত্ততায় উল্লাস প্রকাশের ভাষা না পেয়ে বলে উঠল —চেল্—কিৎ—কিৎ—কিৎ—কিৎ!

সমস্ত জীবন যেন একটা প্রমত্ততা বহুদিনের মজা-পুকুরের পাঁকের মধ্যে গ্যাসের মত সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সামান্য আলোড়নেই তলা থেকে ঘুলিয়ে উঠছে উপরে—ফোয়ারার ধারায়।

ঘটনাটি অবশ্য নতুন না হলেও ঘটনাটির আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিটি নূতন। একেবারে নূতন।

একটি উনিশ কুড়ি বছরের যুবতী কুমারী। অধিবাসের অর্থাৎ গায়ে-হলুদের চিহ্ন গায়ে নিয়ে নতুন কাপড় পরে থানার বারান্দায় বসে আছে। মাথায় ঘষা চুল ফুলে ফেঁপে পিঠে এবং মুখের দু পাশ আংশিকভাবে ঢেকে ছড়িয়ে রয়েছে। সম্ভবত আমলার গন্ধও পাওয়া যাবে। না হলে সাবানের গন্ধ।

আজ তার বিয়ে।

রাত্রিতে বাড়ীর সকলে ঘুমুলে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল; লুকিয়েছিল চণ্ডীতলার জঙ্গলে। ভোরবেলা এসে উঠেছে থানায়।

বিয়ে সে করবে না। বাপ মা তার জোর করে বিয়ে দিতে চায়। সে থানায় এসেছে আশ্রয়ের জন্য।

তার বয়স আঠারো বছরের বেশী।

সে বিয়ে করবে না। থানা যদি তাকে আশ্রয় না দেয় তবে সে আত্মহত্যা করবে। তার জন্য দায়ী হবে থানা গবর্ণমেণ্ট।

এর আগে এই ঘটনা ঘটেছে। অনেক ঘটেছে। বিয়ের রাত্রে কনে নিখোঁজ হয়েছে।

অপবাদ রটেছে। কিন্তু হয়তো বা সেই দিন—নয় তো বা পর দিন তার দেহ পাওয়া গেছে নদীর দহে। কিংবা সেই দিনই মেয়ে বিষ খেয়েছে। এমনও হয়েছে, মেয়েকে পাওয়া গেছে আট-দশ মাইল দূরে ভিখারিনীর বেশে।

কারুর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া স্বতন্ত্র কথা। তার সঙ্গে এর মিল নেই। এ মেয়ে থানায় এসেছে—বাপ মা সমাজ সবার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। খারাপ মেয়ে হলে সে এই সুযোগে নিখোঁজ হত—থানায় আসত না। বাপ আসত থানায়। পথের ধারের জনতার কথাবার্তাগুলি এখানে, মৃদুস্বরে হচ্ছিল না। এখানে কোন বেদনা নেই। এখানে উল্লাস—উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস রয়েছে, তার প্রকাশ কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু মেয়েটি আশ্চর্য। তার কোন চঞ্চলতা নেই। সে স্থির হয়ে আছে।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে যেন পড়তে পড়তে এগিয়ে এল নসুবালা। স্টেশন থেকে খবর শুনে সে ফিরে এসেছে। তার থানা পুলিশের ভয় ঘুচিয়ে জেগে উঠেছে কৌতূহল।

—হেই মা। বিয়ের কনে পালিয়ে এসে থানায় এয়েছে। বলে বিয়ে করব না। জোর করলে মরব। গলায় দড়ি, বিষ, কাপড়ে আগুন, জলে ঝাঁপ, বঁটিতে গলা কাটা, ছাদ থেকে লাফানো—মরার তো হাজার পথ। হাজার কেন—লাখো পথ। কিন্তু সে পথ ধরে কে? এত সাহস কার?

যার এত সাহস সে কি মেয়ে গো! ডাকিনী না যোগিনী না ভেরষ্টা না পিশাচী না দেবতা! সে কি নসুবালার না দেখলে চলে?

নসুবালা এসে তার মুখের কাছে একটু হেঁট হয়ে ঝুঁকে দেখে দেখে বললে—হেই মা—তুমি—? তাই তো বলি! সীমে?

৩

হায় মন রসনা আমার—
একি তুই পারবি—গাহিতে—
নতুন কালের নতুন ভানুর নতুন মহিমে,
এক মুখে যে নারি কহিতে।

গুনগুনিয়ে গান ধরেছিল—নসুবালা।

ওই দিনই সন্ধ্যেবেলা।

মেয়েটিকে নসুবালা জানে। এ চাকলায় ভিক্ষাজীবী নসুর অচেনা বড় কেউ একটা নেই। বিশেষ করে আইবুড়ো বিয়ের যুগ্যি মেয়ে। কারণ সে হল ভানুর মা। কুমারী মেয়েদের

উপর তার, একটা স্নেহের টান আছে। তা নইলে সে ভাতুর যা হয় কেমন করে।

ওদিকে ফটিকদাস মাটি তৈরী করছিল, পুতুল তৈরী করবে। আজ একদিকে ওই হাঙ্গামা, অন্যদিকে সেটেলমেণ্ট আপিসে তিনখানা গাঁয়ের লোক এসে আর এক হাঙ্গামা জুড়েছিল। জমিদারী উচ্ছেদের পর জমি জেরাতের নতুন ব্যবস্থা বিলি হবে, তার আগে মাপ জোক হচ্ছে, কার কোন জমি—কতটা জমি—কি স্বত্বে দখল ক'রে লেখা হচ্ছে ; এরপর পরচা হবে। শোনা যাচ্ছে পঁচিশ একরের বেশী জমি কেউ রাখতে পাবে না, রাখলে সরকার নিয়ে নেবে। তারপর নাকি ভাগ করে দেবে—যারা গরীব, চাষ করে খেটে খায়, অথচ নিজের এককাঠা জমি নেই তাদের। কিন্তু—

ফটিকদাস কথাটা শুনেছে—ওই আপিসের সামনেই লোকেদের বলতে শুনেছে ; এবং শুনে সে বুঝতেও পেরেছে ব্যাপারটা। আজ এসেছিল আকুটি গ্রামের লোকেরা। তার মধ্যে চাষীভূষী গেরস্তরা এসেছিল হেঁটে এবং পাঁচখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী করে এসেছিল আকুটির ঘোষালবাবুদের পাঁচ তরফ। তারা প্রায় হাতাহাতি করে গেছে।

সেটেলমেণ্ট আপিসের পাশে দুটো গাছতলায় পাঁচখানা সতরঞ্জি বিছিয়ে বসেছিল বাবুরা। মধ্যে মধ্যে ঝগড়া,—মধ্যে মধ্যে হাসি-ঠাট্টা চলছিল। মধ্যে মধ্যে গালাগাল। মেজ তরফের মেজবাবুই এখন পাঁচ বাড়ীর মধ্যে বয়সে বড়। সারাদিন বারচারেক আফিং খেয়েছে আর যোগেশ দাসের দোকান থেকে বার আষ্টেক চা খেয়েছে, ঝিমিয়েছে, সিগারেট বিড়ি টেনেছে। ঝিমিনির মধ্যেই বোল কেটেছে।

ছোট তরফের ছোটবাবু এককালের শৌখীন লোক, কাঠকাঠরার আসবাবে বিলাতী ছবি পুতুলে ঘর সাজাবার তার ঝোঁক ছিল কোট প্যাণ্টলুন মিহিধুতি পাঞ্জাবি—দামী সাজ পোশাকের বাতিক ছিল—এখন অবস্থা খারাপ বলে ও সব ঝোঁক মন্দা পড়েছে। সেই ফটিককে ডেকে তার পুতুল দেখেছিল। কিনেছেও সব পুতুল দুটো করে! সেই সময় কথাগুলি মন দিয়ে শুনবার অবকাশ পেয়েছিল ফটিক। ওঃ! সে কি কথা।

গোমস্তা এসে বলেছিল—বাবু আপত্তি করছে ওরা! বলছে ওরা!—বলছে এ হবে না!

বাবু চোখ না খুলেই বলেছিল—ক'টাকা চাচ্ছে রে? ক' টাকা দিতে গিয়েছিলি?

—টাকা নেবে না।

—ওরে বাবাঃ। ভূতের বেটা বেহ্মদত্যি! সেটেলমেণ্ট করতে এসে টাকা নেবে না।

—বলছে ধরা পড়লে চাকরি যাবে। আর ধরা পড়বেই। বলছে যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে ফাল চলে?

—চলে। বল্ গিয়ে এ কাপড় সেলাই নয়, জমি সেলাই। ওতে ফালই লাগে। চালুনীর ফাঁক দিয়ে চালতে পারলে হাতী গলে যায়। বল গে হয়। মহাভারতে আছে। একটা মেয়ের একসঙ্গে পাঁচটা স্বামী হয় না তো মহাভারতে হল কি করে। পাণ্ডুরাজার পাঁচ পুত্তুরের কোন পুত্তুরটা পাণ্ডুর নিজের? তবু পাণ্ডুর রাজ্য কোন্ আইনে পায়? এ তো শালা বাপ থাকতে বেটারা ভিন্ন হয়েছে। নে এই দানপত্তরটা নিয়ে যা। বলবি ভাল করে

ঠাণ্ডা জলে চোখ ধুয়ে পড়তে। বলবি—পারলে এমনি করে ফালে সেলাই হয়। এ সূতোর সেলাই নয়। কাছির সেলাই। না—না! তারপরই ঘন ঘন বারকয়েক সিগারেট টেনে বলেছিল—দে-রে, ও ছোটখোকা আমার আফিংয়ের কৌটোটা!

আফিং খেয়ে বলছিল—কচু পোড়া খেলাম রে বাবা, সায়েবরা চলে গেল; নাড়াবুনেরা কীর্ত্তনে হল। জমিদারী নিয়ে আশ মিটল না। জমি নেবে। পঁচাত্তর বিঘের বেশী রাখতে দেবে না। চারটে ছেলে আমার, তাদের ভাগে তা হলে উনিশ বিঘেও পোরে না। এক বিঘের ধান বিড়ি তামাক; পাঁচ বিঘে অন্ত নেশা। তারপর তো অন্ত খরচ।

আবার একটু থেমে বলেছিল—শালা তিনদিনকা যোগী পাও বরাবর জটা। কোথা থেকে বাউণ্ডুলে চাকরের বেটা চাকরে দু কলম ইংরেজী শিখে হাকিম হয়ে বসেছে। আইন দেখাচ্ছে। আমরা বাবা সাতপুরুষ জমিদারী করে এলাম। মাকে মামার বাড়ী দেখায়।

এর সঙ্গে খারাপ কথার মিশেল ছিল অনেক।

চমৎকৃত হয়েছিল ফটিক কথার বাঁধুনীতে আর বাহারে। বলেই চলেছিল বাবু। তার ভিতর থেকে ফটিক আসল তথ্যটি সংগ্রহ করেছিল।

বাবুর জমি আছে তিনশো বিঘে। পতিত জমি তাও পাঁচশো বিঘে। জমিদারীর পতিত জমি চেক কেটে বউ বেটির নামে বন্দোবস্ত দেখিয়েছে। এখন জমির বেলা দেখাচ্ছে জমিতে চার ছেলের মালিকান। তিনি তাদের দানপত্র করেছেন। তা হলেই চার ছেলেকে পঁচাত্তর বিঘে খেয়ে যাবে!

তা বটে—একেই বলে ফাল দিয়ে কাছির দড়ির সেলাই। এ সেলাই টেনে ছিঁড়বে না। বলিহারি বুদ্ধি। ওরা চলে ডালে ডালে তো এরা চলে পাতায় পাতায়।

আর শুনেছে যেখানে যত পতিত আছে সেখানে নানান গাছের ডাল কেটে বসাচ্ছে। আর এ গাছ সে গাছের চারা বসাচ্ছে। ব্যস্ তা হলেই রক্ষে। বাগান হয়ে গেল। ফলের বাগান হলে জমি বাজেয়াপ্তির আইনে পড়বে না।

ওখানেই কে একজন ছোকরা বলেছিল—েল হালুয়া! নিবি জমি কেড়ে? করবি মানুষে মানুষে সমান?

এখানেই বেধেছিল হাঙ্গামা, বাবুদেরই কোন এক তরফ একজন প্রজাকে দিয়ে এতে আপত্তি দিয়েছে। বলেছে মেজবাবু বেনাম করছে।

ফটিকদাস মাটি তৈরী করতে করতে সেইসব কথা ভাবছে। নম্বুর গান তার কানে ঢুকছে না। সেও গান বাঁধছে। কিন্তু মুশকিল হল যে ফটিক গাইতে পারে না, গলা নেই। না থাক, তবু মন থামছে না। মনের মধ্যে কলি ঘুরছে—

পুরনো চালের শোন গুণ-মহিমে—
ফাল কাছিতে জমি সেলাই—ছিঁড়তে নারে ভীমে।

নম্বুবালার তখন নতুন কলি যুগিয়েছে।

নতুন কালের তপ্ত খোলায় কনকচূড়ের খই—
ভাদ্দুর আমার মুখ ফুটেছে—ও মন রসনা আমার—
শুনে যা লো সই।

নবীনপুরের এক আঁজলা কনকচূড়ের খই ওই মেয়ে! ডাকনাম—কনক।

নবীনপুরের অমর চক্কোত্তির মেয়ে—ভাল নাম—সীমা। ওই ওই তার কনকচূড়ের ধান। লোকে বলে গেছো মেয়ে—একটা ভাঙা সাইকেলে চড়ে ইস্কুলে আসত। গত বছর পর্যন্ত এসেছে।

অমর চক্কোত্তি এ কালের বিচিত্র মানুষ। নন্দু বলে, না পোলোয়া না খিচুড়ী—তুমি খিচুড়ী। ওর মধ্যে নাই কি? চক্কোত্তি নয় কি?

চক্কোত্তি—বামুন—হা তা বটে। কে বলবে নয়? ওদের বংশ চণ্ডীতলার সেবাইত ক'ঘরের একঘর,—পালা পড়লে চান ক'রে কে'টের কাপড় প'রে কপালে সিঁদুরের টিপ্ প'রে চণ্ডীতলায় যায়। ভাগ নিয়ে ঘরে আসে। মাসে আটদিন পালা।

ইস্কুলে পড়ে একটা-পাশ-করা লোক, রেজেস্টারী আপিসে দলিল লিখে রোজগার করে বারমাস। আটঘড়ার শেখজী—আমজেদ আলির সঙ্গে এক তক্তপোশে বসে ওখানে কাজ করে, একসঙ্গে বসে চা খায়, লোকে বলে মদও খায়, কোন কোন দিন রাত্রে একসঙ্গে খায় দায়। শেখ মুরগী রাঁধে। সে অবিশ্যি আঙুলের আড় দিয়ে করে। আবার জেলার কাগজে বেনামী চিঠি লেখে। লোকে তারিফ করে, চক্কোত্তি এমন রসিয়ে লেখে! আর দারোগা হাকিম জমিদার কাউকে ছাড়ে না। ভুবনপুরে যাত্রার দল আছে, সেই দলে আবার এ্যাক্টোও করে।

বাবাঃ, সে কি তেজ চক্কোত্তি ঠাকুরের! যখন বিশ্বামিত্র সেজে নামে, তখন যত গোলমাল থাকুক আসরে—সব চুপ হয়ে যায়। ওরে বাবা—

—দিনু শাপ—সবংশে নির্বংশ হবি—
অনন্ত নরকে যাবি—আরে রে দুর্মতি।

সে শুনে লোকজনের বুক গুরগুর করে ওঠে। মনে হয় হাত জোড় করে ছুটে গিয়ে বলে—হেই চক্কোত্তি ঠাকুর, থাম বাবা, রাগ খানিক থামাও। ওরে বাবা, এত রাগ! হেই মাগো। নিব্বংশ বলতে আছে! শুধু এই নয়, সে আমলে চক্কো'ত্তি স্বদেশী করে জেল খেটেছিল তিন মাস। তখন খদ্দর পরত। এখন খদ্দর পরে না। তবে ভোটের সময় গাজনের ঢাকীর মতো ঢাক বাজিয়ে নেচে বেড়ায়। বক্তৃতাও করে।

৪

অমর চক্কোত্তির ছেলে নাই, আছে চার মেয়ে। এ মেয়ে সেজ অর্থাৎ তৃতীয়া। ভাল নাম সীমা। ডাকনাম কনক। হয়তো কনকই আসল নাম। কিন্তু পর পর দুই মেয়ের পরও

যখন কনক হল—তখন নাম হল সীমা। বড় মেয়ে বনলতা—মেজ স্বর্ণলতা—তারপর মিলিয়ে হয়েছিল কনকলতা। কিন্তু আর যেন মেয়ে না হয় সেইজন্ত পাল্টে রাখা হয় 'সীমা'।

আর্ণাকালীর মত নামগুলি অমর চক্কোত্তির পছন্দ হয় নি। সীমার পরও আবার মেয়ে হয়েছিল—তার নাম 'ক্ষমা'। তারপরও মেয়ে—কিন্তু সে মেয়ে বেঁচে নেই। মেয়ে-মা এক সঙ্গে গিয়ে অমর চক্কোত্তি খালাস পেয়েছে।

দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। তখন চক্কোত্তির জমিজমাও ছিল এবং দেশে একটু খাতির না হোক আদর ছিল। জেলখাটা লোক! জমি বেচে বিয়ে দিয়েছে তাদের। তারপর থেকে চক্কোত্তি পাল্টেছে। তার আদর গেছে।

তার কারণ মদ। এবং আরও একটি কারণ। এক বিধবাকে ঘরে এনে রেখেছে। ও'দিকে আশ্চর্যের কথা—চণ্ডীতলার পাওনা কমে এসেছে। এখন চণ্ডীমায়ের একরকম নিজেরই চলে না—তা দু আনার অর্ধেক অংশের শরীক চক্কোত্তির চলবে কি করে।

চক্কোত্তিও তাতে দমে নি। সে মেয়ে সীমাকে আগে থেকেই সাইকেল চড়া শিখিয়ে নিজের ভাঙা সাইকেলটা তাকে দিয়েছিল। সীমা চন্দনপুর মাইনর ইস্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে পাশও করেছিল। চক্কোত্তি তাকে বই কিনে দিয়ে বলেছিল—তা হলে তুই পড়। তোর জন্তে আমি নিশ্চিন্তি। দরকারমতো হাইস্কুলে যাবি। পাশেই রেজেস্টারী আপিসে থাকি। মাস্টারদের কাছে দেখিয়ে-টেকিয়ে নিয়ে আসবি।

সীমা মাইনর গার্লস স্কুলে পড়বার সময় রেসিটেশন করত ভাল। চক্কোত্তিই শিখিয়েছিল। তখন গার্লস স্কুল—বয়েজ হাইস্কুলের প্রাইজ হ'ত একসঙ্গে। দুইই মাধববাবুর প্রতিষ্ঠা করা। রেসিটেশনে সেবার নাম করেছিল সীমা। রবীন্দ্রনাথের দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে—কবিতা আবৃত্তি করেছিল। তখন দুই ইস্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন—মাধববাবুর ছোট ছেলে রায় বাহাদুর পবিত্রবাবু। পবিত্রবাবু বই লিখতেন, তাঁর থিয়েটার ছিল—নিজে খুব ভাল পার্ট করতেন। তিনি পরের বছর সীমাকে এবং চন্দনপুরের গোপাল চৌধুরীর ছেলে শুভেন্দুকে নিয়ে—চন্দ্রগুপ্ত থেকে চাণক্য এবং মুরার দৃশ্ত রেসিটেশন করিয়েছিলেন। তার পরের বৎসর ওদের দুজনকে দিয়েই করিয়েছিলেন—'অভিসার' রেসিটেশন। দুজনেই সুর মিলিয়ে আরম্ভ করেছিল—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে—একদা ছিলেন সুপ্ত। তারপর 'সন্ন্যাসী গায়ে ঠেকিতে চরণ থামিল বাসবদত্তা' আসতেই—শুভেন্দু শুয়ে পড়েছিল এবং সীমা ডান হাতখানিতে প্রদীপ ধরার ভঙ্গি ক'রে—তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল—

ক্ষমা কর মোরে কুমার কিশোর—
দয়া কর, যদি গৃহে চল মোর—
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
এ নহে তোমার শয্যা।

এরপর শুভেন্দু উঠে বসে আরম্ভ করেছিল।

অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,...
সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।

তারপর আবার, দুজনে আরম্ভ করেছিল—'সহসা ঝঞ্ঝা তড়িত শিখায় মেলিল বিপুল আস্ত।' এমন ভাবেই শেষ করেছিল গোটা কবিতাটির আবৃত্তি। সেবার সেটি এত ভাল হয়েছিল যে—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দত্তসাহেব খুশী হয়ে বলেছিলেন, এদের মেডেল দেওয়া উচিত। আমি আশা করি ইস্কুল কর্তৃপক্ষ এদের মেডেল দেবেন আসছে বার।

তখন সীমা ছোট ছিল। বয়স তখন দশ-এগারো। তারপরও সে অনেক সুনাম অর্জন করেছে, অন্ততঃ রেসিটেশনে। একা করেছে। দুজনে করেছে। শুভেন্দুর সঙ্গে আবার থিয়েটারও করেছে। বয়েজ ইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী হল উনিশশ একান্ন সালে, ওরা দুজনে করছিল কচ ও দেবযানী! প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে—কর্ণকুন্তী-সংবাদ করেছে। সে শুভেন্দুর সঙ্গে নয়, তাপু—তপন সরকারের সঙ্গে। সে পুরনো কথা। ১৯৫০ সালের কথা। তারপর কয়েক বছরই চলে গেছে। ১৯৫৫ সালে সীমা প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়েছিল। অমর চক্কোত্তি আশা করেছিল সীমা পাস করবে। পাস করলে সীমাকে এখানকার গার্লস স্কুলে ঢুকিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল তার। ষাট সত্তর যা পাবে তাই তার সংসারে আসবে। সংসারে এখন বড় টানাটানি। দিন দিন জিনিসের দর বাঁশের ডগায় গিয়ে ঠেকেছে। আর জমাটার বিশেষ কিছু হবে না। মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর নয়। তার উপর—বোধ হয় রূপ আছে বলেই—সাজবার-গুজবার খুব ইচ্ছে। ওটাকে কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্তি। সীমা হয়তো শেষ বয়সে তাকে পুষতে পারবে। কিন্তু যেমন ভাগ্য! ভাগ্য ছাড়া কি বলবে অমর চক্কোত্তি? নইলে যে দোষ চাপে তার ঘাড়ে। সে সব বই কিনে দিতেই পারে নি মেয়েকে। সুতরাং ভাগ্য মন্দ বলাই ভাল। ভাগ্যের জন্যেই সীমা ফেল করলে। ১৯৫৬ সালের ইলেকসনে বেশ টাকা পেয়েছিল অমর। সেই টাকায় বই কিনে দিয়ে মেয়েকে বলেছিল—এবার ফেল হলে শুনব না। কিন্তু এবারও ফেল করেছে সীমা।

চক্কোত্তি-বাড়ীর বিধবা কর্ত্রীটির সঙ্গে সীমার বনিবনাও হত না। এ কাল—সমাজতন্ত্রের কাল—কিন্তু সমাজের কাল নয়; ও বিষয়ে সমাজতন্ত্রের মতামত উদার। তবুও সেকালের লোক আছে বেঁচে—একেলেদের মধ্যেও সেকেলে আছে, এবং একেলের মতামতের এমন অনেক আছে যারা অন্যের নিন্দে যে-কোন ছুতোয় পেলেই হল—তাতেই তারা জিভ শানিয়ে কথা বলে। সেসব কথা সীমাকে শুনতে হয়। কারণ সে ইস্কুলে আসে। পরীক্ষার ছ মাস আগে সে এখানে মেয়েদের হোস্টেলে ছিল। শনি-রবিবার বাড়ী যেত। ওই বাইসিকিলে চড়ে যেত। এবং দেড় দিনে সাড়ে পাঁচ দিন শোনা কথার বিষয়গুলির ঝাঁজ কোন না কোন প্রকারে তার কথার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসত।

বিধবা সহ্য করত। মধ্যে মধ্যে বলত—দেখ সীমা—আমি তোমার গুরুজন! বয়সে বড়। সম্বন্ধ কিছু না-মান কিন্তু বয়সে বড়, বাড়ীর রাঁধুনী বলেও মানা উচিত। আমি তোমাদের

বাড়ী বেচে আসি নি, তোমার বাবা আমাকে এনেছে। তোমার লজ্জা—রাগ—আমার উপর করে তো লাভ নেই—তোমার বাবার উপর করো। বল তো তোমার বাবাকে আমি বলব।

সীমাকে চুপ করতে হত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার একটা কোন ছুতোয় নতুন করে বাধত। ক্ষমা এ সবের মধ্যে থাকত না। তার সঙ্গে মাসীর সত্যই একটা স্নেহের সম্পর্ক আছে এবং ক্ষমা বোধ হয় এ সবের মধ্যে দোষ দেখে না। মাসী চাল ধান বেচেও তার শখ ও সাধ মিটোয়।

চক্কোত্তি বলে—সে বাপের খাতির রাখে না, তা সত্যিই সে রাখে না—; এই বিধবা প্রসঙ্গ উঠলেই সে সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সকল জনের সকল বাড়ীর অতীত ইতিহাস আওড়াতে শুরু করে—। কার কোন্ ব্রাত্য বংশের নারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল—কোন্ অভিজাত বংশে কার কোন্ রক্ষিতা ছিল—এসব তার নখদর্পণে। সীমার সঙ্গেও এ নিয়ে তার বাকযুদ্ধ হয় নি এমন নয়। হয়েছে; লোকজন যেই উপস্থিত থাকে তাদের সামনেই উঁচু গলায় হয়েছে।

নসুবালার গানের কলিতে সেসব কথার উল্লেখ আছে। নসুবালা ভোলে নি একটি বর্ণও। সে বলে—পক্ষীর মত শুনি। যা শুনি তাই বলি। ভুলি না। বুজেচ বেয়াই। হ্যাঁ, আমি মা তোর পোষা পাখি, যা শেখাস মা তাই শিখি, সেই বিত্তান্ত।

তারপর হঠাৎ বলে, সেই হাটকুড়ো জেলের বাড়ী সরক পাখি ছিল, সেই সরকের সরক পাখি আমি। মাছ নিতে গিয়ে বাড়ীর উঠোনে দাঁড়ালেই, বাস্—'ভাতারখাগী ঝাঁটকুড়ি'—। যত গাল শুনত, সব বলে যেত একে একে। তারই মধ্যে বলব, হেই মা! বাবুমশাই। বাই বাবু মাছ দিয়ে আসি! আবার তখুনি বলত, মর মর মর মিন্‌সে! বলা দেখ!

নসুবালা তাই বটে। চক্কোত্তির কথা ও গানের মালায় গেঁথে রেখেছে। সপ্তাহে একদিন সে চক্কোত্তির গাঁয়ে যায়। গেলে ওদের বাড়ী যাবেই। যত ভাব তার সীমা ক্ষমার সঙ্গে তত ভাব তার ওই ওদের বিধবা মাসীর সঙ্গে। নসুবালার কাছে কারুর কোন দোষও নেই বিচার নেই। যে কেউ ওকে সমাদর করে ভাতুর মা বলে ডাকলেই হল।

নসুবালার গানে বলে—

আগে গাছের ডালে কাঁটা
তবে ডালের ডগায় ফুল—
বহিলে কলঙ্ক নদী ও মন রসনা আমার
তার ভাঙনে গড়ে কূল।
পতিতপাবনী গঙ্গা, শিব ধরিল মাথায়
ঝাঁপ দিয়ে পালাল ধনী—ও মন রসনা
শান্ত রাজা কোথায়?
চক্কোত্তির কণ্ঠখানি বাজে যেন শঙ্খ—

গলা পর তিলক আঁকে
মনরসনা—পবিত্র কলঙ্ক—।

মস্ত ছড়া। গায় ওদের নিজের সেই একঘেয়ে সুরে। তাতে কোন কথাটি বাদ নেই। চকোত্তি পুরাণে কলঙ্কের কথাই বলে না; গ্রামের এবং আশপাশ গ্রামের লোকেদের গোপন প্রেমের কথা বলে না, তাদের নিজেদের বংশের কথা বলে।

অমর চকোত্তি সীমার কাছেই বলছিল, বলতে এতটুকু মুখে আটকায় নি, আমার ঠাকুরদাদা কেঁচুনীপাড়া যেত শিবের মত। মাঠে মাঠে কাঠকুড়ুনী ঘাসকাটুনীদের পেছনে পেছনে ঘুরত। আমার বাবার আমল থেকে হাল আমল—বাবা সন্ধ্যেবেলা ঝড় নাই জল নাই, যেত শুদ্দুরপাড়ায় ষোল-বছুরে বিধবা সৈরভীর বাড়ী; আমার পৈতের সময় মুখ দেখিয়েছিল সৈরভীকে; আমার ভিক্ষেমাকে দেখেছিস তো হারামজাদী। এ কালে আমার পালা। বাবা! আজ আর রাজা প্রজা নই, বামুন শুদ্দুর নই, সবাই সমান। শুদ্দের বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে গিয়ে মাথা দেবে? পতিত নাই পঞ্চায়েত নাই, ভয়টা কিসের? তোকে ভয় করতে হবে? তোর লজ্জা লাগে তুই আপনার পথ দেখ। লাজলজ্জা ভয়ডর আমার নাই। লোকে বলে আমি মদ খেয়ে চণ্ডীমায়ের মাটির ঢিপিতে কিল মেরেছিলাম। মদের ঘোর মিছে কথা, মেরেছিলাম জেনেশুনে, টনটনে জ্ঞান ছিল। মদ খেয়েছিলাম—যারা থাকবে, তারা তো এরপর মারবে, সেই মার সহ্য করবার জন্যে। আর যদি বলে সেবাইত থেকে খারিজ করব, তবে বলবার পথ থাকবে—মদ খেয়ে আমার জ্ঞান ছিল না।

চণ্ডীমায়ের সেবাইত চকোত্তি, একদিন মদ্যপান করে চণ্ডী-রূপিণী যে স্তূপটি আছে সেই স্তূপটির উপর দমাদম কিল মারতে শুরু করেছিল—এবং চীৎকার করেছিল, লাগ্‌তা হায় তো চিল্লাও—স্রিফ মাটি হায় তো ভাঙো।

এইটি নসুবালা সহ্য করতে পারে না। চণ্ডীমায়ে তার অসীম ভক্তি বিশ্বাস। নিত্য সকালবেলা গিয়ে সেখানে প্রণাম করে, মনের প্রশ্ন নিবেদন করে। আবেদন জানায়, মায়ের ঘরের একটি টিকটিকি টক টক করলেই সে তার মধ্য হতে জবাব আবিষ্কার করে নেয়। জঙ্গলে ঘেরা চণ্ডীমায়ের স্থান, সেখানে কীটপতঙ্গের সরীসৃপের ইঁদুর-বাঁদরের মেলা—টিকটিকিও সেখানে অনেক; যে-কোন টিকটিকিই টক টক করুক সেটি নসুর সেই আদি ও অকৃত্রিম টিকটিকিটি যে নাকি মায়ের হয়ে কথা বলে। যাক্। এই ঘটনার অর্থাৎ মাকে কিল মারার পর সে চকোত্তির উপর খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং সে কিছুদিন ওদের বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। নিত্য সকালে উঠে প্রত্যাশা করত যে, শুনতে পাবে গতরাত্রে অমর চকোত্তি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরেছে, অথবা সর্পাঘাত হয়েছে কপালে, অথবা ওলাওঠা হয়েছে। দিনের পর দিন তা না হওয়াতে সে বিস্মিত হয়েছিল। একদা সেই বিস্ময়বশে ওই চকোত্তির বাড়ী গিয়ে সরাসরি তাকেই প্রশ্ন করেছিল—তোমার কিছু হল না কেন বল দিকি?

—কি? কি হবে?

—মায়ের বুকে তুমি চাই চাই করে কিল মারলে—তবু—।

আর নন্দুকে বলতে দেয় নি চক্কোত্তি, হা-হা করে হেসে উঠেছিল।

বিরক্ত হয়ে নন্দু বলেছিল—

এমন করে হেসো না—হা-হা করে। হ্যাঁ।

—হাসব না?

—না। রহস্যটা বল।

—এই মরেছে—

—হ্যাঁ মরেছেই বটে। বল! তুমি তাহলে—

—কি?

—সাধকটাধক বট? এঁ্যা?

গম্ভীরভাবে কৌতুক-রসটিকে প্রগাঢ় করে তুলে চক্কোত্তি বলেছিল—বলিস নে কাউকে খবরদার। তাতেই কাজ হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিল চক্কোত্তির কথা। একটা প্রণাম করে নন্দু বেরিয়ে এসেছিল।

এ নিয়ে তার বেয়াইয়ের সঙ্গেও কথা হয়েছিল। ফটিকদাস হেসে বলেছিল, তোমার নিজের মহিমে আছে বেয়ান, তাই সবাইয়ের মধ্যে তুমি মহিমে দেখ।

বেয়ান রেগে বলেছিল—মরণ। মিনসের কথা শোন।

—শোন বেয়ান শোন! যাত্রার দলের রাধা বলত, শুনেছ তো, তমাল গাছ, তাকে কেষ্ট বলত; তালগাছ—তাকেও বলত, এই আমার শ্যাম। শ্যাম বিরিঞ্চির পাতা পেড়ে—শ্যাম পিদীমের কালো শিষে—শ্যামসোহাগী কাজল পড়লে তাই হয়।

—তোমার কথা আমি মানি না হে মানি না।

—মেনো না ভাই।

এ সব পুরনো কথা।

তারপর সীমা দ্বিতীয়বার ফেল করলে।

খবর যেদিন এল, সেদিন চক্কোত্তি মদ খেয়ে বাড়ী এসে কিছুক্ষণ কেঁদেছিল; সীমার দোষ নেই, দোষ তার। কতটুকু করেছে সে তার পড়ার জন্যে? কিছে? নিজে সে একদিন দেখিয়ে দিয়েছে? তবে?…ওই যে ঘরে অলক্ষী অধর্মকে পুষে রেখেছে তার ফল—? তার ফল যাবে কোথায়?

বিধবাটির নাম মনোরমা। সে কাজ করছিল—ঘর ঝাঁট দিয়ে চলেছিল, নিরুত্তরে কাজই করে গিয়েছিল, কোন উত্তর দেয় নি। চক্কোত্তির একতরফা খোয়োক্তি শেষ হতেই সে চাবির

গোছাটি খুঁট থেকে খুলে চক্কোত্তির সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। শুধু বলে গিয়ে-ছিল—পাপ অধর্ম চলল ঘর থেকে, সংসার তোমার ধর্মে পুণ্যে পবিত্র হোক।

চক্কোত্তি চমকে উঠেছিল—এ কি? এটা কি হল? এই—! এই! যেতে তাকে সে দেয় নি। মনোরমা যেতেও ভরসা করে নি, ফিরেছিল। এবং এরপর চক্কোত্তি উল্টো গাইতে শুরু করেছিল। সীমার শ্রাদ্ধের মন্ত্র নয়—ঘটী বাজানো বামুনেরা চাবী দিয়ে ঘটী বাজিয়ে টাকা না পেলে যেভাবে মৃত ব্যক্তির নরকে দুর্দশার কথা বর্ণনা করে পথে দাঁড়িয়ে তাই করেছিল।

এই বিধবাটিই এবার বলেছিল, অনেক হয়েছে। অনেক দেখালে। এই পাড়াগাঁয়ে মেয়েকে বাইসিকিল চাপা শিখিয়ে ইস্কুলে পাঠালে, বোর্ডিংয়েও ক' মাস রাখলে, পাস করিয়ে মেয়েকে চাকরী করাবে—মেয়ে তোমাকে পুষবে। ওসব আশা ছাড়। এখন দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে দাও, এখনও কুড়ি পার হয় নি, বুড়ী হয় নি। ম্যাট্রিক ফেল, পাড়াগাঁয়ে দু-চারজন শখ করে বিয়ে করতে চাইবে। তোমরা মেয়ের জন্তে বিয়েতে পণ নাও, পণ হয়তো বেশী পাবে।

চক্কোত্তির কথাটা ভালো লেগেছিল, সে ভালোলাগা ভয়ঙ্কর ভালোলাগা। মনে হয়েছিল এই কথাটাই সে খুঁজছিল, খুঁজে পাচ্ছিল না। সে মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল, আধমিনিট, তারপর বলেছিল, আচ্ছা বলেছ তো। আবার বলেছিল—ঠিক বলেছ।

পাত্র বের করতে তার দেরী হয় নি।

পাত্র—চন্দনপুর থেকে তাদের গ্রাম দু মাইল। তাদের গাঁ থেকে আরও পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে বনচাত্‌রা গাঁয়ের গোবিন্দ পাঠকের নাতি—ভুবন পাঠকের ছেলে রমেন পাঠক। গোবিন্দ পাঠকের শোনা যায় বিশ হাজার টাকা, পাঁচশো বিঘে জমি ছিল। ভুবন পাঠক যুদ্ধের বাজারে এবং পরে কণ্ট্রোলের সময় কালোবাজারে ধান বেচে বিশ ত্রিশ হাজার টাকাকে দু লক্ষে দাঁড় করিয়েছে। ভুবন পাঠক চন্দনপুরের ছাত্র, থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল, তার পাঠ্যাবস্থায় বাপকে সাইকেলের জন্তে ধরেছিল। বাপ একশো টাকা দাম শুনে বলেছিল নমুনা দিস, আমার কামার খাতক আছে, তাকে লোহা দেব সে গড়ে দেবে, দশটা টাকা মজুরী। লোহা তো ভাঙা-চোরা বাড়ীতেই আছে। ভুবন পাঠক বাপের মৃত্যুর পর সাইকেল কিনেছিল। খড়ের চাল তুলে টিনের চাল করেছিল। সেই ভুবনের ছেলে—ম্যাট্রিক ফেল করে মালিক হয়ে বসে। মাটির দেওয়াল টিনের চাল তুলে পাকা ইঁটে দালান বাড়ী করেছে। সাইকেল এখন তার এছাড়া তিনখানা। এছাড়া রমেন গ্রামে থিয়েটারও খুলেছে। সেই সূত্রে অমর চক্কোত্তি সেখানে যাওয়া আসা করেছে কিছুদিন। রমেন শৌখীন ছেলে। বিয়ে হয়েছিল—বউ মরে গেছে। দুটি বাচ্চা ছেলে, মানুষ করছে রমেনের মা। রমেন এখন শখ ধরেছে, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মুখ্যু মেয়ে সে বিয়ে করবে না—তার লেখাপড়া জানা মেয়ে চাই।

রমেন তার বাড়ীও কয়েকবার এসেছে। বাইসিকিলে চড়ে। মানুষ হিসেবে মেজাজী আমিরী, দু-পুরুষের কৃপণ অপবাদ ঘুচিয়ে এখন বাবু সাজতে চায়।…চকচকে সাইকেল, হাবী

শৌখীন শীয়ার কভার ফিট করা, ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী ফিট করা আলো, পোশাক-পরিচ্ছদ খাস কলকাতার বড় দোকানের তৈরী। ফ্যাশানে একটু ব্যাকডেটেড—এখনও ওপেনব্রেস্ট কোট পরে। তা হোক। দামী সিগারেট খায়। প্রথম থিয়েটার করবে—তারই জন্তে এসেছিল—অমর চক্রোত্তির কাছে, চন্দনপুরের বাবুদের অনেক ছোকরার চেয়ে তার পার্ট ভাল হত। বড় বড় পার্ট করেছে। ওখান থেকে—আশেপাশে থিয়েটার যখন গজাতে লাগল, তখন সে তাদের মাস্টারী করেছে, ডিরেক্টরী করেছে। স্টেজ বাঁধা থেকে অ্যাক্টিং পর্যন্ত সবই সে তাদের শিখিয়েছে। জায়জায় জায়গায় শক্ত পার্টও দিয়েছে। টাকা নিয়ে অবশ্য। ফি তার মিনিমাম পঞ্চাশ টাকা। এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়া সিগারেট, মদ এ তো আছেই। রমেন যখন এসেছিল, তখন সে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার ফি জান তো।

—জানি না ঠিক। তবে শুনেছি। সে তো একরকম নয়!

—হ্যাঁ। মিনিমাম একটা আছে। তা সেখানে কাজও সেইরকম করি। বাতলে দি। তাতে যতটা হয়। যতটা পারে। সপ্তাহে দু দিন রিহার্স্যালে যাব। প্লের একদিন আগে যাব—প্লের পরদিন ভোরে চলে আসব। এক রাত্রির প্লে—পঞ্চাশ, দু রাত্তিরে পঁচাত্তর, তিন রাত্তিরে নব্বইও নিই—একশো নিই। আর পুরো খাটবো—সপ্তাহে চারদিন রিহার্স্যালে যাব, দরকার হবে পার্ট করব, প্লের তিন দিন আগে যাব—প্লে হয়ে গেলে—স্টেজ খুলে দিয়ে আসব—একরাত্তিরে—একশো—দু-রাত্তিরে একশ পঁচিশ তিন রাত্তিরে দেড়শো।

রমেন বলেছিল, আমাদের তিন রাত্তির প্লে। আমি আপনাকে দুশো টাকা দোব। প্লে সাকসেসফুল হলে, আপনাকে কাপড় চাদর দিয়ে বিদেয় করব।

খুশী হয়ে চক্রোত্তি বলেছিল, আর একটি কণ্ডিশন বাপু।

—বলুন।

—ওখানে যে কদিন থাকব, সিগারেট দু প্যাকেট করে। বাজে সিগারেট খাই না আমি।

—কি সিগারেট বলুন।

চক্রোত্তি বলেছিল—"আপনি কি হারাইতেছেন তাহা আপনি জানেন না" যার বিজ্ঞাপন। কচ কচ। কাইচি। চক্রোত্তি প্রতিপদেই রসিকতার পরিচয় দিতে ছাড়ে না। কথা শেষ করে চক্রোত্তি হেসেছিল।

রমেন বলেছিল, তাই দোব।

—আর—। একটি হাত উপরে অন্যটি নীচে রেখে লম্বা মাপের কিছু ইঙ্গিত দেখিয়েছিল চক্রোত্তি। তারপর বলেছিল—"দব্যি"। অর্থাৎ দ্রব্য।

দ্রব্য মানে কি এবং ওই লম্বা মাপ কিসের তা রমেন সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিল। সে হেসে বলেছিল—ব্যবস্থা আমার চালাও। সে দোকানের জিনিস নয়। আমার সব 'গৃহজাত'। আঙুল ডুবিয়ে দেশলাই জেলে দিন—দপ দপ করে জলবে।

চক্রোত্তি বলেছিল—বেঁচে থাক ভাই, তুমি আমার সোনার চাঁদ।

রমেন বলেছিল—একটি শর্ত কিন্তু।

—এর পর তুমি ছশো শর্ত বাতলাও মেনে নোব। বল।

—দিন এক বোতলের বেশী পাবে না। বিকেলবেলা এক পাঁট দোব। রিহার্স্যাল শেষে এক পাঁট। সকালবেলা থেকে না।

—এক ঢোঁক দিয়ো ভাই। না দিলে খোঁয়াড়ি মরবে না। সাইকেল হাঁকিয়ে আসতে হবে সাত মাইল পথ। পথ তো নয়—শালা—আরাবল্লীর পাথুরে গোপথ। না খেয়ে ঠ্যাঙাতে পারব না সাইকেল। আবার রেজেষ্ট্রী আপিস চণ্ডীতলা সেরে ঠিক চারটের সময় হাজির হব। ও দুটো না-রাখলে তো চলবে না ভাই। বারো মাসের ভাতঘর!

—বেশ তা হলে পাকা কথা দিলেন তো?

—হাতীর দাঁত দিলাম। মরদকা বাত হাতীকা দাঁত! কি বই ধরছ?

—কর্ণার্জুন—সীতা—আর একখানা আধুনিক। মানে খুব মডার্ন।

—ঠিক আছে। বায়না কিছু দিয়ে যেয়ো। আর একটা কথা। ওয়ান মোর।

—বলুন।

—প্লে সাক্‌সেসফুল হলে কাপড়-চাদর দেবে বলেছ। তা ওটা—! মানে চণ্ডীতলায় হাজরে দিতে হয়। ওটা যদি তসরের দাও—তো—বুয়েচ না—। কালো নরুণ পেড়ে। ওটাই এখন ফ্যাসান হয়েছে। বুয়েচ?

তাও দিতে রাজী হয়েছিল রমেন।

মেজাজ তার আমিরী। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিল আগে, এখন শুধু মেম্বর। সদর শহরে—এস. ডি. ও, চন্দনপুরে বি. ডি. ও. আপিসে হরদম যাওয়া আসা। মধ্যে মধ্যে খদ্দরের কাপড় জামা পরেও আসে, থানা কংগ্রেসের মিটিংয়ে। এখন রমেন কংগ্রেসের মেম্বর।

চতুর ছেলে! শুধু ইঙ্গিত বোঝে বলেই চতুর নয়। ওর চতুরতা দেখে চকোত্তি যে চকোত্তি তারও বিস্ময় জন্মেছিল। চকোত্তি পলিটিক্‌স্ বোঝে বলে অহঙ্কার করে। পলিটিক্‌স্ করে। আগে, চল্লিশ সালের আগে, কংগ্রেসের ভোটে মাতত। তারপর চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে জনযুদ্ধের মহড়ায় নেমে পড়ে। প্রথম—আই. পি. টি. এ.। তারপর সাতচল্লিশ-আটচল্লিশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তে-ভাগা 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়' নিয়ে মাতামাতির সময় এই অঞ্চলে এক কম্যুনিস্ট পকেটে নেতা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেই কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল, অমনি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই বলে ফতোয়া দিয়ে শান্ত নাগরিক হল। রেজেষ্ট্রী আপিসে এসে জুটল এই সময়। তারপর বাহান্ন সালে কংগ্রেস আপিসে যাতায়াত শুরু করলে। কংগ্রেসের হয়ে কাজ করবে। এখানকার কংগ্রেসপ্রার্থী ছিল ধনী মারোয়াড়ী। তবে মারোয়াড়ী হলেও আজীবন কংগ্রেসকর্মী। তা হোক বা না হোক তার টাকাটাই ছিল চকোত্তির সব থেকে বড় বিবেচনার বিষয়! খেটেছিল সে। টাকাও পেয়েছিল এবং জেয়েও ছিল, উপরন্তু একখানা বাইসিকলও সে আর ফেরত দেয় নি। তারপর ছাপ্পান্ন সালে এখানে

কংগ্রেস ক্যাণ্ডিডেট ছিল এ জেলার একজন ধনী ব্যক্তি। প্রতিদ্বন্দ্বী কম্যুনিস্ট ছিল ক্যাণ্ডিডেট, কংগ্রেস হারল। লোকে বললে, কংগ্রেসের নিজের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যারা করেছে, তার মধ্যে চক্কোত্তি একজন প্রধান। চক্কোত্তিও হেসেছে। বলেছে, প্রমাণ দিলে জুতো খাব।

—তুমি তাজাল বনের মিটিংয়ে কি বলেছ ?

—কি বলেছি ? তারা জিজ্ঞাসা করলে, মশায়, বাবুটি কবেকার কংগ্রেসী ? বললাম—ঠিক জানি না, তবে আজীবন হতে পারে। তারা বললে—আজীবন ? ওর বাপ নামজাদা ইংরেজের পক্ষের লোক ছিলেন না ? বললাম—ছিলেন, কিন্তু তাঁর চেয়ে দেশহিতৈষী কে আছে ? তারা বললে—তা হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসী তো নয়। সেরকম তো অনেক দেশপ্রেমিক আছে মশায়। আপনি কংগ্রেসী বলছেন তাই বলছি। তাই বলছি বাপের পথ ছেড়ে—বাপ চিরকাল কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন, আজ উনি কংগ্রেসী হলেন কেন, এম. এল. এ. হবার জন্যে, মন্ত্রী হবার জন্যে ? ওঁর নিজের শালা, তিনি কম্যুনিস্ট, বক্তৃতা করে গেলেন, তা উনি তাই হলেন না কেন ? কংগ্রেসী কেন ? বলুন। আমি বললাম—যদি বোঝেন কখনও কংগ্রেস মন্দ, কম্যুনিস্ট ভাল, তখন উনি নিশ্চয়ই তাই হবেন। যেমন বাপের মতকে ভুল বুঝে আজ উনি কংগ্রেসী হয়েছেন। তারপর হেসে বলেছে, ওঁর নিজের শালা বড় কম্যুনিস্ট লীডার, সে এসে বড়লোকীর ছাদ্দ করে গেল, মানে উনি বড়লোক, ওঁর ছাদ্দই করে গেল। লোকে ওঁকে, ওঁর বাবাকে চেনে জানে। আমার বলায় কি যায় আসে বল। যদি বল যায় আসে তো বলব, আমি কোন মিথ্যে কথা বলি নি। কংগ্রেস বার করে দেয় দেবে। আমি তো জানি, আমি কোনদিন এম. এল. এ. হব না। মন্ত্রী হবার কোন সাধ নাই, এমন কি মন্ত্রীর আরদালী হবার দরখাস্ত করব না কোন দিন। এই বলেই শেষ নয়, সে কম্যুনিস্ট এম. এল. এ-র সঙ্গে নতুন করে দহরম-মহরম জুড়ে দিলে প্রকাশ্যে এবং পারমিট, রিলিফ, ক্যাশডোল প্রভৃতির ব্যাপারে একজন অন্যতম ছোটখাটো কর্তা হয়ে বসে পড়ল।

এমন যে অমর চক্কোত্তি সেও চমৎকৃত হল, এই রমেনের পলিটিক্সের বুদ্ধি দেখে। ওই থিয়েটারের সমারোহের মধ্যে কোথা দিয়ে সে কি করলে তা কেউ জানলে না, তবে থিয়েটারের পরেই ইউনিয়ন বোর্ডের মিটিংয়ে হিসাব-নিকাশ পাসের প্রস্তাবে এমন শোচনীয়ভাবে প্রেসিডেন্টকে হারিয়ে দিলে যে, প্রেসিডেন্টের আর পদত্যাগ না করে উপায় রইল না। তারপরও চতুর রমেন নিজে প্রেসিডেন্ট হয় নি, তার এক কর্মচারীকে প্রেসিডেন্ট করে নিজে মেম্বরই থেকে গেছে। করে সবই রমেন। প্রেসিডেন্ট আপিসে পুতুল, বাড়ীতে তার মাইনে করা কর্মচারী। অন্য মেম্বররা থিয়েটারে পার্ট করছে। রমেনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এ রহস্যটি সাধারণ নয়। অসাধারণ। কংগ্রেস বা কম্যুনিস্ট বা পি. এস. পি. যে পার্টিতে ও যাবে সেখানেই ও ঠিক নিজের জায়গা করে নেবে। গীতার হবেই। ভগবান সহায়—খুঁটোর জোর আছে। ভুবন আচার্যির দু লক্ষ টাকা ওর হাতে। আমিরী মেজাজ হলেও বিষয়বুদ্ধিতে আমিরী ফাঁক রাখে নি—সেখানে আমিরী সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে। ওখানে রমেনের

হিসেব সেই চৌবাচ্চার হিসেব। চৌবাচ্চা হতে নির্গমনের নলে ঘণ্টায় যখন দশ গ্যালন জল নির্গত হয়, তখন জল আগমনের পথে অন্তত বারো গ্যালন প্রবেশের ব্যবস্থা পাকা রেখে কাজ করে সে। ঠাকুরদা করত মহাজনী চাষ, বাবা সেটাকে বাড়িয়েছিল, সুযোগ পেয়েছিল কন্‌ট্রোলের বাজারে। তাদের বাড়ীটা দুটো জেলার সীমানা ঘেঁষে। সুযোগ বুঝে ও জেলার খরিদ্দারকে সীমানা পার করে—বিক্রী করে দাঁও মেরেছিল। রমেন এখন দোকান করেছে—চাল ধানের গদী, তার সঙ্গে মনিহারী, কাপড় লটকোন। ওদের গ্রাম বনচাতরা থেকে তিন মাইল পশ্চিমে সদর-ঘাট। একটা রাস্তা ঘাটের দুই মাথা থেকে তিন দিকে চলে গেছে উত্তরে একটি সাঁইথিয়া অন্যটি পাঁচথুপী কাঁদী, দক্ষিণে চন্দনপুর হয়ে ঘুরে পার হয়ে সোজা বোলপুর পর্যন্ত। ঘাটের মাথায় রমেন ধান কেনে কম দামে, কাপড় মনিহারী লটকোন বেনেতি মালমসলা বেচে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কলাই লঙ্কা শাঁখ আলু—কেনে সে সস্তায়, চন্দনপুরে সে যায় না, নদীর ওপার থেকে যে রাস্তাটা সাঁইথিয়া গেছে, সেটা এখন ভাল রাস্তা, পিচ হয় নি, তবু সুগম পথ,—এই পথে চলে যায় সাঁইথিয়া। সেখানেই ওর বেচা-কেনা। ফলে চৌবাচ্চায় বারো গ্যালনের পথে পনর গ্যালনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তাতে খানিকটা তো চৌবাচ্চা ছাপাবেই, সেই ছাপানো জল থিয়েটারের সমারোহে গৃহজাত মদের প্রাচুর্যের জন্যে ব্যয় করেছে। ওদিকে ইনকাম ট্যাক্সের খাতা হাল্কা হচ্ছে।

এ ছেলে যদি ভাল পাত্র না হয় তো ভাল পাত্র কে? চেহারা একটু বেঢপ্, মোটা বেঁটে; তা হোক। সাজলেগুজলে বেশ লাগে! এই তো কর্ণার্জুনে কর্ণের পার্ট করলে—সীতাতে রাম—মাটির ঘরে—অলক, কি খারাপ লেগেছিল! একটু বেঁটে। তা ওরাই যে বেঁটে ছিল না প্রমাণ কি! আর তার মেয়ে সীমাই বা কি এমন আশ্চর্য পদ্মাবতী বা সীতা বা ওই যে অলকের ভালবাসার মেয়ে। বেশ হবে। শ্রীমান রমেনের বুদ্ধির সঙ্গে অমর চক্কোত্তির বুদ্ধির যোগাযোগ ঘটলে আশ্চর্য ঘটনা হবে। দুর্যোধন শকুনি, রাবণ কালনেমি মামাভাগনে, এ শ্বশুর-জামাইয়ে এমন একটা নতুন কিছু হবে, যা একটা আশ্চর্য ঘটনা!

বেশ—বেশ বলেছে মনোরমা। দিয়ে দাও বিয়ে ঐ রমেনের সঙ্গে। অমর চক্কোত্তি সেদিন ওই রমেনের দেওয়া তসরের কাপড় পরে মা চণ্ডীর ওখানে গিয়ে জবাফুল মাথায় দিয়ে বলেছিল—মা-গো, সেদিন কিল্ মেরেছিলাম—সাড়া দিস নি। আজ জবাফুল চড়ালাম, প্রণাম করলাম, আজ সাড়া দে। না হলে—।

ঠিক করতে পারে নি, চক্কোত্তি কি করবে! ভাঙবে? কিংবা—দেওয়ালে ঝুলানো খাঁড়াখানা নিয়ে কোপ মারবে? কি, কি করবে? কিছু যে ভেবে না পেয়েই কিছু কি করা হয় নি।

পরের দিনই সে গিয়েছিল বনচাত্‌রা। সীমাকে রমেন দেখেছে। তাকে সাইকেলে চড়ে ইস্কুলে যেতে দেখেছে। ক'বছর আগে, ইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীতে সীমা এবং শুভেন্দু দেবযানী অভিনয় করেছিল ।—সে অভিনয়ও রমেন দেখেছে।

কথাটা পাড়বামাত্র রমেন ঘাড় তুলে চক্কোত্তির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, আমি কাল যাব আপনার বাড়ী, গিয়ে উত্তর দিয়ে আসব। সীমাকে দেখেছি আমি, আর একবার দেখব। কিন্তু কোন কথা কাউকে বলবেন না। তাকেও না। ওর আমি পেণ্ট করা চেহারা দেখেছি, সহজ চেহারা দেখে নিজে ভেবে নিয়ে বলব। আপনার তো দুটি মেয়ে আছে। একটি বেশ সুন্দরী।

—সেটি ছোট। ক্ষমা। সে মেয়ের রূপই আছে। বুয়েচ না, তুমি যা চাও তা নয়। এই ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। বুয়েচ।

—দুটিকেই দেখব আমি। সেই জন্যেই বলছি, কাউকে কিছু বলবেন না। সাজাবেন না। কেমন? একজনকে না একজনকে হাঁ বললে তো একজনের মনে কষ্ট হবে।

যাই হোক দেখে শুনে রমেন সীমাকেই পছন্দ করলে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল চক্কোত্তি। ক্ষমার বিয়ের ভাবনা নেই—ওর পাত্র ঠিক হয়ে আছে। ছেলেটির বাড়ী বোলপুরের কাছে। সে এম. এ. পড়ছে শান্তিনিকেতনে। ভাল ছেলে। তার সঙ্গে ক্ষমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে আছে অনেকদিন থেকে। তার মা সম্বন্ধ করে গেছে। ওই চণ্ডীতলাতেই সম্বন্ধ হয়েছিল। ছেলেটির মা এসেছিল চণ্ডীতলায়, ওরা অনেক দিন থেকে চকোত্তিদের কুটুম, ওরা চণ্ডীতলায় এসেছে খবর পেয়ে কুটুম্বিতা করবার জন্যই মা গিয়েছিলেন চণ্ডীতলায়; এবং অনুরোধ করেছিলেন, পরের বেলাটা থেকে যাও আমাদের বাড়ী। সঙ্গে সীমা ক্ষমাকে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বয়স তখন আট বছর, পাঁচ বছর। সেই সময় ফুটফুটে ক্ষমাকে দেখে ছেলের মা বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল চণ্ডীতলাতেই। চণ্ডীতলার কোন গুরুত্ব চক্কোত্তি মানে না, তবে মা সম্পর্কে তার দুর্বলতা আছে। তা সে অস্বীকার করতে পারে না। বাপ সম্পর্কে সে ভিক্টোরিয়া-সৈরভীর সংস্পর্শের কথা অনায়াসে সহাস্যে বলতে পারে। কিন্তু মায়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও সে নিজে বলা দূরের কথা পরে বললেও সহ্য করতে পারে না।

চক্কোত্তির মা এই সেদিনও বেঁচেছিল। পুত্রবধূর মৃত্যুর পর সে মরেছে। তার মা একটু বোকা-সোকা মানুষ ছিল, সে কথা বললেও চক্কোত্তির সহ্য হয় না, তখন আর এক মানুষ হয়ে দাঁড়ায়।

তার কারণ আছে। তার মনে পড়ে যায়, তিরিশ সালে ইস্কুল ছেড়ে সে যখন আইন অমান্য আন্দোলনে নেমেছিল, তখন তাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে বলাতে চেয়েছিল, আর এ

কাজ করব না। কোনও ভয়েই অমর তা বলে নি, শেষ পর্যন্ত বেত মারা হয়েছিল, পুলিসের বেত। কিন্তু তাতেও সে বলে নি। প্রতি বেতের শেষে সে চীৎকার করেছিল, করব। করব। সে তার উঁচু মাথা—সেই তার চোখের দৃষ্টি, বিশৃঙ্খল চুল, সেই চেহারা, যারা দেখেছিল, তারা কেউ ভোলে নি। মায়ের কথায় সেই চক্কোত্তি যেন উঁকি মারে। খোকা বললে বলে—না। কথা বলতেও জান না। কাকে কি বলতে হয় শিখো, বুঝলে! মা আমার দেবী ছিলেন। সাক্ষাৎ দেবী। সংসারে যদি কোন পাপ বা অন্যায় করে থাকেন, তো সে পরের গরুর গোবর কুড়িয়ে নেওয়া। বাস। সেই মায়ের দেওয়া কথা রক্ষার জন্যও বটে, আর ক্ষমা তার ছোট মেয়ে, দেখতে মিষ্টি চেহারা অনেকটা চক্কোত্তির মায়ের মত, তার বাল্যকালে অনুগতও ছিল একটু এইসবের জন্যও বটে, ক্ষমাকে তার জীবনের লাভ-লোকসানের হিসাবের মধ্যে সে টানতে চায় না। কিন্তু রমেন শক্ত ছেলে; ছেলে আর কেন,—বয়স চল্লিশের কাছে, সুতরাং শক্ত মানুষ, ব্যক্তি, চিজ; রমেনের কথায় গররাজী হতে চক্কোত্তি পারত না। কিন্তু মা চণ্ডী নিজেকে সত্য প্রমাণ করলেন অমর চক্কোত্তির কাছে। রমেন সীমাকেই পছন্দ করলে!

* * * *

বিপদ বাধল এর পর। রমেন রাজী হলে কি হবে, সীমা বেঁকে বসল। অমর চক্কোত্তি বলে দিলে—এর নড়চড় করতে ভগবানের বাবার সাধ্যি নাই। তুই তো সীমা!

একদিন মদ খেয়ে তাকে প্রহারও করলে। তারপর আবার কাঁদলে, খুব ঘটা করে কাঁদলে—নিজের দুর্ভাগ্যের কথা কলাও করে বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। এবং সে তার অভিনয় নয়। দুটোই অকৃত্রিম অকপট।

এ যুদ্ধ চলল আট দশ দিন। শেষে হার মানলে সীমা। সে একা আর সকলে একদিক। বাবা, মনো-মাসী এমন কি ক্ষমা পর্যন্ত। পাড়াপ্রতিবেশীর কাছেও গোপন ছিল না। চক্কোত্তিবাড়ীর কোন কথাই গোপনে হয় না—সবই হয় উচ্চ নাদে। তারাও সকলে বাবার পক্ষে। তারা একবাক্যে বললে—এ তো ভাগ্যির বিয়ে গো। এমন হয় কার। অনেক ভাগ্যি মা, তোমার অনেক ভাগ্যি—এ তুমি লক্ষ্মীর আসনে বসতে যাচ্ছ, তাতে লাথি মেরো না। লাথি মেরো না। এমন তো কখনও দেখি নাই মা!

মনোরমা বললে—আমার কথা তোমার ভাল লাগে না জানি! তবু বলছি সীমা—এতে তোমার ভাল হবে—সুখে থাকবে।

মনোরমা তার নিজের জীবনের কথা বলেছিল। বলেছিল, এই আমার দিকে দেখ। আমি এমন ছিলাম না। বিয়ে দিয়েছিল,—পাত্র দেখে, ঘর দেখে নি বিষয় দেখে নি—শুধু পাত্র। পাত্র সুপাত্র, ভাল লেখাপড়া—চাকরী ভাল—শ্বশুর শাশুড়ী নেই—মনে হল এমন বিয়ে কার হয়। পাঁচ বছর যেতে না যেতে বিধবা হলাম। নিরাশ্রয়। ভাই—বিদেশে চাকরী করে। সেখানে ছিলাম কিছু দিন কিন্তু সে দাসী বাঁদীর চেয়ে অধম অবস্থা। রাঁধুনী-ঝি এরাও খেতে পায় কাপড় পায়। এ শুধু পেট ভাতা। আর বউয়ের বাক্যবাণ সে অসহ্য। সেখান থেকে চলে

ওপার গাঁয়ের ভিটেতে—ভিক্ষে করে খাব খেটে খাব। তাও তো অভ্যেস নেই, পারলাম না। একদিন মরতে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। গলায় দড়ি দিলে পারি নি। বিষ গুলে খেতে পারি নি। শেষ—নদীতে ঝাঁপ খাব না হয় বর্ষার রাত্রে পথে সাপে কামড়াবে বলে রাত্রে পথে বেরিয়েছিলাম। সেই রাত্রে পথে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা। কোথা থেকে আসছিল।

একটু থেমে হেসে মনোরমা আবার বলেছিল, তোমার বাবাকে লোকে পাষণ্ড বলে। হয়তো সে পাষণ্ড আজ হয়েছে। কিন্তু সেদিন আমার সঙ্গে পাষণ্ডের ব্যবহার কিছু করে নি। শুধু বলেছিল—আজকের দিনটা তুমি মরা ক্ষান্ত দাও। চল আমার বাড়ী চল। আমার বুড়ো মা আছে তার কাছে থাকবে রাত্রিটা, কালকের সন্ধ্যে পর্যন্ত। তারপর যদি চাও রাত্রে ঠিক এই ভাবেই বেরিয়ে আসবে। বলেও দিচ্ছি কি ভাবে মরবে। পথে বের হলেই সাপে কামড়ায় না। আমি একরকম নিশাচর, আমাকে দেখ আজও সাপে কামড়ায় নি। নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েও মরতে না পার। ট্রেন! ওই চন্দনপুরের ধারে নদীর উপর ব্রিজের মুখে লাইনে মাথা দিয়ো। দেখ—স্বামীর যদি খুদ কুঁড়ো কিছু থাকত—তবে আমাকে এই দুঃখদশায় পড়তে হত না। আজকের দশাকে আমি দুঃখদশা বলি না। তোমরা জান না, লোকে জানে না, জানতেন তোমার ঠাকুমা। পরের দিন ভেবে ভেবে যখন মরবার সাহস ফুরিয়ে গেল—তখন তোমার বাবাকে বললাম—আমাকে একটা কাজকর্ম দেখে দিন—আমি খেটেখুটে খাব। তোমার বাবা বললেন,—কি কাজ করবে? রাঁধুনীগিরি? সেখানেও বিপদ আছে। অনেক বিপদ। তার চেয়ে একটা কথা বলব? আমার ঘরে থাক—আমার মা-মরা মেয়ে দুটোকে মানুষ কর—বুড়ো মায়ের সেবা কর। তোমার ঠাকুমা একদিন ডেকে বললেন—বাবা, বিধবা বিয়ে তো হয় শুনেছি। তোরা দুজনে বিয়ে কর। আমার চোখে ছানি পড়ছে—তবু আমি দেখতে পাই বুঝতে পারি তোরা দুজনকে ভালবেসেছিস। তা আমার কথা শোন। ভাল হবে। ধর্ম খুশী থাকবেন। বিয়ে আমাদের হয়েছে। তোমার ঠাকুমার সামনে—মালা বদল করে বিয়ে হয়েছিল। কথাটা গোপন রাখতে হয়েছে। চণ্ডীতলার সেবাইতগিরির জন্যে—আর তোমাদের বিয়ের জন্যে। অপবাদ মাথায় করে আমি নিয়েছি—ওই সেবাইতগিরি দশ পনের টাকা আয়ের জন্যে। সেও টাকা—সীমা। এ কালে—এ কালে কেন সব কালে—পুরুষের চরিত্রদোষ—চাঁদের কলঙ্ক। রক্ষিতা রাখলে মাপ হয় সব। কিন্তু বিধবাবিবাহ? সর্বনাশ! আমার কথা শোন। এতে তোমার ভাল হবে। তুমি তো শক্ত মেয়ে। রমেনের পয়সা আছে, বুদ্ধি আছে খাতির আছে—ওর দোষটোষ শুধরে নেবে!

সীমা এই কথাতেই সেদিন প্রথম টলেছিল। প্রণাম করেছিল মনোরমাকে। মনোরমা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল—আমাদের বিয়ের কথা বলো না সীমা। তা হলে ওই দশ-পনেরটা টাকা যাবে। রমার বিয়ে যেখানে ঠিক হয়ে আছে সেও ভেঙে যাবে।

রমা এ সব কথা শোনে নি। সে সীমাকে ভয় করত এবং দেখতেও পারত না। সীমা ওকে বলত—*দিদি। সে রমার সাজগোজে অনুরাগের জন্য।*

রমা ওকে বলত—মেয়ে প্রহ্লাদ! দিদী!

ক্ষমাও ওর হাত ধরে বলেছিল—কেন কেলেঙ্কারী করছিস দিদি? না—না—না। এ সব তুই করিস নে। বাবার মুখটা হাসাস নে। লোকে যাচ্ছেতাই বলছে তুই শুনিস নি।

সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে ভুরু দুটি কুঁচকে উঠেছিল—কি যা তা বলছে?

—বলছে; চন্দনপুরে তুই বাবুদের ছেলেদের প্রেমে পড়েছিস। ওখানে পড়তে যাস; বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে রেসিটেশন করেছিস—থিয়েটার করেছিস—সেই সব নিয়ে যা তা বলছে। সেই জন্তে তুই বিয়ে করতে চাচ্ছিস না।

তার রাগও হয়েছিল—হাসিও পেয়েছিল। বাবুদের ছেলে—ওই শুভেন্দু? দূর। থিয়েটারে ও কচ সেজেছিল—সে সেজেছিল দেবযানী। শুভেন্দু আবৃত্তি ভাল করে, এ্যাক্টিং করে, কিন্তু রোগা লিক্‌লিকে—কোল কুঁজো—দূর! তপনের সঙ্গেও রেসিটেশন করেছে। সে তো তার থেকে বয়সে ছোট—তাকে দিদি বলে! রাম রাম রাম!

ক্ষমা তার হাত ধরে ফিস ফিস করে প্রশ্ন করেছিল—সত্যি কথা সীমা?

সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল—ভাগ্!

—তবে?

সে উত্তর দেয় নি। উঠে চলে গিয়েছিল। বিকেলবেলা মনোরমা তাকে বলেছিল—ক্ষমা একটা কথা বলছিল সীমা—

—সে সব মিছে কথা মাসী। ওটা একেবারে পচা। দিন রাত্রি প্রেমের স্বপ্ন দেখছে। ওর জন্তেই সাবধান হয়ো।

মনোরমা মুখে প্রশ্ন করলে না—মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অর্থাৎ উত্তরটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় নি। সীমা হেসে বলেছিল—আমাকে বললে—লোকে বলছে—তুই বাবুদের ছেলেদের প্রেমে পড়েছিস। তারপর হাত ধরে চুপি চুপি বলে—সত্যি কথা সীমা? তা কি বলব? বললাম—ভাগ্। তাতেই মনে হয়েছে ওর সত্যি। তা বল না—কি বলতে পারতাম আর? খুব চীৎকার করে বলা উচিত ছিল? না—কোমর বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে চেঁচাতে হত—কোন্ আবাগী ভাতারখাগী বলে—কোন ঝাঁটাখাগী পোড়ারমুখী বলে—আমি বাবুদের ছেলেদের প্রেমে পড়েছি? সে হেসে ফেললে।

মনোরমাও হাসল। বললে—তা হলে একটা কিছু ঠিক করতে হবে তো?

—কি আর হবে? যা চিরকাল হয়। বাপ যখন হাড়কাঠে ফেলে কোপ মারে তখন বাঁচায় কে। গর্দান দিতে হবে।

—না না। এমন তুমি ভাবছ কেন?

—না মাসী। ভাবছি নে এমন। বাবাকে বলো—তাই হবে, বিয়ে ওকেই করব। প্রেমেট্রেমে কারুর পড়ি নি আমি। আমার ইচ্ছে ছিল পাশ করে চাকরী করব। ম্যাট্রিকটা পাশ করলে—ছোট ইস্কুলে একটা মাস্টারি নিতাম—তারপর প্রাইভেটে—আই. এ. বি এ পাশ করতাম। ওই চাকরী করব ভারী শখ ছিল আমার জান, এই দিদিমণিরা ওই সব মেয়ে অফিসাররা—কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আসে—কেমন স্বাধীন জীবন—এই রকম হবার সাধ ছিল।

বাবাও বলত—পাশটা কর চাকরী করবি। তা বাবার দোষ তো খুব দিতে পারব না? সে তো পড়বার সুযোগ দিয়েছিল, লোক-নিন্দে মানে নি—আমাকে সাইকেল চালানো শিখিয়ে—সাইকেল দিয়েছিল। বলেছিল, চলে যা চেপে ইস্কুল। যে যা বলে বলুক। মাস্টারদের বলে দিয়েছিল—দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। আমিই পাশ করতে পারলাম না। আর একবার দিলেও পাশ করব—তাই বা কি করে বলি। তার থেকে ঠিক বলেছ—বিয়েই ভাল। তবে লোকটাকে ভাল আমার লাগে না।

মনোরমা খুশী হয়েছিল। হেসে বলেছিল—পরে ভাল লাগবে তোমার, তুমি দেখো।

এরপর বিয়ের দিন স্থির হয়ে আয়োজন হয়েছিল। সীমা আর কোন কথা বলে নি। তার মনের মধ্যে একটি অতি মৃদু করুণ আক্ষেপ—অতি ক্ষীণ স্বরে বিলাপের মত ধ্বনিত হয়তো হয়েছে,—কিন্তু বিয়ের আয়োজনের সানাই কাঁসি ঢোলের আওয়াজের মধ্যে সে সুরটি হারিয়ে গেছে। সে নিজেও শুনতে পায় নি—সে করুণ ধ্বনি বা—বুঝতেও পারে নি যে, চোখ তার যেন ভিজে-ভিজে হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে গায়ে হলুদও হয়ে গেল। হলুদ মাখা হল,—রঙ খেলা হল। তখন সীমা যেন কেমন হয়ে গেল। একটা আশঙ্কা—তার সঙ্গে আনন্দ। সে বিচিত্র অবস্থা। অনেকটা বিহ্বলের মত।

তারপর বিকেল বেলা এসে উপস্থিত হল চন্দনপুরের ইস্কুলের বন্ধুরা। চন্দনপুরের ইস্কুলের কজন মেয়ে সঙ্গে তাদের একজন শিক্ষয়িত্রী 'আরাধনা দি'। আরাধনা দি—বয়সে হয় তো দু এক বছরের বেশী, ছোট্টখাট্টো শ্যামলা মেয়েটিকে কেউ শিক্ষয়িত্রী ভাবতে পারে না, ক্লাস নাইন টেনের মেয়েরা তার থেকে মাথায় বড়। বয়সেও দু জন বেশী। আই.এ. ফেল করে আরাধনা ইস্কুলে চাকরী নিয়েছে মাত্র মাস ছয়েক। এর মধ্যে সে ছাত্রীদের সঙ্গেই বেশী মিশে গেছে। অন্য শিক্ষয়িত্রীরাও সকলেই অল্পবয়সী নস্যবালা বলে :—সব দুধের মেয়ে গো! এই খানিকটা হাঁপালো! অর্থাৎ তার ধারণা প্রকৃত বয়স থেকে ওদের একটু বেশী বড় দেখায়। ওদের সকলেই কুমারী বলে—এ ধারণা তার হয়েছে। নস্যর কথা নস্যরই—সে থাক। আরাধনার সঙ্গে এই সব শিক্ষয়িত্রীর বয়সে পার্থক্য অল্প বলে সে তাদের সঙ্গে মেশে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে, তার মেলামেশা বয়স্কা ছাত্রীদের সঙ্গেই বেশী। সেই সূত্রে গত কয়েক মাসের মধ্যে সীমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশ নিবিড় হয়েছিল। পরীক্ষার আগে মাস দেড়েক সীমা হোস্টেলে ছিল। সিট ছিল না—, তখন আরাধনাই তার সিটের চৌকির সঙ্গে একখানা বেঞ্চি যোগ দিয়ে—সেট'কে ডবল সিট করে নিয়ে সীমাকে জায়গা করে দিয়েছিল।

বিয়ের সময়ে সীমা ওদের নিমন্ত্রণ করিয়েছে। ওরাও দল বেঁধে বিকেলে এসে হাজির হল। অন্য দিদিমণিরা সব আসবেন সন্ধ্যেবেলা। আরাধনা বললে—কাল আমি থাকছি

না সীমা। আসতে পারব না।

সীমা সপ্রতিভ মেয়ে এবং প্রগল্‌ভার চেয়েও বেশী, একটু প্রখরা। তবে সে সেদিন কেমন লজ্জায় কোমল অবনতমুখী হয়ে গেল। আরাধনার কথা শুনে সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন? আসতে পারবেন না কেন?

—একটা ইণ্টারভ্যু আছে। বর্ধমানে যাব। চাকরীটা ভাল। তাই আজ এলাম শুভেচ্ছা জানাতে। শুভলাক্! তোমার এ সব দুর্ভাবনা ঘুচল।

একটি ক্লাস টেনের মেয়ে—বয়স সবার বেশী, চন্দনপুরেরই মেয়ে—সে বললে—হ্যাঁ। গরু-জন্ম খালাস।

অন্য একজন বললে—হিংসা হচ্ছে না কি?

—তা ভাই হচ্ছে। পাশও করতে পারছি না—বাবাও বিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে পারছে না। এ কি—বিচ্ছিরি কাণ্ড বল তো! আমার দাদু—কি, বলে জানিস? আমাকে পড়তে শুনলে বলে—এই—এই থাম। ঘ্যানর—ঘ্যানর! সেই যে কোন্ মান্ধাতার আমলে আরম্ভ করেছে—One morn I met a lame man in a lane close to my farm—সে লেন আর পার হল না আজ পর্যন্ত। লেংচে লেংচে লেংচে চলেইছে চলেইছে। বন্ধ কর। যা ভাত রাঁধ গে যা।

সকলে হেসে উঠল।

তারপর গান হল। দুটি বোন কলকাতায় বাড়ী—ভাল গাইতে পারে—তাদের একজন গান গাইলে। ফিল্মের গান—

জানতাম তুমি আসবে—তুমি আসবে—
এসে হাসবে, ভালোবাসবে কোনদিন।

মেয়েরা মুচকে মুচকে হাসতে সুরু করেছিল। সীমা মুখ নত করে তাকিয়েছিল মাটির দিকে। তারই মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে টপ টপ করে দুটি ফোঁটা জল ঝরে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি জল মুছে ফেলেছিল বটে, কিন্তু মনের সেই যে চাপা দেওয়া বেদনা দুঃখ-অতৃপ্তি, যাই তার নাম হোক; আবার বের হতে সুরু করেছিল অগ্ন্যুদ্গারের মত, সে আর নেভে নি। সারা রাত্রি সে জেগে ছিল।

প্রেমে সে কারুর পড়ে নি; না—না—না। তবে যার প্রেমে পড়তে পারে কখনও কোন-দিন—সে ওই কালো মুস্কো ওপেন-ব্রেস্ট কোট পরা টাকার অহঙ্কারে অহঙ্কারী রমেন আচার্যি নয়। তার প্রেম ওই নতুন কালের দিদিমণিদের সঙ্গে। ওই যে সেদিন জীপে করে নতুন সোসাল এডুকেশন অফিসার মিস বিশ্বাস এসেছিলেন—ওই অফিসারদের সঙ্গে। অফিসাররা তার রাজপুত্র। দিদিমণিরা তার মন্ত্রীপুত্র। হাসপাতালের নার্সরা আছে—ওটা তার কাছে কোটালপুত্র। কোটালপুত্রকে সে বরণ করবে না। রাজপুত্র দুর্লভ। মন্ত্রীপুত্র খুব দুর্লভ নয়।

তার বাবা ঠাট্টা করে বলে—বলে নয় বলত—পাশ তো কর। তারপর বিয়ে যদি করিস

তবে রাজপুত্তুর পারব না—মন্ত্রীপুত্তুর একটা জুটিয়ে নেব। এক এক প্রভিন্সে এখন মন্ত্রী উপমন্ত্রী তিন তিন ডজন করে।

কিছুতেই মনকে সে শান্ত করতে পারে নি—এই নতুন কালের মেয়েদের এই আশ্চর্য সুন্দর স্বাধীন জীবনের হাতছানি কোন কিছুতেই আড়াল পড়ে নি। শেষ রাত্রে সে ঘড়ি দেখেছিল টর্চ জেলে। গায়ে-হলুদের তত্ত্বে রমেন—নানান জিনিস পাঠিয়েছিল—তার সঙ্গে দামী রিস্টওয়াচও ছিল। টর্চটা ছিল। না-ছিল কি? রিস্টওয়াচ থেকে হাইহিল লেডী শু। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা গীত-বিতান থেকে—কলার বক্স পর্যন্ত। অর্থাৎ গার্ডেন পার্টি টিপার্টি থেকে সাহিত্যসভা—শিল্পসভা—পর্যন্ত বিচরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ববিধ উপকরণ। সেই ঘড়িটাতেই সময় দেখেছিল—তখন সাড়ে তিনটে। ক্ষমা পাশে ঘুমিয়ে আছে, সে উঠে সমস্ত গহনাগুলি খুলে রেখে—নিঃশব্দে দরজা খুলে খালি পায়ে বেরিয়ে পড়েছিল। নীচে নেমে এসে—বাড়ীর দরজা খুলে চারিদিক দেখে নিয়ে সোজা পশ্চিম মুখে পথ ধরেছিল। পথে এসে উঠেছিল চণ্ডীতলায়—; নবীনপুর এবং চন্দনপুর দুই গাঁয়ের ব্যবধান দু মাইল দেড় মাইল; এরই ঠিক মাঝখানে চণ্ডীতলা। চণ্ডীতলার সঙ্গে তাদের আবাল্য পরিচয়। সেবাইত ঘরের মেয়ে। চণ্ডীতলায় কোথায় কি আছে, কোথায় বিপদ কোথায় নিরাপদ স্থান সব তার সুবিদিত। চণ্ডীতলা ঢুকতেই যে শিবমন্দিরটি আছে সেই মন্দিরে ঢুকেই সে লুকিয়েছিল। বড় নিরাপদস্থান। ভয় তার হয় নি। সেবাইত ঘরের মেয়ে—দেবতাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; মূর্তির কতটা পাথরত্ব কতটা দেবত্ব তাও তাদের ভালভাবে জানা আছে বলেই নাড়তে ছুঁতে—গা ঘেঁষে বসতে ভয় হয় না। তার উপর সীমা হল অমর চক্কোত্তির কন্যা। চল্লিশ সালের পর চক্কোত্তি যখন থেকে দেশ-সেবক থেকে রাজনীতিজ্ঞ হল—তখনই ওর শৈশব। সে দিক থেকে, চণ্ডীর-পেটে কিল-মারা অমর চক্কোত্তির কন্যা সে। সে মন্দিরে ঢুকে মার্কণ্ডেয়র মত শিবের কাছে গড়িয়ে পড়ে নি—জড়িয়ে ধরে নি—তাকে অবশ্য অপমান করেও কিছু করে নি—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুযায়ী দেওয়াল ঘেঁষে বসেছিল। মন্দিরটি পূর্বমুখী, ভোরের আলো দরজার ফাঁক দিয়ে পড়বামাত্র সে সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমটা পথ ধরেছিল—ইস্কুল হোস্টেলের। খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। না—। ওখানে বাবা আসবে প্রথমেই। দিদিমণিরা যদি—। যদি নয়, নিশ্চয় তাঁরা তার পক্ষ নেবেন না। কারণ অন্য মেয়ের অভিভাবকেরা বিরূপ হবেন। এবং মানে দাঁড়াবে এই যে, দিদিমণিরাই এমন শিক্ষা দিয়েছে। ও ইস্কুলে পড়তে দিলে মেয়েরা বিয়ে করবে না। বলে একটা বদনাম রটে যাবে ইস্কুলের। আরাধনা দি'র চাকরী তো যাবেই।

তা—হলে? সে দ্বিধার মধ্যে স্টেশনের পথ ধরেছিল। ভোর পাঁচটায় ট্রেন আছে একটা। চড়ে বসবে সেই ট্রেনে।

তারপর?

তারপর যা হবার তা হবে।

হবে—? রুখা চুলে এলো খোঁপা—পরনে কোরা তাঁদের কাপড়—তাতে হলুদের আভাস

—বিয়ের কনে টিকিটের পয়সা নেই বিনা টিকিটের যাত্রী—এ যে ঘর থেকে পালানো বিয়ের কনে বুঝতে দেরী হবে না এবং পরের স্টেশনে নামিয়ে পাল্টা ট্রেনে চন্দনপুর ফিরে পাঠাবে—বাবা এসে স্টেশন থেকে ধরে নিয়ে যাবে।

তবে?

তবে—থানা। হ্যাঁ থানা। থানাই সে যাবে। থানাই একমাত্র আশ্রয়। সঙ্গে সঙ্গে থানা মুখো ঘুরেছিল সে—এবং হন হন করে এসে থানার বারান্দায় উঠে সামনে যে সিপাই ছিল—তাকেই বলেছিল—দারোগাবাবু কোথায়?—কে আছে থানায়?

সিপাহী অবাক হয় নি—তবে ভেবেছিল অন্যরকম। না। তাও তো নয়। মেয়েটির কাপড়-চোপড় বেশভূষা তো বিপর্যস্ত নয়। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কোথা বাড়ী? কি হয়েছে?

—সে দারোগাবাবুকে বলব—তুমি তাঁকে ডেকে দাও।

—এখনও তো ঘুম থেকে ওঠেন নি। বস তুমি?

—বসব কোথায়? মাটিতে? একটা কিছু দাও।

সিপাহীটি এবার তাকে চিনেছিল, এ তো এখানকার ইস্কুলের মেয়ে, একে তো বাইসিক্‌লয়ে চড়তে দেখেছে। তাই নিয়ে রঙ্গরসিকতাও করেছে নিজেদের মধ্যে। এ তো সেই। সে একখানা মোড়া বের করে দিয়েছিল—তাদের নিজেদের মোড়া। আপিস ঘর তখনও বন্ধ।

সীমা প্রথম মোড়াটায় বসেছিল, তারপর ঢুলতে শুরু করেছিল, কিছুক্ষণ পর আর বসে বসে ঢুলতে পারে নি। মোড়া থেকে নেমে বারান্দার উপর শুয়ে পড়েছিল। থানায় এসে নিশ্চিন্ত বোধ করছে। সত্যই নিরাপদ বোধ করছে সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম তার সর্বাঙ্গ অবশ করে দিচ্ছে।

ছটা হতে হতে—রাস্তার লোকের চোখে পড়েছিল—থানার বারান্দায় একটি মেয়ে শুয়ে আছে। তারা থমকে দাঁড়িয়েছে কি ব্যাপার? চুরি করেছে? ধর্ষিতা হয়েছে? কি? কি? কি? সংসারে পাপও যত—পেনাল কোডের ধারাও তত। সব ধারাগুলো মনের মধ্যে সাড়া তুলে চলে গেল সে সকলজনের।

ঘণ্টা দেড়েক সে গভীর ঘুম ঘুমিয়েছিল। তারপর উঠেছিল জেগে। সামনে খানিকটা দূরে তখন জনতা। গুঞ্জন করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে পিছন ফিরে বসেছিল। কেউ চিনতে পারে এ ইচ্ছে তার ছিল না। হঠাৎ সকলকে ঠেলে নম্রু এসে তার কাছে দাঁড়াল!—এ-ই! হেই মা গো! তুমি? সীমে?

ঘাড় ফিরিয়ে নম্রুকে দেখে আবার সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

এই সময়েই দারোগাবাবু এসেছিল বেরিয়ে—কি ব্যাপার?

—এই মেয়েটি ভোরবেলা থেকে এসে বসে আছে স্যার।

—আরে? তোমাকে যেন চিনি চিনি লাগছে! হ্যাঁ—। তুমি তো—ইস্কুলে পড়।

একেবারে হড়হড় করে বলে ফেলেছিল—আমার নাম সীমা চক্রবর্তী, আমার বাবার নাম অমর চক্রবর্তী—নবীনপুর আমাদের বাড়ী। এই ইস্কুলে আমি পড়তাম। এবার ফেল করেছি। বাবা আমায় জোর করে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমি বাড়ী থেকে ভোর রাত্রে পালিয়ে এসেছি; আমাকে রক্ষা করতে হবে। জোর করে বিয়ে দিলে আমি বিষ খাব—নয় তো গলায় দড়ি দোব—নয় তো ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ব। আপনারা দায়ী হবেন।

—হেই মা—হেই মা—হেই মা। দশ হাত পিছিয়ে গিয়েছিল—নম্বুবালা।

দারোগাবাবু তাকেই ধমক দিয়ে উঠেছিলেন—এ্যাই ও! ঢঙ করতে এসেছে দেখ—সঙ কোথাকার!

চমকে উঠেছিল নম্বু। সীমাই বলেছিল—আমিও ওকে চিনি। ও রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল।

দারোগা বলেছিল—ওই বুঝি মন্ত্রণাদাতা?

—না! সীমা জবাব দিয়েছিল।

নম্বুবালা বলেছিল—দেখ দিকি বাপু। বদনাম দেওয়া দেখ দিকি!

—চুপ কর! যা তুই এখান থেকে! যা—।

আঙুল দেখিয়ে দিলে দারোগা।

নম্বু যাবার জন্তই ফিরল—কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরে এল এবং দারোগাকে বললে—যেতে আমি পারব না দারোগাবাবু। আমি থাকব।

—থাকবি?

—হ্যাঁ মশায় আমি থাকব। দেখেন—আমি ভাত্নর মা—চির জীবন ভাত্নকে নিয়ে কাটালাম। এই কন্তেটি বলছে—জোর করে বিয়ে দিলে—আমি বিষ খাব—গলায় দড়ি দোব—নইলে ট্রেনের চাকায় কাটা পড়ব। তা শুনে আমি কি করে যাই? যেতে আমি পারব না। আপনারা কি বেবস্থা করেন দেখব? সীমেকে শুধোব—মা আর তো মরবে না? সীমে বলবে—না, তবে আমি যাব। তা আপনি রাগই করেন আর রোষই করেন। আমি মশায় বসলাম!

সত্যি সত্যিই বসল নম্বু।

দারোগা বললে—যাও তো রাইটারবাবুকে ডাক তো। ডাইরীটা লিখে নিন। আর শোন বাপু,—কি নাম তোমার গো মেয়ে? সীমা—বললে না? হ্যাঁ, সীমা। শোন—ডাইরী মুহুরীবাবু লিখে নিচ্ছেন। তোমার বাবা জোর করে বিয়ে দিলে—খবর পেলে আমরা নিশ্চয়ই গিয়ে বন্ধ করব। তবে সময়ে খবর পাওয়া চাই। হ্যাঁ। আর আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা তো আমাদের নাই। আছে একটা হাজতঘর—সেখানে তো চুরি ডাকাতি না করলে ঢোকানো যায় না!

—তা হলে আমি থাকব কোথায়? যাব কোথায়?

—তা তো বলতে পারব না বাপু।

জনতা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল—নম্বুর এগিয়ে যাওয়া ও চেপে বসবার পর।

এই এগিয়ে আসা দলের কে একজন জনতার মধ্যে থেকে বললে—শুভেন্দুর বাড়ীতে খবর দেব ?

কথাটা অন্তরাল থেকে শব্দভেদী বাণের চোরাগোপ্তা মারের মত মার একটা।

অন্য কে একজন বললে—শুভেন্দুর বাবার মাথা ফেটেছে, এখন তার মাথা ঘামাবার সময় নাই হে।

জবাবে প্রশ্ন এল ওপাশ থেকে।

প্রশ্নকর্তা অজ্ঞাত।

—তা হলে তপন ?

সীমার কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল। ঝিঁঝিঁ পোকার মত একটা কিছু ডেকে উঠল কানের দু পাশে। সেই কথা! সেই কথা! সেই কথা! সেই কথা ছাড়া আর কিছু নেই সংসারে। মেয়ে আর পুরুষ হলেই বাস—সেই এক সম্বন্ধ! এক কথা!

কোন কিছুর আকস্মিক দংশনে মানুষ যেমন ভঙ্গিতে চমকে, উঠে দাঁড়ায় তেমনি ভাবে সে উঠে দাঁড়াল—সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কে বললেন কথা? কে? বলুন একবার, বলুন!

চোখ দুটো তার জ্বলছে।

এবার সব চুপ হয়ে গেল। একটি কথার সাড়া উঠল না। তবে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন উঠল। কিছু লোক মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে মাথা হেঁট করে। মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সকৌতুকে দৃষ্টি বিনিময়ও চলছে। অন্য সকলে অন্য দিকে চেয়ে রয়েছে, তাদের মুখের হাসি গুঞ্জনমুখর নয়, শুধু নীরব রেখায় ফুটে উঠেছে। কিছু লোক ভুরু কুঁচকে তিক্ত দৃষ্টিতে সীমার দিকে চেয়ে আছে। সীমার কথা তাদের আহত করেছে।

নমুও উঠে দাঁড়িয়েছে সীমার সঙ্গে সঙ্গে। সেও সবিস্ময়ে দেখছে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে। সীমা উত্তরের প্রতীক্ষা করছে—ওরা হাসির শব্দে রেখায় বিরক্তিতে উত্তর দিচ্ছে। এরই মধ্যে নমু হাত জোড় করে বললে—কি রকম করণ! ভদ্দ সন্তান সব! এ কি কাজ! একটি কুমারী কন্তে, আপনাদের কন্তে! হায় হায় হায়। টুকটুকে পারা ভাল ঘরের ছেলে কেউ এগিয়ে এস—বল—চল আমার ঘরে চল—আঃ লক্ষ্মী পথে চলে যাচ্ছে—কেউ দোর খুলে ডাকে না গো!

সীমা তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল—না। ভাদুর মা, তুমি থাম। চুপ কর বলছি। বিয়ে আমি করব না।

অবাক হয়ে গেল নমু—বলে উঠল—হেই মা! ওই কালোমুসকো মুনসেকে বিয়ে করবে না—ওই যথের ঘরে পা দেবে না আলাদা কথা, তাই বলে—।

—না—না—না। মধ্য পথেই বাধা দিল সীমা।—চুপ কর তুমি। তুমি যাও এখান থেকে।

দারোগাবাবুটি চুপ করেই বসে সমস্ত দেখছিল—শুনছিল। বুড়ো লোক এবং লোকটি

চতুর বলে খ্যাতি আছে। লোকে বলে, নীলার তুল্য কতকগুলি রত্নসম ব্যক্তির একটি চক্রবলয় গঠন করে দারোগাবাবুটি তার মাঝখানে সম্পদ ও শক্তির সৌভাগ্যের মসনদে বসে আছে। পাত্র রমেন আচার্যও সেই চক্রবলয়ের রত্নগুলির অন্যতম একটি বড় রত্ন। দারোগাবাবু রমেনের বিয়ের কথা জানে এবং তার নিমন্ত্রণও আছে, অমর চক্রোত্তির বাড়ীতে আজ সন্ধ্যায় বরযাত্রী যাবার কথা। বিয়ের পর বিশেষ বন্ধু সম্মেলনেও নিমন্ত্রণ আছে—সেখানে সেই বোধ করি তার প্রধান অতিথি হয়ে বসবে। এখন এটা কি হল ?

মাঝে মধ্যে মন তার খিঁচড়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হল। গণতন্ত্র হয়েছে! কচু হয়েছে। ইংরেজ আমল হলে—এক ধমকে বা একবার গলা ঝেড়ে রক্তচক্ষে লোকগুলোর দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে সব সাফ হয়ে যেত। বিলকুল সাফ। এবং সে নির্ভয়ে মেয়েটাকে হাজতে পুরে খবর পাঠিয়ে দিত অমর চক্রোত্তির কাছে—একজন চৌকিদার ছুটিয়ে দিত বন্চাতরায়! কিন্তু এই ইনকিলাবের কাল—আর গণতন্ত্রের রাজত্ব; —সে করতে সাহস হয় না। কিন্তু করবেই বা কি ? কূল কিনারা তো দেখতে পাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে মুহুরীবাবু এসে পড়ল। ধমক দেবার একটা লোক পেয়ে রাবণারি সিংহ কেটে পড়ে বাঁচল বললে—কতক্ষণ লাগে তোমার মুখ ধুতে হে। নাও, এই মেয়েটার ডাইরী লিখে নাও। যাও গে মেয়ে—বলগে—ওঁকে, কি বলবে ? আর শোন—

—কি ?

—যদি আত্মহত্যা করবে বল—তা হলে তোমাকে এ্যারেস্ট করব আমরা। বুঝে ডাইরি লিখিয়ো।

—বেশ তো! আমি তাই চাচ্ছি! জেলে চলে যাব। তাও আমার ভাল।

—না। তোমাকে পাগলা গারদে পাঠানো উচিত। কিন্তু ওসব কোথাও পাঠাবো না। তোমার বাপকে ডাকব—বলব, এই শুনুন আপনার মেয়ে কি বলছে।

হঠাৎ তিনি ফেটে পড়লেন—ডেঁপো—ইঁচড়ে-পক ফাজিল মেয়ে কোথাকার! যেমন ওই চক্কোত্তি বামুনটা—তেমনি তো হবে তার মেয়ে। মাতাল চরিত্রহীন—আবার পলিটিকাল ওয়ার্কার—আজ তেরঙ্গা ধরে,—কাল লালঝাণ্ডা ঘাড়ে করে ইনকিলাব করে পরশু হিন্দু মহাসভার ঝাণ্ডা তুলে নাচে। পেতে হবে না তার ফল ?

—আপনি চুপ করুন।

—আপনি চুপ করুন। ভেঙিয়ে উঠল দারোগা।—অনারেবল মেয়ে-মন্ত্রী এলেন আমার। হুকুম চালাচ্ছেন।

নীমা এবার লাফিয়ে নেমে পড়ল বারান্দা থেকে—বললে—চললাম আমি। ডাইরীতে আমার দরকার নেই। আপনারা সাক্ষী থাকুন। দারোগাবাবু যা বললেন—যে ব্যবহার আমার সঙ্গে করলেন আপনারা তা চোখে দেখেছেন, কানে শুনেছেন।—এরপর আমি যাব সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর পুলিশ সাহেবের কাছে।

দারোগা চমকে উঠল।—কনেস্টবল! এ্যারেস্ট হার। পাকড়ো!

সঙ্গে সঙ্গে সীমা ঘুরে দাঁড়াল।···কেন? খবরদার আমার গায়ে হাত দেবে না।

—এস তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাকে নিয়ে যাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

ভবানীকিঙ্করবাবু। এই গ্রামের এককালের উচ্চ মধ্যবিত্তের সন্তান। এখানকার পুরানো কংগ্রেস কর্মী—সেই উনিশ শো তিরিশ থেকে।

—বাঃ! ঠিক সময়ে এসেছেন ভদ্রলোক। দারোগা বক্রহাস্যের সঙ্গে বললেন—কিন্তু শুনুন ভবানীবাবু—আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন।

—বেশ তো—তার জন্তে যা হয় করবেন। চল তুমি—।

—দাঁড়ান। আপনার বিরুদ্ধে একটা নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে কেস হয়েছিল।

—সে কেস মিথ্যা। আদালত রায় দিয়েছে! আপনিই সে কেস করিয়েছিলেন।

—না, করাই নি। একথা আমি মেয়েটিকে বলছি—। ওগো মেয়ে, তুমি তার পরও যাবে ওঁর সঙ্গে?

—যাব।

হঠাৎ জনতার পিছন দিকে একটি চাঞ্চল্য—ঘটনার প্রবাহটিকে, বন্যার স্রোতকে যেমন—পাশের কোন বিলের আধারে টেনে নেয়, তেমনি ভাবেই মোড় ফিরিয়ে দিলে। দুটি আধুনিকা মেয়ে এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে।

—দয়া করে একটু সরুন তো! একটু পথ দিন!

সুশ্রী মার্জিতরুচি আজকালকার মেয়ে। এখানকার ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। হেডমিস্ট্রেস আর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টীচার, কমলা দিদিমণি।

তারা এসে দাঁড়াল—সীমার পাশে। সীমা মাথা নামালে। সে বুঝতে পারলে না—কি বলতে এসেছেন বড় দিদিমণি আর কমলা দিদিমণি। সে ভাবছিল, দিদিমণি বলবেন—এ কি করেছ সীমা। আমাদের বদনামের যে শেষ থাকবে না! ছি—ছি—ছি।

না। তা বললেন না। কমলাদিদি বললেন—আমরা এই মাত্র খবর পেলাম।

বড় দিদিমণি বললেন—চল, আমার ওখানে চল। পাগল মেয়ে কোথাকার।

দারোগা বললেন—তা হলে ওকে বুঝিয়ে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। বুঝলেন? ওর বাপকে আমি খবর পাঠাচ্ছি। সে এসে নিয়ে যাবে!

—ও যদি যেতে না চায় তো পাঠাব কেন? কমলা দিদি বললেন। বড়দিদিমণি ভুরু কুঁচকে তাকালেন কমলার দিকে। বড়দিদিমণি কানে খাটো। কমলা খুব কাছে এসে ওকে বললেন কথাগুলি। মুখের দিকে চেয়ে—শুনে—বুঝতে পারেন তিনি।

দারোগা বললেন—একটা কথা মনে রাখবেন—মেয়েটি মাইনর।

—না। ওর বয়স আঠারো পার হয়ে গেছে।

—আপনি কি করে জানলেন?

—আমাদের স্কুলের খাতায় আছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য যে ফর্ম পূরণ করেছে—তাতে আছে। সীমা মাইনর নয়। চলো সীমা"

ভবানীবাবু এতক্ষণ চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল—সে বললে—ভালোই হল। তুমি তাই যাও। তোমার বাবা আমাকে ভাল চোখে দেখে না। তুমি তা জান। সে ভাবত, লোকেও ভাবত—আমি শত্রুতা করবার জন্যেই তোমাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছি। এই জন্যে অনেকক্ষণ লোকেদের পিছনে দাঁড়িয়ে শুনেছি আর ভেবেছি। এ খুব ভাল হল।

দিদিমণিদের সঙ্গে সীমা—বড়দিদিমণির কোয়ার্টারে এসে উঠল; পিছনে পিছনে জনতার অংশ।

তারা তখনও পেছন ছাড়ে নি।

বাড়ীর দোরে দুহাত মেলে সকলকে আটকে বার বার ভবানীবাবু বললে—আর কেন সব? কেন পিছনে পিছনে আসছ? যাও। যে যার বাড়ী যাও। কাজে যাও। যাও।

তাতে দু'চারজনই খসল। বাকী সব একটু দূরত্ব বাড়িয়ে চলতে লাগল। নসু কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে নি। সঙ্গে সঙ্গেই চলছে। মাত্র দু চার পা পিছনে থেকে। আপন মনেই বলছিল—ভাদুর আমার কালের বা' লেগেছে। হায় হায় হায়।

ভাদু আমার বিয়ে করবে না!—তবে কি করবে ভাদু মা?—না নেকাপড়া শিখে চাকরি করব। হায় হায় হায়। তা, চাকরি করে, 'ভাদুর মা দুখিনী'কে একখানি কাপড় দিয়ো যেন। সেই কাপড় পরে নাচব—আর তোমার মহিমে গাইব। ও মন রসনা আমার।

সন্ধ্যের সময় সেই গানই জুড়েছিল নসুবালা আর গুন-গুন করছিল। সীমার সঙ্গেই তার একটা বেলা কেটেছে। ভিক্ষেই আজ করা হয় নি। তা না হোক। ভবানীবাবুর বাড়ীতে আধ সের চাল পেয়েছে। তার মা দিয়েছেন। মেয়েদের বোর্ডিং আর ভবানীকিঙ্করদের বাড়ী লাগালাগি—এক দেওয়ালে। ভবানীবাবুদেরই ন' আনার শরিকদের দালান সমেত বাস্তুবাড়ী কিনে মেয়েদের বোর্ডিং হয়েছে। সে শরিকরা এখন ফকির। ভবানীবাবুর মা—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ। দুর্গা মা। দয়ার আর পারাপার নাই। ওঁর কাছে গেলেই পেটটা ভরবে। আধ সের চাল। সেই চাল ক'টি নিয়েই বাড়ী এসে ফুটিয়েছে, স্নান করে—ভাদুকে মুখ মুছিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে—খানকয়েক বাতাসার ভোগ দিয়ে—খেয়ে নিয়ে বসে বসে শুধু ভেবেছে। সীমার কথাগুলি মনের মধ্যে—ফুলন্ত গাছের চারিপাশে উড়ন্ত মৌমাছির মত, প্রজাপতির মত ঘুর ঘুর করে ঘুরছে। হায় হায়—ভাদুর আমার ভাবনা শোন দিকি! সাধ শোন দিকি!

আগের কালে লোকে বলত—লক্ষ্মী হও মা। লক্ষ্মী হও!

ভাদু বলছে—না বাবা, লক্ষ্মী নয়—বল সরস্বতী হও!

ভাদু বলে—লক্ষ্মী আমি হব না কো—
উটি বলো না—
খাটিতে নারিব আমি—ও মন রসনা আমার—
নারায়ণের তিলগুনা।

সেই লক্ষ্মীর কথায় আছে—এক গরীব ব্রাহ্মণের ক্ষেতের দুটি তিলফুল কানে পরেছিলেন বলে—নারায়ণের হুকুমে এক বছর লক্ষ্মীকে বামুনের ঘরে দাসীবৃত্তি করে 'তিলগুনো' খাটতে হয়েছিল। তা বটে—বাপের ঘরে—কন্তে লক্ষ্মী—হাত-নুড়কো—মানে ছোটখাটো ফাইফরমাশের ছোট ঝি। শ্বশুর ঘর যাবার সময় বাপকে আধ মুঠো ধান দিয়ে আধ মুঠো ধান সঙ্গে নিয়ে যায়। তা গেলে কি হবে, শ্বশুরবাড়ীতে কন্তের অবস্থা হয় ওই তিলগুনো খাটা লক্ষ্মী তার চেয়ে সরস্বতীই ভাল।

নতুন কালের ভাদু আমার
নাম হয়েছে সীমে।
মহিমে তার ঢাকে ঢোলে—ও মন
রসনা আমার তার সঙ্গে শিঙে।

মধ্যে মধ্যে ছুটে ছুটে গিয়েছে বেয়াইয়ের সন্ধানে।

—বেয়াই! বলি ফিরেছ?

বেয়াই ফেরেনি, ঘরের তালাটা ঝুলছে; অগত্যা নসু ফিরে এসেছে।

কখনও খানিকটা এসে সেখান থেকেই হেঁকেছে—বে-য়া-ই-হে।

সাড়া না-পেয়ে ফিরে গেছে। বেয়াই আজ খুব বিকিকিনি পেয়েছে তা হলে। সেটেলমেন্টের ক্যাম্পে আজ ওই দিককার লোক। আকুটির বাবুরা পুরানো বাড়ী। আর লক্ষ্মীকে ওরা বেশ শক্ত টানে বেঁধেছেঁদে রেখেছিল। এবারে গেলেন মা, রাজ আজ্ঞেতে যেতে হল। ঠেকাবে কে? তারা সব এসেছিল সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে যতটা রাখা যায় মা লক্ষ্মীর পেসাদ! সেইখানেই আজ জমেছে বেয়াই, ফেরবার নাম নাই।

বেয়াই বলে ভাল। বলে, জান—তোমার ওই সব ভাল লাগে।—আমার ভাল লাগে এই সব। খানিক খানিক বুঝি তো। তা বেয়ান, তোমার পাগলের সে গান—সেরা গান। বুয়েচ।—

যে গড়েছে সেই ভাঙে ভাই—
যে ভাঙে সেই গড়ে—
বিধেতা পাগল বুড়ো—
ও মন রসনা আমার—খেলয়ে বালুচরে।
ব্রজধাম সে রচেছিল—কই সে ব্রজ হায়—
বুড়োই ভেঙেছে ব্রজ
ও মন রসনা আমার—তবু বংশী থামে নাই।

বুয়েচ, এও তাই। বিধেতা হুকুম করলেন সেই হুকুম—সেই হুকুমে সাহেবরা গেল; রাজলক্ষ্মী এলেন, গান্ধী রাজার শিষ্যসেবকদের কাছে। বিলিতি বস্ত্র ছাড়লেন—খদ্দর পরলেন—শঙ্খ পরলেন, পাটে বসলেন।

রাজলক্ষ্মী হুকুম করলেন—রাজা-রাজড়ার বাবু জমিদারের বাড়ীর লক্ষ্মীকে নোটিস হল—সব এস—এসে আমার সঙ্গে মিশে যাও।

ফটিক দাসের কাছে রসের উৎস ওইখানে। সব মানুষ সমান হয়ে যাচ্ছে, বেশ লাগছে তার। ফটিক বলে—আমি বেয়ান বনমৌমাছি—বাগানের ফুলে ঘুরি না। ফসলের ক্ষেতে ঘুরি! যত রস ধানেরই ভিতর, বুয়েচ বেয়ান। ধান কোথা হয়? না—জমিতে। ধান কি করে? চাল করে সিদ্ধ করে ভাত বানিয়ে খায়। আর কি হয়? বেচলে টাকা হয়। তাহলে কি হল? রসের গোড়া হল জমি—আগা হল টাকা।

বেয়ান হে, মা গঙ্গার স্তব তো তোমাকে পড়ে শুনিয়েছি।

—হ্যাঁ হে হ্যাঁ। বন্দ্য মাতা সুরধুনি—পুরানে মহিমা শুনি—পতিতপাবনী নারায়ণী—

—হ্যাঁ। মা গঙ্গা ছিলেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, পিথিমীতে নেমে পাহাড় বন দেশ ঘাট ভাসালেন মানুষের জীবন উদ্ধার হল—কিন্তু গেলেন কোথা—না গঙ্গাসাগর।

—বটে বেয়াই বটে। বলছ ভাল। হাকিমকেও বলতে হবে ভাল।

—হ্যাঁ, মা গঙ্গার আদি হল ব্রহ্মার কমণ্ডলু অন্ত হল গঙ্গাসাগর, চান করলে সব কামনা সিদ্ধ হয়। জমি ব্রহ্মার ঘর—টাকা গঙ্গাসাগর আমি সার বুঝেছি—খাঁটি বুঝেছি। আমার ঘর হল না টাকা নাই বলে। জমি থাকলে টাকা হত। শেষ কথা বুঝে নিয়েছি। তোমার রঙের কথা—তোমাকে ভাল—তোমার ভানুকে ভাল। উ সব দুজন একজন। তাই বুয়েচ—আমি মজা পাই ওই সবে। বসে পুতুল বেচি আর দেখি। হরি হে, তুমি সত্যি হলে, তুমি কখনও জমি কখনও টাকা। তা না হলে ব্রেজধামের রাখালি ছেড়ে মথুরা পালাতে না। রাধাকে ছেড়ে কুঁজিতে মজতে না। শেষ কথা। সার কথা। কুঁজি নয়, মথুরার সিংহাসন।

নন্দবালা হাসে। কি বলছে বেয়াই। হায় হায়, দু-দুটো বোষ্টমী আনলে—দুটোই পালাল। বেয়াই বলে—টাকা জমি থাকলে পালাত না। তা আধা সত্যি বটে। কিন্তু! না-না-না। তাই হয়! তুমি জান না বেয়াই শেষ কথা তুমি জান না। শেষ কথাটি সে জানে।

সংসারে শেষ কথা জানা ভারী শক্ত। কিন্তু শেষ কথাটি না জানলে তো মানুষের ঘুম হয় না। নানান জনে নানান কথাকে শেষ কথা ধ'রে নিয়ে মনকে বোঝায়, বলে শেষ কথা পেয়েছি। তাতেই শান্তি পায়, স্বস্তি পায়। সংসারের শেষ কথাটি বুঝেছে ভেবে নিয়ে পরমানন্দে গান গায়। কেউ গান গায় সুরে—কেউ মনে মনে।

সন্ধ্যাবেলা—সুরে স্বরে গান গাইতে গাইতে ফিরল—ফটিক দাস। সে ইচ্ছে করেই উচ্চ-কণ্ঠে গাইতে গাইতে ফিরল।

ফালের ফুটোয় কাছি পরাও—

—ক্যা-নো?

দিনের আলোর আলোয়—
কাল কাছিতে জমি সেলাই—
ও মন রসনা আমার—সারো ভালোয় ভালোয়।

ডালা খুলে আলো জেলে বসতে বসতে তার সাড়া পেয়ে ছুটে এল নন্দবালা।—বাবাঃ কি বেসাত করলো বেয়াই? কত টাকার বেচলে? সারা দিনটি কাটালে যে!

—বিলকুল ফক্কা বেবাক ফাঁক। সব পুতুল বেচেছি। ডালা খালি। আকুটির বাবুরা আরও বরাত দিয়েছে।

—ওদের অনেক পয়সা নয়?

—কাল কাছিতে জমি সেলাই করে জমিদারী শালের দোসর দোলাই তৈরী করছে বাবুরা। বাবুদের পয়সা থাকবে না? বলিহারির বুদ্ধি। বসে শুনেছি আর গান বেঁধেছি। দাঁড়াও আগে মাটিটা দেখি—ভিজিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। ওঃ, চাষীদের পয়সা কত! শখ কত। হে! একটা ছুটো বেয়াকেট কি জনা-র চাই। বরাত মেলাই। তোমার খবর বল।

—আমি বেয়াই আরো আশ্চর্যি দেখে এসেছি। ফিরেছি কখন! তিন-তিনবার তোমার বাড়ী এসে ফিরে গিয়েছি কথাগুলো পেটে গজগজ করছে, শোন। শোন—আমার নতুন ভাদু —সীমেরানীর গান শোন!

—আমারটা আগে শোন বেয়ান। আগে আমারটা। কাল দিয়ে জমি সেলাই! এ কখনও শুনেছ?

—উঁহু আমারটা আগে!

—দাঁড়াও তো, দাঁড়াও তো!

—ক্যানে—। ওই দেখ—ক্যানে বলছি! ক্যা-নো—ক্যানো!

ফটিকদাস বললে, ব্যাঙের বাজনা বাজছে না!

—ব্যাঙের বাজনা?

—হ্যাঁ, শোন!

—হুঁ! দাঁড়াও দাঁড়াও। দেখি দাঁড়াও। দীঘির পাড়ে উঠে দেখি। ওখান থেকে নবীনপুরের শড়ক ফটফটে দেখা যায়।

—দেখতে হবে না। রমেন আচায্যি বিয়ে করতে আসছে।

—হা হা হা। হেসে গড়িয়ে পড়ল নন্দ।

—হাসছ?

—শোন, গান শোন আমার—।

সে শুরু করল তার গান। ফটিক মাটি ঠাসতে শুরু করল। নন্দ গাইতে গাইতেই বললে —না মাইরি, তুমি যেন কি? বেয়াই!

—ক্যা-নো?

—এয়েছ, চা খেলে না; আমি বেয়ান—চা দিলে না। মাটি ঠাসতে বসলে!

—মাটি না ঠাসলে কালকের ডালা ফাঁক। রেতে গড়ে—আগুনে সেঁকে শুকুতে হবে। সকালে রঙ। পেট ভরতি তো রাজ-ফুর্তি। পয়সা নইলে পেট ভরে না! নাও। চা কর। আমি ওখানে খেয়েছি। বাবুরা খাইয়েছে। লাও—লাও। এই একটা সিগরেট লাও। এও বাবুদের।

—দাও। রেখে দিই। চা খেয়ে খাব।

হঠাৎ রাস্তা থেকে কে যেন বললে—ওরে, তোদের দেশলাই আছে?

ভারী গলার আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠল।

দুজন লোক—সেই কালিপড়া লণ্ঠনটির স্বল্প আলোয় আলোকিত অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। ও রে—দেশলাই আছে?

—কে? কে বট? চমকে উঠল নমু।

—আমি রে! যোগপুরের ডাক্তারবাবু!

যোগপুরের ডাক্তারবাবু—ধ্রুব ডাক্তার! বাপরে! লোকে বলে এখানকার বিধান রায়। ফটিক দাস এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করলে—প্রণাম ডাক্তারবাবু!

—হেই মা গো! সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি গো!—ও বাবা। নমু এগিয়ে হেসে দাঁড়িয়ে বললে—আমাকে চিনতে পারছ তো। আমি ভাদুর মা! কোথা এয়েছিলেন—কার কি হল?

—জোরে বল—আমি শুনতে পাই না। কানে কালা। এঁটে-এঁটে বল। বদ্ধ কালা আমি।

—আমি ভাদুর-মা, চিনেছ আমাকে?

—চিনেছি। দে দেখি দেশলাই না হয় আগুন। আলোটা জেলে নিই। রাস্তায় দপ করে নিভে গেল!

কালিপড়া হ্যারিকেন এবং দেশলাই—দুই আনলে ফটিক। আলো পড়ল ডাক্তারের উপর।

শক্ত কাঠামো কালো রঙের মানুষটিকে বড় তো বড়—ছোট ডাক্তার বলেও চেনবার উপায় নেই। পায়ে জুতো একজোড়া আছে, কিন্তু সে জুতো কাদায় ধুলোয় বিবর্ণ শ্রীহীন। শুধু সোলখানা পুরু এটা বোঝা যায়। পরনে মোটা কাপড, গায়ে গেঞ্জি—জামা, কোট একটা, কাঁধে কেলা আছে, মাথায় একখানা চাদর বাঁধা। মুখে একজোড়া ভারী গোঁফ, মাথার চুলের ডগাগুলি চাদরের পাগড়ীর প্রান্ত থেকে বেরিয়ে কপালের উপর পড়েছে। তবে ডাক্তারকে দেখেছে সকলে, মাথার চুল তার পাতলা এবং সেগুলি অবিন্যস্তই থাকে। পিছনে ডাক্তারের অনুচর একজন, তার হাতে কলব্যাগ।

ডাক্তার আলোটা জ্বালবার উদ্যোগ করছে এমন সময় পিছনে অন্ধকার থেকে কে ডাকলে—ধ্রুবদা!

ডাক্তার শুনতে পেলে না, সঙ্গের লোকটি উত্তর দিলে—এইখানে—।

ফটিকদাস সঙ্গে সঙ্গে বললে চীৎকার করে—আমি ফটিক, ডাক্তারবাবু আমার

বাড়ীতে।

ডাক্তার মুখ তুলে প্রশ্ন করে তাকালে। সঙ্গের লোকটি ঝুঁকে উঁচু গলায় বললে—ভবানীবাবু! বলতে বলতে টর্চের আলো এসে পড়ল উঠোনে।

ভবানীকিঙ্কর এসে দাঁড়াল।—এই নাও, দেশলাইটা রাখ। কিনে আনলাম। পথে ও-লণ্ঠন আবার নিভবে।

—দাও। ডাক্তার পকেটে পুরলে দেশলাইটা।

নসু জিজ্ঞাসা করলে—দাদাবাবু—ডাক্তারবাবু কাকে দেখতে আইছিলেন।

—গোপাল চৌধুরীকে রে! মাথা কেটেছে!

—মাথা ফেটেছে—তা কেমন মাথা ফাটা? বড় ডাক্তারবাবুকে—।

—একটু বেশী বটে। শিরা ছিঁড়েছে—রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।

শুনতে পেয়েছিল ধ্রুব ডাক্তার। মুখ দেখে বোধ হয় কথা বুঝতে পেরেছিল। সে ভবানী-কিঙ্করকে বললে—বেঁচে যাবে। তবে আর কাজকর্ম করতে পারবে না। হ্যাঁ। বেঁচে যাবে। চল! বরযাত্রীরা পৌঁছুল বোধ হয়। রমেনের বাবা ভুবনের সঙ্গে পড়েছিলাম। রমেনকে একবার টাইফয়েড থেকে বাঁচিয়েছি। কথাগুলি বললে সে ভবানীকে।

ভবানী বললে—তা হ'লে এইটুকু রাস্তা টর্চেই চলে যেতে।

—তা যেতাম। অন্ধকারেও যেতে পারি। যাই তো। তা সেদিন একটা খালে পা পড়েছিল। বয়স হ'ল তো, আলো এবার চাই। রাত্রেই আবার বাড়ীও ফিরব—। সকালে রোগী আসবে। তা তুমি যাবে না? রমেন তো তোমার চ্যালা গো। থানা কংগ্রেসের মেম্বর, তুমি প্রেসিডেণ্ট। নেমন্তন্ন করে নাই?

—করেছে। তবে এই ব্যাপার, মানে, আসল কনে তো, এখানে পালিয়ে এসেছে। মিস্ট্রেসরা সাহস করে এগিয়ে এল—তাই—নইলে তো আমিই নিয়ে যাচ্ছিলাম আমার বাড়ী! এখন ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। তা খবর তো গোপন থাকবে না। আমিও গোপন করি নি। রমেন কিছু বলুক না বলুক—অমর চক্কোত্তিকে তো জানেন। আর রমেন নামে মেম্বর, সুবিধের জন্তে মেম্বর। নইলে এখানকার যে দল আমার বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে কারবার। আমি যাব না, তুমি যাও।

বলতে বলতেই তারা ফটিকদাসের উঠোন থেকে রাস্তায় নেমে এল। পথে উঠে ডাক্তার বললে—চললাম রে ভাদুর মা! ফটিকচন্দ্র হে—চললাম!

ফটিক বললে—পেনাম ডাক্তারবাবু!

নসু বললে—একটা নয় ধন্বন্তরী—একশো পেনাম। রোগে ধরলে মরণে সে তুফানে মা চণ্ডী কাণ্ডারী, তুমি তার হাতের হাল বৈঠে। বাবা রে!

ফটিক বললে—শুনতে পেলে না।

—না পাক। আমি তো বলেছি যা বলবার! ভগবান তো আরও কালা। তার ওপর কানে তুলো গোঁজা। তবু তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত ইনিয়ে বিনিয়ে বলেই চলেছে।—কিন্তুক—

শুনলে তো—! রমেন্দোর বিয়ের কথা!

—শুনলুম বৈকি! ছোট মেয়ে ক্ষমার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। বেয়ান হে—যত রস ধানের ভিতর হে ধানেরই ভিতর! রমেন্দোর ধান আছে—জমি আছে—টাকা আছে। কনে পালালে বিয়ে আটকায়? মাটির থেকে কনে গজায়। তুমি নাচছ—

"হায় রমেন্দোর বিয়ে হ'ল না—
নতুন কালের বা' এসেছে, ও মন রসনা আমার
ভাদুরা বিয়ে করবে না—কেউ তা
বলো না!"

—উঁহু! উঁহু!

—উঁহু, কিসের উঁহু!

—শোন বা? না-না-না, শুনিবেন?

—শুনিব।

নসুবালা গান ধরলে—

"ও হায় নাকের বদলে নরুণ,
ফুলের বদলে রাঙা বিলিতী বেগুন
সীমার বদলে ক্ষমা—ও মন রসনা আমার
তাকদুমাদুম!
তাই ঘুনাঘুন—তাই ঘুনাঘুন—
চরণে নূপুর বাজে তাই ঘুনাঘুন!"

ফটিক না-না জানিয়ে নীরবে ঘাড় নাড়ে আর হাসে। মাঝে মাঝে গানের ফাঁকের মধ্যে বলে—বিলিতী বেগুনের অনেক গুণ; অনেক পোষ্টাই। রমেন্দোর এতে ভাল হবে।

এরই মধ্যে আবার কার ভরা গলার সাড়া এল,—ফটিকচন্দ্র! নসুবালা!

জিভ কেটে থেমে গেল নসুবালা। ফটিক ব্যস্ত হয়ে সসম্ভ্রমে জবাব দিলে—দে-মশায়?

—হ্যাঁ হে। রাত্রি বেশ হয়েছে বাবা! এইবার ঘুমোও। আমরাও ঘুমোই। কি বল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই থামলাম আমরা দে মশায়।

—বেশ-বেশ! আমরা যে কানের কাছে কি না!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা বুঝতে পারি নাই এত রাত্তির হয়েছে।

—হ্যাঁ। জমেছিল! আমারও ভাল লাগছিল। তা ঘুমের তো দরকার আছে!

ফটিকের বাড়ীর হাত চল্লিশেক তফাতে বড় রাস্তাটার একটা ত্তে-মাথায় দে মশায়ের নতুন পাকা বাড়ী। সেই বাড়ীর বারান্দা থেকে কথা বলছে দে মশায়।

দে—শিবনাথ দে এখন চন্নপুরের সব থেকে বড় ব্যবসায়ী—লোকে বলে ধনীও বটে। মস্ত

গদির মালিক তার সঙ্গে একটা গোটা রাইস মিল—তারও মালিক। কিন্তু আশ্চর্য অনুত্তেজিত ধীর মানুষ। নিতান্ত সামান্য অবস্থা থেকে আজ বিরাট সম্পদের অধিকারী। জীবনটা শুধু হিসেবের জীবন। জাতিতে গন্ধবণিক; বাল্যজীবনে নিদারুণ দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সহ্য করেছে সে। বাপ ছিল সেকালের এক দুর্ধর্ষ মানুষ, উচ্ছৃঙ্খল জীবন ছিল তার। দেনায় আকণ্ঠ ডুবে বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করেছিল। তারই ছেলে শিবনাথ। সে ছিল অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। চৌদ্দ পনের বছর থেকে নিজের পড়াশুনো করেছে, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মহাজনের সঙ্গে মামলা লড়েছে, কিছু কিছু উপার্জনও করেছে। প্রাইভেটে নীচের ক্লাসের ছাত্র পড়াতো। টুকিটাকি ব্যবসা করেছে। মেলায় মেলায় ফিরেছে। জমিদার মহাজনের বাড়ী এসে দীনভাবে আবেদন করেছে, মহাজনের নালিশের ক্ষেত্রে তার পক্ষে সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য। এরই মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। বাড়ীতে আইন পড়েছিল ওই মহাজনের সঙ্গে মামলার জন্য। তারপর পেয়েছিল চন্দনপুরের লক্ষপতিদের বাড়ী। নায়েব হয়েছিল।

তারপর সুরু করেছিল ব্যবসায়। সে ব্যবসায়ে তার সমৃদ্ধি হয়েছে ধুলো থেকে সোনার মত। কিন্তু সে কোন যাদুমন্ত্রে নয়, এ বিশ্বাস করে লোকে যে ধুলো সোনা হয়েছে দে মশায়ের বুদ্ধির এবং হিসাবের অতিসূক্ষ্ম ভাগমাপের রাসায়নিক ক্রিয়ায়। গ্রামের জমিদার পিছনে লেগেছে ইউনিয়ন বোর্ড লেগেছে—ব্যবসায়ীরা পিছনে লেগেছে—পুলিস লেগেছে—কিন্তু এই অনুত্তেজিত স্নায়ু শান্ত মানুষটি তার হিসেবের মাপ করা অকম্পিত পদক্ষেপে বলতে গেলে সোজা চড়াই ভেঙে এসেছে বিষয়সম্পত্তি ও সম্পদের পাহাড়ের মাথায়। মাটিতে পা কাঁপে নি—উপরে আকাশের দুর্যোগে মাথা টলে নি। লম্বা মানুষ, মোটা হাড়ে শক্ত কাঠামো, মেদবর্জিত শরীর; কথা বলতে গেলে কখনও মুখের উপর কথার ভাবের ছাপ পড়ে না। ঠাণ্ডা হিমের মত লোকটি। যেখানে ঢুকব মনে করে সেখানে ঢুকে যায়—কখনও সোজা পথে—কখনও বাঁকা পথে এবং সে পথে ছুঁত-পবিত্তের বিচার সে করে না। যে যতই দরবার করুক—ফৌজদারি বা দেওয়ানি যে কোন আদালতে, দে তার দিকের ন্যায় এবং আইনসম্মতা প্রমাণ করে বেরিয়ে আসে মাথা উঁচু করে, কিন্তু মুখে কোন উল্লাসের চিহ্ন কেউ দেখতে পায় না।

জীবনে দে হল দাবা খেলোয়াড়; পাশা খেলোয়াড় নয়—যারা আড়ি মারতে কচে-বারো হাঁক হেঁকে কচে-বারো দান ফেলে—ছাদ ফাটানো চীৎকার করে ওঠে, পাড়া চমকে দেয়। দে —প্রতিপক্ষের মন্ত্রী মারবার সময় নিঃশব্দে সেটিকে তুলে নিয়ে নিজের বলটি বসিয়ে দেয়। শেষ কিস্তি দিয়ে মৃদুস্বরে 'মাৎ' শব্দটি উচ্চারণ করে—ফের বল্ সাজাতে বসে নতুন দানের।

সকালে উঠে মিলে যায় দে, দুপুরে ফিরে এসে খায়, ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করে, আবার চারটেতে মিলে গিয়ে বসে—ফিরে আসে রাত্রি দশটায়। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে।

দে গ্রামের ভিতরের বাড়ি ভাই-ভাইপোকে দিয়ে—গ্রামে পূর্ব দিকে ব্রাহ্মণদের পাড়া ঘেঁষে বাড়ী করেছে। এখান থেকে আরও খানিকটা পূর্বে তার মিল। তার মিলের কাছেই সরকারী পাকারাস্তার ওপাশে—চণ্ডীতলা।

কেউ কেউ বলে—চন্দনপুরের একটা নতুন কাল এসেছিল—পঞ্চাশ বছর কি ষাট বছর

আগে স্বর্গীয় মাধববাবুর আবির্ভাবে ; তিনি গ্রামের পশ্চিম দিকের পোড়ো প্রান্তর কিনেছিলেন বা তাঁকে কেউ গছিয়েছিল—তাঁর জমির ক্ষুধা দেখে ; সে যাই হোক, পশ্চিম দিকটার কৃষ্ণসায়র থেকে মাইলখানেক পাকাসড়কের দুই পাশে ইস্কুল হাসপাতাল রেজেস্ট্রি আপিসকে কেন্দ্র করে বেড়েই গেছে। এখনও সরকারী বাড়ীর ঘরদোরের বাড়ার ঝোঁক পশ্চিম দিকে। এবার নতুনকাল এসেছে নিজে ; কারও পিছন পিছন আসে নি,—ক'লের পিছনে পিছনে যারা এসেছে তাদের মধ্যে দে মশায় একজন প্রধান। অন্তত এ কালের লক্ষী যাদের আশ্রয় করেছেন—তাদের মধ্যে দে সর্বপ্রধান। দে পশ্চিম দিক থেকে গ্রামের মুখটা ফিরাতে চেয়েছেন পূর্ব মুখে। এদিকটায় ছিল দরিদ্র এবং ব্রাত্য যারা তারাই, এটা তাদেরই পাড়া। তাই মধ্যে মধ্যে রাত্রি এক প্রহরের পর ঢোল বাজলে কি নাচ গান হলে—দে মশায় ডেকে বলে, ওহে—বাপুরা, এবার ক্ষান্ত দাও। ফটিক-নসুকে একটু স্নেহের সঙ্গে রসিকতা করেই বলে—ফটিকচন্দ্র হে—নসুবালা-ভাদুজননী। এইবার—একবার—! 'থামো' কথাটা উহ্য রেখে দেয়।

নসুবালাদের পালা এক প্রহরের আগেই সাধারণত শেষ হয়। কোন কোন দিন তারা এমনই মত্ত হয়ে পড়ে যে খেয়াল থাকে না—কখন মেঘের ডাকের মত গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ শব্দের একটানা ডাক ডেকে এক প্রহর রাতের উড়োজাহাজ মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আকাশের দিকে চাইলে দেখা যায় চলন্ত নক্ষত্র যেন দলে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। রোজ নিত্য নিয়মিতই যায়। উত্তরবঙ্গের প্লেন সার্ভিসের পথ চন্নপুরের মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে। প্লেন যায় কলকাতা দমদম। প্লেনখানিও পার হয়, ও'দিকে আশেপাশে শিয়ালেরাও ডাক শুরু করে। ওদিকে ইস্টিশানে গাড়ি ছাড়ে—পুঁ শব্দে সিটি দিয়ে। কিন্তু এ ট্রেন প্রায় লেট থাকে। তাই প্লেন সার্ভিস হওয়ার পর থেকে ট্রেনের সিটির দিকে মানুষের কান বা মন থাকে না। মন থাকে প্লেনের শব্দের দিকে।

নসু উঠল। আর নয়! প্রহর রাত কখন পার হয়ে গিয়েছে। দে ঘরে এসেছে, খেয়েছে এবার শোবে। 'ল্যেট' হয়ে গিয়েছে! অর্থাৎ দেরি।

তার আর দোষ কোথায় ? চন্নপুরে দশখানা গাঁয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এসে মরে। প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটে থাকে.—মারামারি, কথা কাটাকাটি, গান-বাজনা, রঙ্গরস, কোনদিন মিছিল—কোনদিন মিটিং—হয়েই থাকে! সাতচল্লিশের পর থেকে এসব—ঘরোয়া ব্যাপার। বিয়ের দিন থাকলে বিয়েও হয়। কিন্তু আজকের কাণ্ড সচরাচর ঘটে না। বিয়ের কনে পালিয়ে এসে থানায় হাজির! বিয়ে করবে না, লেকাপড়া করবে, বি-এ এম-এ পাশ দেবে।

আর গোপাল চৌধুরী ছোট জাতের হাতে চটি খেয়ে নিজ হাতে চেলাকাঠ মাথায় মেরে এমন করে ফাটালে- যে তার রক্ত বন্ধ হয় না। ওদিকে রমেন্দ্র আচার্যি বুড়ো বয়সে—ক্ষমাকে বিয়ে করতে আসছে ব্যাণ্ড বাজিয়ে।

দোষ কি নসুবালার—দোষ কি ফটিক দাসের।

—চললাম বেয়াই চললাম। মা ভাদুমণি রাসমোহনের সঙ্গে ঝগড়া করো না। ঘর

খুলে পালিয়ে গিয়ে ইস্কুলে উঠো না।

নসুবালা এসে উঠল—নিজের বাড়ী। ঘরের উঠানে এসে দাঁড়াল। কে কাতরাচ্ছে—কাঁদছে!

—কে বটে? কে? সাবি—না—কে লো? সাবি?

আওয়াজ এল—আমি লই, দাদা।

তবে কে,—গৌরো?

—হাঁা—বাতটো বেড়েছে।

—হে ভগবান! নসুবালা ঘরে গিয়ে শুল।

ওঃ! কি প্রহার! সাবিত্রী শঙ্করী তরলা ফুরি—উব্বি—ওই এক বংশ! এ অঞ্চলে বাবু-ভাইয়ের আমলে খেল্ খেলেছে। ওঃ! রাতদুপুরে তখন এ কান্না কাতরানি শোনা যেত না—শোনা যেত হাসি—খিল্-খিল্-খিল্-খিল্! সঙ্গে সঙ্গে—ছোটার শব্দ আর কাচের চুড়ির রিনিঠিনি রিনিঠিনি শব্দ!—আরও রাত্রে ভারী পায়ের শব্দ শোনা যেত। আসত শশী—অভিলাষ গৌর শাব্‌লা—গোপ্‌লারা ফিরত চুরি করে। ধান চুরি করে সামালদারের ঘরে মাল ফেলে টাকা নিয়ে ফিরত। ভয় লাগত নসুর তখন বাইরে উঠতে। তখন তারা বাঘ ছিল। আঃ, গোটা বংশটাকে কে যেন মাথায় বাড়ি মেরে একেবারে শুইয়ে দিয়েছে।

শশী অভিলাষেরা মরেছে। গৌরো গোপলা আছে কিন্তু রোগে পঙ্গু হয়ে আছে। আর এই মেয়েগুলো যারা সেকালে দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সব কুৎসিত রোগে পাড়ু হয়ে এখন ভিক্ষে করে বেড়ায়। তরলার কুষ্ঠ হয়েছে। এখন ওরা রাত্রে কাঁদে, কাতরায়।

চোর, খারাপ মেয়ে আজ আর নেই তা নয়। তবে এরা শুয়ে পড়েছে। ভিক্ষে করে খায়। বর্ষার সময়—মাস দু-তিন সরকার থেকে গম পায়। সে গম সস্তা দরে দোকানীরাই কেনে।

দে-ও শুনতে পেয়েছিল এ কাতরানি। সে জানালাটা বন্ধ করে দিল। তার মত শান্ত শক্ত মানুষের মনও আজ চঞ্চল হয়েছে! সে মিলের গদী থেকে বেরিয়ে আজ সরাসরি বাড়ী আসে নি। সে দেখতে গিয়েছিল গোপাল চৌধুরীকে। চৌধুরীর সঙ্গে সে এক বছর পড়েছিল ছেলেবেলায়। গোপাল চৌধুরী জমিদারের ছেলে, ফেল করাই ছিল তার জমিদারির গৌরব। ফেল করেই দে'র সঙ্গী হয়েছিল, আবার ফেল করে দে'র পিছনে পড়েছিল কিন্তু বয়সে এক বলে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত বন্ধুত্ব অটুট ছিল। তারপর যৌবনে গোপাল হয়েছিল জমিদার-বাবু আর দে, সে-কালে সকলজনের কাছে কূটবুদ্ধি জটিল-চরিত্র অপরাধী। ইদানীং আবার একটা সম্বন্ধ হয়েছিল। গোপাল ধান বিক্রী করে, দে কেনে। দরকার মত অগ্রিমও নিয়ে যায় বিশ পঞ্চাশ, একশো। সবই অবশ্য চিরকুটে লিখে—লোক মারফৎ চলে, সাক্ষাৎ দেখাশুনো হয় না। গোপাল তার গণ্ডী ছেড়ে বাইরে পা দেয় না। দে'রও সময় নেই। কিন্তু আজ সকালেই সংবাদটা পেয়ে অবধি ইচ্ছে হয়েছিল গোপালকে একবার দেখে আসে। ন্যাড়া বাউড়ীকে

শাসন—সামান্য কথা। সে জন্য নয়, গোপালকে দেখবার জন্যই যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছে সম্বরণ করেছিল কারণ গোপালের দুঃখ বাড়বে—লজ্জা পাবে। সন্ধ্যার পর যোগপুরের ধ্রুব ডাক্তার যখন নবীনপুর যাচ্ছিল—তখন পথের ধারে মিশে বসেছিল শিবনাথ দে। ধ্রুবকে দেখলে চকিত হয় সকলেই। কারণ বড় ডাক্তার। রোগ কঠিন না হলে আসে না। দে-ও চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—আরে ডাক্তার! তুমি কোথায় ভাই? ধ্রুবর কাছে গোপালের অবস্থার কথা শুনে—সে আর ইচ্ছা সম্বরণ করতে পারে নি—গিয়েছিল তাকে দেখতে। দেখে কষ্ট পেয়েছিল। ওঃ, গোপালের কি অবস্থা!

সেই মনেই আজ গৌরোর কাতরানি—দে'-কে একটু চঞ্চল করলে। সে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। অন্য দিন—কারুর কাতরানি এমন বিচলিত করে না দে-কে।

দিন পাঁচেক পর গোপাল চৌধুরীও ঠিক এমনই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে খোলা জানালার মধ্য দিয়ে তাকিয়েছিল। এবং মধ্যে মধ্যে বিড়বিড় করে আপন মনে বকছিল।

ধ্রুব ডাক্তারের কথা সত্য হয়েছে। চৌধুরী বেঁচে গেছে এ যাত্রা, কিন্তু মাথার মধ্যে একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বাইরের জগতে তাকিয়ে থেকেও সব দেখেও তার সঙ্গে তার মনের যোগ ঘটে না। অসংলগ্ন কথাও বলে যায়।

পাগল নয়। মাথায় আঘাতের জন্য এমনি ঘটে গেছে। নিজের মনের মধ্যেই হয়েছে এখন তার জীবনের বসতি। তার বাইবে আর কিছুই নেই।

তবে পক্ষাঘাত হয় নি এইটেই পরম ভাগ্য।

সেদিস রাত্রে দে যখন দেখতে এসেছিল—তখন চৌধুরী ওকে চিনেছিল কিন্তু ডেকেছিল ভুল নামে। ভুলটা তখন থেকে শুরু। চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছিল—ঠাকুর মশাই? ওরে আসন দে আসন দে!

ছেলে শুভেন্দু বলেছিল—কাকে কি বলছেন! উনি দে মশায়। আমাদের গ্রামের বিশ্বনাথ দে, আপনার বন্ধু।

শুভেন্দুর কাঁধে হাত রেখে মৃদু একটা চাপ দিয়ে তাকে চুপ করতে বলেছিল দে মশায়। শুভেন্দু তার মুখের দিকে তাকালে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলেছিল—থাক।

একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসেছিল দে মশায়।

কেঁদে ফেলেছিল গোপাল চৌধুরী।—দেখুন, দেখুন আমার দশা দেখুন! আমাকে—।

—হা—হা করে কেঁদে উঠেছিল চৌধুরী। এ দৃশ্য সহ্য করা দে মশায়ের মত মানুষের

পক্ষেও কঠিন হয়েছিল।

প্রতিকার করুন। এর—। আবার কান্না।

শান্ত কণ্ঠে সে বলেছিল—হবে। তবে আপনি তো বড় বংশের সন্তান, পিঁপড়ের কামড়েও হাতীর শরীরে বিষ হয় জ্বালা করে—আপনি তো হাতী, বড় বংশের সন্তান, ওটা তো পিঁপড়ে, পিঁপড়ের কামড়েও বিষ হয়, জ্বালা করে, তবে সেটা কি ধর্তব্য! চোরে খুন করে—ডাকাতে প্রহার করে—সে কি অপমান? ওকে আপনি বাউড়ী ধরছেন কেন? ও চোর। ধরা পড়ে পাগল হয়ে কাজটা করেছে। ডাকাত চোর—এদের কি জাত বিচার করে কেউ, বলুন!

একথা শুনে চৌধুরী শূন্য দৃষ্টিতে পলেস্তারা-খসা ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। অর্থাৎ কথাটার অর্থ সে বুঝেছিল।

এরপর শিবনাথ সে উঠে চলে এসেছিল। বলে এসেছিল—কাউকে এখন কাছে আসতে দিয়ো না। আমার আসাটাও ঠিক হয়নি।

তারপর চৌধুরীর ছেলে শুভেন্দুকে বলেছিল—যদি টাকাকড়ির দরকার থাকে তবে যেয়ো আমার কাছে।' ধান দিয়ো পরে।

সে চলে গেলে গোপাল চৌধুরী হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিল—সাপের মাথায় ভেক নৃত্য করে! ভেকের রাজত্ব! ভেকরাজ এসেছিল—ভেক রাজ! ঠাকুর মশাই! পটোঝাড়া বামুন—ভেকরাজ!

তিনদিনে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়েছে চৌধুরী, বিপদ কেটে গেছে; কিন্তু এই গোলমাল সুরু হয়েছে। বাইরের জগৎ আর চিত্তলোকের গভীরের জগতের সঙ্গে যে একটি সেতু থাকে স্মৃতি শিক্ষা ও সচেতনতার পিলারের উপর—সেই সেতুটি ভেঙে না গেলেও একেবারে বেঁকে হেলে পড়েছে। বাইরের সঙ্গে ভিতরের যোগাযোগ সব ছিন্ন হয়ে গেছে।

চৌধুরীদের বাড়ী গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বাড়ী। তিন পুরুষ আগে তৈরী দোতলা চকমিলানো পাকা বাড়ী। শরিকে শরিকে ভাগ হয়েছে; পুরানোও হয়েছে। একটা ছুটো ফাটলও দেখা দিয়েছে। একটা অংশে—তার শরিকদের অংশটা নতুন পলেস্তারায় মেরামতে অপেক্ষাকৃত শ্রীসম্পন্ন। তারই পাশে গোপাল চৌধুরীর অংশটায় পলেস্তারাই নেই; শুধু ফাটলগুলো সেরে সিমেন্ট বালির দাগরাজিগুলো বিসর্পিলভঙ্গিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় বিচিত্রগঠন সরীসৃপের ফসিলের মত দেওয়ালের গায়ে জেগে রয়েছে।

এ তিনদিনে চৌধুরীর মনের সেতুটাও অনেকটা ওষুধ-বিষুধ ও বিশ্রামের বালিসিমেন্টে মেরামত হয়ে এসেছে। তবে ডাক্তারেরা বলে—ধ্রুব ডাক্তার প্রথম দিনেই বলে গেছে যে, ও আর ঠিক সোজা হবে না—বেঁকে থাকবেই।

সকাল বেলা সেদিন চৌধুরী বালিশের উপর তাকিয়া রেখে হেলান দিয়ে বসে জানালাপথে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। পুরানো কালের বাড়ী, জানালাগুলি ছোট, তিন ফুট দু ফুট বোধ হয়। যে ঘরখানিতে চৌধুরী শোয় সেখানা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ দিকে একটি জানালা—পূর্বদিকে ছুটি। উত্তরে অন্য ঘরে ঢোকবার দরজা, পশ্চিমেও দরজা এবং একটি

দেওয়াল আলমারী। পুরনো আমলের খাট, কতকাল আগের বার্নিশ এবং ধুলো ময়লায় কালো হয়ে গেছে, ছত্রিগুলো ভাঙা। দক্ষিণদিকে একেবারে অবারিত মাঠ, এক মাইল দূরে চাষী সদ্‌গোপের গ্রাম—গোপতলী দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে পুরনো সড়ক—যেটা সিউড়ী থেকে চলে গেছে কাটোয়া—সেইটে। আগে ছিল লাল কাঁকরের, এখন সেটা পিচের হয়েছে। কালো ফিতের মত মনে হচ্ছে। তারও দক্ষিণে গ্রামের গাছপালার উপরে ও ফাঁকে ফাঁকে সকালের রোদ পড়ে টিনের চাল ঝকমক করছে। কত টিনের চাল? ওই—ওই—ওই! অথচ—! অথচ আগেকার কালে গোপতলীতে টিনের ঘর একখানাও ছিল না। আজ চৌধুরীর বয়স পঞ্চান্ন ছাপান্ন, তার যখন বারো বছর বয়স, রাত্রিকালে গোপতলীতে একদিন আগুন লেগেছিল। —ছাদে উঠে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য সভয়ে দেখেছিল। রাঙা হয়ে উঠেছিল দক্ষিণের আকাশ আগুনের ছটায়, আঁকা-বাঁকা শিখা মধ্যে মধ্যে লকলকিয়ে বনের ঘেরেরও মাথা ছাড়িয়ে যেন আকাশ ছুঁতে যাচ্ছিল। তার উপর উঠেছিল সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী—উপরটা কালো। গোলমাল উঠছিল—ও—ও—ও—!

পরের দিন শুনেছিল—গোপতলীর পূবপাড়াটা গোটা পুড়ে গেছে সেই সময় দুই পাল চালে টিন দিয়েছিল। তাছাড়া আর গোপতলীতে টিন ছিল না। আজ নাকি সব টিন—সব টিন। শুধু টিন নয়, বাড়ীর সামনেটায় বারান্দাগুলো সব পাকা করে গাঁথা এবং ঘরের মেঝে সিমেণ্টের। ওঃ!

সকলের এখন বসবার ঘর হয়েছে। সে ঘরে তক্তাপোশের সঙ্গে চেয়ার সাজানো আছে।

ওঃ, আগের কালে গোপতলীর পালপাড়ার দুটি ছেলে পড়ত চৌধুরীদের সঙ্গে। ওদের খাটো আঁটশাট জামার পকেটে গুড়ের পাটালি নিয়ে আসত। একটা বিশ্রী গন্ধ উঠত। তার জন্যে ওদের পাশে বসতে চাইত না সে এবং এ-গ্রামের ছেলেরা! এখন ওদের ছেলেদের দেখে বিস্ময় লাগে।

পাল বংশের রূপ আছে। লালু মোড়ল—টুকটুকে পাকা আমের মত তার গায়ের চামড়া। লালু মোড়লের চার ছেলে—ভূপেশ-দেবেশ-গোপেশ-সুরেশ। চারজনেই সুপুরুষ এবং চারজনেরই টকটকে গৌরবর্ণ রঙ ছিল। চারজনেই লেখাপড়া শিখেছিল। গোপেশ এম-এ পাশ করে উকীল হয়েছিল। তাতে কিছু হয় নি—শেষে মাস্টার হয়েছিল। লোকে বলত—পাশ করলে কি হবে? বামুন বদ্যি কায়েত না হলে ওকালতি সমুদ্রে হালে কি পানি পায়? তাদের ছেলেরা এখন এদিকে আসে যায়। গোপাল চৌধুরী দেখে—সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। রাজপুত্রের মত চেহারা—তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদ, তেমনি মার্জনা—! এরা সব চাকরি করে!

ওঃ—।

গোঁ—ভঁ—ভঁ—শব্দে চমকে উঠল চৌধুরী। কি বিশ্রী শব্দ! আঃ—এমন রাগ হচ্ছে! নাকে যেন বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছে চৌধুরী এখান থেকে।—হ্যাঁ! ঠিক একখানা না—একখানা নয়—

দুখানা। দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল—দুটো বুনো জানোয়ারের মত দুটো, কি নাম, কি নাম যেন? হ্যাঁ হ্যাঁ জীপ—জীপ।—জীপ—জীপ যাচ্ছে। দুটো-চারটে-ছটা এ তো আসছেই আসছেই। জরীপ। কি নাম—? ব্লক—। হেন তেন—! ইরিগেশন, হায় হায় হায়—থিয়েটারের পর্যন্ত এস-ডি-ও হয়েছে। এরা সব আসছেই এরা সব আসছেই। অথচ লোকের জমিদারী নিয়েছে। টাকা দেয় নি। কবে দেবে ঠিক নেই। দশ বিশবার হেঁটে—হাত তোলা একশো টাকা কি দুশো টাকা। খাও—তাই ভাঙিয়ে খাও বছর ধরে।

বিড়বিড় করে বকে উঠল চৌধুরী—কালেক্টারী—? কে দেবে আমার কালেক্টারী। অস্থাবর ক'রে আদায় করব!

অর্থাৎ তার জমিদারীর কম্পেনসেসনের কথা বলছে। ভুল করে বলছে কালেক্টারী অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট রেভেন্যু!

—বাবু মা-শা-য়!

গেঁড়িয়ে কে চেঁচাচ্ছে। ওঃ, সেই—সেই এসেছে! কি নাম?—চৈতন্য! না—! বলাই! না। কি নাম? ছেলেবেলা তাদের বাড়ীতে কি করত—? কি করত? রান্না করত! গরু নিয়ে চরাতে গিয়ে একটা বাছুর বিক্রী করে দিয়েছিল মুসলমান পাইকারকে! মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল ছোট কাকা! তারপর লোকটা চোর হয়েছিল। চুরি করে জেল খেটেছে। ওর দুটো বোন—হ্যাঁ হ্যাঁ—একটাকে—তাদের বাড়ীর চাপরাসী কানু শ্বশুরবাড়ী থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিল। মেয়েটা—মেয়েটা বজ্জাত। কিন্তু এ বেটা? কি নাম বেটার?

—এই! কি নাম তোর? এই!

—আংএ—আঙি—শ্যাই! অর্থাৎ আজ্ঞে আমি মশাই!

—আঙি শ্যাই—। ভেঙালে চৌধুরী!

চৌধুরীর স্ত্রী ঘরের কোণে বসে তরকারি কুটছিল এবং স্বামীর প্রতিও দৃষ্টি রাখছিল। সে শান্ত মানুষ এবং শক্ত মানুষও বটে। স্বামীর বিড়বিড় করে বকায় চঞ্চল সে হয় নি, কানও তাতে দেয় নি। এখন এমন ভাবে চীৎকার করতে দেখে সে বঁটিটা কাত করে রেখে উঠে এল এবং নীরবে জানালাটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু খপ করে হাত চেপে ধরলে চৌধুরী।

স্ত্রী বললে—ছাড়!

চীৎকার করলে চৌধুরী—আমি কি মরেছি?

—কেন? মরার কি হল?

—জানালা 'খুলে' দিচ্ছ?

—খুলি নি, বন্ধ করে দিলাম, চেঁচাচ্ছ বলে!

—না। বলে নিজেই হাত বাড়ালে খুলে দেবার জন্য।

এবার জানালা খুলে দিলে চৌধুরীগিন্নী। চৌধুরী আবার চীৎকার করে প্রশ্ন করলে—তো—র না—ম কি—? এ—ই!

—ওর নাম গৌরো!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল চৈতন! এ-ই তো-র সে-ই বোনটা মরেছে না আছে?

—আজ্ঞে আছে, এই তো পাঁচদিন আগে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আপনকার বাড়ী এসেছিল।. মহাব্যাধি হয়েছে!

—কি নাম ছিল আমাদের সেই—সেই—

—কালু শেখ চাপরাসী।

—হ্যাঁ হাঁ। আমরাই রেখেছিলাম তাকে। ওই কাণ্ডের পরও তাকে রেখেছিলাম। এর পর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চৌধুরী বললে—তাকে চাল দিয়েছিলে?

—দিয়েছিলাম। গৌরোকেও দেব। দিয়েই তো যাই। গৌরো তোমাদের গরু চুরি করেছিল—তার জন্তে চাল আজও দিই। আর সে হারামজাদী সর্বনাশ করেছিল—কালু শেখ —তারপর সে লক্ষ পাপ করেছে—নিজের খেয়াল-খুশিতে করেছে—তার জন্তেও দিই। দিয়ে দিয়ে কুলুচ্ছে না। জমিদারীর আয় গিয়েছে, চাল বেচে সব—নুন তেল থেকে মেয়ের ইস্কুলের মাইনে—ছেলের লম্বা পাঞ্জাবির টাকা। হবে আর কত বল?

—হবে আর কত? হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিক বলেছ, হবে আর কত? ঠাকুর? খায়? ভোগ? ভোগ? ভোগ হয়?

—কি বকছ আবোলতাবোল? ভোগ হবে না কেন?

—হবে না। বন্ধ করে দাও!

—বন্ধ করে দেব? এ মতি না হলে এমন হবে কেন?

—কচু! কচু! কচু! বাজে! মিথ্যে। ঠাকুর! দেবতা! সব সব বাজে বাজে।

—শোও। চোখ বন্ধ কর। এমন করে পাগলামি করো না! হ্যাঁ গো—তুমি এমন করলে আমি কি করব বলতে পার? নাও, শোও দেখি।

চৌধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। এবং স্ত্রীর এ অনুরোধ উপেক্ষা না করে, বালিশে হেলান দিয়ে শুয়েই পড়ল। স্ত্রী জানালায় মুখ বাড়িয়ে গৌরোকে বললে—এমন করে চেঁচাস না বাবা, যাচ্ছি, দিচ্ছি। বাবুর অসুখ! তারপর জানালাটা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হল।

—না। না। না। চীৎকার করে উঠল চৌধুরী।

—বন্ধ করে দি। একটু ঘুমোও।

—আমি তো বাঁচব না। মরব। মরব। দেখব না? খুলে দাও।

জানালা খুলে দিয়ে চৌধুরীগিন্নী চলে গেল। দরদালানে বেরিয়ে মেয়েকে ডাকলে—নেলি! তোর বাবার কাছে কেউ নেই। তুই গিয়ে বোস্।

নলিনী—চৌধুরীর মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়ে, বিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয় নি বলেই পড়ে। শান্ত মেয়ে। লেখাপড়ায় ভাল নয়। কিন্তু এই বাড়ীর মান-মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। বই হাতে সে বাপের কাছে এসে বসল, আড়চোখে বাপের দিকে চাইলে। ভয় করে তার বাবাকে। আগে থেকেই ভয় করে, এখন তো অসুস্থ। বাবা চীৎকার করছে দিন রাত। আগে মানুষটা

কত শান্ত নিরীহ ছিল। রাগ তাকে করতে সে কখনও দেখে নি। তার যত রাগ ছিল—তার জ্ঞাতি-ভাইদের উপর। তাকে দেখে শুধু ঘাড় নাড়ত—আক্ষেপের সঙ্গে ব্যঙ্গে মেশানো ছিল তার প্রকাশ। তার মানে নেলি বুঝত। নেলি ইস্কুল যেত বই নিয়ে বেণী ঝুলিয়ে—তার জন্যই আক্ষেপ ব্যঙ্গ তার প্রতি—তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ত বাবা। এতে নেলির নিজের ওপর বড় দুঃখ এবং ঘৃণা হত, শেষ পর্যন্ত। অর্থটা এসে দাঁড়াত এই যে কিছুতেই তার বিয়ে হচ্ছে না।

হঠাৎ এই সময়ে আবার উত্তেজিত ভাবে গোপাল চৌধুরী ডাকলে—সুরো, সুরো! ও-সু-রো-!

অগত্যা উঠে কাছে গেল নেলি বললে—কি বাবা?

—তুই?

—হ্যাঁ। মা নীচে গেছে ভিক্ষে দিতে। কি বলছ বাবা? কি হল?

—ওই—ওই—সেই—সেই—সেই যাচ্ছে না?

—কে?

—ওই যে! নেলি—নেলি।

—এই তো আমি নেলি!

—না—না। ওই যে!

নেলি জানালা দিয়ে দেখলে—একটি আধুনিকা মেয়ে কাঁধে ঝোলা এবং হাতে একটা স্যুটকেস ঝুলিয়ে চলে যাচ্ছে।

—ওই! সেই না? শুভেন্দুর সঙ্গে গায়েহলুদ হয়েছিল! পালিয়েছে!

—না। ও তো সে নয়।

—কি নাম তার?

—সীমা।

—হ্যাঁ। তা হলে লুকিয়ে বিয়ে হয়ে গেছে নাকি? তোর দাদার সঙ্গে?

—কি যা-তা বলছ?

—লোকে বলছে। তোরা বলছিস। তোর মা তোকেই শুধুচ্ছিল। আমি চোখ বুজে শুয়েছিলাম। তোরা ভেবেছিলি আমি মরে গিয়েছি!

নেলির মনে পড়ল। কাল বিকেলে—সে ইস্কুল থেকে এলে মা তাকে ডেকে এই নিয়ে কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। কাল সে যখন ইস্কুলে যাচ্ছিল—শুভেন্দু তাকে তাদের ওই বাড়ীর ফটকটার কাছে আড়ালে ডেকে বলেছিল—চিঠিখানা সীমাকে দিস তো! বুঝলি?

সে শঙ্কিত এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকিয়েছিল।

শুভেন্দু বলেছিল, কিছু নেই চিঠিতে। কোনও অন্যায় কথাও লিখি নি।

—তুমি ভালবাস তাকে, না কি?

—ভালবাসার কথা নয়। পাঁচ লোকে পাঁচ কথা রটাচ্ছে। আমাকেই জড়াচ্ছে। কিন্তু আমি তো কিছু জানি না। তাই তার মনের কথাটা আমি জানতে চেয়েছি। দেখ না তুই, পড়ে দেখ!

মা সেটা কেমন করে উপর থেকে দেখে ফেলেছিল। তাই ইস্কুল থেকে ফেরা মাত্রই তাকে ডেকেছিল—শোন।

বাবা তখন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিথর হয়ে ঘুমুচ্ছিল। তারা অন্তত তাই ভেবেছিল। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিচ্ছেন—দিনের বেলা খাবার পর একটা ঘুমের পিলও খেয়েছিল বাবা। ঘুমুবার কথাই ছিল সাড়ে পাঁচটা ছটা পর্যন্ত। সেই বিশ্বাসে বাবার বিছানার পাশেই মা জিজ্ঞাসা করেছিল—ওই চিঠির কথা। কঠোর কণ্ঠে বলেছিল—মিথ্যে বলবি নে। তোর হাতে চিঠি দিয়েছে শুভো আমি নিজে দেখেছি। বল, কাকে দিয়েছে চিঠি?

—তাকেই বটে।

—সীমাকে?

—হ্যাঁ।

—কি লিখেছে তাতে জানিস?

—হ্যাঁ। জানি। আমি না পড়ে দিতে চাই নি আমাকে সেইজন্য পড়তে বলেছিল। আমি পড়েছি।

—কি?

—লিখেছিল—। থেমে ঢোক গিলে নিল নেলি। তারপর বললে—খারাপ কথা কিছু লেখে নি।

—সেটা কি? খারাপ নয় তো মুখে আটকাচ্ছে কেন?

—লিখেছিল—। লোকে বলছে—অনেক কথা। তুমিও শুনেছ—আমিও শুনেছি! এর মধ্যে কি কোন সত্য কিছু আছে? যদি থাকে তবে তুমি যখন দেবযানীর মত—কচকে ভালবাসার কথা ভুলে বৃদ্ধ যযাতি রাজাকে বিয়ে করে সম্রাজ্ঞী হতে চাও নি—তখন আমিও কচের মত দেবতার দাস বা আমার বংশমর্যাদার দাস হব না এটা নিশ্চয় জেনো।

মা বলেছিল—মেয়েতে ছেলেতে থিয়েটার! যা ঘেন্না করি তাই। আমি তখুনি জানতাম। ইংরেজ রাজত্বকে লোকে বলত ম্লেচ্ছের রাজত্ব। কিন্তু তখন কটা এমন কাণ্ড ঘটেছে? আজ স্বাধীন হয়ে দেশের পাখা বেরিয়েছে। এ যে ম্লেচ্ছের অধম। ছি—ছি—ছি!

অন্য সময় হলে নেলি প্রতিবাদ করত। রুগ্ণ বাবার পাশে দাঁড়িয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে সাহস পায় নি।

সেকাল। সেকাল। সেকাল। সেকালের গল্প সে কিছু কিছু শুনেছে। যা চলে আসছে গোপন ধারায়। এখানকার ঝর্ণার মত। এখানে ঝর্ণা ঝরঝর করে ঝরে না। এখানে ঝর্ণা নিঃশব্দে বের হয় বড় বড় টিলার প্রান্তে সবুজ একটি কর্দমাক্ত স্থানের মাঝখানে—একটি

বা কয়েকটি টলটলে জলভরা গর্তের আকারে। জল বের হয় কুয়োর তলায় জল যেমন বের হয় তেমনি ভাবে। ছোট ছোট গর্তগুলি ছাপিয়ে ক্ষীণ কিন্তু অহরহ প্রবহমাণ ধারাটি বেয়ে চলে নদীর দিকে বা কোন বড় নালার দিকে। এর জল ব্যবহার কেউ করে না, কিন্তু কৌতূহলবশে এর ধারে সবাই যায়—সকলে এর জল আস্বাদন করে দেখে। শ্যাওলার একটি স্বাদ আছে। গন্ধও আছে। এই গল্পগুলিও তাই তেমনি ধারায় বেয়ে চলে—এর আস্বাদন এখানকার পুরনো বাসিন্দাদের, নতুন মানুষেরা একটু বড় হলেই জানতে পারে। গল্পগুলি এখানকার কুলীন কন্যা—যাঁরা চিরদিন পিতৃগৃহে কাটিয়েছে তাদের চরিত্র নিয়ে। অপবাদের কথা। তাদের গোপন প্রেমের গোপন কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে এ নিয়ে ঝড় বয়েছে। বিবাহিত শ্বশুর-ঘরবাসিনী কন্যারাও বাদ যায় নি। এ ঝড় গ্রাম থেকে চিঠির মারফৎ সেখানে গিয়ে সে কন্যার আশ্রয়ের মাথার চাল উড়িয়ে নিয়েছে। কন্যা গ্রামে ফিরে এসে মুখ লুকিয়েছে তার পিতৃগৃহে। কিন্তু শেষ জীবনে সেও হয়েছে সমাজের শাসনকর্ত্রী।

কারণ তখন তার গলায় উঠেছে তুলসীকাঠের মালা এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে তার চেহারা হয়েছে বাজের আগুনে পোড়া তাল গাছের মত।

এসব কথা নিয়ে সে কতদিন তর্ক করেছে মায়ের সঙ্গে। সে নিজে ওপথের ধার দিয়েও হাঁটে না, ইস্কুলে বান্ধবীরা তাকে সেকেলেই বলে ;—সীমা তাকে বলে শুচি ঠাকরুণ। সাক্ষাৎ শুচিতা—বা শুচিবাইগ্রস্তা। বলবার ভঙ্গিমায়, পার্থক্যে অর্থেরও তারতম্য হয়। যখন শুচিবাইগ্রস্তা বোঝাতে চায়—তার চেহারাটা হয় ডিঙ্গী মেরে পা ফেলে চলা শুচিবাইগ্রস্তা বিধবার মতন।

মাকে এ তর্কে হার মানতে হয়েছে তখন! শেষে মা বলেছে—তবে যাও মা—তুমিও যাও—ওই সব করগে যাও।

—আমার কথা তো আমি বলি নি।

—বল নি। কিন্তু বলবে নাই বা কেন ? যখন দোষ নেই—ভাল পথ। তখন হাঁটবে নাই বা কেন ?

মায়ের কথায় কাল সে চুপ করেই ছিল। সাহস পায় নি। বলতে পারে নি—অন্যায় দোষ ধ'র না মা। দাদা অন্যায় করে নি। সে ন্যায় কাজই করেছে। তবে বলেছিল—তোমায় ভাবতে হবে না। সীমা পত্র পেয়ে পড়ে আমাকেই পড়তে দিয়েছিল। এবং বলেছিল, তোর দাদাকে বলিস ভাই—সে যেন এসব কথা কানে না তোলে। কেন বেচারা দুঃখ পাচ্ছে। সে সব কিছু নয়। আমি পড়ব রে। পাশ করব। চাকরি করব। বিয়ে আমি করব না। তোর দাদাকে ধন্যবাদ দিস। সে যে লিখেছে এ কথা এর জন্যে অনেক ধন্যবাদ দিলাম আমি তাকে। চিঠি লিখে উত্তর আমি দেব না। মুখেই তুই বলিস, এই আমার জবাব। তারপর নেলি বলেছিল—মা, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি। একটি কথাও বাড়িয়ে বলি নি ঢাকি নি।

মা বলেছিল—আশ্চর্য মা! কি যে হয়েছে, ফেরতা দিয়ে কাপড পরে ঝোলা কাঁধে চটি

ফটকটিয়ে বেড়ানো আর চাকরি করার শখ—আর ঢঙ!

তারপর ব্যঙ্গ করেই ভেঙিয়ে সীমাকে বলেছিল—'সে সব কিছু নয়। আমি পড়ব রে। পাশ করব। চাকরি করব!' হাঁ তা করবি—হাকিম হবি। এজলাসে বসে বিচার করবি! মরণ, শুভেন্দুর মত পাত্তর—আমাদের মত ঘর তোর সাতজন্মে কখনো হবে?

অবাক হয়ে গিয়েছিল নেলি। এ আবার মা কি বলে? হাসিও পেয়েছিল। বেচারি মা! গায়ে লেগেছে—তাঁর ছেলের মত ছেলের প্রেমে সীমা পড়ে নি—তার জন্তে!

বাবা তন্দ্রার মধ্যে কথাগুলি শুনেছে। কিন্তু তার উত্তর আজ সে কি দেবে?

বাবাকে কি এসব কথা বলা যায়? তার উপর মানুষটি যে একটি সকরুণ বিয়োগান্ত বেদনায় একান্ত আর্ত বিভ্রান্ত মানুষ হয়ে পড়েছে! তাকে বেশি বকিয়ে কি করবে। সংসার-যুদ্ধে ঘা খেয়ে মেরুদণ্ড ভেঙেও পুরনো কালের সংস্কারের বোঝাকে জীবন সম্বল ভেবে পিঠে বেঁধে কুঁজো হয়ে ঠাকুর দেবতা ভগবানরূপী অনেককালের পাকা লাঠিখানির উপর ভর দিয়ে হেঁটে চলেছে—বৈতরণীর ঘাটের দিকে। একমাত্র বিশ্বাস—ঘাটে তরী আছে এবং তার পারানি আছে এই সংস্কারের বোঝার বহনের পারিশ্রমিক। তার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে কি হবে।

কথাটা নেলির নয়। নেলি শুনেছে। কথাটা বড় মানুষের।

ভবানীকিঙ্করবাবুর বড় দাদা শ্যামাকিঙ্করবাবুর। একথা তাঁর। তাঁর এখন মস্ত খ্যাতি। মস্ত বড় মানুষ। আজ আর তিনি শুধু এখানকার মানুষ নন গোটা দেশের দাবী তাঁর উপর। গোটা দেশ তাঁকে দাবি করে। মস্ত বড় লেখক। বাবার চেয়ে এক বছরের বড়। শিবনাথ দের বয়সী। তাঁরই সহপাঠী। গ্রামে তিনি থাকেন না। কখনও কদাচিৎ আসেন। যখন আসেন তখন তাঁর ওখানে লোকেরা যায় দলে দলে। এখানকার লোক, পাঁচখানা গ্রামের লোক ইস্কুলের মেয়েরা দিদিমণিরা ছেলেরা মাস্টাররা। সকলে ছুটে যায়। যায় না কেবল বাবা। অথচ এক সময় নাকি এমন ছিল যে—বাবা আর শ্যামাকিঙ্করবাবু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাতেন। ভোরবেলা বেড়ানো থেকে সুরু করে রাত্রি দশটায় তাস খেলার পালা শেষ করে তবে ছাড়াছাড়ি হত।

শ্যামাকিঙ্করবাবু কয়েকবার দেশে এসে নিজে তাদের বাড়ী এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে গেছেন। বাবা গিয়েছে—কিছুক্ষণ থেকেই সকলের অলক্ষ্যে উঠে চলে এসেছে। সেই নিয়ে একদিন কথা হচ্ছিল শ্যামাকিঙ্করবাবুর ওখানে। তাঁরা বসেছিলেন বাগানের মধ্যে। ঘরের মধ্যে ব্যাটারী সেট রেডিও বাজছিল, সে শুনতে গিয়েছিল শ্যামাকিঙ্করবাবুর ভাইঝির সঙ্গে। কথাটা তার কানে এসেছিল শ্যামাকিঙ্করবাবু বলেছিলেন—গোপালকে তোমরা দোষ দিয়ো না। ওকে তোমরা বুঝতে পার না। আমি পারি। বড় দুঃখ হয়। বলে ওই কথাকটি বলেছিলেন। সেদিন তার খুব ভাল লাগে নি। হয়তো বুঝতে তারও ভুল হয়েছিল। মনে হয়েছিল—সত্য বলবার ভান করে নিন্দেই তিনি করলেন। তার সঙ্গে খানিকটা করুণাও করলেন বোধ হয়। আজ সে বুঝছে। তার বাবা সম্পর্কে এমন সুন্দর করে সত্যটি প্রকাশ করা আর যায় না।

পুরনোকালের সংস্কারের বোঝা কুঁজো পিঠের ওপর বেঁধে ভগবান বিশ্বাসের পাকা লাঠির ওপর ভর দিয়ে বৈতরণী ঘাটের দিকেই বাবা হেঁটে চলেছে বটে। যদি ঘাটে তরী বাঁধা থাকে তবেই বাবা পার হবে। নইলে কোথায় ভেসে চলে যাবে কে জানে! বাবা সাঁতার জানে না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে নেলি।

আজ গোপাল চৌধুরী তার মুখের দিকে স্থির কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে।—লুকিয়ে ওদের বিয়ে হয়ে গেছে? ওই মেয়েটির সঙ্গে তোর দাদার?

যেন লুকানো সত্যের স্বীকৃতি খুঁজছে তার মুখ চোখের মধ্যে। সে অস্বস্তি বোধ করলে। তবু সংযত এবং শক্ত হয়ে বললে—না বাবা ও—স—ব মিছে কথা। আমি তো সেদিন মাকে একথা বলি নি। বরং বলেছি ও—স—ব কথা মিথ্যে। দাদার সঙ্গে সে মেয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

—সত্যি কথা বল। আমি তোকে হুটো টাকা দেব।

—না—না—না। তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করে বলতে পারি।

—হুঁ। বলে চুপ করে গেল, কিছুক্ষণ পরে বলল,—তোর দাদা কোথায়?

—সে তো সিউড়ি গেছে—কম্পেনশেসনের টাকার জন্য। কত টাকা দেবে বলে যে নোটিস এসেছে। তুমিই তো পাঠালে।

—হ্যাঁ—। ঘাড নাড়লে চৌধুরী।—হ্যাঁ হ্যাঁ। কত টাকা বল তো?

—আড়াই শো না কত। আমি তো দেখি নি।

—হ্যাঁ। টাকাটা পেলেই—। হ্যাঁ—। ওটা পেলেই কলকাতা যাব। শ্যামাকিঙ্করকে ধরব—রেভেন্যু মিনিস্টার—ওই যে—কি নাম—তাকে পাকড়াবার জন্যে। টাকা দিতেই হবে। তিরিশ হাজার তো পাব তার দশ হাজার দিতে হবে। তোর বিয়ে দোব। আর ব্যবসা। ত্থাখ্, একটা ব্যবসা করব। হ্যাঁ।

নেলি আর সইতে পারলে না। ছুটে বেরিয়ে ঘর থেকে নীচে নেমে এল।—মা—তুমি যাও। আমি এ সব করছি—মা—। আমি ও-ঘরে থাকতে পারব না।

চৌধুরীগিন্নী তখন উঠোনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে দিচ্ছেন—নসুবালাকে। নসুবালা এসেছে। দুটি পাকা আতা ফল দাওয়ার উপর রেখেছে।

ফল দুটি সংগ্রহ করে এনেছে অসুস্থ বাবুর জন্যে।—খেতে দিয়ো মা! রসনায় স্বাদ হবে।

—আঃ, সব বিত্তান্ত শুনে থেকে আর আপ্‌সে (আপসোস করে) বাঁচি না মা। তিনদিন বাইরে থেকে খবর নিয়েছি। আজ আত্তা থেকে দেখলাম—জানালার কাছে বাবু উঠে বসেছেন। তাই ঘরকে এলাম। আতা দুটি কাল থেকে নিয়ে ফিরছি মা। ভিখ দিচ্ছ দাও। ভিখ করেই তো খাই। তা ভিখ নয় মা, বাবুর খবরের লেগে—এয়েছিলাম। তা ভিখ নিয়েই যাচ্ছি।

চৌধুরীগিন্নী কথা বাড়ালেন না। ভিক্ষে দিয়ে চলে গেলেন।

নসু বললে—বাবুদিদি, তুমি ভাল আছ ?

বাবুদিদি সম্বোধন শুনে হেসে ফেললে নেলি—আছি।

—বেশ! বেশ! তা দাদাবাবু—? সে কই গো?

—সিউড়ি গেছে।

—বেশ! বেশ! লোকের করণ দেখ দিকি নি। কি সব যে বলে! তারপর গলা নামিয়ে বলে, সে সব কি সত্যি কথা নাকি? সীমার সঙ্গে—?

—না, সে সব মিথ্যা কথা।

—মিথ্যে কথা! বেশ বলেছ। ঠিক বলেছ। সত্যি বলেছ। তা' আজ যাই। বাবুর অসুখ—তা নইলে ভাদু শোনাতাম। ভাদু আমার বিয়ে করবে না! তাই নিয়ে গান বেঁধেছি। তোমাদের মত ফেরতা দিয়ে কাপড় পরবে, স্কুলে যাবে, চাকরি করবে। তাই নিয়ে গান বেঁধেছি। তা', পরে শোনাব! হোক!

নেলি হাসলে। এই এক অদ্ভুত!

১০

নসুবালা অদ্ভুত। অদ্ভুত তার জীবন ধারণের প্রণালী।

সে নতুন ভাদু গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে বেড়াবে। নসুবালার 'মাঙন' মাগ্না মাঙন নয়—ওই গান শুনিয়ে মাঙন। বেয়াই বসেছে আজ বি. ডি. ও. আপিসের চৌমাথায়। আজ দুদিন ধরে বেয়াইয়ের খাটুনি গিয়েছে বিষম। সে'দিন—; কদিন হল? সোমবার হাট ছিল—তার ফেরা দিন মঙ্গলবার—সেদিন—তারপরে বুধ বেরস্পতি শুক্ক্ শনি রবি,—চারদিন হল তা হলে। কদিন আগে পাঁচ দিনের দিন—সেই হাঙ্গামার দিন সেটেলমেণ্ট আপিসে আকুটির বাবুরা এয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক। ওই অঞ্চলের পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ের লোক। সে'দিন বেয়াইয়ের মাল সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বেয়াইয়ের মালের কদর বেড়েছে। বেরাকেট পিছু দু আনা দাম চড়েছে। তারাই চোটাচুটি করে বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপরেতে সেইদিন থেকেই বেয়াই মাটি ঠাসছে—মাখছে আর ছাঁচে ফেলছে। আর শুকুতে দিচ্ছে। দুদিন আগে থেকে বেয়াই বুদ্ধির জোরে ফন্দি খাটিয়েছে ভাল। মণ দুই কয়লা এনে মজার চুলো করেছে। চারপাশে চারটে ইঁটের পায়া তৈরী করে তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছে লোহার একখানা ভারী পাত দুহাত চওড়া—চার হাত লম্বা, চার হাত 'ক্যানো'——বেশী হবে—পাঁচ হাত। পাতখানা ধার করে এনেছে দে মশায়ের ধানকল থেকে। রাজ্যের লোহালক্কড় সেখানে জমা হয়ে আছে। লোকে কোথা থেকে পায় এত লোহা—কে জানে? সব লোহা—সব লোহা হয়ে গেল মা! সেই যোগীন্দ মূলগায়েন মশায় গাইত—'যে দিকে ফিরাই আঁখি—কেষ্টময় ভুবন দেখি;' —সেই বৃত্তান্ত গো। বাড়ীতে কড়া হাতা খুন্তি-কোদাল

টামনা-কুড়ুল কাস্তে দা' কাটারী গজাল পেরেক হাতুড়ী ই-সব ছাড়ান দাও, ওসব চিরকাল আছে। মাটির বাঁধ বেঁধে লোহার লাইন পেতেছে ভুবনের ই মাথা থেকে উ মাথা পর্যন্ত তার উপরে রেলগাড়ী— ; ইঞ্জিনটা গোটাই লোহার, গাড়ীগুলোর চাকা লিগেস্তলাটা সব লোহার, মালগাড়ীগুলো তো সব লোহা। সিনগাল না সিগনাল—তা আবার লোহার তারের টানায় ওঠে নামে। লোহার খুঁটি পুতে টেলিগেরাপ—, তারে তারে খবর—মিনিটে মিনিটে—তাও সেই লোহার তার দিয়ে মোড়া। বাবুরা বলেন, ওর ভেতরে তামার তার আছে।· সাবধানে পথ চল নইলে লোহার গজাল পেরেক পায়ে ঢুকবে। ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে কোথায় যে পড়ে আছে। কে জানে চালে টিন পড়ল সেও একরকম লোহা। লোহা না-হলে দুপুরে এমন 'তাতে'—গরম হয়? ইস্টিশানে তো উপর দিকে চেয়েছ তো মুখ থুবড়ে পড়ে নাক ভেঙেছ। 'সিনগালের' তারে পা আটকে দড়াম করে পড়বে। আবার গাঁয়ের তিন কোণে তিনটে রাইস মিল। চন্নপুর তিন কোণা গা—পূব কোণ পশ্চিম কোণ দক্ষিণ কোণ আছে উত্তর কোণ নাই। এ মিল তিনটের তিনটে চিমনী লোহার চোঙা কালো আলকাতরা মাথা ভূইফোঁড়ের মত ঠেলে উঠেছে আকাশ বাগে আর লোহার ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। মিলের লোহা ভাঁই হয়ে 'পর্বত পেমান' হয়েছে। এখানা রাস্তার ধারে নালার উপরে পাতা ছিল - উপর দিয়ে লরী ঢুকত। এই দেখ, এই দেখ, ভুল দেখ হায় ভোলা মনের; লরীর কথা মটরের কথা জিপগাড়ীর কথা বলতে ভুল হয়েছে বাসের কথা ভুলে গিয়েছি, লোহারশিক-চাকাওলা সাইকেল রিস্কা—সাইকেলের কথা মনে হয় নি। হায় মন রসনা! 'কেমন করে ভুলে গেলি তোর পেছনে যম রাজারই ভেঁপু বাজায়; মোষের মতন উড়োয় ধুলো বাগ মানে না—কি গরজায়। হায় হায় হায়!'

তা' দে মশায়ের একখানা লোহার পাত খুঁতো হয়েছিল বলে সেখানা বাতিল হয়ে পড়েছিল। বেহাই ফটিক দাস গিয়ে সেখানা চেয়ে এনেছে। তারপর ইঁটের পায়ার উপর সেখানাকে চাপিয়ে তার তলায় একটা গর্ততে কয়লার আঁচ করে তাতিয়ে তার উপর বেরাকেট পুতুল শুকিয়ে নিয়েছে। আর রঙ করেছে সেও প্রায় দিন রাত। ক'দিন সে বেরুতে পারে নাই। আজ বেরিয়েছে। আজ হাট বটে, সোমবার। কিন্তু আজ পাঁচ সাত দশখানা গাঁয়ের লোক আসছে বি. ডি. ও. আপিসে; সরকার চাষের ঋণ দেবে, সেই ঋণ নেবে। দলে দলে ভাগ হয়ে 'গুরুপ' না কি বলে বেঁধে বসবে। দরখাস্ত লিখবে। ঝগড়া করবে, সময়ে সময়ে হাতা-হাতি করবে। এ বলবে—দোব ফাঁস করে তোমার গুপ্ত কথা? সেবার লোন নিয়েছ—আজও শোধ কর নাই। আর টাকা নিয়ে চাষ করেছ না কচু করেছ, তুমি সাইকেল কিনেছ। আবার রোখ দেখ!

—আর তুমি? হ' শালো—তুমি যে টাকা নিয়ে এখান থেকেই মালদ'র আম শ দরুনে কিনে নিয়ে গেলে। লুপ্ লুপ্ করে খেলে?

—অম্বল শূলে হবে খেয়ে থাকলে। জামাই রাগ করছিল—তার মা আমার মেয়ের ওপর খাপ্পা। জামাইষষ্ঠীতে তত্ত্ব করতে পারি নাই। তাই পঁচিশটা আম—বারো টাকায় কিনে

তার সঙ্গে কাপড় কিনে পাঠিয়েছি। বলুক দশটা লোকে এতে আর সাইকেল কেনাতে সমান?

বেহাই এগুলি মনের খাতায় টুকবে আর পুতুল বেরাকেট বেচবে। বাতাস থাকলে বুড়ো পুতুলের মাথাগুলি আপনি দুলবে। না থাকলে বেহাই নিজেই বিড়ি খেয়ে ধোঁয়ার ফুঁ দিয়ে বাতাসে দুলিয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে হাসবে—বলবে—যত রস খানেরই ভিতর।

তা আজ সকালে লোকজন কম ছিল তখন—তখন নসুবালা এক নাচন নেচে এসেছে। লোকটা গেয়ে এসেছে। ভিক্ষে কিছু মিলেছে। লোকে হেসেছে খুব। তাতেই নসুবালা বেশী খুশী। তারপর হাটে যাবার কথা, কিন্তু একবার চৌধুরী মশায়ের খবর না নিয়ে যেতে পারে নি। খবর নেওয়া হল। চলো এবার হাট। গুন গুন করে ভাঁজতে ভাঁজতেই চলল নসু।

সে থমকে দাঁড়াল। বাবুপাড়ার ভেতর হয়ে গলিগলি সোজা পথে হাটে যাবে বলে রাজরাজেশ্বরের দোলপিঁড়ে ডাইনে রেখে কুলি সড়কটি ছেড়ে দু পা এগিয়েছে সবে—এমন সময় কে ডাকলে উত্তর দিক হতে ওই কুলীনপাড়ার মোড় থেকে—এই—এই নসুবালা এই!

—কে গ—অ! এঁ্যা? আঃ পেছাডাকা দেখ দিকি?

—এই নসু, শোন! নসু!

অ! দুটি ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে।

অ বাবা, কুলীন পাড়ার চাটুজ্জে মশায়ের ছেলে আর দত্ত পাড়ার একজনা।

—কি বলছ বাবুদাদারা?

—আয় আমাদের সঙ্গে।

—কোথায় যাব? আমি যে হাট যাচ্ছি!

—যাবি পরে। এখন আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। কি গান গেয়েছিস সকালে পাঁচ মাথার মোড়ে?

পুলকিত হল নসু! তা হলে লোকের মন ভিজেছে মজেছে! সেই কথা সকাল থেকে ঘোঁট হয়েছে—গান শুনে লোকে মেতেছে—আবার শুনবে বলে; ডাক পড়েছে।—চল—চল—চল!

চলতে চলতেই সে বললে—সে ভাদু ভাল ভাদু দাদাবাবু। ভাদু আমার বিয়ে করবে না। শুনবেন চলুন না!

ওঃ—গোলমাল উঠেছে খুব। অনেক লোক তা হলে। জয় ভাদুমণি। মান রেখো মা দশের সামনে!

তা রাখবে। নিশ্চয় রাখবে। শেষকালে সেই দু কলি—

নাকের বদলে নরুণ

ফুলের বদলে রাঙা বিলিতী বেগুন—

সীমার বদলে কমা—।

ওঃ। শুনে বাবুরো সবে হেসে হবে খুন।

তাই ঘুনা ঘুনঘুন।

পাঁচ মাথায় অনেক লোক। গ্রামের লোক বেশী।

জনতার মাঝখানে কেউ উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলছে।

নসুবালা থমকে গেল।—ও বাবা, এ যে সতীশ ঘোষালের গলা। সে যে ভীষণ লোক! দুনিয়ার শাসনকর্তা! তেজী লোক! আগুন! হাকিম হুকিম কাউকে ভয় করে না। ভগবান মানুষটা'কে খোঁড়া করেছে—নইলে যে কি করত—! বাবাঃ গোটা দেশকে 'টটরস্ত' করে দিত! হাঁটতে পারে না, মাথা ঘোরে। তবু দিনান্তে একবার পাঁচ মাথার মোড়ে এসে হক কথা উঁচু গলায় হেঁকে বলে যায়। এই সব লোক—যদি মন্ত্রী হয়, তাহলে দেশের চোর ডাকাত বদমাশ জোচ্চোর হাকিম-হুকিম সব ঠা—ণ্ডা হয়ে যায়। লোকটিকে নসুবালা ভয় করে। তবে ভালোও বাসে। লোকটি গান-বাজনা বোঝে। তা বোঝে। আবার নাকি কি খেতাব পেয়েছে!

ওঃ গলার জোর দেখ দিকি!

ও বাবা! এ কি বলছে গো? এঁ্যা!—দেওয়া উচিত! নসুর পিঠে চাবুক মেরে চামড়া তুলে দেওয়া উচিত তার সঙ্গে এই এ কালের মূর্খ যুবকদের!

—ও বাবা! দাদাবাবু—আমি যাব না।

—না চল। তোকে যেতে হবে! শুনব তোর গান। দশজনের কাছে বিচার হবে। চল্!

কাতর দৃষ্টিতে নসু তাদের দিকে চাইল!

* * * *

সতীশ ঘোষালের সত্যই গলার জোর আছে। নসুর চিন্তার মধ্যে গ্রাম্যতার ছোঁয়াচ থাকাতে হয়তো কিছুটা রঙচড়া হতে পারে, তবে—মোটামুটি লোকটির ওই রূপ। বিনত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বাল্যকালে পিতৃহীন মায়ের পরম আদরে লালিত। ভাই বোন নেই। ম্যাট্রিক পাশ। বয়স এখন বাহান্ন তিপ্পান্ন। প্রথম বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে চন্নপুরের অচলা কয়লাখনি ও ব্যবসায়ের লক্ষ্মীর প্রসাদ কামনায় কয়লাকুঠিতে কোল মার্চেণ্টের আপিসে চাকরিতে ঢুকেছিল। চাকরিতে সে কৃতিত্ব সর্বত্রই দেখিয়েছে—কিন্তু কোনখানেই সে উপরের কর্মচারীদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারে নি। জীবনে কোথায় কবে কিভাবে একটি প্রশ্ন তার মনে জাগ্রত হয়েছিল—সেটি হল ও আমার থেকে বড় কিসে? এবং এ প্রশ্ন এখানেই শেষ নয়—এর শাখার প্রান্তে যে ফুলটি ফুটল তার বর্ণে গন্ধে এইটে প্রচারিত হল—ওরা জানে কি? সুতরাং কিসে আমার চেয়ে বড়?

এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিটি চাকরিতেই সে লড়াই করেছে, কিন্তু সতীশের মতে এ দুনিয়া অবিচারের দুনিয়া। অবিচারের দুনিয়ায় সে অবিচারই পেয়েছে। যেখানে চাকরি পেয়েছে সেখানেই মাস কয়েকের মধ্যে তার চাকরি গেছে বা সে নিজেই কোন এক মুহূর্তে

'সেলাম সাব, বহুৎ হুয়া খুব হুয়া—আউর নেহি' বলে চলে এসেছে। রাগলে সে হয় হিন্দী বলে নয় ইংরিজী। বাংলা বলে না। তারপর আজ বৎসর পনের ঘরেই বসে আছে। বাড়ীতে বসে কিছু ছেলেকে প্রাইভেট পড়ায়; আর দুটি কাজ, একটি সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে পড়াশোনা প্রায় রিসার্চ বলা যায়। মস্ত বই সে লিখেছে। বড় সঙ্গীতাচার্য দু'একজনের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিল—তাঁরা সুখ্যাতি তো করেছেনেই, একজন আবার সঙ্গীত রত্নাকর উপাধিও দিয়েছেন। অপর কাজটি দুনিয়ার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। নিত্য সকালে বা বিকালে পাঁচ মাথার মোড়ে এসে এই সম্পর্কে একটি বক্তৃতা সে দেয়। মাসে তার ডাকটিকিট খরচই দশ পনের টাকা। 'কোপাই' কাগজে তার ছড়ায় লেখা অনেক প্রতিবাদ বের হয়। দরখাস্ত করে এস-ডি-ও, ডি-এম এর কাছে—সেও ছড়াতে। মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত নেহেরুকেও চিঠি লেখে—অন্তত তাই শোনা যায়। সেটা বোধ হয় ছড়ায় হবে না, কারণ পণ্ডিত নেহেরু তো বাংলা জানেন না। এবং ইংরাজীতে ছড়া সে লেখে না।

আজ সকালে নসুবালা এই পাঁচমাথার মোড়ে—'ভাদু আমার বিয়ে করবে মা' ভাদু গেয়ে গেছে, তখন সতীশ তার কোঠার উপরে বসে—চশমা চোখে—তার বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখছিল। প্রথমটা সে কান করে শোনেও নি। তারপরই তার মন আকৃষ্ট হয়েছিল, মন দিয়ে শুনেছিল। গানের সে বোদ্ধা; নসুর গলা ভাল, গানে তার দখল আছে। কতবার তার পিঠ চাপড়ে সে বলেছে—বাহবা বাহবা! বা বেটি! নসু তার পায়ের ধুলো নিয়েছে। আজও তার ভাল লেগেছিল। এবং বেশ একটি কৌতুক অনুভব করেছিল! হারামজাদীর রসজ্ঞান আছে। সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে থেকে আর একবার শুনবারও সংকল্প করেছিল। দু-একটা কলি দু'এক জায়গায় সুরের খোঁজখাঁজ দেখিয়ে দেবে তাও ভেবেছিল। অকস্মাৎ সব উল্টে গেল। হঠাৎ কানে গেল—পাষণ্ড অধার্মিক রক্তচোষা মহাজন ওই—শিবু দে নাকি খুব ধার্মিক লোক—ভাল লোক। সচকিত হয়ে ঘোষাল মাথা তুলল, পাঁচমাথার দিকে তাকাল। কি শিবু দে, ধার্মিক লোক, ভাল লোক! দাঁড়াও আমি যাচ্ছি। যখন সে পাঁচ মাথায় এল, তখন নসুবালা চলে গেছে। এবং ঠিক সেই সময় অমর চক্কোত্তি এসে পাঁচমাথার মোড়ের মাথায় সাইকেল থেকে নামল।

১১

মেয়ের বিয়ের পর আজ প্রথম চন্দনপুর ঢুকছে অমর চক্কোত্তি। খারাপ মেজাজ নিয়ে ঢুকছে। তবে সে শক্ত লোক। মোটামুটি খুব চঞ্চল সে হয় নি। অন্তত গোড়ার দিকে তো নয়ই। সীমা ভোররাত্রে পালিয়ে আসার পর সকালেই সে তাকে খুঁজতে চন্দনপুরেই আসছিল। পথে নেমে ঢুকেছিল চণ্ডীতলা। ভেবেছিল থুথু ফেলে আসবে। ওখানেই সব সংবাদ পেয়ে হঠাৎ সে

খুশী হয়ে উঠেছিল। সীমা কোন ছোঁড়াটোঁড়ার সঙ্গে ভাগে নি। কোন কুজাতের সঙ্গেও না। এবং সীমা এখন তার সীমানার বাইরে। বহুৎ আচ্ছা। ঠিক হ্যায়! পাঁচশো টাকা সে অগ্রিম নিয়েছে। তাই—তাই সই। এবং সঙ্গে সঙ্গে থুথু না ফেলে চণ্ডীকে একটি প্রণাম করে—সেইখান থেকে সাইকেল ঘুরিয়ে এসে উঠেছিল বন-চাতরা। ভাল্লুক বিয়ে! উপায় কি? সে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে রাজী আছে। অভিনয় চাতুর্যে চরম শোক এবং ক্ষোভোন্মাদ প্রদর্শন করে বলেছিল—আমাকে জেলে দাও। আমার কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখে নাও। যা—ইচ্ছে! ভালো ভালো কথা বলেছিল নাটক থেকে। "আমি অপরাধী কিন্তু সে অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নয়। বিশ্বাস কর। আমি তোমার করুণার দুর্গে আশ্রয় চাচ্ছি। আমাকে যা করবে কর।" কিন্তু রমেন্দ্র ভোলে নি। হ্যাণ্ডনোট নয়—পুলিস নয় জেল নয় মশায়, আমার কুটুম্ব সজ্জন এসেছে। বিয়ে হতেই হবে। আপনার আর একটি মেয়ে আছে। ক্ষমা রয়েছে। ওর সঙ্গে বিয়ে হতে হবে। বাস, আপনারও ক্ষমা—আমারও ক্ষমা।

সুতরাং ক্ষমার সঙ্গেই রমেন্দ্রর বিয়ে হয়ে গেছে।

সেই বিয়ের পর আজ সে প্রথম চন্দনপুরে ঢুকল। যথানিয়মে এসে প্রথম উঠল চণ্ডীতলায়। সেদিন থুথু ফেলা হয় নি আজ ফেলবে। বিয়ের পর ঘটনাগুলো এমনই ভাবে ঘটে গেল যে মন মেজাজ ভাল নেই। প্রথম, ক্ষমাকে সে রমেনের হাতে দিতে চায় নি, বাধ্য হয়ে দিয়ে সুখীও হয় নি। ক্ষমার বর ও নয়। এই ছোট মেয়েটাকে সে বড় ভালবাসত। দ্বিতীয়, বৌভাতের পরদিন রমেন তাকে অপমান করেছে। কঠিন অপমান। বউভাতের দিন সে মদ খেয়েছিল জামাই-বাড়ীতে। শুরু করেছিল রমেনের বাপের সঙ্গে। তারপর কতজনের সঙ্গে যে খেয়েছে ঠিক নেই। থিয়েটারের সময় যাদের সঙ্গে খেয়েছে তাদের কারও একজনের সঙ্গে বাদ দেয় নি। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়ে বমি করেছিল। পরের দিন সকালে তখনও খোঁয়াড়ি মরে নি মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে—সেই সময় রমেন তাকে ডেকে বলেছিল—একটা কথা বলছি মন দিয়ে শুনুন।

—কি?

—দেখুন—আগে আগে এসেছেন—পাছা ঘোরাতে মানে থিয়েটার করতে। তখন মদ খেয়েছেন বমি করেছেন বেলেল্লাগিরি করেছেন, কুকুরে মুখ চেটেছে, কথা উঠলে বলেছি—এই আমার বাবাকেই বলেছি আমাদের স্বজাত স্বজ্জাত ধরছ কেন? থিয়েটারবাতিক এ্যাক্টর এদের জাত আলাদা। আনন্দ করে একটু আধটু খেতে খেতে ঢলাঢলি করে ফেলে। কিন্তু কাল কাণ্ডটা করলেন কি হিসেবে? থিয়েটার তো ছিল না। এসেছিলেন তো আমার শ্বশুর হিসেবে। ওই রকম করে বেলেল্লাগিরি করলেন কি বলে? কি ভেবে ছিলেন? এবার আর একটা হুঁকো নয় দুটো হুঁকো? রমেনের শ্বশুর আর থিয়েটারের মোশন মাস্টার একসঙ্গে? লোকে কি বললে, বলছে, শুনেছেন?

চক্কোত্তি সহজে দমে না। সে বলেছিল—আমি তোমার শ্বশুর নই তোমাদের থিয়েটারের মোশন মাস্টারও নই। আমি অমর—অমর চক্কোত্তি—! কোন গুণ নাই যার কপালে

আগুন। আমি চণ্ডীমায়ের পেটে ঘুষি মেরেছি মদ খেয়ে। এতে লুকোছাপা নেই বাবা! তুমি তো জেনেই আমাকে শ্বশুর করেছ! হ্যাঁ—যদি নিজের চরিত্র গোপন করে তোমার শ্বশুর সাজতাম তো বলতে পারতে।

রমেন কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিল। তারপর বলেছিল—হ্যাঁ এ কথা স্বীকার করতে হবে আমাকে। তা'—গরুর গাড়ী করে দেব—না—।

—না—না—না! তোমার সাইকেলটা দাও। তা হলেই হবে।

—ভাল—তাই নিয়ে যান। আমারখানাই নিয়ে যান। গদীর তিনখানার অনেক কাজ। যান ওখানাই নিয়ে যান। ক্ষমার সঙ্গে দেখা হবে না। তবে শুনে যান—ক্ষমা খুব চটেছে। বলেছে—এমন বাপের মুখ দেখতে নেই।

—বহুৎ আচ্ছা বাবা। মেয়ের বাপের কাছে, বিশেষ করে আমার মত বাপের কাছে এর চেয়ে সুসংবাদ আর কি হতে পারে! তা চললাম আমি। তোমার বাবার সঙ্গেও দেখাশুনো থাক।

চলে এসেছে সে রমেন্দ্রের সাইকেলখানায় সওয়ার হয়ে। এসেই বাড়ীতে মনোরমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমুল ঝগড়া। কিন্তু মনোরমা পরম সহিষ্ণু মেয়ে—সে তুমুল ঝগড়াটার শব্দ বাড়ীর বাইরে যেতে দেয় নি। প্রহার করেছে চক্কোত্তি। তাও সে নীরবে সহ্য করেছে। এবং বার বার বলেছে—চীৎকার করো না। মারছ মার, গাল দিচ্ছ দাও কিন্তু আস্তে করে দাও। বলে চক্কোত্তির মন্ডভাণ্ডার থেকে মদ বের করে দিয়ে বলেছে—খাও। খোঁয়াড়ি ভাঙো। খুব আকণ্ঠ খাও। আমি কিছু ভাজাভুজি করে দিচ্ছি। তারপর ঘুমোও! যা করেছ কুটুম্ববাড়ীতে তা আজকেই আসবে গাঁয়ে। নিজে চীৎকার করে সেটা জানিয়ে কি ফল হবে? নাও মদ খাও। সেটা পরশুদিনের কথা।

গতকাল একজন লোক এসেছিল সাইকেল নিতে। ক্ষমার লেখা চিঠিও সে নিয়ে এসেছিল! ক্ষমা লিখেছে—অষ্টমঙ্গলায় আমার যাওয়া হইবে না। সাইকেলখানি ফিরাইয়া দিয়ো। কিন্তু অমর চক্কোত্তি সাইকেল ফেরৎ দেয় নি লোকটাকে বাইরে থেকেই ভাগিয়ে দিয়েছে।

—ভাগ্! যা বাড়ী যা।

—সাইকেল—

—সে আমি গিয়ে দিয়ে আসব।

—বাবুর খুব—

—হোক রে বাবা হোক অসুবিধে। বেশী হয় তো একখানা কিনতে বলগে। বেশী ত্যাঁদড়ামি করবি তো চড় খাবি। যা।

সেই সাইকেল চেপেই সে এসেছে আজ। মায়ের থানে ঢুকে সাইকেলে তালাচাবি দিচ্ছে, সেই সময়েই শিবনাথ দে মা চণ্ডীর স্থানে তার নৈমিত্তিক প্রণামটি সেরে বেরিয়ে এসেছিল। দে তার সেই নিজস্ব শান্ত ভঙ্গিমায় বলেছিল—আরে বাপরে! চক্কোত্তি! মেয়ের বিয়ে হয়ে

গেল।

—হ্যাঁ। বাজনা শুনতে পাও নি? তোমার মিল থেকে তো এক দৌড়ের পথ আমার গ্রাম। রাস্তাটাতে দেখা যায় গো। আলো দেখ নি?

প্রথমেই যেন খোঁচা বিঁধেছিল চক্কোত্তির ক্ষতস্থানে।

দে মিষ্ট মৃদুস্বরে সহাস্যে বলেছিল—চোখও আছে, কানও আছে, মিলে থাকলে দেখতে শুনতে পেতাম। কিন্তু গ্রামের ভিতরে যে-বিয়ের বাড়া কাণ্ড আমাদের—

—তা হলে তো বৃষোৎসর্গ।

—না। দানসাগর। তা তোমার ওই মেয়েটি ভাল মেয়ে। প্রশংসার মেয়ে। আমরা সকলে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছি। বেশ তো শিখুক লেখাপড়া! তোমার দায় খালাস হয়ে গেল তাকে নিয়ে। ছোট মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেল। সাইকেলটি দেখছি রমেনের। চিনি সাইকেলখানা। ভালো সাইকেল। দামী জিনিস। তা ওটি দক্ষিণে পেলে বুঝি?

আর সহ্য হয় নি অমর চক্কোত্তির—সে চীৎকার করে উঠেছিল, শাট্‌আপ—ইউ বদমাশ পাষণ্ড কোথাকার।

হেসে ফেলেছিল দে।—আরে—হঠাৎ শাট্‌আপ-টাট্‌আপ কেন হে!—কি হল, কি অন্যায় বললাম?

—আই সে—ইউ শাট্‌ আপ! বেরিয়ে যাও। তুমি পাষণ্ড—তুমি ভণ্ড—তুমি ঠগ—তুমি—তুমি রক্তচোষা মহাজন এক্সপ্লয়টার বেরিয়ে যাও তুমি।

দে'র মুখের উপর থেকে একটি অদৃশ্য আবরণ যেন নিঃশব্দে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চোয়াল দুটি শিবনাথের চওড়া—সে দুটো শক্ত হয়ে উঠল, চোখের তারা দুটি বারেকের জন্য স্থির হল। সে দাঁড়িয়েছিল, এবার দাওয়ার উপর চেপে বসল—বসে ধীর শান্তকণ্ঠে বললে—চেঁচিও না। কথাটি শুনো। দেখো, চণ্ডীমায়ের স্থান এখানকার জনসাধারণের, জনসাধারণ ম্যানেজিং কমিটি করে তার উপর সব ভার দিয়েছেন। আমি সেই কমিটির একজন সভ্য। তোমরা পাণ্ডা—সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অনুযায়ী তোমরা দেবতার সেবক। সেবক মানে চাকর। সেবার ত্রুটি হলে সেবককে সাস্‌পেণ্ড করতে পারি, বরখাস্ত করতে পারি। তুমি দেবতায় বিশ্বাস কর না। মা চণ্ডীর পিঠে তুমি একবার চড়েছিলে, পেটে কিল মেরেছিলে। তখন তোমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। আজ আবার তুমি এসেছ—উচ্ছিষ্ট অশুচি কাপড় জামা পরে। তোমার কাপড়ে জামায় ওই দেখ—এঁটোর দাগ লেগে রয়েছে। মুখে মদের গন্ধও উঠছে মনে হচ্ছে। তোমাকে আমি সাধারণের দেবস্থান—এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলছি না, বলছি তুমি মন্দিরে ঢুকবে না। আর তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললে—রাজ-পুরোহিত মশায়।—কোথায় গো। শুনুন একবার। দেখুন—ম্যানেজিং কমিটির সভ্য হিসেবে অমর চক্কোত্তিকে আমি সাস্‌পেণ্ড করে গেলাম। আমদানীর ভাগ উনি পাবেন না আজ থেকে। ওঁর ভাগের টাকা পয়সা মায়ের ভাগের সঙ্গে জমা থাকবে। কমিটিতে প্লেস করে যা হয় স্থির হবে। কমিটি আমার প্রস্তাব বাতিল করেন, উনি

সব ফেরৎ পাবেন। আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়—উনি সেবকপদ থেকে বরখাস্ত হবেন। তারপর মামলা-মকদ্দমা যা করবার করবেন। আমরা লড়ব। বলে রাখলাম খরচ আমি দোব।

কথা শেষ করে ধীর পদক্ষেপে শিবনাথ দে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল।

সকলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চক্কোত্তি পর্যন্ত। শিবনাথ দে কথা বললে বিশেষ করে আইন দেখিয়ে এমনি সুরে কথা বললে—লোকে থমকে যায়। কারণ তার ধ্বনির গাম্ভীর্য আছে যা নিরেট ভারী বস্তুর ধ্বনির মত উচ্চ নয় কিন্তু নিষ্ঠুর এবং দৃঢ়।

কয়েক মুহূর্ত পরেই চক্কোত্তি সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল। তার মোহ কেটেছিল। সে বলেছিল—দেখা যাবে। জনসাধারণের মন্দির—জনসাধারণ দখল করে নেবে। সে খেল্ অমর চক্কোত্তি খেলতে জানে।

—হ্যাঁ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ। তা বেশ! দেখা যাবে।

আবার একটু হেসেছিল শিবনাথ দে। তারপর আরও দুপা গিয়ে দে ঘুরে দাঁড়িয়ে সহাস্য মুখে বলেছিল—নসুবালার নতুন ভাদু গান শুনেছ চক্কোত্তি? 'ভাদু আমায় বিয়ে করবে না?' শুনো—কাল শুনো। একটু খুঁত আছে আজ পর্যন্ত। ওকে ওই চমৎকার সাইকেলখানার কথা বলে দেব। গেঁথে নেবে। ওটা সে জানে না।

* * *

অমর চক্কোত্তি এতেও দমে নি। সে জোর করেই সেই কাপড়ে—সেই অবস্থাতেই মন্দিরে ঢুকে মায়ের মাটির স্তূপের দেহ থেকে সিন্দুর নিয়ে কপালে পরেছিল, জঙ্গলের ভিতর থেকে বুনো বেল ফুল অপরাজিতা ফুল এনে চেপে বসে—পুজোর অভিনয় করে চোখ বুজে বিড়বিড় করে মন্ত্রপড়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট নেড়েছে—;

—মাট্যাঃ ঢিপয়ে নমঃ মাট্যাঃ ঢিপয়ে নমঃ। মিথ্যায় নমঃ। বোগাসায় নমঃ।

এ মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করতে তার পেটের ভিতর হাসির একটা আবর্ত ঘুরপাক খাচ্ছিল; কিন্তু সে তা সম্বরণ করলে; এ ক্ষমতা তার আছে। ইলেকশনের সময় সে যখন রামদাস মহাবীরকে রুদ্র দেবতা বলে অভিহিত করে বক্তৃতা করে তখন তাদের গ্রামের মুখ-পোড়া-বীর হনুমানটার কথা মনে পড়লে এমনি হাসি বুক পেট তোলপাড় করে আবর্ত তোলে। কিন্তু তাতে তার বক্তৃতা ব্যাহত হয় না। থিয়েটারে যাত্রায় সে অভিনয় করে এ শক্তিটা আয়ত্ত করেছে।—গম্ভীর মুখে গাঢ় ভক্তি গদগদ কণ্ঠে 'জয় মা। নে মা!' বলে ফুলের অঞ্জলি ছিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সে। এবং সাইকেলের চাবি খুলে সবরেজেস্ট্রি আপিস যাবার পথে—চৌমাথায় একটা সাঁকোর প্যারাপেটের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলেছিল—পাষণ্ড রক্তচোষা মহাজন শিবনাথ দে—যে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার—সে কমিটি দেবস্থানের কমিটি হতে পারে না। আমরা যতকাল চণ্ডীতলার সৃষ্টি, ততকাল চণ্ডীর সেবায়েৎ পাণ্ডা। ওই শিবনাথ দে বলে কিনা আমাকে সাসপেণ্ড করবে? আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে ঠাট্টা করবে? বলে কিনা—সেই নসুটাকে দিয়ে গান বাঁধিয়ে গাওয়াবে!

সতীশ ঘোষাল ঠিক সেই সময়েই পাঁচ মাথার মোড়ে এসে দাঁড়াল এবং সাঁকোর প্যারা-পিটের ওপর দাঁড়িয়েই শুরু করলে—একটা ছোট জাত একটা ব্রাত্য একটা নপুংসক—তার এ সাহস কোথা থেকে হয়? কি করে হয়? ব্রাহ্মণ ভদ্র রাজনৈতিক কর্মী—তার কন্যা—হয়তো সে ভুল করেছে, সে ভুল অবশ্যই শোধরাবে। কিন্তু তার নামে গান বেঁধে এমনভাবে নেচে বেড়াবে এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে না? এসব দেখবে না সমাজ? না দেখলে সবারই এই দশা হবে। এই এক দৃশ্য। এর মূলে আছে ধনীর চক্রান্ত। উস্কানি। হায় দেশ! হায় স্বাধীনতা! ভেকে পদাঘাত করছে গোক্ষুর সর্পের মাথায়।

বি. ডি. ও. সাহেব—দেখুন, স্বাধীন রাজ্যে এ অঞ্চলের উন্নতি করতে এসেছেন আপনি—আপনি দেখুন, কেমন উন্নতি হচ্ছে। আপনি বসে আছেন মাটির পুতুলের মত। ধনী—ধনী আছে যে পিছনে। চমৎকার স্বাধীনতা। আর এই সব যুবক। স্বাধীন দেশের যুবক। নিবীর্য মূর্খ সব। শুনছে। হাসছে! হেসো না। হেসো না! আসছে, তোমাদের মাথায় পদাঘাতের দিনও আসছে। একটা ছোটলোককে শাস্তি দিতে পারে না এরা।

একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে—সে দিন আপনি কি বলেছিলেন? আজ উল্টো বলছেন কেন?

—কি? কি উল্টো বললাম?

—সেদিন গোপাল চৌধুরীকে ন্যাড়া মেরেছিল—আমরা বলছিলাম ন্যাড়াকে ধরে এনে শাসন করা উচিত—করব আমরা। আপনি আজকের মতই জানালা থেকে নেমে এসে ঝগড়া করেন নি আমাদের সঙ্গে? বলেন নি—ঠিক করেছে ন্যাড়া। নতুনকালের অগ্রদূত সে। শোধ—শোধ—প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে। অনেক মার তারা পুরুষানুক্রমে খেয়েছে—আজ শোধ নেবে না? ছোটলোক! কে ছোটলোক? মানুষ! বলেন নি আপনি? আজ নসুকে বলছেন—ছোটলোক! কেন বলছেন?

—তুমি মূর্খ, তুমি মূর্খ, তুমি মূর্খ! তুমি শুনেছ সে ছড়া গান? সে প্রহারের চেয়েও মর্মান্তিক! লজ্জার কথা! ঘৃণার কথা!

—না। সে গান আমরা শুনেছি। কোন অপমান সে করে নি। মেয়েটির সে প্রশংসা করেছে। রমেন আচার্যিকে শুধু খানিকটা ঠাট্টা করেছে। আর ওই চক্কোত্তিকে—।

কই চক্কোত্তি? চক্কোত্তি এই অবসরে সরে পড়েছে। চলে গিয়েছে, সে বুদ্ধি রাখে। সতীশ ঘোষালকে সে জানে। জানে—ঘোষালের হাঙ্গামা বাধাবার পারঙ্গমতা যথেষ্ট। এবং কোন হাঙ্গামায় সে লাভবান হয় না। সুতরাং সে সরে পড়েছে। হয়তো বা এতক্ষণে তার মনও শান্ত হচ্ছে ক্রমশ। সে বুঝতে পারছে সকালবেলা চণ্ডীতলায় সে উত্তেজিত না হলেই ভাল করত।

সতীশ ঘোষাল চারিদিকে তাকাচ্ছিল চক্কোত্তির খোঁজে। কই চক্কোত্তি?

কে একজন বললে—চক্কোত্তি কি আর আছে। সে পালিয়েছে। এখন যে-যার বাড়ী যাও। ঘোষাল, তুমিও আর বকে শরীর খারাপ করো না!

—করব না? হোয়াট ডু ইউ মীন? ডু ইউ মীন টু সে—ছাট আই কেয়ারড টু সাইড উইথ ছাট বাগার চক্কোত্তি? আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি। আমার ক্ষমতা থাকলে চাব্‌কে এই ধরনের অন্যায়কারী ওই নস্যুটার পিঠের চামড়া তুলে দিতাম।

—কই দিন। দিন চামড়া তুলে। এই নস্যুকে নিয়ে এসেছি আমরা। কই চাবুক আনুন।

এবার ঘোষালের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে এটা ভাবে নি। সত্য বলতে কি সে ভেবে চিন্তে কিছু করে না বা বলে না। জীবনের ব্যর্থতায় তার দুরন্ত ক্ষোভ মনের কন্দরে অবরুদ্ধ বাষ্পের মত ঘুরপাক খায়, যে কোন অজুহাতে যে কোন ছিদ্র দিয়ে সে ক্ষোভ বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার অধিক কিছু না।

—নিন! মারুন!

ছেলে কয়েকটা নাছোড়বান্দা যেন। তার কারণ আছে। সতীশ ঘোষাল ওদের সুযোগ পেলেই তিরস্কার করে। সুযোগ পেতে হয় না—সুযোগ খুঁজে নেয়। তাদের কথায়-বার্তায় অকস্মাৎ এসে যোগ দিয়ে তাদের তিরস্কার করতে শুরু করে।

ক'দিন আগে গোয়ালা দুধে জল দেয় এই নিয়ে আলোচনার মধ্যে হঠাৎ ঘোষাল এসে গোয়ালার পক্ষ নিয়েছিল। এবং দুধের জলের জন্য দায়ী বড় ব্যবসায়ী শিবনাথ দে, এইটেই প্রমাণ করতে চেয়েছিল সে। শিবনাথ দে চালে কাঁকর মেশায়,—ডালে ভেজাল দেয় তেলে ভেজাল দেয়, ঘিয়ে চর্বি দেয়—তাতে দোষ হল না—দোষ হল গোয়ালার? আই—আই স্ট্যাণ্ড ফর হিম, দি গোয়ালা!

ব্যাপারটার ওখানেই শেষ হয় নি, সতীশ ঘোষাল তার জের টেনেছে 'কোপাই' পত্রিকা পর্যন্ত। তার নিজস্ব ধারায় সে একটি প্রতিবাদপত্র ছড়ায় রচনা করে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিল। চিঠিপত্রের (*মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন*) কলমে সেটি বেরিয়ে গেছে। দু'তিন দিন আগেই পত্রিকাখানি নিয়ে এই পাঁচ মাথার মোড়ে এই প্যারাপেটে বসেই সতীশ ঘোষাল উচ্চকণ্ঠে পড়ে সকলকে শুনিয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে তার এক রসিকতা-পটু (রসিক নয়) রূপ বের হয়। সে বসেই উচ্চকণ্ঠে বলে—অব ধা-ন। অব ধা-ন! নাগরিকগণ শ্রবণ করুন।

"চালে কাঁকর—ডালে কাঁকর
গব্য ঘৃতে চর্বি
যা—যা—যা—যা ছোঁড়ারা যা,
যা পারিস তা করবি
কালো বাজার আলো করে
আসছে টাকা দেদার
এতে ওতে চাঁদা বলে
ভাগা কিছু নেতার।
ধমকে মারেন ছোকরা দিগে—

সব বাজারের সবু নাগ—
চাঁদা ভাগা না নিবি তো
জালাস নেকো জলদি ভাগ।
সাহেব গেল সুবো গেল
যত কালকের ছোক্‌রা—
ভেজাল বলে চ্যাঁচাস নেকো
করিস নেকো ন্যাকরা।
লেখায় ভেজাল পড়ায় ভেজাল
পাশ করা সব মুখ্যু।
গরুরা সব গুরু হল
এই তো বড় দুঃখু।
হাকিম দিগে হুজুর বলে
চাকরি বরং করগে যা
নেহাৎ লড়াই করবি যদি
গয়লা সাথে লড গে যা।
গয়লারা সব ঘরে থাকে
দুগ্ধ বেচে গয়লানী
ব্রজলীলা জমবে ভাল
ভাণ্ড ভেঙে খা ননী
হায়রে কপাল ছোঁড়া রাখাল
কাটিয়ে টেরী লম্বা—
মাতব্বরী করে বেড়ায়
আমরা হলাম খাম্বা।

নিচে ফুটনোট খাম্বা মানে থাম অর্থাৎ আমরা থাম হয়ে গিয়েছি। বোবা—জড়। দেখে শুনে এবং লজ্জায়।"

সবু নাগ হল শিবু দে। মানহানির দায় এড়াবার জন্যে শিবুকে সবু করেছে। তার সঙ্গে সতীশের ঝগড়া অনেক দিনের। শুধু শিবু দে নয়—গন্ধ বণিকদের ভুলু দত্তের সঙ্গেও তার দীর্ঘকালের বিবাদ। এবং সব বিবাদের পিছনে কি আছে সে নতুন কালের ছেলেরা জানে না। কিন্তু ঝগড়াগুলির উপলক্ষ্য সতীশ ঘোষালের পথের ঝগড়া। পথ নিয়ে ঝগড়া। ভুলু দে তার একটা পথ বন্ধ করেছিল। সে অনেক দিন আগে। তখন শিবু দে তাকে সাহায্য করেছিল। সে পথ ঘোষাল পেয়েছে। এখন আবার একটা নতুন ভিটে কিনেছে শিবু দে, তার ফলে সতীশের বাজারের দিকে আসবার একটা সহজ গলিপথ বন্ধ হয়েছে। তা নিয়ে মামলা চলছে।

শিবু দে-র সম্পর্কে কোন মোহ কোন কারণেই এ গ্রামের লোকের নেই। শিবু দে মশায়ের

নিজেরও নেই। তাকে ভালো লোক—অর্থাৎ মহৎ লোক কোন লোকেই ভাবে না এবং সে নিজেও চায় না লোকে তা ভাবুক। ও নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। পথের মূল ঝগড়াটা পথ নিয়ে নয়, একটা নালা নিয়ে। ঘরের জলনিকাশী নালা। আগের কালে শুধু বর্ষার জল বের হত। স্নান ছিল পুকুরে, এমন কি চব্বিশ ঘণ্টার জল-আচরণ তাও চলত খিড়কীর পুকুরে! সেটা একেবারে বাড়ীর দোরে নাও হতে পারত! তবু লোকে খেয়ে হাত ধুতে যেত সেই পুকুরঘাটে। এখন বাথরুমের রেওয়াজ হয়েছে—বাড়ীতে ইন্দারা হয়েছে, সুতরাং বাড়ীর ভিতর জল অহরহ পড়ে। উঠোন সিমেন্ট বাঁধানো। জল চব্বিশ ঘণ্টা নিষ্কাশন পথ খুঁজছে, বের হচ্ছে। এই নালা বন্ধ করবার জন্ম লাগল সতীশ। দরখাস্ত। সত্যাগ্রহ। শেষ কাগজপত্র ঘেঁটে শিবু দে গোটা পথটাকেই বন্ধ করে দিলে। গ্রামের কেউ খুশী হল না। তবে সতীশ ঘোষালকে সহানুভূতি দেখিয়ে তার কাছে বা পাশে দাঁড়াতেও কেউ এল না। সেও ঘোষালের প্রয়োজন নেই। সে তাই বলে। এবং কাঁটা গাছে যে ফুল ফুটুক, তাতে কোল দিতে কেউ আসে না। এই কারণেই, সতীশ ঘোষাল আজ অমর চক্কোত্তির পক্ষ নিয়েছে। শিবু দে-র সংস্রব ছিল, সুতরাং নেমে এসেছে তৎক্ষণাৎ। এবং শিবু দে যেহেতু বলেছে যে নসুকে দিয়ে ভাদু বানিয়ে গাওয়াবে সেই হেতু সে নসুর এই ভাদুর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে এসেছে। অন্যথায়, সে হয়তো নসুকে বাহবাই দিত। প্রথম শুনে তো সে মনে মনে হেসেছিল।

নসুকে যখন সামনে ধরে ছেলেরা বললে—কই মারুন। বের করুন চাবুক ; তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সতীশ তাকিয়ে রইল সকলের দিকে। তার একবার ইচ্ছে হল সে এমন একটা হুঙ্কার ছাড়ে—যে হুঙ্কারে এখানকার সমস্ত লোক মুহূর্তে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায়। কিন্তু সে হুঙ্কার করবার শক্তি তার নেই। হয়তো বা কারুরই নেই। এবং মুহূর্তে মুহূর্তে তার উলটো একটা জিনিস—একটা ভয়—তার সঙ্গে একটা লজ্জা—দারুণ লজ্জা, তাকে যেন নাগপাশের মত জড়িয়ে ধরছে। এবার মুহূর্তে মুহূর্তে তার বাঁধনটা শক্ত থেকে শক্ততর হচ্ছে। তার ফলে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা তার মনের সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হচ্ছে। তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে এক সময়ে সে তা অনুভব করলে। তার হাত পা কাঁপতে শুরু করেছে বুকের মধ্যে হৃৎস্পন্দন ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠছে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হল—সে হা হা শব্দে হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। সে কান্নায় সব গাছ পাথর বেদনায় গলে যায়। কিন্তু তাও সে পারলে না। লজ্জার নাগটা তার কণ্ঠরোধ করে চোখের সামনে ফণা তুলে দুলছে—না—না—না বলে দুলছে। পৃথিবী দুলছে।

পৃথিবীর কেউ তাকে বোঝে না। নিষ্ঠুর পৃথিবী! নিষ্ঠুর!

সে পড়েই যেত। সত্যিই সে কাঁপছিল। সেই অবস্থায় তাকে কেউ ধরলে। ধরলে দেবব্রত চক্রবর্তী। দেবব্রত চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারলে সতীশ। চক্রবর্তী বললে—

—করছেন কি আপনারা! দেখছেন না পড়ে যাবেন! সরুন সরুন। দয়া করে রাস্তা ছাড়ুন।

সামনেই আশু সিংহীর ডাক্তারখানা। গোলমাল শুনে আশু সিংহী প্রথমেই একবার এসেছিল। তখন পালার সবে শুরু, সন্ত গালাগালি শুরু করেছে অমর চক্কোত্তি। তাতে শুনবার কিছু ছিল না। বরং কৌতুক বোধই করেছিল অকস্মাৎ শিবনাথ দেকে নিয়ে পড়ায়। হঠাৎ শিবনাথ দেকে কেন গালাগাল পাড়ছে বুঝতে পারে নি, কম্পাউণ্ডারকে বলেছিল, এস—এস ভেতরে এস। ও আর কি শুনবে ?

তারপর সতীশ ঘোষালের কণ্ঠস্বর পেয়েও বিস্মিত হয় নি। হেসে কম্পাউণ্ডারকে বলেছিল—ঘোষাল এল।

সেও হেসে বলেছিল—হ্যাঁ।

—আগুন জ্বললে—উনপঞ্চাশ বায়ু আসবেই। কথাটা বললে দেবব্রত চক্রবর্তী। সে এখানকার বাসিন্দা বটে কিন্তু চন্দনপুরের অধিবাসী নয়। শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ লম্বা মানুষ। সে কাজেই এসেছিল আশু সিংহীর ডাক্তারখানায়।

আশু বলেছিল—খুব বলেছেন, সাক্ষাৎ উনপঞ্চাশ বায়ু! একে সতীশ ঘোষাল তার উপর শিবনাথ দে'র নাম। আর রক্ষা আছে!

—যাক! কে আছে বাইরে। এস—এস। আমাকে আবার দেবব্রতবাবুর সঙ্গে যেতে হবে। এস এস।

একে একে রোগী দেখছিল আশু। হঠাৎ কোলাহল প্রবল হল। হঠাৎ সতীশ ঘোষালের কণ্ঠস্বর নীরব হল। বাইরে থেকে কে বললে—গেল—গেল বোধ হয়! বেচারা রোগা মানুষ। থরথর করে কাঁপছে যে!

সত্যই হুঙ্কার দিতে পারে নি, কাঁদতে পারে নি ঘোষাল, কিন্তু মর্মান্তিক ক্ষোভে দুঃখে অসম্মানে থর থর করে কেঁপেছিল—কেঁপেছিল আপন অজ্ঞাতসারেই। চেয়েছিল সে পাথর হয়ে যেতে কিন্তু মানুষ পাথর হয় না।

দেবব্রত এবং আশু দুজনেই বাইরে এসে এই অবস্থা দেখে একসঙ্গেই লাফ দিয়ে পড়েছিল বারান্দা থেকে। দুজনেই তরুণ। ছুটে গিয়েছিল এগিয়ে। আরও একজন এসেছিল ওপাশ থেকে, সুরেশ্বর মুখুজ্জে—সতীশের আত্মীয় ও প্রতিবেশী। প্রৌঢ়ত্ব পার হয়েছে কিন্তু এখনও সক্ষম এবং স্বাস্থ্যবান। মানুষটির রঙটি কটা। দূর থেকে রঙ দেখে চেনা যায়। সে বলেছিল —করছ কি ? তোমরা করছ কি ?—না—না।

বলতে বলতে দেবব্রত এসে পতনোন্মুখ সতীশকে ধরে ফেলল।

ওপাশ থেকে সুরেশ্বরও ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হল—সতীশ! সতীশ!

সতীশের ঠোঁট দু'টি কাঁপল। চোখ থেকে দু'টি ধারায় জল গড়িয়ে পড়ল একটিবার। দুবার নয়।

কিছুক্ষণ পর সুস্থ হলে—সুরেশ্বর সতীশকে বাড়ী নিয়ে গেল। আশু বললে, ভয় নেই। তবে এখন তিনচার দিন ওঠা হাঁটা বকাঝকা করবেন না।

সুরেশ্বর বললে—শুনলি তো।

গম্ভীরভাবে সতীশ বললে—শুনলাম।

—হ্যাঁ। চল তা হলে বাড়ী চল। ডাক্তারের কথা শুনে ঘরে শুয়ে থাকবি। কি দরকার এই সব গাঁয়ের লোক শাসনে বল্ তো।

—তুমি বুঝবে না। গোলামী ক'রে ক'রে মনটা তোমার গোলাম হয়ে গিয়েছে।

সুরেশ্বর বললে—মারে গালে ঠাস করে এক চড়!

সতীশ বললে—তা তুমি মারতে পার, তুমি গুরুজন। কিন্তু সত্য বলেছি আমি।

—বেশ। তাই হল। চোরা না-শোনে ধর্মের কাহিনী! চল বাড়ী চল—মা শুয়ে শুয়ে চেঁচাচ্ছে—ওগো সতীশকে আমার বাঁচাও গো। পরিবার বেচারা গলির মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আমি মাঠ থেকে এসে শুনে ছুটে আসছি।

সুরেশ্বর একটি নির্বিরোধী মানুষ। যা এ সংসারে বিরল। একান্তভাবে নিঃস্বপ্রায়—এক মধ্যবিত্তের ঘরে জন্ম। লেখাপড়া সে আমলে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত; কিন্তু দুটি জিনিস তার সম্বল ছিল—অটুট সবল স্বাস্থ্য। সে স্বাস্থ্য হিংসা করার মত স্বাস্থ্য। একাল হলে সে অলিম্পিকে যেতে পারত। সে যোগ্যতা তার ছিল। দৌড়ে, হাই-জাম্প—লঙ-জাম্পে ফুটবলে আশ্চর্য কৃতিত্ব ছিল। আর ছিল—কর্মে নিষ্ঠা এবং এই নির্বিরোধী চরিত্রমাধুর্য। এই দুটি মূলধনেই সে এখানকার এই চন্দনপুরের সামন্ততন্ত্রের শেষ ব্যাঘ্র বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর বড়বাবুর অধীনে কাজ করেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। ঢুকেছিল সামান্য বেতন পাঁচ টাকায়। শেষ সে হয়েছিল হিসাববিভাগের কর্তা। শুধু জমিদারী নয়, তার সঙ্গে ব্যবসা। বিরাট ব্যবসা। বেতন হয়েছিল দেড়শো টাকা। দেশ স্বাধীন হল—তার সঙ্গে একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য রেখে এই সামন্ততন্ত্রী ও ব্যবসায়ী পরিবারটি মুখ থুবড়ে পড়ল। তখনও সুরেশ্বর তাদের ছাড়ে নি। তারপর ছেড়েছে। এমন এই নির্বিরোধী মানুষটি শুধু এই একটি গুণেই গ্রামের মধ্যে সকলের কাছে ভালবাসার পাত্র হয়ে বেঁচে আছে। শ্রদ্ধাও আছে সে ভালোবাসার মধ্যে কিন্তু সে তা চায় না। শ্রদ্ধার প্রতি বা প্রতিষ্ঠা-সম্মানের প্রতি তার সত্যই মোহ নেই। সেই কারণেই সে অনায়াসে সতীশ ঘোষালের মত লোককেও বলতে পারে—মারে গালে ঠাস করে এক চড়। এবং ওই কথার মিষ্টতার জন্যই সতীশের মত লোকও বলে—তা তুমি মারতে পার। তুমি গুরুজন।

পথে সুরেশ্বর বললে—দেখ্ তো কি কাণ্ড করলি।

—কি করলাম?

—কি করলি? মরতিস্ যে!

—মরতাম যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মত।

—কথায় বলে—নড়তে নারে বন্দুক ঘাড়ে। তোর সেই বৃত্তান্ত। এদিকে তো ঠেঙা ভিন্ন হাঁটতে পারিস না। মরদ আমার লড়ুয়ে সেপাই। আর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক—কিসের জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলি? কার পক্ষ নিয়ে? অমর চক্কোত্তির?

—তা বলে ছোট লোক—

—কে ছোট লোক ? তুই নিজে কি বলিস ? বলিস নি হাজার দিন—এই তো কালই বলেছিলি—ওই গোপাল চৌধুরীর কথায়—ছোটলোক কেন বলবে ছাড়াকে ? ছোটলোক কিসের ? গরীব বলতে পার। বলিস নি ?

চুপ করে রইল সতীশ এবার। সুরেশ্বর বললে—তোর তো আসল কথা—দে'কে নিয়ে। শিবু দে'র নাম।

সতীশ ফোঁস করে উঠেছিল—কিন্তু সুরেশ্বর বললে—চুপ কর—এত লোকের সামনে আর —থাক।

বি. ডি. ও'র সামনে তখন লোকারণ্য। দূরে একটা প্রবল সমবেত কণ্ঠের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। মিছিল আসছে। কম্যুনিস্ট এম. এল. এ. মিছিল নিযে আসছে—লোন আদায়—

—বন্ধ করো, বন্ধ করো।

—ইনকিলাব—

—জিন্দাবাদ।

সতীশ দাঁড়িয়ে গেল।

সুরেশ্বর বললে—দাঁড়ালি কেন ?

সতীশ বললে—দেখেছ ?

—কি ?

—ওই আসছে—। সে আঙুল দিয়ে দেখালে দূরের মিছিলটাকে।

সুরেশ্বর বললে—মিছিল—। তা, ওর আর কি দেখবি ?—

সতীশ বললে—দাঁড়াও না। দেখি।

আজ সে জনতার একটা অবশ্য আশ্চর্য রূপ দেখেছে।—সে রূপ—মানুষের মাথা গুনে বা মাথার সমাবেশে দেখা যায় না। দেখা যায় অকস্মাৎ।

নসু—ছুটেই প্রায় পালাচ্ছিল—ওই মিছিলটা দেখে।

১২

আশু সিংহী চলেছিল দেবব্রতের সঙ্গে। চন্দনপুরের দক্ষিণ প্রান্তে একেবারে কোপাই নদীর ধারে—ছোট একটি আশ্রম তার। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে এসে এখানে কিছুদিন ছিল—চণ্ডীতলায় তারপর নিয়েছিল চাকরি—চাকরি নিয়েছিল ওই বড়বাবুদের পড়ো এস্টেটে। তারপর ওদের কাছে জমি নিয়ে আশ্রম করেছে। একা মানুষ। ওখানে আছে ব্রাত্যপল্লী। তাদের মধ্যেই বাস করে। নাইট ইস্কুল করেছে, নিজের হাল গরু আছে—কিছু জমি আছে, চাষ করে,

মুর্গী হাঁস পোষে আর পড়ে। ব্রাত্যদের সুখ দুঃখের ভাগ নেয়। আগেকার কাল হলে লোকে বলত এনার্কিস্ট। এখন সহজ রটনা কম্যুনিস্ট। দেবব্রত নিজে বলে—না। তা আমি নই। হলে বলতাম ওতে লজ্জারও কিছু নেই ভয়েরও নেই। কারণ স্বদেশী রাজ্যে যদিই সরকার আটক আইনে ধরে তবে দশ পয়সা দশ আনা নয় অনেক বেশী খরচ করে আরামে জেলখানায় রাখবে এবং অসম্মান করবে না। এতেও প্রশ্ন অনেকে করে—তাহলে আপনি কি? কেন—এইভাবে রয়েছেন ব্রাত্যদের মধ্যে?

দেবব্রত বাঁকা জবাব দেয় না, সোজা জবাব দেয়। দেখুন, আমি গোড়া থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে মানুষ। এসব আমার ভাল লাগে।

তবু সন্দেহ মেটে না—সন্দেহ এও অনেকে করে যে, এইভাবে ওদের মধ্যে থেকে—হয়তো একদা ওদের ভূ-সম্পত্তি গ্রাস করবে। কেউ সন্দেহ করে হয়তো ব্রাত্যনারীবিলাস অন্যতম কারণ। কেউ অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পায়, একদিন ওই লোকটি এখানকার এম. এল. এ. হয়ে দাঁড়িয়ে ধ্বনি তুলেছে—ইনকিলাব—

লোকে বলছে—জিন্দাবাদ।

এখানকার কংগ্রেসী প্রধান ভবানীকিঙ্করের সঙ্গে যথেষ্ট প্রীতি কিন্তু দেবব্রতের। বিশেষ করে একটি জায়গা আছে, যেখানে উভয়ে এক নেশায় আসক্ত দুই নেশাখোরের মত বন্ধু। সেটি হল ফুলের চাষ। ভবানীকিঙ্করের পৈতৃক বাড়ীর ঘর যত ভাঙছে, তত জায়গা বাড়ছে এবং তত সে ফুলগাছ লাগাচ্ছে। দেবব্রতের জায়গা অনেক। পড়ো প্রান্তর। তার মধ্যে ফুলের বাগান সেও করে। এ ওকে চারা দেয়। বিশেষ করে ডালিয়া।

আজ একটি ব্রাত্য চাষীর অসুখ কঠিন হয়েছে। তাই সে আশু সিংহীকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রৌঢ়েরা বয়স্কেরা বিষয়ীরা যে সন্দেহই করুক দেবব্রতকে—গ্রামের তরুণেরা দেবব্রতকে ভালবাসে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তার অনেকের সঙ্গে।

দুজনেই সাইকেলে চলছিল। সকালের এই ঘটনাটির সঙ্গে দুজনেই খানিকটা জড়িয়ে গিয়েছে। কথা ওই নিয়েই হচ্ছিল। পথে আজ ভিড় অনেক। বি. ডি. ও. আপিসের ভিড় —হাটের ভিড়—মিছিলের ভিড। এখানে এম. এল. এ.'র যেখানে যত কর্মী আছে সকলেই কিছু লোক এবং লাল ঝাণ্ডা নিয়ে আসছে। ধ্বনি দেবে—তারপর মিটিং হবে।

দেবব্রত বললে—আর বেশী একটু হলেই ভদ্রলোক বোধ হয় মরে যেতেন—না?

আশু বললে—ব্লাডপ্রেসার আছে। বলা তো যায় না! তবে প্রেসারের চেয়ে মনের ব্যাপারটাই ওঁর বেশী। কমপ্লেক্সেই খেলে ওঁকে। কমপ্লেক্স, ফ্রাস্টেশন দুই মিলে—উনি এমন হয়েছেন। হাঁটতে সম্ভবত উনি বেশ পারেন—তবে মনের ধারণা হয়ে গেছে—পারেন না। না ধারণা করে উপায় নেই। কারণ উনি তো সবই পারেন বা পারতেন—কেবল রোগের জন্যেই পারছেন না।

দেবব্রত বলল – অমর চক্রবর্তী কিন্তু চালাক, সে কখন সরে পড়েছে।

—নিশ্চয়! পলিটিক্স করে। সে উদো—তার পিণ্ডি যখন বুদো খেতে বসেছে, তখন

তো বেঁচে গেছে। আবার থাকে! অ্যাণ্ড হি সেণ্টেড ইট। সে তো জানে যতই সে শিবু দে'র নাম করে গাল দিক—মেয়ে যখন তার এখানে—তার জোর ক'রে বিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে—পেয়েছে, তখন সে এখানে কোন সিম্প্যাথি পাবে না!

—জাঁদরেল মেয়ে।

—মেয়ে ভাল। পড়ায় ভাল; দু বছর ফেল করলে তার কারণ বাপ। মেয়েটি সাইকেল চেপে ইস্কুলে আসত। এই চন্দনপুরে। তা থেকেই বুঝছেন—দুঃসাহসিকা! হেসে বললে—কে জানে ঠিক হল কিনা!—তা বাপ পড়তে সময় না দিলে কি করবে? বই না পেলে কি করবে? মেয়েটি গান গায় ভাল। বাপও কৃতী লোক। অনেক পার্টস ছিল। তিরিশ সালে জেল হয়েছিল। দেশপ্রেম ছিল। থিয়েটার করত ভাল। গান জানে। তারপর ছেতরে গেল। বেয়াল্লিশ থেকে হল কম্যুনিস্ট। তারপর বাহান্ন সালে কংগ্রেস। মেয়েটিকে গান শিখিয়েছিল। মিটিংয়ে নিয়ে যেত—গাইত। মিটিংএ মিটিংএ ঘুরেছে মেয়ে। ও তো বাপের বিত্তের গোড়া পর্যন্ত পায় নি। সে আদর্শবাদে মশগুল। ও মশাই আগুন হবে দেখবেন। মেয়ে থিয়েটার ক'রে ভাল। আরে—আরে—। গরু জোড়াটা সামলাও ভাই গাড়োয়ান।

সামনে কয়েকখানা গাড়ী যাচ্ছে। তরকারি বোঝাই গাড়ী। একজন গাড়োয়ান কিছুতে তার গরুকে বাগাতে পারছে না। গরু দুটো চকিত হয়ে উঠেছে। আশু নেমে পড়ে বললে—নামুন। নেমে পার হওয়াই ভাল। একবার পোস্টাপিসটাও দেখে নিই। দাঁড়ান।

দেবব্রত বললে—চলুন। আমারও পোস্টকার্ড কিনতে হবে।

পোস্টাপিসে এখন অনেক চিঠি, অনেক কাজ। প্রায় সত্তর আশী বছরের পুরনো পোস্ট আপিস। আগে অধীনে দুটি ব্রাঞ্চ আপিস ছিল; এখন দশ-বারোটা। তার সঙ্গে টেলিগ্রাফ হয়েছে আজ কয়েক বছর। এখন নতুন টেলিফোন লাইন বসছে। আজ হাটবার—অনেক লোক আজ ডাকটিকিট পোস্টকার্ড কিনবে। ডাক্তার গিয়ে দাঁড়াল। এবং বললে—নাও বিপদ!

জানালার ধারে পোস্টমাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আর্যকুমার রায় যথারীতি বক্তৃতা করছে। ইংরিজীতে বক্তৃতা—অর্থহীন বলেই মনে হয়। কিন্তু অর্থ একটা আছে—আই বেগ টু সে স্তার—ইউ পোস্টমাস্টার—ত্থাট—এ্যাজ ইন দি পোস্টাল ল—এ্যাণ্ড এ্যাজ ইন দি পেনাল কোড—অল লেটারস—রেজিস্টার্ড লেটারস—মনি অর্ডারস ইনসিওরস এ্যাড্রেসড এ্যাজ ইন দি নেম অব নিউজিল্যাণ্ড কোল কোম্পানী—এ্যাজ ইন দি নেম অব ইস্ট রায় ডি কলিয়ারী—এ্যাজ ইন দি নেম অব পিওর রায় ডি কোল কোম্পানী—এ্যাজ ইন দি রেজলুশন অব দিজ কোম্পানীজ শুড বি গিভন টু শ্রীআর্যকুমার রায়। এই 'এ্যাজ ইন দি'র সুতোয় গাঁথা একটি বক্তৃতা। এটি আর্যকুমার নিত্য পোস্ট আপিসে এসে একবার আউড়ে যাবে। এবং শেষে চাইবে—কি আছে দাও। থাকে না কিছুই। তখন এখান থেকে থানায় গিয়ে একবার এই বক্তৃতাই করবে। তার

সঙ্গে থাকবে—এখানে পোস্ট আপিসে একটি ষড়যন্ত্র রয়েছে। যার জন্য তার প্রাপ্য চিঠিপত্র সব এরা দিচ্ছে ব্যানার্জি বাবুদের। নিশ্চয় ভাগাভাগি আছে। অবিলম্বে পোস্ট আপিসের পোস্টমাস্টার পিওন এমন কি রানারদের পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হোক।

তারপর গিয়ে বসবে নিজের বৈঠকখানায়। বিড়বিড় ক'রে বকবে, এবং রাস্তায় ভদ্রজন যাকে দেখবে—ডেকে বলবে—একবার থিয়েটার করুন। আমার বইটা খুব ভালো হয়েছে। আপনাব একটা পার্ট আছে।

অবস্থান্তরের জন্য ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার জন্যও দায়ী এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

আশু ডাক্তার ডাকবিলিব দরজায় দাঁড়ালে এবং বললে—রোজ কি ভাল লাগে! কতক্ষণ আরম্ভ করেছে? শেষ হ'তে দেরি কত?

ডাক্তারের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দরজায় ঝুঁকে প্রায় ঠেলে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে।

—একটু সরুন।

ডাক্তার ঠেলা বা ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তের জন্য আধুনিকা মেয়েদের উপর বিরক্ত হল—নাঃ, এরা বড়ই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। কিন্তু তার ভাবনাটা শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে—টেলিগ্রাফ কখন থেকে হবে? কাউণ্টার কটার সময় থেকে খুলবে?

ডাক্তার কণ্ঠস্বর শুনে ঝুঁকে তার মুখের পাশটা দেখে সবিস্ময়ে বললে—নেলি?

গোপাল চৌধুরীর মেয়ে নেলি। নেলি নিজে পোস্ট আপিসে,—টেলিগ্রাম করতে এসেছে! —মুহূর্তে প্রশ্ন বেরিয়ে এল মুখ থেকে—টেলিগ্রাম! বাবা কেমন আছে?

—ভালো। তারপরই বললে—সেই রকমই বিড়বিড় করে বকছে।

—ও ক্রমে ভাল হবে। কিন্তু তুমি নিজে এসেছ পোস্ট আপিস। টেলিগ্রাফের সময় জানতে চাচ্ছ! ব্যাপার কি?

—কিছু নয়। দুটো টেলিগ্রাম করব।

—আরজেণ্ট না অর্ডিনারী? আরজেণ্ট হলে এখনি হবে।

—দুটোতে কত লাগবে?

—যা লাগুক, ভাবতে হবে না তোকে, দে আমাকে দে। নতুন কণ্ঠস্বর। পিছন থেকে বললে কেউ।

আর কেউ নয়—নেলির জ্ঞাতি কাকা। নিত্য চৌধুরী।

—আয় আমার সঙ্গে বাইরে আয়। ডাক্তার একটু এস তো ভাই। একটা টেলিগ্রাম ছকতে হবে। আমাদের তো বিদ্যে সেই সে আমলের ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত। তাও বসে বসে—না-পড়ে সব ভুলে মেরে দিয়েছি। এস।

বাইরে এসে নিরিবিলি একটা কল্কেফুল গাছতলায় দাঁড়িয়ে—নিত্যবাবু টেলিগ্রামের খসড়াখানা নিয়ে ডাক্তারের হাতে দিলে।

'শুভেন্দু ফ্লেড ফ্রম হোম—ক্যাচ হিম—ইফ হি গোজ টু ইউ। প্লিজ! এ্যাণ্ড ওয়্যার।

গোপাল চৌধুরী।'

আশু সবিস্ময়ে নিত্য চৌধুরীর মুখের দিকে তাকালে। সে দৃষ্টি তার সপ্রশ্ন। প্রশ্নটি মুখে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে। কোথায় যেন একটা কিছু রয়েছে। যাকে যুক্ত করা যায় ওই অমর চক্কোত্তির পালিয়ে আসা কন্যাটির সঙ্গে। ফ্রেন্ড কথার মানে কি তা নইলে?

নেলী মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে গর্ত করতে চাইছিল। সেকাল হ'লে স্বচ্ছন্দে ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারত – মনে মনে বলছে—মা ধরিত্রী গহ্বর বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস কর, আমি লুকিয়ে বাঁচি। কিন্তু সে যখন ঘরের দেওয়ালের আত্মগোপনের আশ্রয় পরিত্যাগ করে এই সংবাদ 'তারে-তারে' দিগ্‌দিগন্তে ছড়াতে এসেছে—তখন ওকথা অচল।

নিত্য চৌধুরী বললে—দেখো না, বিপদের ওপর বিপদ! দাদার ওই অবস্থা আর শুভেন্দু পালিয়েছে। কাল সিউড়ি গিয়েছিল—জমিদারের কম্পেনসেশনের আড়াইশো টাকা পাবার দিন ছিল। আজ সকালে ফিরবার কথা। আমার কর্মচারী মিশ্রও গিয়েছিল সিউড়ি। তার হাতে দেড়শো টাকা আর এক চিঠি খামে ভ'রে দিয়ে বলেছে—আমি একবার কলকাতা যাচ্ছি। বলবেন বাড়ীতে। চিঠিতে লেখা—ভাগ্যের সন্ধানে আমি বাহির হইতেছি—আমার জন্তে ভাবিবেন না। ভাগ্য ফিরাইতে পারিলে ফিরিব। নইলে মৃত্যুকালে শক্তি থাকিলে সংবাদ দিব। সুখেন্দুকে ভাল করিয়া পড়িতে বলিবেন। ইতি শুভেন্দু।

অবাক হবার কিছু নেই। শুভেন্দু থিয়েটার-পাগলা—ওই পাগলামীতেই পাশ করতে পারে নি। কিন্তু এদিকে কোন বদখেয়াল অভদ্রপনা তার ছিল না। ডাক্তার থেকে পাঁচ বছরের জুনিয়ার ছিল ইস্কুলে। বয়সে বছর তিনেকের ছোট। ডাক্তারদের সময়ে ইস্কুলের অভিনয় টিমে ওই ছিল হিরো। সে তাকে ভাল ক'রেই জানে। তার স্বপ্ন ছিল—সে সিনেমায় নামবে —কলকাতার থিয়েটারের অভিনেতা হবে। চেষ্টাও এর মধ্যে কম করে নি। ডাক্তার যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, তখন সে কলকাতায় গেলে তার হোস্টেলে যেত এবং গল্প করত— কোন্ কোন্ স্টুডিয়োতে গিয়েছিল - কার কার সঙ্গে দেখা হ'ল। কে কি বললে—সেইসব কথা। শেষ একবার বলেছিল—নাঃ! ও আর হল না। বুঝলি আশু!

সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন রে?

—কাল যা দেখলাম ভাই! আর শুনলাম! নাঃ—!

—কি দেখলি রে—কি শুনলি!

শুভেন্দু বলেছিল—সে কাল গিয়েছিল ইউনিভারসিটি ইনস্টিস্টুটে বড় একজন অভিনেতা ডিরেক্টার সিনেমার গল্পকারের স্মৃতিসভায়। সভাপতি ছিল—তাদেরই শ্যামাকিংকরবাবু। আর বড় বড় ডিরেক্টার সিনেমাস্টাররা ছিল প্রধান অতিথি বক্তা—উদ্বোধক এইসব। সভার শেষে সে শ্যামাকিংকরবাবুর সঙ্গে দেখা করবে এই মতলবে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। সভায় সিনেমাস্টার ডিরেক্টাররা শ্যামাকিংকরবাবুকে যে খাতির দেখিয়েছিল, তাতে তার ভক্তি বেড়েছিল শ্যামাকিংকরবাবুর উপর। এবং বুঝতেও পেরেছিল যে শ্যামাকিংকরবাবু যদি ভাল ক'রে বলেটলে

দেন—তবে নিশ্চয় সে পাট পাবে। ফিল্মেও পাবে—থিয়েটারেও পাবে। গেটের পাশে ভিতরে বাইরে লোকে জ্যাম করে দাঁড়িয়ে গেছে। ফিল্ম-ডিরেক্টারেরা বের হয়ে গেল—যেতে দিন—যেতে দিন। তাদের যেতে দিল—তবুও কাউকে বললে—ওরে—'রাধা'র বাবা যাচ্ছে রে। মানে রাধা ছবির ডিরেক্টার। কাউকে বললে—'বড় বউ'য়ের শ্বশুর যাচ্ছে। তারপর এক এক ফিল্ম অ্যাক্টর বেরোয় আর হৈ-হৈ ওঠে।—হা—! অমুক! ও দাদা! দাদামনি হে! এই যে—প্রেমের ঠাকুর! ও—কালাচাঁদ! শেষকালে এল—সব থেকে বড অ্যাক্টর। সে যেন ফুটবল ম্যাচে গোলে বল ঢুকে গেল!—এ—ই! তারপর সে যেন আমাদের দেশে নন্দোৎসবের নৃত্য। তিনি প্রথমটা হাসিমুখে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। নমস্কার করলেন। বললেন—যেতে দিন দয়া ক'রে। কে কার কথা শোনে—? কেউ বলে—দাদা। কেউ বলে—ভাই ও ভাই। কেউ বলে—ও মানিক—কেউ কোন বইয়ের নায়কের নাম ক'রে ডাকে। কেউ গান ধরে দেয়—যে গান ছবিতে তার মুখে শুনেছে। তিনি এবার একটু কড়া সুরেই বললেন—এ কি? যেতে দিন! রাস্তা দিন।—পথ ছাড়ুন। বাস—আর একখানা বল ঢুকলো গোলে।—রেগেছে। একজন এগিয়ে গিয়ে তার জামার হাত ধ'রে টানে, সঙ্গে সঙ্গে কেউ টাই ধ'রে, কেউ কোটের পিছন চেপে ধরল। এরপর কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু এই সময় বেরিয়ে এলেন শ্যামাকিংকরবাবু। সঙ্গে আরও কয়েকজন নামকরা লোক। তাঁরা এসে হাত জোড করে বললেন—পথ দিন। যেতে দিন। তারা শান্ত হল—পথ দিলে। যারা নাচছিল তারা আর একরকম হয়ে গেল। ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে পথ পেয়ে অ্যাক্টর ভদ্রলোকও বেরিয়ে গেলেন। এঁরা গাড়ীতে গিয়ে চড়লেন। চলে গেলেন। কিন্তু অ্যাক্টর ভদ্রলোকের পিছনে লোকে ধাওয়া করলে তাঁর গাড়ী পর্যন্ত। ইনি শ্যামাকিংকরবাবুর থেকে অনেক জনপ্রিয়। অনেক। অনেক। কিন্তু—।

ঘাড নেড়ে শুভেন্দু বলেছিল—ভালবাসা প্রেম হলে রাহুর প্রেম। গিলে খায়। রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে—তোমার প্রেমে আঘাত আছে নেইকো অবহেলা। এদের ভাগ্যে দেখলাম প্রেমের সবটাই যেন অবহেলা না হোক, ব্যঙ্গ-কৌতুকে ভরা। শুধু চারজন বাদ। দেখেছি ভাদুড়ী মশাইকে। বাপ রে—কি চাউনি!

একটু থেমে প্রসঙ্গটার অন্য পর্যায়ে এসে বলেছিল—শ্যামাকিংকরবাবুর বাড়ীও গিয়েছিলাম। খুব আদর করলেন। বললেন—কি খবর বল? আমি বললাম—সিনেমায় নামার কথা। তিনি বললেন—দেখ তুমি ভাল পার্ট কর আমি শুনেছি। কিন্তু সেখানকার ভালো এখানকার ভালো তো এক নয়, এটা তো মানবে। তা ছাড়া একটা গোড়ার কথা বলি। বল তো পৃথিবীতে নাচে কে—গায় কে? আমি হতভম্ব হলাম। কি বলছে?—তারপর বললাম—মানুষ? তিনি বললেন—না। নাচে রূপ গায় স্বর—সুস্বর। কুস্বর যার তার গান কেউ শোনে না। আর যার রূপ নেই কুরূপ সে যতই ভাল নাচুক কেউ দেখে না! রূপের দুটো দিক—একটা স্বাস্থ্য—অন্যটা শ্রীসুষমা। তোমার শরীর এমন রোগা, তাতে কোন্ পার্ট করবে। আগে শরীর ভাল কর। আরও কথা আছে। পড়তে হবে। না পড়ে বড়

অভিনেতা হওয়া যায় না। তোমাকে তো চরিত্রটিকে বুঝতে হবে—ক্যারেক্টার অ্যানালিসিস করে। পড়, শরীর ভাল কর। তা ছাড়া আরও একটা কথা বলি—।

ছবির নায়কের ছবির জীবন আর অভিনেতার বাস্তব জীবন এক নয়। মোট কথা —খুব সুখের ক্ষেত্র নয়। ছবিটা হয়তো স্বর্গ— কিন্তু অভিনেতারা মাটির মানুষ।

উত্তর কিছু দিতে পারে নি। ফিরে এসে পথে তার কাছে ওই কথাগুলি বলে বলেছিল।—নাঃ, ও আর হল না। বুঝলি আশু।

পরের বছর শুভেন্দু প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়ে পাশ করেছিল। কিন্তু বাড়ীর সামর্থ্যের অভাবে আর কলেজে পড়তে পায় নি। নানান চেষ্টা করেছে। অর্থোপার্জনের চেষ্টা। ব্যবসার যুগ। ব্যবসা করতে চেষ্টা করেছিল এটা ওটা সেটা—কিন্তু সবেতেই ব্যর্থ হয়েছে। কিছুদিন চাষী হবার চেষ্টা করেছিল নতুন মতে। নদীর ধারে চৌধুরীদের অনেক জমি—সেই জমিটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে নদী থেকে জল তুলবার জন্তে মোটর পাম্প কিনে চাষ করেছিল। ছোট একখানা ঘরও করেছিল। সেখানে সারাদিন থাকত। বই রাখত, পড়ত। চাষে ফসলও ফলল। কুমড়ো কপি হল বড় বড়। এখানকার চণ্ডীতলার মেলায় এখন এক্জিবিশন হয়—সেখানে শুভেন্দুর কপি কুমড়ো ফার্স্ট হয়ে সার্টিফিকেটও পেয়েছিল। কিন্তু হিসেবনিকেশে দেখা গেল—টাকার অঙ্কে লোকসান ঠিক না হলেও—পাম্পের দাম যা ইনস্টলমেণ্টে দেবার কথা, সে সব বাকী পড়েছে। সুতরাং—কোম্পানী আদালত মারফৎ নোটিশ করে পাম্প কেড়ে নিয়ে গেল, সময় তিন মাস রইল, যার মধ্যে টাকাটা শোধ করলে, পাম্পটা ফিরে পাওয়া যাবে। বারোমাসের বারশো টাকা তার উপর সুদ আদালত খরচা নিয়ে আঠার শো টাকা। কিন্তু সে টাকা যোগাড় হল না। হয়তো চেষ্টা করলে হ'তে পারতো, কিন্তু গোপাল চৌধুরী সে হতে দিলে না। চাষ করার বিরোধী সে গোড়া থেকেই। গোড়ায় বলত—ওতে কি হবে? চাষা হবি শেষে চৌধুরী বাড়ীর ছেলে।

এখন বললে—যা দিয়েছি যথেষ্ট দিয়েছি। আর এক ছটাক জমি কি গহনা আর আমি দেব না। বারো-চৌদ্দ বছর লেখাপড়া শিখে শেষে চাষ। চাষা হবি তো লেখাপড়ার কি দরকার ছিল?

ইদানীং মোক্তারী পরীক্ষার জন্তে তৈরী হচ্ছিল শুভেন্দু। গোপাল চৌধুরী তাতেও খুশী হয় নি। বলত—ওতে কি হবে! চামচিকে পক্ষী হয়? দূর!

তবে?

তবের উত্তর গোপাল চৌধুরী দিতে পারে নি। সে উত্তর জানে না। তবে একটি কথা জানত, বলত—ভগবানকে ডাক। তিনি পথ দেখাবেন। আমি কি করে বলব?

এই ঘটনার পর কিন্তু চৌধুরীর ও কথাগুলোও পালটে গেল। সে স্ত্রীর মুখের সামনে হাত নেড়ে বলেছে—কচু – কচু—কচু। ধর্ম—দেবতা—ভগবান—বাজে—মিছে—কচু।

শুভেন্দু সেই কারণেই ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছে।—হয়তো ভগবানই পথ দেখিয়েছেন! বিচিত্র!

নিত্য চৌধুরী আশু ডাক্তারকে বললে—এইটেই গুছিয়ে লেখো টেলিগ্রাম। নেলি ইতিমধ্যে একটা খসড়া এগিয়ে দিলে। নিত্য চৌধুরী জিজ্ঞেস করল—ওটা কে লিখলে রে নেলি? তুই?

নেলি তেমনি মাটির দিকে মুখ করেই পায়ের নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে—আমি আর সীমা।

—সীমা? অমর চক্কোত্তির মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—সে কিছু জানে নাকি কোথায় গিয়েছে? জানেটানে কিছু? তাকে চিঠিটিঠি দিয়েছে নাকি?

—না, সে কিছু জানে না। আমি জানি সে জানে না। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব।

—কোথা কোথা টেলিগ্রাম করবি?

—মামার বাড়ী—কলকাতায় মেজদার কাছে।

—মানে রঞ্জনের কাছে? হ্যাঁ, তা যেতে পারে।

রঞ্জন নিত্য চৌধুরীর ছেলে—ডাক্তারী পড়ে।

নেলি বললে—আর—

নিত্য জিজ্ঞাসা করল—কে?

—শ্যামাকিংকরবাবুর কাছেও যেতে পারে।

—পারে। ঠিক ঠিক! তা লেখো ডাক্তার। ফর্ম আনি তিনটে।

লিখতে লাগল ডাক্তার।—বল, ঠিকানা বল নেলি। আমি শ্যামাকিংকরবাবুরটা লিখে নিচ্ছি। ক্যালকাটা টু। শুভেন্দু মিসিং। ডিটেন ইফ গোজ টু ইউ। ওয়্যার—কার নাম দেব? গোপালবাবুর?

—না, কাকার নাম দাও।

—তাই ভাল। টেলিগ্রামের উত্তর এলে তোমার বাবার মাথা খারাপ হবে।

ডাক্তার দ্বিতীয় ফর্ম টেনে নিলে। কি বললে—ঠিকানা বলুন—

—রঞ্জন চৌধুরী—মেডিকেল কলেজ হোস্টেল—লেখো।

ডাক্তার তখন থেমে গেছে। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে—যেন সাধারণ যা দেখতে পায় না তেমনি কিছু সে দেখতে পেয়েছে। একটি স্মৃতির টুক্‌রো ছবি হয়ে সামনে ভেসে উঠেছে। মনে পড়ে গেছে একটা কথা। এই তো আট মাস আগে। সবে তখন পাম্পটা কেড়ে নিয়ে গেছে কোম্পানী; শুভেন্দু বেকার হয়েছে, সেই সময় একদিন তার ডাক্তারখানায় বসে খুব হাসতে হাসতে বলেছিল—বলেছিল - বল্‌ তো আশু, সত্যিই পটাসিয়াম সাইনাইডে যন্ত্রণা হয় না? আর ধর অন্য বিষে যখন অজ্ঞান হয়ে স্পাজ্‌ম্‌ হয় তখন যন্ত্রণা-বোধ থাকে?

শঙ্কিত হয়ে আশু বলেছিল—কেন? এ খোঁজ কেন? খাবি-টাবি নাকি?

—তুই বল্ না।

—না। কিন্তু হল কি বল ? প্রেম ?

—দূর ! প্রেম-ট্রেম দূর অস্ত। ভাবছি বেঁচে কি করব।

—ভাবিস নে। অবস্থা ভাল হবে—বিয়ে হবে—

—দূর ! ওইটুকুতে কি হবে ?

—তবে পলিটিক্স কর্, মন্ত্রী হবি।

—ভাগ—পুরনো আমলে পলিটিক্স করে সুখ ছিল, ফাঁসী গিয়ে আত্মহত্যা করে শহীদ হওয়া যেত। এ আমলে যে সে সব গোলমাল হয়ে গেল। পলিটিক্সে মরা বড় কথা নয়, মারা বড় কথা। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই—এ কথাটাই বাজে হয়ে গেল। লক্ষপতি কোটিপতি হলেও লোকে গাল দেয় বড়লোক বলে। টাকাপয়সায় রোমান্স নেই। একমাত্র প্রেম করে মরা যায়। তাই বা তেমন প্রেমিকা কই ? আমি এতদিনে আত্মহত্যা করতাম। করি না কেন জানিস ?

—কি করে জানব—তুই না বললে।

—ওই যে কাগজে লিখবে—শুভেন্দু চৌধুরী দুঃসহ বেকার জীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন—ঐ জন্যে। মরবার মত একটা রোমান্স নেই যে একালে প্রেম আর বেকার যন্ত্রণা বাদ দিয়ে। যদি মরি আমি তবে ওই জন্যেই মরব। লিখে যাব—মরিবার মত রোমান্স নাই বলিয়াই আমি মরিতেছি। বুঝলি ?

সেদিন সবটাই পরিহাস বলে মনে হয়েছিল। আশু বলেছিল—একসেলেণ্ট হবে। খুব সেনশেসন হবে। এবং সত্যিই তোকে শহীদ বলবে লোকে।

কথাটা পরিহাসের তাতে সন্দেহ ছিল না সেদিন।

তারপর মনে পড়ল—শুভেন্দুর মুখ; যেদিন সে তার বাবাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় এসেছিল গাড়ী করে।

সে তাকে তিরস্কার করেছিল—নিয়ে এলি কেন তুই ? আমাকে ডাকলি নে কেন ?

শুভেন্দু ম্লান হেসে বলেছিল—আনলাম। একটু হেসে আবার বলেছিল, কথাটা তো চাপা থাকবে না।

—সে থাক আর না থাক তুই আমাকে খবর দিয়ে দেখলি নে কেন ? দেখ তো ভিড়।

—সে ঝগড়া পরে করবি। এখন দেখ।

তারপরই সে বেরিয়ে এসে দরজার বাজুতে ঠেস দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোপাল চৌধুরীর মাথায় কয়েকটা চেলা কাঠির কুচি পাওয়া গিয়েছিল। বেঁধে দিয়ে সে শুভেন্দুকে বলেছিল—না রে, এনে ভালই করেছিলি। এখানে আনায় অনেক সুবিধে হল।

শুভেন্দু উত্তর দেয় নি। কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল।

সেই কথা মনে পড়ে ডাক্তারের কলম থেমে গেল।

নিত্য চৌধুরী বললে—কি হল ডাক্তার? লেখ।

—লিখছি। সে খস খস করে লিখে গেল। রঞ্জনের ঠিকানা সে জানে। সে ডাক্তার, রঞ্জন মেডিকেল স্টুডেণ্ট। সেখানে শুভেন্দু যাবে না। জীবনের প্রতিযোগিতা তার খুড়োদের সঙ্গে বটে—কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী তার রঞ্জন! থাক, সে কথা বলে কাজ নেই।

—বলুন এবার মামার বাড়ীর ঠিকানা।

—বল নেলি।

১৩

শুভেন্দুর খোঁজ কোথাও পাওয়া গেল না। সকল জায়গা থেকেই জবাব এল—দুখানা টেলিগ্রামে একখানা পত্রে। পত্রখানা মামার বাড়ীর। সব জায়গার এক খবর—না—শুভেন্দু আসে নি। গোপাল চৌধুরী শুনে খুব বেশী চেঁচামেচি করলে না। কপাল ভাল, ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে আসছে। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে ভুল হয়ে যায়। নাম ভুল হয়, দশটা কথা বলতে গেলে দুটো তিনটে কথা অসংলগ্ন হয়ে যায়। আশু বলেছে এবং যোগপুরের ধ্রুব ডাক্তার বলেছে ও একটু-আধটু থাকবে। তবে সাবধানে থাকতে হবে।

চৌধুরী চটে উঠল কথাটা শুনে—। জেনেশুনে মরবার জন্যে কেউ অসাবধান হয় নাকি। ডাক্তারগুলোর কি বুদ্ধিসুদ্ধি নেই?

—না। কোন বুদ্ধি নেই ওদের। ওরা ঘোড়ার ঘাস কাটার উপযুক্ত। তা ভগবানের অবিচার। ওদেরই দালান-কোঠা হয়! আর বুদ্ধিমানেরা ওদেরই ডেকে দু টাকা ষোল টাকা ফি দেয়।

চৌধুরী বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় যেন লাফ দিয়ে উঠতে চাইলে। কিন্তু খচ্ করে কোমরে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করে কাতরে উঠল—ওরে বাবা রে। ওরে বাবাঃ রে।

নেলি ছুটে গেল—কি হল বাবা? মাথায়—

—না—না—না। কোমরে! কোমরে! কোমরে রে!

—কি হল?

—শিরা—শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে রে।

—টিপে দি।

—দে। দে।

কিছুক্ষণ পর যন্ত্রণা কমে এলে চৌধুরী কাতর আক্ষেপে বললে—এ কি বিপদ হল বল দেখি! আশ্বিন মাস, সামনে পূজো, ধান উঠবে। আখ কাটা আছে। মাড়াই করতে হবে, শাল বসেছে। ও দিকে মাঠ থেকে ধান চুরি যাবে। এখন আমি যদি উঠতে না পারি—।

ওঃ—এমন শত্রু পুত্র মানুষের হয়? কখনও—কখনও তোমার দুর্ভাগ্য ঘুচবে না—ঘুচবে না—ঘুচবে না।

—কি বলছ? আর্তস্বরে তিরস্কার করলে চৌধুরীগিন্নী।

—কি বলব বল? ভুলটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছে চৌধুরী। ভাঙা গলায় পরমুহূর্তে বললে—অনেক দুঃখে বলছি। তার জন্যে তো নেহাৎ কম করি নি। ছেলেবেলায় কত ভেবেছি—আমি পারলাম না—আমার শুভেন্দু পারবে—বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে। ওই ছোটটা—সুখেন্দুটার জন্য কতটুকু করেছি? নেলির বিয়ে দিতে পারছি নে। তার তুলনায় শুভেন্দুর কত করেছি তুমি বল। আজ সে পালাল। কি? না ভাগ্যের সন্ধানে। আমার ভাগ্য! আমাকে এই শরীরে যেতে হবে এবং কোনদিন মাঠের উপর উপুড় হয়ে মরে পড়ে থাকতে হবে।

নেলি বললে—ভেবো না বাবা, আমি যাব মাঠে, গিয়ে পাঁজা গুনে আসব। পাঁজা গোনা আমি জানি। আর মা খামারে ধান ভাগ বুঝে নেবে।

এবার আর চৌধুরীর সহ্য হল না। হাত নেড়ে ক্ষিপ্তের মত বলে উঠল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা হলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়—চৌদ্দপুরুষ ওপার থেকে ধন্য ধন্য করে। আর ঐ বৃহন্নলাটা ভাদুগান বেঁধে গেয়ে বেড়াক মুল্লুকময়—

ভাদু আমার মাঠে মাঠে পাঁজা গুনে
বেড়াইতেছে—
গোপাল চৌধুরীর হায় মন রসনা—
সৌভাগ্যটা একবার দেখে যাওগো।

চৌধুরীগিন্নী যে চৌধুরীগিন্নী বিরস বিষণ্ণ বদনা বলে প্রসিদ্ধা তিনিও গান শুনে হেসে ফেললেন স্বামীর কবিত্বশক্তি এবং সঙ্গীত-পারঙ্গমতা দেখে। নেলিও মুখ ঘুরিয়ে হাসছিল। চৌধুরী চটে গিয়েই বললে—হাসছ যে?

চৌধুরীগিন্নী বললে—তোমার ছড়ার বাহারে আর সুরের মাধুরীতে।

এবার নেলি খিল খিল করে হেসে উঠল—আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না।

চৌধুরীও হেসে ফেললে নিজে। বললে—হাস। তা হাসতে পার। তা—ও হারামজাদী ছড়া বানায় ভাল। ভয় তো সেখানে। কিছু পেলে হয়।

* * *

কথা সত্য। আজ মাসখানেক নতুন ছড়া বাঁধবার মত কোন খবরের সন্ধান পায় নি নসু। ওই যে একদিনে দুটি ঘটনা ঘটে গেছে—তারপর চন্দনপুর যেন ঝিমিয়ে গেছে। সেদিনের ঘটনার একটি নিয়েই নসু ভাদু তৈরী করেছিল—তাও গাইতে গিয়ে সতীশ ঘোষালকে নিয়ে যে বিপদ ঘটেছে তা নসুর কল্পনাতীত। এমন কখনও হয় না। অমর চক্কোত্তি রাগতে পারে—কিন্তু সতীশ ঘোষাল এমন আগুন হল কেন?

নসু বলে—ক্যানো বলো দিকিনি বেয়াই।

ফটিকদাস বলে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে
দিতে নারে সীমা—
কি করে বলিব বল তাহার মহিমা।

—তা বলেছ ঠিক। কিন্তু নোকটি তাই এমন নয়। বুয়েচ? গানে ভারী দখল। আমাকে মধ্যে মধ্যে দেখিয়েছেন। বুয়েচ! গলাটি সরেস নয়। একটু নীরস বিরস বটে, কিন্তু খোঁচখাঁচ যা দেখায় তা বলিহারি। ছড়াও লেখে। কি সব—তোমার ওই সব জজ-ম্যাজিস্টর—হাকিম-হুকিম, ই কে করলে—উ কি করলে তাই নিয়ে। আমি ভাই রসের ভিয়েন জানি—গুড়ের ভিয়েন—লবণ লঙ্কা-মরিচ আদা ই নিয়ে কারবার বুঝি না। তা ভাই পারে তো। সে মানুষ এমন ক্ষেপে গেল। যা গেল। উ ভাদু আমি গাই না। লোকে জিরি-বিরি করে ধরে তখন গাই।

—তা ভাল কর। নতুন ভাদু তৈরী কর।

—কি নিয়ে করব? ঘটল কি? সব যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। তা তুমি তো পট আঁকছ খুব। দেখাও না তো একদিন!

ফটিকদাস শুধু পুতুলই করে না। ও পটও আঁকে। পটুয়ারা কাপড়ের উপর কাগজ সেঁটে লম্বা গুটানো পট আঁকে—ফটিকদাস তা আঁকে না—তবে কাপড়ের উপর দিয়ে সাঁটা কাগজে খাত বেঁধে তাতে তুলি দিয়েই ছবি আঁকে। ছড়াও বাঁধে। এক একটি ছবির তলায় এক-একটি ছড়া। সেও দেখায় না কাউকে। অবশ্য বেয়ান নসুবালা ছাড়া। তারও সময় আছে। রাত্রিকালে পুতুল গড়ার কাজ সেরে ঘরের ভিতর একটি কাঠের পিলসুজের উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ জেলে—চশমা চোখে রঙ তুলি খাতা নিয়ে বসে। নসুবালা সন্ধ্যায় গান-বাজনার মজলিস সেরে বাড়ী গিয়ে ভাদুমণিকে পৌছুতে আসে। বেয়াইয়ের রসিকলালের কাছে তখনই উঁকি মেরে দেখে যায়—তার ছবি আঁকা। সন্ধ্যেবেলা আসরে যে ছড়া বেয়াই বলে—তারই পট আঁকে। সবগুলোর নয়—দুটো চারটের।

সেই আকুটির বাবুর কালে জমি সেলাইয়ের ছড়াটির পট লিখেছে। সে দেখেছে নসু। খাসা হয়েছে। সেই থলথলে ভুঁড়ি—সেই টাক—সেই ফোকলা মুখে সামনে একটি দাঁত—সেই শুকনো ভাইপোটি সব ঠিক। ছড়া শুনে কোট পেণ্টুল পরা সাহেবের সেই ছানাবড়া করা চোখ সব অবিকল!

ফটিকদাস বললে—বেয়ান, যে কাণ্ড তোমাকে নিয়ে হল তাতে ছবি আঁকাই ছাড়তে হয়। তা তো ভাই পারি না। উটি আমার নেশা। চণ্ডুর নেশার মতন। তা ভাই তোমাকেও দেখাই না—। চামড়ার মুখ তো—লোহার তো নয়। কোথা ফসকে কাকে বলবে—বিপদ হবে।

নসুবালা বললে—উঠলাম ভাই।

—কেন? রাগ হল?

—রাগ? বাবারে—তুমি ছেলের বাপ—আমি মেয়ের মা। রাগ করতে পারি? পায়ে মাথায় সমান হয়?

—তবে অভিমান?

—অভিমান! রসের নাগর আমার আচ্ছা বেহায়া তুমি। বদ মতলবী মানুষ কোথাকার, এই বয়েসে আমার কপালে কলঙ্ক দেবা তুমি! আমার মান ভাঙাবে! তোমার বষ্টুমী খুঁজে আনোগা—এনে মানভঞ্জন কর।

—তবে কি করব বল!

—ক্ষমা চাও। বল এমন বাক্যি বলব না!

—বলব না।

—গোপন কিছু রাখব না।

—গোপন কিছু রাখব না।

—বেশ—তা হ'লে—দেখাও।

—দেখ।—এই দেখ আকুটির বাবু। ফাল দিয়ে জমি সেলাই।

—চমৎকার হয়েছে। মেডেল পাবা। উ দেখেছি।

—তা পরেতে—এই দেখ তোমার—সতীশ ঘোষালের বক্তিমে।

—হুঁ। ভাল! বেশ ডেলা পারা করেছ চোখ ছুটো। ওঃ, হাতের আঙুলটা আকাশ বাগে তীরের খোঁচার মতন হয়েছে।

—এই তুমি।

—হ্যাঁ। তাই তো বটে। এই—আমি! তার পরেতে এটা কি হে? ই যে অনেক নোক। ও বাবা! কে গো। এই—স্থাকো। গো বলে ফেললাম। গা—গা। হ্যাগা! এ কে?

—ই সব সেই ইনকিলাব জিন্দাবাদ! কৃষি ঋণ আদায় চলবে না—চলবে না—চলবে না—

ঋণ আদায় করিলে ধান—ফলবে না—

ফলবে না।

ইনি হলেন সেই ভোট পাওয়া বাবু।

—আচ্ছা। এই বুঝি ঝাণ্ডা! হ্যাঁ। তা পরেতে এটা? এও যে অনেক লোক গা? আবার কবে—লাল ঝাণ্ডা এয়েছিল?

—উহুঁ। এ তেরঙ্গা হে। দেখতে পাচ্ছ না?

—তেরঙ্গা? হ্যাঁ এই তো তিন রঙ। তা এ কোন্ রঙ্গ—তা বল? অ—হ—হ। ভবানীবাবুর বোরো ধানের মিটিং। হ্যা—হ্যা বটে তো। এই বুঝি ভবানীবাবু?

—হ্যা—। শোন—

কৃষি ঋণের আদায় বন্ধ আনন্দে সব

লাগাও বোরো ধান—
তেরঙ্গা ঝাণ্ডার পাণ্ডার কথা কর অবধান।
লাল ঝাণ্ডা মেছোদের দিকে।
চাষীর বন্ধু তেরঙ্গা—
ভাত আগে না মাছ আগে—জিজ্ঞাসা করেঙ্গা।

—ভাল ভাল রে বেয়াই আমার রসিকলালের বাবা।

নম্বুবালা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

॥ ১৪ ॥

শুভেন্দু বর্ধমান-স্টেশনের থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুমে বসেছিল। রাত্রি তখন প্রায় তিনটে। তিনটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে ভাগ্য অন্বেষণের পথে। ভাগ্যকে ফেরাতে পারলে ফিরবে। না পারলে এই বৃহৎ পৃথিবীর জনতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দেবে। বাড়ী আর সে ফিরবে না। হারিয়ে যাবার পথ অনেক! অনেক পথ। তার মধ্যে সে দুটো পথ বেছে রেখেছে। গেরুয়া পরে মাথায় জটা তৈরী করে দাড়ি গোঁফ রেখে হারিয়ে যাওয়া। অথবা পাপ করে পাপী হয়েও হারিয়ে যাওয়া। দুটোর একটা। হয় সন্ন্যাসী নয় ক্রিমিন্যাল। তবে প্রথমেই সে চেষ্টা করবে—তার বাবার জীবনে বাবার কর্মদোষে হারিয়ে ফেলা তাঁদের বংশের সেই পুরনো ভাগ্যের সাচ্ছল্য এবং গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে।

সে বুঝতে পারছে তাদের বৈষয়িক অবস্থার অবস্থান্তরের মধ্যেই সে ভাগ্য তাদের হারিয়ে গেল। চোখের সামনে পুকুরের জলে একখানা রূপোর থালার মত পিছলে খানিকটা তেরছা ভঙ্গিতে তলার দিকে ভেসে গিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লক্ষ্মী নাকি চঞ্চলা তার অনেক গল্প সে শুনেছে। গল্প শুনতে হবে কেন, তার অনেক প্রমাণ তো তার চোখের ওপর। তার পিতৃপিতামহের ভাঙা বাড়ীই তার প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে তাদের গোটা বংশটার ওপর মৃত্যুদণ্ডের মত। মুঘল নবাবী আমলের জমিদার তারা, খেতাবে চৌধুরী এককালে একটা পরগণা জায়গীর পেয়েছিল। গোটা গ্রাম জুড়ে চৌধুরীদের পাকা বাড়ী। কালক্রমে সবই ভাঙ্গা আর ফাটা—ফাটা আর ভাঙাতে পরিণত হয়েছিল। পুরনো ভাঙ্গা বাড়ীগুলোর প্রত্যেকটিরই এক একটা অংশ পরিত্যক্ত। তা বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। সাপ খোপের বাসা হয়েছে। নিত্যই দু-দশখানা ইট ভেঙে খসে পড়েছে। কোন কোন দিন অকস্মাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ তুলে খানিকটা ছাদ বা একটা খিলেন বা একটা পাঁচিলের আধখানা কি গোটাটাই ভেঙে পড়ে। তার থেকেও ভয়ানক হয়ে আছে সকল চৌধুরী বাড়ীর সাজার চণ্ডীমণ্ডপের সামনে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু পঙ্কের কাজ করা তিন-খিলেনের ফটকটা। সেটা আজও দাঁড়িয়ে আছে,

ফেটে চৌচির হয়ে গেছে তবুও আছে। শরিকরা আজও পর্যন্ত ওটাকে ভাঙবার জন্ত একমত হতে পারলে না। সকলেই বলে—থাক থাক—যতদিন আছে—ততদিন থাক। চৌধুরীদের সবই তো গেছে—ফাটাফুটো হয়েও ওঁইটেই যা আছে। ওই দেখেই মানুষ অবাক হয়ে বর্তমানে ভিত্তিহীন চৌধুরীদের মুখের দিকে তাকায়। ওই ফটক দিয়ে একদা হাতীর পিঠে হাওদার উপর রঙীন ছত্রতলে বসে চৌধুরী বংশের কুলদেবতা শ্যামচাঁদ স-সমারোহে বনভোজনে যেতেন। ওই ফটক দিয়েই রথযাত্রার সময়ে শ্যামচাঁদের কাঠের রথ 'বের হ'ত—; ওই ফটক দিয়ে চৌধুরী বাড়ীর ছেলে বউ, মেয়ে-জামাই চতুর্দল চড়ে বাড়ী ঢুকত। আজও যে চৌধুরী বাড়ীরই ছেলেমেয়ের বিয়ে হোক—সে বিয়ে হয় ওই শ্যামচাঁদের নাটমন্দিরে এবং আজও ওই খিলেনের তলা দিয়েই চতুর্দলের বদলে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গিয়ে হয় গরুর গাড়ীতে নয় পাল্কীতে নয় সাইকেল রিক্সায় গিয়ে চাপে। ওদের মধ্যে যে দু'এক ঘরের অবস্থা ভাল আছে তারা এখন রেলস্টেশন থেকে মোটর ট্যাক্সি ভাড়া করে আনে।

কোন্ দিন হয়তো কোন নতুন বর ক'নে এবং তার সঙ্গে কোন চৌধুরী বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মিছিলের মাথায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে খিলেনটা, হয়তো সকলেই শেষ হয়ে যাবে। সেকথা সকলেই বোঝে—মুখে বলেও সকলে—কিন্তু ভাঙতে মত কেউ দেয় না। বলে, থাক। পড়বে, যেদিন পড়বার সেদিন আপনিই পড়বে। তাতে যদি কারুর চাপা পড়ে মরাই নিয়তি-নির্দেশ হয়, তো—তারা তাই মরবে।

শুভেন্দুর ঝপ্ করে মনে পড়ে গেল—সেদিনের কথা। যেদিন তার পৈতৃক গ্রামের বর্তমান কালের উঠ্তি কুবের—রাইস মিলের মালিক দে মশাই তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে-ছিলেন সে দিনের কথা। বাবা তাকে বলেছিলেন গুরুঠাকুর! ভ্রম হয়েছিল বাবার নিশ্চয় কিন্তু এমন ভ্রমেরও মানে আছে। কারণ বাবা তাকে বলেছিলেন—বিচার করুন। দেখুন কেমন করে আমাকে মেরেছে! প্রতিবিধান করুন। ঈশ্বরকে ভগবানকে বলুন।

দে মশাই অপ্রতিভ হয়েছিলেন মনে মনে—কিন্তু অসন্তুষ্ট হন নি। এবং বেশ গুছিয়ে সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন। এসব ছাড়া আরও কিছু আছে। সেটা লক্ষ্য করেছিল শুভেন্দু। তাদের সেই পুরনো আমলের বাড়ীখানার দিকে দে মশাইয়ের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার কথা মনে পড়ছে শুভেন্দুর। চোখে বিস্ময়ের কথা মনে পড়ছে। সম্ভ্রমের কথা মনে পড়ছে।

বলেছিল—'কালস্য কুটিলা গতি।'

কালের গতি কুটিল এ সকলেই জানে। এক পড়ে, এক ওঠে—এক কূল ভাঙে অন্য কূল গড়ে এ নিয়ম সনাতনই বটে। কিন্তু এ এক আশ্চর্য কাল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। যখন হ'ল তখন সকলেই খুব খুশী হয়েছিল। ইংরেজের সাম্রাজ্য গেল। দেশের রাজা-মহারাজা—নিজাম নবাব সুলতানদের রাজ্য গেল—তাতে আশ্চর্য একটা আনন্দ উল্লাস অনুভব করেছিল শুভেন্দু। শুধু শুভেন্দু কেন—শুভেন্দুর বাবাও করেছিল।

তারপর জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাশ হল। তখনও খুব খুশী হয়েছিল শুভেন্দু। তারাও

জমিদার—তাদের জমিদারি গেল—কিন্তু তাতে খুব দুঃখিত হয় নি শুভেন্দু, যা হাঙ্গামার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল—এই জমিদারির লাট বা রেভেন্যু চালানো এবং প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় করা; তাতে জমিদারি গেছে বেশ হয়েছে। তাছাড়া তাদেরই জ্ঞাতি—ধনী জমিদার রায়-চৌধুরীদের এই এলাকার পনেরআনা জায়গা জোড়া মালিকানার একাধিপত্য গেল—এইটেই হয়েছিল বড় সান্ত্বনা।

তার বাবার অভ্যেস—উবু হয়ে বসে গড়গড়ায় কাঠের নল লাগিয়ে তামাক খায়। সেইভাবে বসে তামাক খেতে খেতে বাবা বলেছিল—উঁহু-উঁহু—ওরা ঠিক থাকবে! যেতে আমরাই গেলাম। ওদের যে টাকা আছে—কলকাতায় ব্যবসা আছে—ওরা যাবে না।

বাবার কথা মিথ্যে হয় নি। রায়চৌধুরীরা তাদের দশরাত্রির জ্ঞাতি—তাদের পুরনো কালের সম্পত্তির অংশীদারও বটে—তারা যায় নি। তারা নতুন করে ভিত গড়েছে। তাদের ব্যবসা আছে লোহার কারখানা আছে—কয়লার খনি আছে, অভ্রের খনি আছে, সে যেমন ছিল তেমনি আছে—তাতে কেউ হাত দেয় নি—তারই টাকা থেকে তারা নতুন করে দেশের কাজে নেমেছে। হেল্‌থ সেণ্টারের জায়গা জমি দিয়ে—কিছু টাকা দিয়ে হেল্‌থ সেণ্টার করাচ্ছে সরকারকে দিয়ে; বালিকা বিদ্যালয় করাচ্ছে। তারা নতুন করে নাম কিনছে। আগে ওরা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত পোষা পাখী। তারা যা বলাতো তাই বল্‌তো,—যা করতে বল্‌তো তাই করত,—আজ ইংরেজ সরকার নেই,—তারা যাবার সময় পাখীদের পায়ের শিক্‌লি খুলে বা কেটে দিয়ে 'উড়ে যা' বলে ছেড়ে দিয়েছে—কিন্তু ওদের পাখা জমে গেছে—উড়বার শক্তি নেই—যাবে কোথায়—? অগত্যা পায়ের কাটা শিকল বাজাতে বাজাতে কংগ্রেস সরকারের দাঁড়ে এসে—শিস দিয়ে ডাকছে—বলছে—'মথুরারাজের জয় হোক।' 'মথুরাপতি কি জয়।'

সদর সহরে কমপেনসেশন আপিসে দেবোত্তরের জন্য একটা টাকা সরকার থেকে মঞ্জুর হয়েছিল—সেই টাকা আনতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু—আর বাড়ী ফেরে নি। টাকাটার তিনভাগ লোক মারফৎ বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, বাকী সিকি টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে ভাগ্যের সন্ধানে। ভাগ্য তাকে ফেরাতেই হবে।

প্রথম প্রথম দেশের স্বাধীনতা—জমিদারী-উচ্ছেদ সমাজতন্ত্রবাদ শিল্প-বিপ্লব, কৃষি-বিপ্লব সমাজবিপ্লব নিয়ে খুব উৎসাহ পেয়েছিল। উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, বড় জাত-ছোট জাত থাকবে না। বিদ্বান-মূর্খ—গুণী নির্গুণ পুরো ঘোচানো ঠিক যায় না, তবে তফাৎটা সংখ্যার দিক দিয়ে এবং মাত্রার দিক থেকে কমানো যায় বই কি। একটা নতুন দেশ সে কল্পনা করেছিল।

তার কিছুটা হয়েছে। হয় নি এ কথা বলবে না। তবে যা হয়েছে তাতে দেশের মুখ আরও কালো হল। তার বাবা লেখাপড়া শেখে নি, জমিদার বাপের ছেলে; এ অপবাদ ছুটো সত্য, কিন্তু তা ছাড়া তার বাপের আর কোন্ অপরাধ ছিল? নিরীহ মানুষ নিজের লেখাপড়া না শেখা অপরাধের জন্য সঙ্কুচিত লজ্জিত মানুষটি বাড়ীর এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে; নিজের ছেলেমেয়েদের উপরেই তম্বি জুলুম করেছে কিন্তু বাইরের কোন লোকের সঙ্গে কোন বিরোধই কোনদিন করে নি। একটা ব্রাত্য জাতের মানুষ, পেশায় চোর, কাঠ চুরি করার জন্য

তার বাবা তাকে মারতে গিয়েছিল, ধরতে গিয়েছিল—সেটা কি তার অপরাধ! সেই অচ্ছুত জাতের চোরটা তার হাতের জুতো কেড়ে নিয়ে তাকেই মাথায় মেরে চলে গেল অথচ তার সাজা হ'ল না। এই স্বাধীনতা। এই সমাজতন্ত্র!

অন্য-সময় হলে বা অন্য কারুর বাপের এমন অবস্থা হলে—তার অভিমানাহত মনের এমন প্রশ্নের অনেক জবাব দিয়ে—শুভেন্দু তর্ক করত। কিন্তু সে-সব যুক্তি আজ তার মনেই পড়ল না।

আজ তার চোখের সম্মুখে একটা সত্য দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল।

বড়লোক রায়চৌধুরীরা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। জমিদারী নিয়েও তাদের কেউ স্পর্শ করতে পারে নি। নতুন বড়লোক হয়েছে মিলওনার দে। সে দিন-দিন তরাইজঙ্গলের সবল সতেজ শাল গাছের মত হু-হু ক'রে বাড়ছে।

আর নিচে থেকে কাঁটা গাছের ঝোপগুলি সতেজে বেড়ে উঠে তলার দিকটা ভরে তুলছে।

মরছে মাঝারি শাল-সেগুনের দুর্বলগুলি। শুকিয়ে শুকিয়ে মরছে। মরছে তারা। অর্থাৎ মরছে তাদের মত মধ্যবিত্তেরা।

না তা হবে না। সে মরবে না। সে বাঁচবে। তার নিজের সঙ্গে তার বাবাকেও সে বাঁচাবে। তাদের বাড়ীকেও সে বাঁচাবে। দেশ—জাতি জাতীয়তাবাদ দশের মঙ্গল সমাজের মঙ্গল এ-সব, ওই কর্তা যারা তারা করুক। যারা লীডার—তারা করুক। তাকে বাঁচতে হবে। শোধ নিতে হবে। টাকা রোজগার করে প্রচুর টাকা নিয়ে তাকে ফিরতে হবে। তার একটা পথও সে মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছে। সহজ পথ। অত্যন্ত সহজ পথ। অনেক আগেই এই পথ ধরা তার উচিত ছিল। কিন্তু কোথা থেকে যে একটা কিন্তু এসে তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল, তা সে বলতে পারে না। সে কিন্তুটাকে এতদিন কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারে নি। আজ আর তার বাধা নেই। দ্বিধা নেই। সব বাধা দ্বিধা ঘুচে গেছে।

সে ঠিক করেছে সে কলকাতায় গিয়ে সিনেমায় নামবে। স্কুল-জীবনে পূজোর সময় থিয়েটার হতো তাতে সে ছিল হিরো। প্রাইজের সময় সে রেসিটেশন করেছে, সব থেকে ভাল করেছে। শুধু তাই বা কেন? যারা দেখেছে তারা সকলেই বলেছে এমন কি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত বলেছিল এমন রেসিটেশন তিনি শোনেন নি।

কচ ও দেবযানীতে সে কচ আর দেবযানী ছিল সীমা। চিত্রাঙ্গদাতে সে অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা সীমা।

চিত্রাঙ্গদা দেখে তাদের গ্রামের শ্যামাকিঙ্করবাবু তাকে বলেছিলেন—তুমি তো দেখি চন্দন-পুরের অগুরু চন্দন হে! করেছেও বড় ভাল। কিন্তু অর্জুন তোমাকে মানায় নি!

শ্যামাকিঙ্করবাবু শ্যামাকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের খ্যাতিমান মানুষ। কবি নাট্যকার। তাঁর খ্যাতি এখন সারাদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়ানো। কলকাতায়

থাকেন। একদিন গ্রাম থেকে সব ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন ভাগ্যের সন্ধানে।

ওই বড়লোক রায়চৌধুরীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই চলে গিয়েছিলেন। রায়চৌধুরীদের তখন প্রবলতম প্রতাপ—সৌভাগ্যের চূড়া তখন আকাশগায়ে ঠেকেছে। ইংরেজের ঘরে তখন চরম অনুগ্রহের অধিকারী তারা। শ্যামাকিঙ্কর তখন ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মী এবং সাহিত্যিক। দুই পক্ষে একটা না একটা বিরোধ লেগেই থাকত। শেষ পর্যন্ত রায়চৌধুরীরা শ্যামাকিঙ্করের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে গ্রাম ছেড়ে সদরে চলে গেলেন—বলে গেলেন—শ্যামা-কিঙ্করের জন্যে গ্রাম ছাড়লাম। কারণ গ্রামের লোক এ এলাকার লোক শ্যামাকিঙ্করকে চায় আমাদের চায় না। ফলে গ্রামের লোক বিরূপ হল ক্ষুব্ধ হল শ্যামাকিঙ্করের উপর। শ্যামাকিঙ্করও গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। চলে গিয়ে কলকাতায় জীবনযুদ্ধ শুরু করলেন। দেখতে দেখতে পদাতিক থেকে হলেন রথী, রথী থেকে হলেন সেনাপতি, যশ সম্মান তার সঙ্গে অর্থও তিনি পেয়েছেন। আজ শ্যামাকিঙ্কর সর্বজন পরিচিত। এখন মধ্যে মধ্যে আসেন গ্রামে। শুভেন্দুদের প্রতিবেশীও বটেন এবং পিতৃবন্ধুও বটেন। তাছাড়া সম্পর্কে তিনি শুভেন্দুর ভগ্নীপতি। শ্যামা-কিঙ্করবাবু ইচ্ছে করলে অনায়াসে তাকে ছবিতে সুযোগ করে দিতে পারেন। সেবার শুভেন্দু বলেছিল তাঁকে। বলেছিল, আমার পার্ট সত্যি ভাল লাগল আপনার?

শ্যামাকিঙ্করবাবু বলেছিলেন—দেখ তোমার দিদির সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয়—তখন তোমার বাবারও বিয়ে হয় নি। এখন অকারণে তোমার প্রশংসা ক'রে তোমার দিদির মনোরঞ্জনের দরকার নেই আর তা করছি নে। কারণ আমাদের বয়স অনেক হল। পার্ট তোমার ভাল হয়েছে। তবে ভাই মানায় নি ঠিক।

—মানায় নি! বিস্ময়ের সীমা ছিল না তার। তার তো রূপ না-থাকা নয়!

শ্যামাকিঙ্কর হেসে বলেছিলেন—তোমার চেহারা খারাপ তা বলছি নে—বরং একটু বেশী ভাল। তবে ভাই ননীগোপাল-ননীগোপাল লাগে। অর্জুন-অর্জুন লাগে না! মানে অর্জুন হতে হলে বীরের মত চেহারা চাই তো। মেক্-আপে একজোড়া গোঁফ নিলেও মোট-মাট বনবাসী পরিব্রাজক অর্জুন বলে কোন রকমে সান্ত্বনা পাওয়া যেত। ভাবা যেত—ননী ছানা মাখন ঘৃত প্রভৃতি রাজভোগ তো এখন জোটে না তাই রোগা লাগছে। তবে গোঁফ জোড়াটা ঠিক আছে। চিড়িয়াখানার বাঘ সিংহীর মত। রোগা কিন্তু গোঁফের ঝড়তিপড়তি নেই। বরং ওই মেয়েটিকে আসল অর্থাৎ রূপবঞ্চিতা পুরুষালি চেহারা চিত্রাঙ্গদা হিসেবে বেশ মানিয়েছিল।

বলেছিলেন সীমার কথা। কিন্তু সীমার কথা থাক। সীমা তার পথ বেছে নিয়েছে। পড়বে—পাস করবে—কোন ইস্কুলে টীচার হবে—তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তাকে ওই আলিবাবা গল্পের চল্লিশ ডাকাতের সেই চিচিংফাঁকের ধনরত্ন ভরা পাহাড় গুহা—সিনেমাতে ঢুকতেই হবে। সেদিনও কথাটা বলেছিল শুভেন্দু। বলেছিল—আপনি তো বলছেন পার্ট আমার ভাল হয়েছে। চেহারা অর্জুনের মত পালোয়ানি না হ'লেও একালের বাঙালীর ছেলে হিসেবে ভালো—তাও বললেন। তা আমাকে একটু ব্যাক-ট্যাক ক'রে সিনেমা লাইনে

ঢুকিয়ে দিন না।

—সিনেমা লাইনে? অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন শ্যামাকিঙ্করবাবু।—সিনেমা লাইনে যাবে?

সে চুপ করে গিয়েছিল। জোর করে বলবার ভরসা পায় নি। শ্যামাকিঙ্কর বলেছিলেন—পড়া শেষ কর। পড়—

এবার কথা খুঁজে পেয়েছিল সে। বলেছিল—পড়া-শোনা আর আমার হবে না জামাই-বাবু। এই তো পর পর তিনবার পরীক্ষা দিয়ে তবে পাশ করলাম। মিথ্যে কলেজে ভর্তি হই নি। চাকরি পাচ্ছি নে, ঘুরে বেড়াচ্ছি টো-টো ক'রে। আর চাকরিই মিলবে বা কি। পিওন আর্দালীর কাজ তো করতে পারব না। চেহারা আছে পার্ট করতে পারি—সিনেমায় যদি ভাল রোজগার করতে পারি—তাতে দোষ কি?

শ্যামাকিঙ্করবাবুর মুখের হাসিহাসি ভাবটুকু মিলিয়ে গিয়ে—যেন কঠিন হয়ে উঠেছিল—তিনি বলেছিলেন—আছে দোষ শুভেন্দু। দোষ আছে।

কি দোষ? সে কথা আর জিজ্ঞাসা করে নি শুভেন্দু। সাহস হয় নি। এবং কি দোষ প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি কি বলবেন—তা তার জানা ছিল। সে-দিন তা নিয়ে তর্ক করার মত মনের জোর তার ছিল না। এবং সেদিন যে মন তার ছিল সে মন এগুলির মন্দত্ব বা দোষ অস্বীকারও করত না।

এ পথ পিছল পথ।

* * *

বেঞ্চের উপর অকারণেই নড়ে-চড়ে বসল শুভেন্দু। থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমের শেডটার নীচে যাত্রীরা প্রায় সব ঘুমিয়ে গেছে। চিনেবাদামের খোলা, পোড়া বিড়ি সিগারেটের টুকরো, খাবারের ঠোঙা কাগজের টুকরো ধুলো বালির মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ঘুমের খুব অসুবিধে হয় নি তারা দিব্যি ঘুমুচ্ছে। দু-চার জন যারা জেগে আছে তারা কেউ বিড়ি টানছে, কেউ গুনগুন করে গান গাইছে মোট কথা মানুষেরা ক্লান্ত হয়ে নিরুপায় শান্ত হয়ে পড়েছে। শুধু শুভেন্দু শান্ত হয় নি। সে শান্ত হতে পারছে না।

তার পথ চাই। যে পথে অর্থ আছে সম্পদ আছে সেই পথেই সে হাঁটবে। সে পথ পিছল না বন্ধুর না। সে পথ পরিণতিতে মর্মান্তিক পূর্ণতায় পৌঁছে হারিয়ে গেলে এ সব সে বাছবে না বিচার করবে না। এ সব সেই চিরকেলে নীতিবাগীশদের কথা। শুচিবাইগ্রস্ত একদল বুড়োমানুষ এইভাবে এদেশের তরুণদের জীবন চিরকাল পঙ্গু করে দিয়ে আসছে।

"সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ কাহাকেও দুঃখ দিবে না। পিতামাতাকে ভক্তি করিবে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজিত, মদ্যপান করিবে না। পরনারীকে মাতৃবৎ দেখিবে। সতীত্বই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সতীত্ব-বলে একদা সাবিত্রী যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃত স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। মানুষের নিকট ভোগ অপেক্ষা ত্যাগই বরণীয় এবং গ্রহণীয়। কারণ মনুষ্যত্ব ত্যাগের ভিত্তির উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে।"

এর কোনটাই আজকের তরুণ জীবনকে, তাই বা কেন, গোটা মানুষের সমাজকে এতটুকু প্রেরণা দিতে পারছে না। চীৎকার করে মানুষেরা বলছে—বা বলতে চাচ্ছে—না—না—না। ও কথা আমরা শুনব না। ও কথা আমরা মানব না। ও-কথা পচে গেছে—ও-সত্য মিথ্যা হয়ে গেছে। ও-সত্যকে গুলি ক'রে একালের মানুষ হত্যা করেছে। মরে অমর হওয়ার সত্যকে রাজঘাটে সমাধি দেওয়া হয়েছে। আর নয়। ওর পালা শেষ। প্রাচীন প্রগল্‌ভতা স্তব্ধ হও।

নতুন-কালের নতুন সত্যকে খুঁজতে হবে না, কষ্ট ক'রে মাথা ঘামিয়ে বুঝতে হবে না, তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে—বুঝতে পারবে। গোটা দেশের দিকে তাকিয়ে দেখ!

বল, কে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের অস্তিত্বে?

বল, কে মনে করে না ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা প্রতারক?

বল, কে প্রমাণ করতে পারে যে আইন বাঁচিয়ে বে-আইনী পথে নিজের স্বার্থসাধন বা কার্যোদ্ধারে কোন বাধা আছে? বে-আইনীর সংজ্ঞা পেনাল কোডে আছে। তাকে প্রমাণ করে পুলিস এবং আদালত। কিন্তু পাপ কাকে বলে তার সংজ্ঞা কি—কে প্রমাণ প্রয়োগ দিয়ে প্রমাণিত করতে পারে? কে পারে?

পৃথিবীতে সাধারণ মানুষকে কোন এক অবস্থায় আপিং খাওয়ানো চলছে চিরকাল। কখনও এ ধর্মের কখনও সে ধর্মের, কখনও ঈশ্বরনির্দেশ-বিশ্বাসের কখনও নিরীশ্বরবাদের, কখনও এ তন্ত্রের কখনও ও তন্ত্রের—সবেরই মূল কথা হল তোমরা কষ্ট ক'রে যাও। নিজে কষ্ট কর, পরকে সুখী কর। ওর মধ্যেই নাকি অমৃত আছে। ঝাড়ু মার। ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও।

সংসারে যে শক্তিমান—যে রাষ্ট্রশক্তি দখল ক'রে ব'সে আছে সে চাণক্যের মত বলে—আমি মহারাজের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে কুটীরে বাস করি, এক মুঠো আতপ তণ্ডুল সিদ্ধ করে খাই। কুশাসনে বসি, পর্ণশয্যায় শয়ন করি।

হায় মহামাত্য চাণক্য—তুমি যে ভূতপূর্ব মহারাজ নন্দকে পশুর মত হাড়িকাঠে ফেলে কাত্যায়নকে দিয়ে হত্যা করিয়ে তার রক্তে তোমার শিখা বন্ধন করে সংসার রঙ্গমঞ্চ থেকে করতালি নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েছ—তার মূল্য কি ওই কৃচ্ছ্রসাধনের দুঃখের বা কষ্টের অপেক্ষা অধিক নয়?

সব মিথ্যে। সব মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে মানুষের জীবনকে জলস্রোতের মত বাঁধ দিয়ে দিয়ে যে পথে ঘুরিয়েছ এতদিন সেই পথেই ঘুরেছে। জলস্রোতকে উঁচু পথে চালিয়েছ; জীবনকে দুঃখের পথে চালিয়েছ। আর তা হবে না। চলবে না। আজ বাঁধগুলো পুরনো হয়ে জীর্ণ হয়েছে, ফাট ধরেছে, জলস্রোতের চাপ বেড়েছে—পরিমাণ বেড়েছে। এবার সে সকল কৃত্রিম বাঁধ ভেঙে দিয়ে তার গতির স্বাভাবিক পথে ছুটবে। জলের গতির স্বাভাবিক পথ উঁচু থেকে নীচুর দিকে। জীবনের স্বাভাবিক গতির পথ—দুঃখ থেকে সুখের দিকে। বিচিত্র কুটিল মানুষের সূক্ষ্ম আর্থিক বুদ্ধি। এখানেও সে ধাঁধার সৃষ্টি করতে চায়। বলে—সুখ? সুখ কোথায়। সুখ কি ভোগে? সুখ কি সম্পদে? টাকায়? সুখ মনে—মনের শান্তিতে। হ্যাঁ—নিত্য অভাবের

মধ্যেই মনের শান্তি।

মিথ্যে কথা। এসব মিথ্যে কথা।

এবার সব চাতুরী ভেঙে গেছে মানুষের। সুখের পথ সে ভোগের মধ্যেই খুঁজে বের করেছে। তৈরী করে নিয়েছে। সেই পথে জীবনের মিছিল এবার চলবে।

গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখ! দেখ যেখানে যত বাঁধ ছিল, জীবনের সহজ স্বভাবের গতিপথে সব ভেঙে পড়ে আছে, থৈ-থৈ করা জলপ্লাবনের মধ্যে সব কিছুকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

এই তো মিলওয়ালা শিবনাথ দে সেদিন বাবাকে দেখতে এসে তাকে বলে গেল—এক কাজ কর শুভেন্দু। ব্যবসা কর। কিছুদিন যদি মান-মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে খাটতে পার, আর আইন বাঁচিয়ে ধান-চাল বাধাই এর কারবার করতে পার—ধর তোমাদের এই প্রকাণ্ড দালান-বাড়ী, এই বাড়ীতে কোন ঘরে একটা গুপ্ত গুদাম করে কাজ করে যাও—তা হলে বছর দুয়ের মধ্যে দেখবে এই অবস্থার ভাঙন রোধ হয়ে নতুন গড়ন শুরু হয়েছে। কিছু রিস্ক্ অবশ্য আছে। তা লাভ করতে গেলেই রিস্ক নিতে হয়।

সে (অর্থাৎ শুভেন্দু) বলেছিল—ব্ল্যাক মার্কেটিং হবে তো!

হেসে দে বলেছিল—নামটা ব্ল্যাক মার্কেটিং দিয়ে বে-আইনী করেছে। কিন্তু এ তো বাপু চিরকাল আছে। একে আমরা আগে বাঁটাইয়ের কারবার বলতাম। সস্তার বাজারে কিনে চড়া বাজারে বেচা এই তো ব্যবসার মূল কথা গো। ব্যবসাতে একটা কথা আছে ডিফারেন্স। ডিফারেন্সের দাবীতে এই তো চল্লিশ সাল পর্যন্ত লাখ লাখ টাকার নালিশ হয়েছে। ধর তোমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট হল তোমাকে হাজার মণ ধান দোব পাঁচ টাকা দরে, ডেলিভারী শ্রাবণ মাস পর্যন্ত। এখন শ্রাবণে দর হয়ে গেল দশ টাকা তার মানে হাতে হাতে পাঁচ হাজার মারছ তুমি আর আমার পাঁচ হাজার যাচ্ছে। আমি দিলাম না ধান। দিলাম অন্য লোককে দশ টাকা দরে বেচে। তুমি নালিশ করলে—তোমার পাঁচ হাজার লোকসান গেছে—তার ক্ষতিপূরণের দাবীতে।

শুভেন্দু হেসে বলেছিল—না দে মশায়। ও পারব না!

দে বলেছিলেন—ওগো এতখানি ধর্মের মুখ তাকালে কষ্টই পাবে। পরকালে কি হবে কেউ জানে না। আর এটা অধর্ম তাই বা কে প্রমাণ করে দিতে পারে? অধর্ম পাপ হলে এতকাল চলে এল কি করে?

সে বলেছিল—যা চলে এসেছে, চলে এসেছে বলে তাই সত্যও নয় ধর্মও নয়। ধরুন—

বাধা দিয়ে শিবনাথ বলেছিল—ধরতে হবে না। মেনেই নিলাম। যা চলে এসেছে,—চলে এসেছে বলে তাই যেমন পুণ্য কর্ম নয় সত্য কর্ম নয়—তেমনি নতুন বলে আজ যা চালাচ্ছ তাও পুণ্য কর্ম বা সত্য কর্ম নয়। ওগো—ওসব অনেক দেখলাম। বুঝেছ—শক্ত যে তারই সব দোর খোলা—সেই মুক্ত পুরুষ। ওসব ছাড়—ছেড়ে একটা কিছু কর। দেখ আমার নামে

অনেকে অনেক কথা বলবে। এই রায়চৌধুরীদের বড়বাবু—না করেছেন এমন ভাল কাজও নাই আবার না করেছেন এমন মন্দ কাজও নাই। জান তো সব। সবই করেছেন। যে পারে সেই করে। যে পারে সেই মরদ। সেই বেটাছেলে। বুঝেছ, কিছু কর। পরমার্থে কি হয় তা জানি না তবে শুধু অর্থ না থাকলে লোকে তোমাকে পায়ে দলে দিয়ে চলে যাবে। যেমন ওই চোরটা আজ তোমার বাবাকে—। থাক। চোখে তো দেখলে। তার ঘা তোমাকেও লেগেছে গো। কিছু কর। কিছু করে নিজের অবস্থাটার ভাঙনের মুখে বাঁধ দাও; দেখবে তোমার অবস্থা পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়ার অবস্থা পাল্টে গেছে।

ফেরার পথে ওই দিনই শুভেন্দু সঙ্কল্প করেছে—সিনেমা—সিনেমাই একমাত্র তার পথ। ওই পথেই সে তাদের অবস্থার ভাঙন বাঁধতে পারে।

এর পর তাকে অর্থ দিয়ে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই সে যাবে।

স্বর্গে তার প্রয়োজন নেই। নূতন দুনিয়া গড়ার সাধ তার মিটেছে। আর নতুন দুনিয়ার কামনাটাই বা কি, কল্পনাটাই বা কি? কি আছে তার মধ্যে? কোথায় আছে সেকালের পাপপুণ্যের পুঁথি, সামনে ধরে পঙ্গু হয়ে বসে হরিনাম কর? কোথায় আছে গঙ্গাজল পান করে যাগযজ্ঞ করে জীবন ধারণ কর? কোথায় আছে রাত্রি জেগে বি-এ এম-এ পাস করে সৎ একটি কেরানী হয়ে ঝুঁকে বসে দশটা-চারটে কলম পিষে কুঁজো হয়ে গিয়ে অকালে বুড়ো হয়ে কেশে কেশে মর? অথবা স্কুল-মাস্টার হয়ে মানুষের বাচ্চাদের রাখালী করে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে তুষ্ট থাক? ইস্কুল-মাস্টারী নাকি সম্মানের কাজ! কারণ মাস্টারদের চরিত্র সৎ এবং শুদ্ধ বলেই লোকেদের ধারণা। ধারণাটা ঠিক কি ঠিক নয় সে তকরার সে করবে না—তবে তাতে তার হয়টা কি?

ব্যবসা করতে বসে যে লাভ করবার সুযোগ পেয়েও করে না, তার ব্যবসার গদীঘরে গণেশ মুখ ফিরিয়ে বা কুলুঙ্গী থেকে ঝাঁপ খেয়ে আছড়ে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়।

এই তো নতুন দুনিয়ার কল্পনা!

এ কল্পনার মধ্যে সত্যের একটি উদারপথ আছে—সেটি হল—যার যে যোগ্যতা আছে সে সেই যোগ্যতা বিকাশের পথেই চলে। তাতে কোন অমর্যাদাও নেই, পাপপুণ্যেরও কোন কথাই নেই। নতুন যুগের পরিকল্পনায় এইটেই নতুনত্ব। মুক্তি। সকল নিষেধ থেকে সকল বাধা থেকে মুক্তি।

হঠাৎ একটা কথা মাথার মধ্যে খেলে গেল। যেটা তার বাবার পক্ষে মর্মান্তিক এবং অপঘাত মৃত্যুতুল্য অপমানজনক—সেইটেই আজ তার কাছে উদার এবং মুক্ত জীবনের প্রসন্ন আহ্বান।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। ডাউন ট্রেন আসছে, শুভেন্দু উঠল।

॥ ১৫॥

"নানা রঙ্গের পুরী ; কেউ হাসছেন কেউ কাঁদছেন
কেউ করছেন চুরি।
রাম করেন সীতা সীতা—সীতায় ডাকেন রামে—
কেষ্ট করেন রাধা রাধা—রাধায় ডাকেন শ্যামে।
সীতা সতী পুণ্যশ্লোকা—রাধা কলঙ্কিনী—
সীতা রাধা দুয়েই মুক্তি—জপেন যে-নাম যিনি।"

ছড়াটার মাঝখানে ছেদ টেনে দিয়ে ফটিকদাস থামেন। নস্যু বললে—থামলে ক্যানে হে? বল।

হেসে ফটিক বললে—তুমি তো না-জানা লও হে তা বলে করব কি?

—তবে বলা হলটা ক্যা—নো?

মধ্যে মধ্যে নস্যু এমনি ভাবে বেশ শহুরে উচ্চারণে 'ক্যানো' শব্দটি উচ্চারণ করে একটু রসিকতাও করে, আবার নিজের শহুরেত্ব-বোধেরও পরিচয় দিয়ে থাকে।

—বললাম—তুমি জেনেশুনে বুঝে-সুজে বোকার মত হাউ-মাউ করলে বলে। মনে পড়িয়ে দিলাম হে।

—কি মনে পড়িয়ে দিলে?

—মনে পড়ালাম—সংসারে মন্দটা আবার কোথা হে? গোপাল চৌধুরীর বেটা কলকাতাতে নাকি সিনেমাতে নামবে—। তা নামবে। তাতে দোষেরটা কি?

—মরণ দেখ আমার। দোষের তা বললাম কখন হে?

—দোষের বল নাই নাকি? তবে কথাটা বলারই বা কারণটা কি হল?

—হল এই যে এবার সীমের কী হবে?

—কি হবে? সীমে দুদিন বাদে বাড়ী যাবে, তা বাদে আর কাউকে বিয়ে-টিয়ে করবে।

—উঁ-হুঁ—উঁ-হুঁ। হল না। হল না।

—উঁ-হু লয়—হুঁ। তাই হল ; তাই হল।

—না ঠাকুর। তা লয়। ই কালে মেয়েরা আর মানবে না, মানবে না, মানবে না। যে চৌকাঠ ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছে সীমে, সে চৌকাঠ পার হয়ে ঘরে আর ঢুকবে না। শেষকালে ওই দিদিমনি-টনি একটা কিছু হবে। দেখো। আর শুভেন্দু নাকি ওই ছবিতে নামা রাণী-সাজা লয় সখি-সাজা কোন রঙ্গিলা মেয়েকে বিয়ে করবে। লোকজনে এই কথা বলাবলি করছে বাপু। নিজ কন্নে আমি শুনে এসেছি। বন্নে বন্নে যা সত্যি তাই বলেছি, আর যার জন্যে এত চিন্তে, এত বাক্যি—সেই কন্যে, সীমেসুন্দরী—সে দিদিমনির বাড়ীতে থেকে বাড়ছে—

চাকরি করছে—বলছে মরে যাব সেও ভাল—তবু বাড়ী যাব না। আর কন্তে হয়ে জন্মেছি বলে বিয়ে করতেই হবে তার মানে নেই, বিয়ে আমি করব না। শুভেন্দুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। সে যাক্ গে—যা মন তাই করুক গে! হোক গে সে বড়লোক।

অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ফটিক বললে—মা ফুল্লরার দিব্যি? বল্লে বল্লে সত্যি বলছ?

—মা ফুল্লরার দিব্যি।

কথাটা খুব বাড়িয়ে বলা কথা নয়। সত্যি কথাই বলেছে নসুবালা। সীমা চাকরি করছে। সঙ্গে সঙ্গে বড় দিদিমনি—অর্থাৎ গার্লস ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেসের কাছে থেকে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবার জন্তেও তৈরী হচ্ছে।

এখানে রায়চৌধুরীদের হরিবিষ্ণুবাবু গার্লস ইস্কুল স্থাপন করেছেন। এবং সেই ইস্কুল নিয়েই আছেন। সেই ইস্কুলই এখন তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার আগে রায়চৌধুরীরাই এখানকার সর্বাপেক্ষা ধনশালী রাজাতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেনই বা কেন, আজও তাই আছেন। তবে এককালে অর্থাৎ ইংরেজদের কালে, পরাধীনতার আমলে তাঁদের প্রতাপও ছিল রাজার মত। তারও আগে—অর্থাৎ দু পুরুষ আগে হরিবিষ্ণুবাবুর পিতামহ মাধববাবুর আমলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় প্রেমে এখানকার মানুষেরা বিগলিত হয়ে যেত; মাধববাবুকে লোকে দেবতার মত ভক্তি করত। মাধববাবুই রাজসম্পদ উপার্জন করেছিলেন খনিজ বস্তুর ব্যবসায় করে। রাজসম্পদ অর্জন করেও মাধববাবু ছিলেন অসাধারণ, বিনয়ে ফলবান বৃক্ষের মত বিনত। হৃদয়ে ছিল মানুষের জন্য অগাধ ভালবাসা। এবং কীর্তির জন্য ছিল যত পিপাসা তত নেশা। এখানকার মাটিতে তিনিই নতুন কালকে এনে দিয়ে গিয়েছিলেন; হাই ইংলিশ ইস্কুল, চারিটেবল ডিসপেনসারী, প্রাইমারী গার্লস ইস্কুল প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন তিনিই। দ্বিতীয় পুরুষে মাধববাবুর পুত্রেরা—সে কীর্তিকে রক্ষা করেছিলেন বটে কিন্তু দেশের লোকের প্রতি মাধববাবুর স্নেহপ্রেম—তাঁদের ছিলও না এবং সেটা তাঁরা পছন্দও করতেন না। তখন তারা এখানে রাজসম্পদ দিয়ে জমিদারী কিনে রাজসম্মান অর্জন করে রাজার প্রতাপে প্রতাপান্বিত হয়ে মানুষকে শাসন এবং শোষণ দুইই করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁদের হুকুমে চাপরাসীরা থানার কাছাকাছি দোকান থেকেও দোকানদারকে বেঁধে ধরে তুলে নিয়ে এসেছে, মুসলমান প্রজা জলিল শেখকে থামে বেঁধে রাখতে হুকুম দিয়েছেন। এবং তা নিয়ে যতই দরখাস্ত এবং নালিশ হয়েছে সদরের আদালতে—সে নালিশকে অনায়াসে বাঁ হাত দিয়ে পাশে সরিয়ে দিয়েছেন—সরকারের অনুগ্রহভাজন জমিদার ও ইংরেজের সমর্থক ধনশালী ব্যক্তি হিসেবে। তবে এ নিয়ে একটি বিরোধ নিত্য ভূমিকম্প কম্পিত বিশেষ কোন পার্বত্য এলাকার মত গ্রামটিকে নিত্য চঞ্চল এবং কম্পিত করে রেখেছিল।

এতে রায়চৌধুরীদের বিরুদ্ধে যাঁরা বাদ-প্রতিবাদে প্রতিপক্ষ ছিলেন—তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন শ্যামাকিঙ্করবাবু। শেষ পর্যন্ত একদিন সে প্রায় বৎসর বিশেক আগে—১৯৩৮।৩৯

সালে তাঁরা গ্রামকে অন্ধকার করে দেবার জন্য এবং তাঁদের অভাবে গ্রামকে দরিদ্র করে দেবার জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রথম গেলেন জেলার সদরে—তারপর গেলেন কলকাতায়—সেখানে ব্যবসায় সমারোহে ঐশ্বর্যের জুয়াখেলায় প্রমত্ত হলেন। প্রমত্ততার মধ্যে দানের পর দান হারতে হারতে সম্বিৎ পেয়ে কলকাতা থেকে সরে গেলেন খনিঅঞ্চলে। এবং সেখানেই একদা লাগল পরস্পরের মধ্যে মতান্তর এবং মনান্তর। ফলে ঐশ্বর্য ভাগ হল।

তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তাঁরা অকস্মাৎ অনুভব করলেন—তাঁদের নগদ টাকা এবং সোনা-দানার সম্পদ অনেক নষ্ট হলেও—তাঁদের জমিদারী এবং ভূমি-সম্পত্তি কিছু যায় নি। তাঁদের রাজ্য আছে, কিন্তু রাজার প্রতাপ, রাজার সম্মান, এবং মাধববাবু দেশের মানুষের কাছে যে প্রেম, যে শ্রদ্ধার কর গ্রহণের অধিকার অর্জন করে গিয়েছিলেন—তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

অন্যদিকে তাঁদের অভাবেও গ্রামের মানুষ দিব্য বেঁচে রয়েছে—এবং তাঁদের উপর নির্ভর করবার সুযোগ নেই বলেই—তারা আজ স্বাধীনভাবে ছোট বড় মাঝারি রকমের ব্যবসাবাণিজ্য করে দিব্যি চালাচ্ছে। তাঁরাই করেছিলেন দুটো রাইস মিল—সে দুটো আর তাঁদের নেই, মাড়োয়ারীরা দিব্যি চালাচ্ছে এবং একটা নতুন মিল করেছে গ্রামের গন্ধবণিকদের শিবু দে। শিবু দেও একসময় তাঁদের ঘরে চাকরি করেছে। ওদিকে ইংরেজ রাজত্ব যায় যায় হয়ে উঠেছে। এবং কিছুদিন পর ১৯৪৭ সালে ইংরেজ রাজত্ব গেল। যেদিন গেল—সেদিন শ্যামাকিঙ্করবাবুকে দেশের লোক কলকাতা থেকে ডেকে আনলে। চন্দনপুরের স্বাধীনতার পতাকা তাঁকে তুলতে হবে।

এরপর গ্রামে ফেরা রায়চৌধুরীদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর সমস্ত দেশটাই যখন স্বাধীন হয়ে আর এক রকম হয়ে গেল—তখন সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্বাধীন ভারতবর্ষের মধ্যে—এই গ্রামটুকুকেই মনে হল অতি আপন অতি নিরাপদ। বাধ্য হয়ে তাঁরা দেশে ফিরলেন। এবং একান্তভাবে আপন গ্রামে পরের মত অনাত্মীয়ের মতই বাস শুরু করলেন। ওঁদের মধ্য থেকে একদা বেরিয়ে এলেন—হরিবিষ্ণুবাবু। মানুষটি বাড়ী থেকে বেরিয়ে খুঁজে খুঁজে নিজের পিতামহের পদচিহ্ন আঁকা পথটি ধরলেন। চন্দনপুরের শিক্ষা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে এসে কাজ শুরু করলেন।

মাথায় খাটো মানুষ, বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, সোনার মত দেহবর্ণ—মাথার চুলগুলি একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এর খানিকটা বংশধর্ম খানিকটা যে এই বিপর্যয়ের ফল—তাতে কোন সন্দেহ নেই। হরিবিষ্ণু জন্ম থেকেই সম্মান ও অহংকারের সুখশয্যায় শায়িত, যখন হাঁটতে শিখলেন, তখন মাটির উপর পা ফেললেন মাটির মালিকানার অধিকার নিয়ে। যখন ছেলেদের সঙ্গে খেলার বয়স হল—তখন খুড়তুতো জাঠতুতো মামাতো ভাইদের সঙ্গে খেলার গণ্ডি সীমাবদ্ধ রইল; যারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল সাধারণ ছেলেরা—তাদের সঙ্গে খেলতে নেই এই কথাটাই কেউ বলে দিলে তাঁকে। যখন ইস্কুলে ঢুকলেন তখন ইস্কুলের ফাউণ্ডারের পৌত্র এবং সেক্রেটারীর পুত্র পরিচয়টাই বড় হয়ে উঠল—ছাত্র পরিচয়ের চেয়েও। যখন কর্মজগতে

ঢুকলেন তখন বয়স আঠারোর বেশী নয়—তখনই তাঁদের সাহেব ম্যানেজার থেকে জমিদারীর ম্যানেজার পর্যন্ত সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বললেন—"আজ্ঞে না ওখানে না, এইখানে সই করুন। হ্যাঁ। সুতরাং আঠারো বছর বয়স থেকে চুয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত হরিবিষ্ণুবাবুর মনের গড়নের ভিত গড়ে উঠেছিল এ অঞ্চলের মানুষের যেখানটায় তার পায়ের অনতিদূরে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করেছিল সেইখানে এবং মনের দেউলের চূড়াটি উঠে তাকিয়েছিল ভাইসরয় এবং গভর্নরের লাট-প্যালেসের পাশে তার পার্শ্বচরের মত। সেখানে তার অপরিমেয় অহঙ্কারের কথা বলতে হবে না। কিন্তু এসবের সঙ্গে ছিল তাঁর একটি অসাধারণ ব্যক্তিসত্তা এবং আশ্চর্য এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন। কর্মপারঙ্গমতা ও মেধার দিক দিয়ে তাঁর মত কৃতী কর্মী সকলকালেই দুর্লভ। এই দুর্লভ মনটিই তাঁকে শক্তি দিল প্রেরণা দিল—সকল সঙ্কোচকে সরিয়ে ফেলতে। সব সরিয়ে ফেলে তিনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কর্মীর দায়িত্ব তুলে নিয়ে দেশের সেবক হয়ে বসলেন। এবং সত্যকারের কর্মীই হয়ে উঠলেন তিনি। দুধারি তলোয়ারের মত কর্মক্ষমতা হরিবিষ্ণুবাবুর। একদিকে তিনি ইঞ্জিনীয়ারের কাজে অর্থাৎ বাড়ী তৈরীর প্ল্যান এস্টিমেট থেকে সব পারেন—আবার সরকারী দপ্তর থেকে ওয়ান-থার্ড দিয়ে টু-থার্ড টাকা বের করে আনার পথও জানেন। একসময় ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। এবং তাঁর সময় বোর্ডের কাজ যে গোটা প্রদেশের মধ্যে সব থেকে ভাল এবং কলঙ্কজীর্ণহীন গৌরবের সঙ্গে চলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে ইস্কুল চালাতেও জানেন। এখানে শিক্ষকেরা কেউ কেউ তাঁর ব্যক্তিত্বকে অহঙ্কারদুষ্ট বলে অপবাদ দেন বটে, কিন্তু তাতে হরিবিষ্ণুবাবু বিচলিত নন। ওটুকু তিনি বজায় রাখতে চান।

ইস্কুলের ছাত্রী থেকে শিক্ষয়িত্রী পর্যন্ত সকলেই তাঁকে কাকাবাবু বলে।

এই হরিবিষ্ণুবাবুই সীমাকে বোর্ডিংয়ে একটা চাকরি দিয়েছেন।

সেদিন থানা থেকে সীমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন দিদিমনিরা। নিয়ে গিয়েছিলেন আবেগের বশে। সীমা যা করেছিল—তা যেন খুব একটা মহৎ কাজ করেছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু স্কুলের এবং ছাত্রী নিবাসের হেডক্লার্ক—এবং অ্যাসিস্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন বললেন—কাজটা তো ঠিক হয়নি বাবু! তারা প্রশ্ন করেছিল—কেন?

হেডক্লার্ক বলেছিলেন,—দেখ, সীমা তো রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ হবে না বা ডক্টরেট পেয়ে দিগ্‌গজও হবে না। সুতরাং বিয়ে করবে না এটা তো খুব সুস্থ কথা ভাল কথা নয়। বিয়ে করাটা তো একটা খারাপ কাজ এ কথা কেউ বলবে না। আর বিয়েই যদি করবে না—তবে গোড়াতেই বলে নি কেন?

তর্ক করেছিলেন শিক্ষয়িত্রীরা। তর্কে ঠিক হারেন নি তবে ক্রমশই যেন আপনা থেকেই দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে পড়েছিলেন। ভেতর থেকে কেউ যেন বার বার বলতে শুরু করেছিল —তাই তো! তাই তো! তা হলে!

সীমার সৌভাগ্য বলতে হবে—। দিনকয়েক পরেই বিকেলে সদর থেকে কাকাবাবু অর্থাৎ

হরিবিষ্ণুবাবু এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

হরিবিষ্ণুবাবুর কাছে সীমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বড় দিদিমনি। হরিবিষ্ণু বড় দিদিমনির মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এ সব কি কাণ্ড বাধিয়ে ফেলেছ তোমরা? ইস্কুলের দুর্নাম রটে যাবে যে!

বড় দিদিমনি এম. এ. পাস করেও এখনও কুমারী রয়েছেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—আপনিও এই কথা বলছেন?

—তা বলছি বৈকি! এর মধ্যেই তো এই রকম কথা চার-পাঁচজন বললে আমাকে।

—কি বললে?

—বললে—কি হরিবিষ্ণুবাবু, আপনার গার্ল্‌স হাই ইস্কুলের না কি নামবদল হচ্ছে? হরিবিষ্ণু বালিকা বিদ্যালয় নাম পাল্টে 'চিরকুমারী ব্রতধারিণী শিক্ষায়তন' নাম রাখছেন!

বড় দিদিমনি মিস করুণা রায় চুপ করে অন্য দিকে তাকিয়ে যেন নিজের মধ্যেই মগ্ন হয়ে গেলেন।

হরিবিষ্ণুবাবু বললেন—কি, চুপ করে রইলে যে?

এবার তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে করুণা রায় বললেন—ভাবছিলাম কাকাবাবু।

—কি ভাবছিলে? রেজিগ্‌নেশন দিয়ে একটা নাটক করবে কিনা?

—না, ঠিক নাটক করবার অভিপ্রায় আমার নেই তবে রেজিগ্‌নেশন দেওয়াটাই ঠিক করে ফেলেছি—ওর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করবার মত বাকী কিছু রাখি নি।

—হুঁ। সে জানি আমি। তার আগে এইটে নাও। দেখ। একখানা কাগজ তিনি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। কাগজ নয় চিঠি। একখানা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার। হরিবিষ্ণু গার্ল্‌স ইস্কুলের সেক্রেটারী সীমা আচার্যকে মেয়েদের বোর্ডিংয়ে সুপারভাইজার নিযুক্ত করছেন। মাইনে চল্লিশ টাকা আর ফ্রি বোর্ডিং।

পড়েও সঠিক বুঝতে পারলেন না করুণা রায়—কাকাবাবু কি বলতে চাচ্ছেন। করুণা বললেন—সীমা তো পরীক্ষার জন্তে তৈরী হচ্ছে। সে চাকরি করবে কি করে?

—চাকরির ডিউটি—বুঝে নেবে তুমি হোস্টেল সুপারইন্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে। সে তো তোমার হাতে। এবং সে ডিউটি তুমি নির্ধারিত করবে। আমার ইচ্ছে সকালবেলা মেয়েদের জলখাবার দেবার সময় একবার দাঁড়ানো। আর একবার তরকারী কোটার সময়। বুঝলে না! আবার বিকেলে জলখাবার দেবার সময় এবং রাত্রে খাবার সময়। বাস্।—কি? এখনও যে তাকিয়ে রয়েছ বোকার মত! মেয়েটা পরীক্ষা দেবে তা তো বুঝলাম। কিন্তু হাওয়া খেয়ে গাছতলায় থেকে তো পরীক্ষা দেওয়া যায় না এবং পরের পোষ্য হয়ে, সে তুমি বড় দিদিমনিই হও আর বড়দিদিই হও, তোমার পোষ্য হতে হলে ও তো মনে খুব স্বস্তি পাবে না। তোমার মেজাজও সব সময় ঠিক না থাকতে পারে।

এবার দিদিমনির মুখ প্রসন্ন এবং প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, একটা উচ্ছ্বাস তাঁর অন্তরের মধ্যে ঝড়ো হাওয়া তুলেছে, তারই প্রেরণায় কিছু বলতে গেলেন তিনি। কিন্তু হরিবিষ্ণু বাধা দিয়ে বললেন—

সবুর। যা বলবার পরে বলো। আগে শেষ করতে দাও আমাকে। পরীক্ষার পর ওর কি হবে? বাপের বাড়ী ফিরে যাবে? কিরে সীমা? তাই যাবি? যেতে পারবি? বাবা ঘরের দরজা খুলবে?

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল সীমা।

হরিবিষ্ণু বললেন—ধর্, যদি পাশই করলি—তারপর?

এবারও চুপ করে রইল সীমা। উত্তর খুঁজে পেলে না।

হরিবিষ্ণু বললেন—তারই জন্তে এই ব্যাপারটা করে দিলাম। এই চাকরিটা নিয়ে আরম্ভ কর্। Start life—তারপর—।

এবার সীমা এগিয়ে এসে হরিবিষ্ণুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। সঙ্গে সঙ্গে গভীর কৃতজ্ঞতায় চোখ ফেটে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পায়ের উপর পড়ল।

একটু হাসলেন হরিবিষ্ণু এবং নিজের হাতখানি সীমার মাথার উপর রাখলেন। বললেন—কাঁদিস নে। পড়্ ভাল করে। বুঝলি। পাশ করতে হবে। এবং করা চাই। করুণা এর দায়-দায়িত্ব—মানে ও যাতে পাশ করতে পারে তার দায়িত্ব তোমার উপর অর্ধেকটা অন্তত রইল।

হেসে প্রসন্নকণ্ঠে সোৎসাহে করুণা বললেন—সে ভার আমি নিলাম কাকাবাবু। আর আপনাকে যে কি বলব—

—তা বুঝতে পারছ না। আমি বলি কি—কিছু বলে কাজ নেই। কারণটা কি জান? কারণ মতামতে তোমরা যাকে প্রগ্রেসিভ বল বাপু তা আমি নই। আমি রি-অ্যাকশনারী। দেখ, আমি ছেলের বিয়ে দিয়েছি। বউমা আমার গ্রাজুয়েট, পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে এম-এ পড়ছিল। বিয়ে দিয়ে এনে পড়া ছাড়িয়ে তাকে বাড়ীর ঠাকুর-দেবতার পূজো সেবার ইনচার্জ করে দিয়েছি এবং বলে দিয়েছি পুরনো আমল থেকে যা নিয়ম আছে তার পান থেকে চুন খসলে চলবে না। সেও তাতে অমত করে নি। তবে যদি তাকে একহাত ঘোমটা দিতে বলি—কি বলি ফেরতা দিয়ে কাপড় পরতে পাবে না, কিংবা স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতে পাবে না, তাহলে সে নিশ্চয় আমার হুকুম মানবে না। সীমা ওই একটা অসভ্য মন্তপ টাকাওলাকে বিয়ে না করে চলে এসেছে—সেটা এমনি রকমের বড় একটা কিছু—এবং লোকের মনে খুব চমকও লেগেছে এতে। আমি সত্যি বলতে ওর কাজ সমর্থন করি না—তবুও কিছুতেই অস্বীকারও করতে পারছি না। কিন্তু—

চুপ করে গেলেন হরিবিষ্ণুবাবু।

কথা শেষ হয় নি—কিন্তু বলে থেমেছেন—আবার বলবেন এই অপেক্ষা করে করুণা এবং সীমাও চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু না, হরিবিষ্ণুবাবু আর কিছু বললেন না। এবার করুণা বললেন—তা হলে এখন যাই কাকাবাবু!

হরিবিষ্ণুবাবু বললেন—যাবে? দাঁড়াও। আরও একটু চুপ করে থেকে হরিবিষ্ণু বললেন—সীমা!

—বলুন!

—একটা সত্যি কথা বলবি আমাকে?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সীমা মৃদু স্বরে বললে—বলুন!

—তুই কি? আবার একটু চুপ করে থেকে হরিবিষ্ণুবাবু বললেন—জিজ্ঞাসা করছি শুভেন্দুর সঙ্গে বারকয়েক রেসিটেশন করেছিস—দুবার তোদের ছাত্র ইউনিয়নে থিয়েটারও করেছিস—তোর কি—। বুঝতে পারছিস কি জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি আমি?

মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছিল সীমার। সে মাটির দিকে চোখ রেখে অনুচ্চ কিন্তু পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর দিল—না। আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি।

—পাশ করে কি করবি?

—আরও পড়ব আমি।

—বেশ—বি-এ—এম-এ; তারপর?

—চাকরি-বাকরি করব।

—বিয়েই করবি নে? না, শুভেন্দুকে বিয়ে করবি নে?

উত্তর দিল না সীমা। হরিবিষ্ণু বললেন—তুই শুনেছিস—শুভেন্দু বাড়ী থেকে চলে গেছে? অনেক টাকা রোজগার না করে ফিরবে না—প্রতিজ্ঞা করে গেছে। সিনেমায় নামবার সংকল্প করে গেছে। তা সম্ভবতঃ পারবেও।

সীমা একথার জবাব দিল না। করুণা বললে—মিথ্যে ওকে এসব কথা বলছেন কাকাবাবু। আমি জানি—শুভেন্দুর সঙ্গে ওর এই বিয়ে না করে পালিয়ে আসার কোন সম্পর্ক নেই। এবং বিয়ের উপরেও একালের মেয়েদের মানে আমাদের কোন বিতৃষ্ণা আছে তাও নেই। তবে যার-তার সঙ্গে বাপ-মায়েরা গলায় দড়ি বেঁধে আটকে দেবে—এ বিয়েতে আমাদের আপত্তি।

—হুঁ। আচ্ছা যাও তোমরা।

করুণা এবং সীমা আবার তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে চলে গেল। হরিবিষ্ণুবাবু চুপ করে বসে রইলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে অলস ভাবে টানতে টানতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

শুভেন্দু একজনকে বলে গেছে সে সিনেমায় নেমে ভাগ্য পরীক্ষা করবে। সিনেমার নায়কেরা একালে নাকি লাখ লাখ টাকা উপার্জন করে। সবাই না অবশ্য। দু-একজন—।

হ্যাঁ। এ যুগে সিনেমা-নায়কেরা এবং নায়িকারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতী তাতে সন্দেহ নেই।

এরা ধনী বলে মানুষেরা এদের ঈর্ষা করে না। ধিক্কার দেয় না। দুনিয়ায় যাই করুক—তার জন্ম কোন কৈফিয়তই কেউ দাবী করে না।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার সিগারেট ধরালেন। একটু হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে। এককালে তিনি খুব ভাল অভিনয় করতেন। খুব ভাল। তিনকড়ি চক্রবর্তী নরেশ মিত্তির—

এদের সঙ্গেও তিনি অ্যামেচারে অভিনয় করেছেন। তখন তাঁর রূপও ছিল। যৌবন এবং সেই রূপ তাঁর যদি আজ থাকত—তবে তিনিও নেমে দেখতেন সিনেমায়। এই ইস্কুল কলেজ হোস্টেল এই নিয়ে টাকা খরচ করে হাজার ঝঞ্ঝাট পুইয়ে এমন করে তাঁর বংশের হারানো মান-সম্মান ফিরে পাবার জন্য এইভাবে জীবন কাটাতে হত না।

বছর দুয়েক আগে মোটর অ্যাকসিডেন্টে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী থাকতে জীবন এমন হয়ে যায় নি। আজ জীবনে কোনখানে কোন মধু নেই মাধুর্য নেই—। অর্থ তাঁর আছে —তাতেও নেই। সংসার-জীবনে নেই। ছেলে বউ এরা বেশ আছে, তিনি এই নেশায় পড়ে আছেন। শুধু জীবনে প্রতিষ্ঠা। তাঁর ইচ্ছে আছে পলিটিক্সে নামবেন—এম-এল-এ হবেন—, মিনিস্টার হবেন—জীবনটা সম্মানের সমারোহে ভরে যাবে। তিনি দেশের সেবায় নিজেকে নিঃশেষিত করবেন। হ্যাঁ, শেষেরটুকুও আছে বই কি। আছে।

হ্যাঁ। একালে হয় সিনেমা-নায়ক নয় পলিটিক্যাল হিরো। হয় ছবির হিরো—নয় রাজনীতি ক্ষেত্রের হিরো।

অকস্মাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন হরিবিষ্ণুবাবু। অনেকক্ষণ হাসলেন।—ঠিক কথা, হয় ছবিতে বা স্বপ্নের রাজপুত্র—নয় গণতন্ত্র মতে রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী রাজপুত্র বা রাজপুত্রের মেজ সেজ ছোট ভাই বা খুড়তুতো জাঠতুতো বা মাসতুতো পিসতুতো—কোন একটা তুতো ভাই।

শুভেন্দু স্বপ্নলোকের—ছবির লোকের রাজপুত্র হতে গেছে। তিনি—রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘুরছেন।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার সিগারেট ধরালেন হরিবিষ্ণু।

নস্যুবালা সেদিন সিঁড়ির অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ বসে এই সমস্ত বিবরণ শুনেছিল। সে এসেছিল হরিবিষ্ণু দাদাবাবুর কাছে মাগনের তরে। অর্থাৎ ভিক্ষের জন্যে। দাদাবাবু সন্ধ্যেয় এসে সকালে চলে যায়। থাকলেও ধরা যায় না। সারাটা দিনই ঘুরছে দাদাবাবু। এসেই কপালে হাত দিয়েছিল—হায় নেকন! কারণ তখন হরিবিষ্ণুবাবুর সঙ্গে করুণা দিদিমণির কথাবার্তা চলছিল। সীমা করুণাদির পাশে দাঁড়িয়েছিল; নস্যু একবার উঁকি মেরে দেখেই কপালে হাত দিয়ে পিচ কেটে—চুপচাপ ওই সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করছিল—কতক্ষণে করুণাদির সঙ্গে দাদাবাবুর কথাবার্তা শেষ হবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই কথাবার্তার বৈচিত্র্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে শুধু শুনেই গিয়েছিল। করুণাদি আর সীমা যখন ঘর থেকে বের হল তখন একপাশে একটা আড়াল জায়গা দেখে 'সরে বসেছিল। কারণ একটা ভয় হঠাৎ তাকে আছন্ন করে ফেলেছিল। দাদাবাবু যদি জানতে পেরে তাকে ধমক দিয়ে বলে—কেন—কেন এমন করে চুপি চুপি কথা শুনছিলি তুই! এরপর এইসব কথা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ছড়া বেঁধে—।

হেই মা রে!—কি হবে? যদি দাদাবাবু ডাকে—মহাবীর সিং—বাঁধো ইসকো!—হেই মা গো!—

প্রাণপণে নিশ্বাস বন্ধ করে সে একটা অন্ধকার আড়ালে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়েছিল। করুণাদি এবং সীমা চলে যেতেই সে বেরিয়ে আসবে এমন সময় নিচে আবার কার সাড়া পাওয়া গেল। কে উপরে উঠছে! আবার সে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল।

রক্ষা কর মা ফুল্লরা! রক্ষা কর! হেই মা রক্ষা কর!

—বাবু!

—কে?

—আমি সনাতন মুহুরী।

—এস। কি ব্যাপার?

—কখানা পাট্টা সই করাবার আছে।

—পাট্টা? আবার এখন পাট্টা? জমিদারী তো অনেকদিন গিয়েছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যে সব খাস পতিত এর ওর নামে বেনামী বন্দোবস্ত করে রাখা আছে—সেইগুলির জন্যে—আনরেজিস্টারী পাট্টা-কবুলতি করে রাখা দরকার। শুনছি কংগ্রেসী বাবুরা সব খোঁচাখুঁচি করবে। আজ হুমকি কাল হুমকি—তাই ম্যানেজারবাবু এই ব্যবস্থা করেছেন। কবুলতি সই হয়ে গিয়েছে—পাট্টা সই করে দেবেন আপনি।

—আনো।

সনাতন মুহুরী সে-প্রায় এক বোঝা দলিলের একটা মোট তাঁর সামনে টেবিলের উপর রাখলে।

হরিবিষ্ণুবাবু হেসে ফেললেন,—বললেন—এ যে গন্ধমাদন সনাতন!

—আজ্ঞে—আড়াইশো খানা এতে আছে —এ ছাড়া আরও তৈরী হচ্ছে।

—এ সবই কি বেনাম করা রয়েছে?

—আজ্ঞে না, সত্যি বন্দোবস্তও আছে—তা প্রায় অর্ধাঅর্ধি হবে।

—রেখে যাও—সই করব অবসর মত। আমি কাল দিন-রাত্রিটা আছি। ম্যানেজারবাবুকে বলো—কবুলতির বোঝাটা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ?

—আজ্ঞে বলব। আমি তা হলে যাই এখন?

—না, বসো। দরকার হলে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি তো! বসো। এরপর আর বসে থাকে নি নম্বুবালা। সন্তর্পণে দেওয়াল ধরে-ধরে গোল-সিঁড়ি নেমে বেরিয়ে এসেছে। মনে মনে একটা ভয় হয়েছে—সে সেই অনেকক্ষণ আগে থেকে লুকিয়ে বসে এইসব কথাবার্তা শুনেছে তার জন্য।

সেই কথাই সে বললে বেয়াই ফটিকদাসকে। বললে—সে তো বেয়াই অনেক কথা। সে সব কথার বাঁক কি পাক কি ধার কি! সব কি বুঝি, না বুঝতে পারি! তবে বুঝলাম এই যে সীমে শুভেন্দুকে বিয়ে করবে না। আর শুভেন্দু—সিনেমাতে রাজপুত্তুর সেজে অ্যানেক

টাকা রোজগার করবে।

তারপরই বলে উঠল—হায় নেকন!

হেসে ফটিক বললে—ক্যানে, নেকন আবার কি করল?

—কি করলে? বলি বেয়াই এই কথা নাকি শুধোয়—না শুধাতে হয়?

—ক্যানে গো? দোষ কি হল?

—বলি তুমি তো কানা লও?

—না, কানাও লই—কালাও লই—

—তাই তো বলছি। শুভেন্দু কার লাতি গো? কার বেটার বেটা? আঃ, যার ঠাকুর-দাদার পেতাপে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেয়েছে। নোকে রাজা বলে—তা-ই ছিল—রাজা বাদশা! মেজাজ কি!

হ্যাঁ। রাজত্ব গিয়েছে। এখন রাজপুত্তুর না সাজলে তো কেউ রাজপুত্তুর হবে না। আর গিয়ে, বুয়েছ; সে নাকি মজার রাজত্বি গো।

—আর মজার রাজত্বি। আঃ, সব গেল গো! সব গেল।

—কি গেল?

—কি গেল না বল? রাজাবাবুরা গেল, রাণীমারা গেল, রাজপুত্তুররা গেল, রাজকন্যেরা গেল। বামুনের পৈতে গেল, মেয়েদের ঘোমটা গেল, কোঁচানো কাপড় গেল, ছেলেগুলো চোঙা পেণ্টুলান পড়লে—মেয়েগুলা ফেরতা দিয়ে কাপড় পরলে—ঠোঁটে রঙ দিলে। রান্নাশাল ভাঁড়ার ঘর ছেড়ে ইস্কুলে ছুটল। রব ধরলে—বিয়ে করবে না। আর কি করবে—বল? কি থাকল বল!

এবার ফটিকদাস হাসলে। বললে—তা ভাল; অনেক ভাল। এ অনেক ভাল হল বেয়ান।

—ভাল হল বলছ? সীমের কি ভাল হল?

—হল কি না তুমিই বল? বিয়ে করে তো দু'দিন প'রে ডাইভোর্স গো।—

—ডাইভোর্স? সেই ছাড়াছাড়ি—আইনের কথা বলছ নাকি?

—হ্যাঁ।

চুপ ক'রে গেল এবার নসুবালা। বিয়ে হলে সে বিয়ে সীমার টেঁকবে না? ফটিক বললে—ই ভাল বেয়ান। এই দেখ আমার বউটা পালিয়ে গেল। তাতে ভাই বুকে দাগা আমার লেগেছে। তার থেকে এমনি বিয়ে-টিয়ে না করা ভাল। সীমা তোমার বেশ করেছে। লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করবে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে আলোটা নিভে গেল।

অন্ধকার যেন কোন্ আড়ালে আবড়ালে লুকিয়েছিল—মুহূর্তে ঝপ ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তাদের উপর। তারা চুপ ক'রে বসে রইল।

নসু সেই অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বললে—একখানা গান গাই,—না,

—কি বল ?

—বেশ ভাল দেখে বুঝেছ ?

নস্যু ধরলে সেই পাগলের গান। অন্ধকারের গান।

"আহা ভাই রে! ও-তোর আলোর তরে ভাবনা কেন হায় রে!
অন্ধকারেই পরাণপাখী সেই দেশেতে যায় রে।
সেথা চন্দ্র সূর্য লক্ষ পিদীম তাইরে নাইরে নাইরে!"

—না! অন্ধকারের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে তার হাতখানা চেপে ধরলে ফটিকদাস—না! ও গান থাক বেয়ান।

—তা হ'লে ? কি গান ধরব বল ?

—রঙের গান গাও হে! মরণ তো আছেই। রঙ আজ আছে কাল নাই। পলাশফুলের পালার মত। এল ডাল ভেঙে। পাতাঝরা মরার মত ডালের সর্বাঙ্গে ফুল। বাস, মাস খানেক মাস দেড়েক—তা বাদেই সব শেষ। গেয়ে লাও ভাই।

নস্যু ধরলে—অনেক দিনের পুরনো গান :—

গোপনে মনের কথা বলতে দে গো আঁধার গাছতলায়
ঠা-ণ্ডা শীতল সাঁঝ বেলায়।
শোন—পা-খীরা, গাছের ডালে ঝোটন নেড়ে জোটন বেঁধে কলকলায়।
ঝুঁঝকি আঁধার দিপি দিপি জোনাক মেলা
মনের কথা ফিসিফিসি বলার পালা
বিনি সুতোর মালা-বদল এক পহরের রঙের খেলা
আদ্যিকালের বংশী বাজা—কদমতলার গানের পালায়।
গোপনে মনের কথা বলতে দে—গো!

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে যখন চন্দনপুরের মানুষ মাটি নদীনালা গোটা দেশ এবং দুনিয়ার সঙ্গে রকেটের বেগে ঘুরন্ত এক কুমোরের চাকে চেপেছে নূতন গড়নের জন্য, নানান বিচিত্র পাত্রের গড়নে গড়ে উঠছে এবং বিজ্ঞান-বুদ্ধির চুল্লীতে পুড়ে পাকা হচ্ছে—তখন এই দুটি মানুষ আদিম কালের দুটি মাটির ঢেলার মত এক পাশে পড়ে তাদের গায়ে ঘাসের রোমাঞ্চ জাগিয়ে ফুল ফোটাচ্ছে এবং শুনছে মৌমাছির গুঞ্জন গান এবং ভাবছে এই চিরকালের রঙের গান। আঁধার গাছতলায় সন্ধ্যাবেলা ছাড়া রঙের গান—প্রেমের পালা হয় না। ওরা জানে না এ যুগে, ডাকে—তারে—চিঠিতে চলে সে পালা। বাতাসে ভেসে আসে ওই চিঠির কথা পরস্পরের কানের পাশে।

শহরে কফি হাউসে, পার্কের বেঞ্চে, রেলিংয়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দিনদুপুরে কথা হয়। পালা চলে। সে ওরা জানে না।

চিঠিতে কালির অক্ষরে মনের কথা খামের গোপনীয়তার মধ্যে দিয়ে আসে। কখনও হারায়—কখনও সন্দেহক্রমে কেউ খোলে বটে তবে দু'চারটে ক্ষেত্রে, সকল ক্ষেত্রে নয়। এবং একালে কি বিচিত্রভাবে যে প্রেম হয়!

মাস তিনেকেরও বেশী। এরপর সীমা একখানা চিঠি পেল। চিঠিখানা ডাকে এসেছে, কিন্তু সরাসরি ডাক মারফত তার কাছে নয়—এসেছে আশু সিংহীকে পোস্ট বক্স ক'রে।

আশু সিংহী অপ্রত্যাশিতভাবে পত্র পেলে একখানা। বেশ বড় খামও বটে। মোটাও বটে। চমকে উঠল প্রেরকের নাম দেখে।—এক—এস—ইউ অর্থাৎ ক্রম শু—। এ সংকেতটা আশু জানত। আগেও দু-চারবার চিঠি লিখেছে শুভেন্দু কলকাতায়—সিনেমার ব্যাপার নিয়ে। এখানেও কখনও-সখনও ওদের বাড়ীর রাখাল কি মাহিন্দার চিরকুটের চিঠি নিয়ে এসেছে—তাতেও এই সই থাকত। এস অক্ষরটা এমনভাবে লিখত যে সেটা এস ও সি দুটোই হত, অক্ষম মনোগ্রামের মত এস-এর তলার বাঁকা অংশটাকে বাড়িয়ে সামনে একটু টেনে দিত।

আশু চিঠিখানা খুললে। বড় খাম—মোটা খাম। অনেক কথা লিখেছে সে। যাক একটা দুর্ভাবনা গেল। খবরটা পাওয়া গেল শুভেন্দুর।

আশুকে লেখা চিঠির সঙ্গে আর একখানা আকারে একটু ছোট খাম।

তাতে ছাপার হরফের মত সযত্নে খুব সুন্দর করে লেখা—সীমা। সাধারণ খাম। দুটো চিঠিতে চিঠিটা মোটা হয়েছে; আশুর চিঠিটাও বেশ বড়, ছোট নয়।

লিখেছে—

ভাই আশু,

প্রথম ভেবেছিমাম আত্মহত্যা করব। কিন্তু সে লজ্জা এ লজ্জার থেকে অনেক বেশী। বাবা সেটা করতে গিয়ে একটা আঘাতের পর আর আঘাত করতে ভয় পেয়েছিলেন। হয়তো প্রথম আঘাতটা কম জোরে করে ফেলেছিলেন। অথবা অভিনয় করতে গিয়ে অতি-অভিনয় করে ফেলেছিলেন। আমি তা' করব না। ওতে আমার ঘেন্না আছে। আমি নতুনকালের মানুষ। আমি ওকালের পুরনো রোমান্স—আমার মর্যাদা গেল, এ বলে তো মরব না। মরতে পারব না। বলিনি একদিন যে, খবরের কাগজে মোটা হরফে বেকার যন্ত্রণায় আত্মহত্যা লিখবে, —এ আমার কাছে অসহ্য। তার থেকে তো ডাকাতি করা ভাল;—যদি খেটে খেতে না পারি! রোগ-যন্ত্রণায় আত্মহত্যা আমার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু এর প্রতিকার তো করতেই হবে। তা না হ'লে আত্মহত্যা নয়—বাড়ীর লোকের—দেশের লোকের আমাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা উচিত। র‍্যাটকিলার বিষ বেশী করে দিয়ে মারা উচিত। কারণ বিধাতার সৃষ্টির বাজে খরচ নাকি ইঁদুর। যুক্তিতে তা হলে আমি ইঁদুর।

আশু থামল। একটু না হেসে পারলে না। শুভেন্দু বেশ মুডের উপর চিঠিখানা লিখেছে। বিষণ্ণতার বিষক্রিয়া—মনের গুমোট ভাবটা কেটে গিয়েছে। সীমার চিঠিখানা ঘুরিয়ে দেখলে। খুব যত্ন করে বন্ধ করেছে। একটু নেড়েচেড়ে রেখে দিলো তারপর আবার নিজের চিঠি পড়লে।

তাই ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে প্রথমে ভেবেছিলাম সিনেমায় নামব অথবা থিয়েটারে। আজও ভাগ্যের সন্ধান পাইনি, তবে হাঁটছি। ক্লান্ত হইনি। দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটল। বাবার ঘটনা—সীমার ঘটনা। সীমার ঘটনাতেও কানাঘুষো শুনলাম—সীমা অন্য কাউকে ভালবাসে—নইলে কখনও শুধু পড়ব বলে পালিয়ে আসে কেউ? এবং আমার নামটা এল তার সঙ্গে—কানের টানে মাথার সঙ্গে চুলের মত। আমার বুক কেঁপেছিল—ভয়েও বটে এবং আনন্দেও বটে। বুঝেছিলাম সীমা আমাকে ভালবাসে। আমি চিঠি লিখলাম। বেশ কাব্য করে এবং কৌশল করে লিখলাম—তুমি যখন দেবযানীর মত প্রেম ভুলে যযাতির মত রাজার রাজ্যসম্পদে লুব্ধ হওনি, তখন কচের মত আমিও দেবকার্য সাধনের জন্য অভিশাপ মাথায় করে চলে যাব না। চৌধুরী বাড়ীর গৌরব, তোমরা আমরা ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—এ সব ভুলে যাব। এবং তোমাকে পাশে নিয়ে দাঁড়াব কষ্টের দুনিয়ায়। নেলিকে দিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলাম। নেলি এসে বললে—পত্রের উত্তর সে দেয়নি। মুখে বলেছে—দূর—দূর। তাকে ওসব ভাবতে বারণ করিস। প্রেম-ট্রেম নেই আমার। আমি পড়ব।

আমার মাথায় তখন তাপ জমেছে। বেশ সুস্থ ছিলাম না। মানে যে অবস্থায় মানুষ অসম্ভব কিছু করতে পারে সেই অবস্থায়। মানে—সীমা যদি বলত—হ্যাঁ প্রেমই বটে, তবে আমি ওকে বিয়েই করে ফেলতে পারতাম। কি খাওয়াব কি খাব—কি হবে এসব ভাবতাম না। আমার এ উত্তর শুনে দুঃখ হল। আমার প্রেমে পড়েনি? আমার কি কোন যোগ্যতাই নেই? ওকে আমার প্রেমে পড়তেই হবে। বাধ্য করতে হবে। কি করে বাধ্য করব? ভাগ্য চাই, ভাগ্য। একজন কৃতী লোক হতে হবে। বাড়ীর দুঃখ ঘোচাব, সীমাকে প্রেমে পড়তে বাধ্য করব। বেরিয়ে পড়লাম ওই কমপেনসেশনের একশো টাকা নিয়ে। এসেছিলাম কলকাতায়। প্রথম ছবির রাজ্যেই চেষ্টা করলাম ভাগ্যসন্ধানের। শ্যামাকিঙ্করবাবুর কাছে যাইনি। গেলেই তিনি ধরে বাড়ী ফিরে পাঠাতেন, জানতাম। খবর কি তাঁর কাছে আসবে না? গিয়েছিলাম দেশের পরিচয়ের দাবীতে স্বপন সিংহ ডিরেক্টারের কাছে। চন্দনপুরের নাম শুনে তিনি আমাকে আসতে বললেন স্টুডিওতে। গেলাম। আমাকে জনতার মধ্যে একটা পার্ট—সিনেমার বলে এক্সট্রা দিলেন। ভদ্রলোক গরীব লোকের মিলানো ভিড়। আমাকে গরীব লোক—তাও বয়স্ক লোকের পার্ট দিলেন। অনুগ্রহ একটু ছিল এর ভেতর। পার্টটার মুখে কথা ছিল। আমি পার্টটা ভাল করলাম। অনেকে তারিফ করলে। বললে টাইপ পার্টে আমি ভাল করব। প্রথমেই তারিফ কম কথা নয়। স্বপনবাবুর অ্যাসিস্ট্যাণ্টরা ঠিকানা চাইলে। বললে—ওরা বলে দেবে—দু-চার জায়গায় টাইপ পার্ট হলে ডাকবে। স্বপনবাবু খুশী হয়ে দশ টাকা দিলেন পাঁচ টাকার জায়গায়। কিন্তু আমার ও কথা ভাল লাগল

না। টাইপ পার্ট থেকে যদি জনতার মধ্যে একটি কোন তরুণের পার্ট আমাকে দিতেন এবং পারিশ্রামিক কিছুই না দিতেন তবে আমি খুশী হতাম—আশান্বিত হতাম। আশা থাকত—কোনদিন আমি নায়ক হিরো হতে পারব। এ ছিল একটা গেঁয়ো ক্যাবলার পার্ট। মনের মধ্যে সীমার কথার নতুন মানে খুঁজে পেলাম। মেয়েরা বলে নাকি, বরের রূপ চায়; রূপের অভাব পূর্ণ করতে পারে—এক গুণ আর বীর্য। আমার রূপ নাই। বর হবার মত রূপ নাই এ কথা স্বপনবাবুর মত লোক বলে দিলেন। শ্যামাকিঙ্করবাবুর কথাও মনে পড়ল। নাচে রূপ আর গায় স্বর। সিনেমায় প্লে ব্যাকে সুস্বরের অভাব সহজে মেটানো যায়, ছবি বিশ্বাস নায়ক সেজে গান গেয়েছে কিনা বলতে পারিনে। একালের উত্তমকুমার ঠোঁট নেড়ে হেমন্তকুমারের গলায় গান গায়—কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু রূপের অভাব মেক-আপেও মেটানো যায় না। সুন্দরকে বীভৎস করা যায়, ভয়ঙ্কর করা যায় কিন্তু সুষমা লাবণ্য—যে সুষমা-লাবণ্যে নায়ক সাজে—তা মেক-আপে আসে না। স্বাস্থ্যেও কিছুটা পূরণ করে। আমি তাই ও ভূতটাকে নামিয়ে দিয়ে বলেছি—তুমি এস। আমি রাম কবচ নিয়েছি। যাও!

চলে গিয়েছিলাম কলকাতা ছেড়ে। ঘুরলাম। পায়ে হেঁটে ট্রেনে বাসে। একশো টাকা ছিল, তার সঙ্গে জুড়ে নিয়েছি—আংটি, দুটো আংটি ছিল পৈতের সময়ের, বোতাম—ফঙফঙে অবশ্য, ঘড়িটা—বেচে আর একশো করে ঘুরেছি। দুর্গাপুর—সেখান থেকে আসানসোল—সেখান থেকে রাউরকেল্লা এসে একটা চাকরি মিলিয়ে নিয়ে ছিলাম। মাসখানেক কাজও করেছিলাম। গতরের কাজ। যাতে দেহখানা ভেঙে নতুন করে গড়ে ওঠে। বুকের ছাতিটা চওড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু সইল না। অসুখে পড়ে ছেড়ে দিলাম! ও দুর্দান্ত খাটুনি ওরাই পারে। ওই সায়েবরা আর আমাদের দেশের পাঞ্জাবীরা। এখানে যার কাছে কাজ মানে খাটতাম সে একজন জার্মান সায়েব। লোকটা চিমনী রিবেট করছিল। আমি যোগাতাম তার সরঞ্জাম। একদিন লোকটা পড়ল উপর থেকে,—নিচে সত্ত ভরাট-করা মাটি ছিল তাই পড়ে মরল না—হাতের কব্জীটা ডিসলোকেশন হল—পায়ের অ্যাঙ্কেল ছাড়ল। আমি নিচে ছিলাম —ভারার মাঝামাঝি জায়গায়। যে কারণে সায়েব পড়ল সেই কারণে আমিও পড়লাম। সায়েব দোতলা থেকে আমি একতলা থেকে। ভাই আমারও লেগেছিল যথেষ্ট, কিন্তু সায়েবের মত নয়। তবুও সায়েব উঠল সাত দিনে—আমি পনের দিনে বেরিয়ে এলাম হাসপাতাল থেকে, তারপর শুরু হল জ্বর আমাশয়। সায়েব দশ দিনে কাজে লাগল। আমি আঠারো দিন পর গিয়ে বললাম—এ কাজ আমি পারব না। রিজাইন করছি। দুর্গাপুরে একজন পাঞ্জাবী লরীওয়ালাকে দেখেছিলাম—তার দুখানা লরী—গাছতলায় গ্যারেজ আর সেইখানেই ছোট একটা টিন দিয়ে ঘিরে ঘর। শুনেছিলাম পাঞ্জাবের রেফুজী, দুর্গাপুরে ডি. ভি. সি'র ব্যারাজ আরম্ভের সময় একটা গাই মোষ নিয়ে এসে ওই গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। দুধ বেচত। একটা মোষ থেকে দুটো তারপর একে একে তিনটে গাই করে গাছতলাটাকে গোয়াল বানিয়েছিল। গাছটা এমন ঝাঁকড়া হল যে এক ফোঁটা জল পড়ত না। তারপর সব গাই মোষ বিক্রি করে একটা লরী এবং একটা থেকে দুটো লরী ক'রে ব্যবসা

চালাচ্ছে। বাঙালীকে কত্তারা দোষ দেয়—আমরা তা পারি না বলে। পারব কি ক'রে? বত্রিশ ইঞ্চি ছাতি মেলে না—সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা বাঙালী মেলে না। তা হ'লে তো সিনেমা লাইনেই থাকতাম। ছবি বিশ্বাস বুড়ো হয়েছে। মেক-আপে আর জোয়ান দেখাবে ক'দিন?

যাই হোক—ও চাকরি ছাড়লাম—আমার জার্মান মিস্ত্রী কর্তা বললে—তুমি স্টোরে কাজ কর। একটা পোস্ট খালি আছে।

বললাল—তা জানি সায়েব। কিন্তু ওটাতে গ্রাজুয়েট চাই। আমি তো ম্যাট্রিকুলেট।

সে বললে—যাও যাও। লিখবে তো হিসেব। তার আবার গ্রাজুয়েট। তুমি লেগে যাও আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। টেম্পোরারী হয়ে লাগো। তারপর কাজ ভাল হলে ট্রেড ইউনিয়নের যুগে তোমাকে ছাড়াবে কে?

লাগলাম। মাইনে বেশী হল। সবসুদ্ধ নিয়ে দুশো টাকার বেশী। দিন তার পড়ে কত হিসেবে—আট টাকা প্রায়। কিন্তু বিপদ হল—ওই গ্রাজুয়েট নই। সত্যিই আশু, এ যুগে তোদের লাইনে কবরেজী চলে না—অন্যখানে অগ্রাজুয়েট চলে না। বিচিত্র যন্ত্রপাতি, তার পার্টস—তার নাম বিচিত্র—বানানে ঠেকলাম। নাম শুনেছিলাম প্রপার নাউন—ওতে নাকি বানান ভুল হয় না। মিথ্যে কথা। দিন পনের কাজ করে নিজেরই লজ্জা হল—পনের দিন পরই মাইনে মিলল—মাস শেষ হল। আমিও রেজিগনেশন দিয়ে সরে পড়লাম। কলকাতায় এসেছি। পড়ছি। আই-এ দেব। এ বছর সীমা ম্যাট্রিক পাস করবে—। ওর আগেই আমাকে গ্রাজুয়েট হতেই হবে। একটা কিছু তো চাই-ই—যাতে অন্তত বলতে পারি—নায়ক হবার মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন আমার আছে। এই দেখ সীমা আমার গ্রাজুয়েট হবার সার্টিফিকেট। আর রূপ না থাক—ছাতি আমার ছত্রিশ ইঞ্চি। রমেনের মত কালো ধুমসোকেও আমি ধরাশায়ী করতে পারব। একটা দিনের বেলার চাকরি পেয়েছি। শ্যামা-কিঙ্করবাবুর একখানা পত্র দেখিয়েছিলাম পরিচয়পত্র হিসেবে। কাজ দিয়েছে খুব। আশি টাকা মাইনে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বই ঝাড়াঝুড়ির কাজ। রাত্রে কলেজ।

এইবার তোকে অনুরোধ—। আমার বাড়ীতে বাবা মা নেলি রইল—তাদের অসুখে-বিসুখে দেখিস। টাকা-পয়সার হিসেব রাখিস—আমি দোব। নিশ্চয় দোব। তুই যে দেখবি সে আমি জানি। এবং আমার পিতাকে জানি—তিনি ফি-টি দেবেন বলবেন—দিতে পারবেন না। তুই সেইটে মেনে নিস।

দ্বিতীয় অনুরোধ—তোর নামে টাকা পাঠালাম। একশো টাকা। ইস্কুলে নেলির মাইনেটা দিয়ে দিস—আর হেডমিস্ট্রেসকে অনুরোধ করিস তিনি যেন নেলিকে বলে দেন—তোমাকে ফ্রি ক'রে নেওয়া হল। বাকীটা সীমার জন্য। ও এসে আশ্রয় পেয়েছে দিদিমণিদের কাছে। হয়তো প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে। কিন্তু খরচ আছে তো। পাঁচজনের দানে সীমা পড়বে—এটা আমার সহ্য হচ্ছে না। সে আমার প্রেমে পড়েনি কিন্তু আমি তার প্রেমে ধপাস করে পড়ে গেলাম। যতক্ষণ আমার চিঠি পেয়ে সে নেলিকে না বলেছে—দূর দূর, ততক্ষণ

আমার মনে প্রেমের কিচ্ছু ছিল না। বেশ দাঁড়িয়ে ছিলাম—চৌধুরী বাড়ীর ভাঙা দালানের ছাদে। যেন ওই কথাতে—আমি রেগে লাফ দিয়ে হাড়গোড় ভেঙে পড়লাম।

ওকে একটা চিঠি দিলাম। এটা তোকে পৌঁছে দিতে হবে। এর মধ্যে তোকেও যা লিখেছি—তাই লিখেছি। হয়তো একটু সরসতর হয়ে থাকবে। শেষের অংশটা—অনুরোধের অংশ থেকে শেষটা থাকল না। টাকার কথাটা থাকল—লিখলাম—"যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে পড়ার খরচের জন্ম আমি তোমাকে বন্ধুর দাবিতে সাহায্য করতে চাই। তুমি রাজী হলে টাকা আশু দেবে তোমাকে। তুমি আমাকে ভালোবাস না বাস—টাকাটা নিলে খুশী হব। পরে তুমি শোধ করো। গান আছে—জীবন এত ছোট ক্যানে, আমার কাছে জীবন ছোট নয়। মস্ত বড়। এ কালে তো মস্ত বড়। আগে বিলেত যেতে জাহাজে এক মাস লাগত। এখন তিন দিনও লাগে না। সুতরাং দশ গুণের উপর বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে বদলে গেছে। সুতরাং নিলে তুমি কেনা হবে না এবং দেনা হলেও শোধের সময় পাবে।"

দেখিস কি বলে।

শিবনাথ দে'কেও একখানি পত্র লিখলাম। লোকটি অন্যের চোখে যাই হোক—আমার কাছে উপকারী মানুষ। এক পয়সা ছাড়বার মানুষ নয়। গুণবান মানুষ ধার্মিক মানুষ মহৎ মানুষ—আমি বলি না, তবে ও আমাদের উপকারী মানুষ। ওঁকে লিখলাম—বাড়ীর প্রয়োজন মত টাকা দিতে। বিশেষ দরকারে টাকা লাগলে ধানে শোধ হবে—বা হবে না এটা যেন না ভাবেন। আমি শোধ দেবই। রোজগার থেকে না পারি জমি আমাদের আছে—তাই বিক্রী ক'রে দেব।

বাড়ীতেও পত্র দিয়েছি। ছোট চিঠি। ভাল আছি—কিছুদিন পর যাব। আর যে একশো টাকা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম সেটা পাঠালাম।

আর একটা কথা। সীমার পত্রের ব্যাপারটা যেন গোপনথাকে। ওটা যেন প্রকাশ না পায়। দোহাই। একদিকে অমর চক্কোত্তি। অন্যদিকে গাঁয়ের প্রান্তে নসুবালা। সে খবর পেলে হয়। ভাদু গান বেঁধে গেয়ে বেড়াবে। যেদিন বাবার কাণ্ড এবং সীমার কাণ্ড হয়, সেদিন রাত্রে শিবনাথ দে বাবাকে দেখতে এসেছিল। যখন ফিরে যায় তখন তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর বাড়ীর দোর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। শুনলাম ফটিকদাসের বাড়ীতে গান হচ্ছে।

নাকের বদলে নরুণ—ফুলের বদলে বিলিতি বেগুন—
সীমার বদলে ক্ষমা—ও মন রসনা তাই ঘুনা ঘুন—ঘুন।

দোহাই। আমার ভালবাসা নিস। ইতি—

আশুর ভারী ভাল লাগল চিঠিখানা। আজ এক নতুন চেহারা নিয়ে শুভেন্দু তার সামনে দাঁড়াল। ভারী ভাল মুডের চিঠি। এটাই যদি তার জীবনের মনে স্থায়ী রূপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তো ও জিতে গেল। ও তো হাঁস হয়ে গেছে। জলে পাঁকে দুধে যেখানে ডুব দিক, পালকে লাগবে না একটি বিন্দুর দাগ। কিন্তু আশ্চর্য। কি করে হল? কি ক'রে হয়?

চন্দনপুর গ্রাম—জমিদারী উচ্ছেদের ওপাশে অর্থাৎ পিছনদিকে কর্ণওয়ালিশের আমল তাই বা কেন, আলিবর্দীরও আগে থেকে জমিদারের আড়ং। এখানকার মাটি পর্যন্ত জমিদার। আলিবর্দীর আমলে রাজনগরের নবাবের অধীনে চৌধুরীরা জমিদার। তারপর কর্ণওয়ালিশের আমল থেকে এ পর্যন্ত গ্রামের সব ব্রাহ্মণ বাড়ীই জমিদার বংশের ফ্যাঁকড়া, ডাল থেকে ঝুরিনামা কাণ্ডের মত চৌধুরী বংশের দৌহিত্র। বাঁড়ুজ্জে বেশী—চাটুজ্জে-মুখুজ্জেরা কম জমিদার হয়েছে। তারা নতুন জমিদারী কিনে চন্দনপুরের প্রতাপ আরো বাড়িয়েছে, চন্দনপুরের উঠোন বাঁধিয়েছে প্রজাদের মাথা কুটিয়ে; চারদিকে পাঁচিল তুলেছে জমিদারী ইজ্জতের, ছাদের উপর চিলে কোঠা তুলেছে দম্ভের। চৌধুরীদের নূতন শাখা মাধবলাল এসে তাতে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্ণওয়ালিশের কোটপ্যাণ্টের সঙ্গে গড়গড়া এবং বাঈজী নাচের সিম্বিসিসের মত জমিদারী কয়লার ব্যবসার আয়ে—ইংরিজিয়ানা ইংরিজী ইস্কুল—ইংরিজী মেজাজ ঢুকিয়েছিলেন। সাহেব ভক্তি ও ভয়ের আনুগত্যের বিনিময়ে রায়বাহাদুরী অর্জন ক'রে চন্দনপুরকে স্বর্গ না হোক যক্ষপুরী বানিয়েছিলেন। এরা আর যাই হোক—মানুষেতর কিছু ছিল। অন্তত যাকে যক্ষ বলা যায়।"

কথাগুলি আশুর নয়, কথাগুলি শ্যামাকিঙ্করবাবুর। তিনি বলেন—"স্বাধীনতার পর যক্ষপুরী অধিকারে এল মানুষের। যক্ষবাড়ীগুলিতে নোনা ধরল। নোনা ধরা বাড়ী হলে কি হবে—এ পুরী থেকে বেরিয়ে বাইরে এলে যক্ষেরা মানুষ হয়ে যাবে ভয়ে তারা ঘরের অন্ধকারে লুকোল। তেমনি যক্ষপুরী চৌধুরী বাড়ী। যার প্রতীক ঠাকুরবাড়ীর ভাঙা ফটকটা। বাড়ীটার সর্বাঙ্গে নোনা। ঝুরঝুর করে ঝরছে। জবুথবু স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে আছে। শক্ত হাড়ের মত শক্ত গাঁথুনী। পুরনো জ্যাম ধরা লোহার ফটক।"

আগে শুভেন্দুর বোলচাল কথাবার্তা যত আধুনিক হোক যক্ষপুরীর জবুথবুত্ব ছিল এবং যক্ষপুরীর রোমাঞ্চ মায়াও ছিল। সেটা ফুটত তার রোমাণ্টিক নায়কের অভিনয়ে—ফুটত তার ফিল্ম জগতে নাম করে মনোরম—বিশ্বপ্রিয় হবার সাধের মধ্যে। শুভেন্দুকে সে ওই তার বাবার অদৃষ্টের দুর্ঘটনার দিনেও দেখেছে। ভয় পেয়েছে। ছেলেটা না কিছু করে বসে। মারাত্মক কিছু। শ্যামাকিঙ্করবাবুর একখানা বইয়ে পড়েছে—অর্ধশিক্ষিত জমিদারের ছেলে—যে সৎ মা তাদের সকল দুর্দশার মূল—গৃহত্যাগিনী বলে অপবাদ আছে—সেই সৎমায়ের অপবাদের কথা কোন প্রজা উদ্ধতভাবে বলেছিল. বলে সে তাকে গুলি ক'রে মেরেছিল। শ্যামাকিঙ্করবাবুর সকল জীবন ও চরিত্র এখানকার। ওই প্রকৃতি চন্দনপুরের যক্ষতনয়ের প্রকৃতি। শুভেন্দু তেমনি কিছু করে না বসে।

আশ্চর্য সেই শুভেন্দু!—কোথায় কোন্ রন্ধ্রপথ ভেদ করে ঢুকল—মানুষের জগতের আলো বাতাস—নতুনকালের দিন—যার স্পর্শে মোচন হয়ে গেল তার যক্ষত্বের।

চিঠিখানা সীমার কাছে পৌছে দেবে কি করে ? আশু চিন্তিত হল। দেওয়া সহজ হবে না। অন্তত সকলজনকে গোপন করে দেওয়া অসম্ভব !

—ডাক্তারবাবু !

—কে ?

—আমি মাশায় ! নিমাই।

ওঃ—বাতব্যাধিগ্রস্ত নিমাই ! নিজেদের স্বৈরিণী কন্যাদের যৌনব্যাধির বিষে জর্জর নিমাই ! রাত্রে কাতরায়। গ্রামপ্রান্তে ঘর—তার কাতরস্বর—গ্রামবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ করে না। কেবল শিবনাথ দে ওদের পাশের বিস্তীর্ণ জমি আয়ত্ত করে বাড়ী ক'রেছে বলে সে মধ্যে মধ্যে শুনতে পায়। আর শোনে—নসু ও ফটিকদাস।

আশু জিজ্ঞাসা করল—কি হল ? কি চাই ? ওষুধ ?

—দেন বাবু ! মরে যেছি। ওঃ। কিন্তুক তার লেগে লয়। একবার সাবিকে দেখে এসেন। তার বেষম জর। কেমন লাগছে ! হাসপাতালে নিয়েই বা যাবে কে ? আমি তো এই খোঁড়া।

—ভবানীবাবুর কাছে গিয়েছিলি ? তাঁকে বলগে।

—আজ্ঞে কাল গিয়েছিলাম বিকেলে।

—কি বললেন ? পারবেন না তো বলবেন না তিনি।

—তিনি মশায় খাপ্তাখাপ্পা হয়ে বকছিলেন—ওই জাঙলহাটার মোড়লদিকে। আমি বলতে নেরেছি। পালিয়ে এলাম।

—এখন যা। এখন আর খাপ্তাখাপ্পা হযে নেই।

—তিনি বাড়ীতে নাই। সিউড়ী যেয়েচেন।

—তাই তো ! তবে ? আমি গেলাম না হয় একবার কিন্তু তাতে হবে না। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। দেখতে শুনতে তো লোক চাই !

ভবানীবাবু এগুলি করে। ঐ গুণেই এখনও এখানে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শত্রু-মিত্র, সেই যে তর্পণে আছে যে অবান্ধব যে বান্ধব যে জ্ঞাতি যে অজ্ঞাতি আমার জল নাও, ঠিক তেমনিভাবেই ভবানীকিঙ্কর মৃতের শবদেহ স্কন্ধে শ্মশানে যায়, নদীতে স্নান করে ওই মন্ত্রে জল দেয়। শুধু মৃত্যুর পরই নয়—মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের রোগে যে শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ায়—। সে এখানকার কংগ্রেসের প্রধান, হাসপাতালে গিয়ে ব্যবস্থা করে দেয়। দুর্ভিক্ষে মহামারিতে অগ্নিদাহে জলপ্লাবনে সে সর্বাগ্রে ছুটে যায়। এক বছর আগে প্রবল বন্যা হয়েছিল—আশেপাশের দুটো জেলায় একের তিন ভাগ ডুবেছিল। সরকারী কর্মচারীরা জিপে বোটে যেসব স্থানে পৌছেছিলেন, তাদের আগেই ভবানীকিঙ্কর হেঁটে বুকভরা জল ঠেলে সেখানে

পৌঁছেছিল —মানুষকে অন্তত 'ভয় নাই' কথাটা বলেছিল। ফিরে এসে বাড়ীতে বুকের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আশুই চিকিৎসা করেছে, বিনা পয়সাতেই সে তাকে বহু কষ্টে সুস্থ করেছিল। তার হৃৎপিণ্ডের ধ্বনির মধ্যে সে শুনেছিল, আর পারছি না। আর পারছি না।—এই কথা। ভবানীকিঙ্কর বিচিত্র—চারদিন পর আবার বেরিয়েছিল। কিন্তু হলে কি হবে। যক্ষপুরীর যক্ষরক্ত দেহে আছে—তার ক্রিয়া যাবে কোথায়—লোকটি অসম্ভব ক্রোধী। যার প্রাণ রক্ষা করে সেও তার এই ক্রোধের জন্য তার কৃতজ্ঞতা সপ্রেমে জানাতে গিয়ে ফিরে আসে। আরও একটি খুঁত আছে। সে খুঁত লোকটির লেখাপড়া বিমুখতা। কাগজ কলমের সঙ্গে তার বনিবনাও নেই। যক্ষের সম্পত্তি তাদেরও বেশ ছিল। তার কাগজপত্র ছিল একখানা ঘর বোঝাই। তার কিছু অবশেষে নেই—দেখবার লোকের অভাবে। কংগ্রেসের প্রধান। তারও খাতাপত্র বোধ হয় নেই। যা আছে তা ভবানীবাবুর পকেটে কুলোয়। তবে সরল মানুষ। হৃদয়বানও বটে। যারা এ যুগে অচল। তবু ওই এক কারণে চলে। আশু যাবে একবার, সাবিকে দেখে আসবে। সঙ্গে বরং ভবানীবাবুর ছেলে জগন্নাথকে নিয়ে যাবে। ছেলেটি বাপের গুণ পেয়েছে। তবে অগুণ ক্রোধটি পায়নি। ওকেই সঙ্গে নেবে। সে-ই গাড়ীর ব্যবস্থা করবে। আরও একবারের গাড়ী চাই। সে ভবানীবাবু এসে করবে। সাবিকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। ওই সাবিরা সবই মরবে। একে একে। "যত যক্ষপুরীর কালের যৌন অসংযমের পাপের ভারা—ওদের ঘাড়েই চাপানো আছে—যক্ষপুরীর কাল গত হবার পর ওরা যাচ্ছে। ওদের ফেলছে ভবানীবাবু ভালোই করছে। পাপক্ষয় হচ্ছে যক্ষবংশের।" এও শ্যামা-কিঙ্করবাবুর কথা। এ কাজ তিনিই প্রথম করতেন—প্রথম যৌবনে। তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম যক্ষপুরী থেকেই বৈরাগ্যবশে ও আলোর আহ্বানে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়িয়েছিলেন। দেশসেবা সমাজসেবার ধ্বজা তিনিই এখানে উঁচু করে তুলেছিলেন। তিনি চলে গেলেন এ সব ছেড়ে সাহিত্যকর্মে। তাঁর পরিত্যক্ত ধ্বজাপতাকা ভবানীবাবু তুলে নিয়েছে।

—ডাক্তারবাবু! কম্পাউণ্ডার ডাকলে।—কলে যাবেন না? রোগী তো সব অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।

—ও। আচ্ছা। ডাক্তার বের হল। ঘড়ি দেখলে, এগারটা পার হয়ে গেছে।

সামনে বি-ডি-ও আপিসে লোকারণ্য আজ।—কি ব্যাপার আজ?

কম্পাউণ্ডার বললে—রাস্তা। সব নতুন রাস্তা হবে। বড় রাস্তা থেকে গাঁয়ের রাস্তা। তাই মিটিং। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মেম্বাররা এসেছে।

—আচ্ছা।

—তুমি আমাদের হেমন্ত মাস্টারের ছেলে? ডাক্তার? এক সবল প্রৌঢ় মণ্ডলমশাই জাতীয় লোক এসে সামনে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ।

লোকটি বললে, তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিল। ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছিলাম। আমার নাম রঘুনাথ ঘোষ। বাড়ী রামডাঙ্গা।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। নাম শুনেছি আপনার। তিরিশ সালে পিকেটিং করতে গিয়ে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

—শুনবে বই কি। সে সব অনেক কথা। পড়াই ছেড়ে দিলাম। এখন পাকু ঘোষ বলে নাম। বুঝেছ! মানে সব কাজেই আমি নাকি পাক লাগাই। তা অন্যায় হলেই লাগাই। এক নম্বর আপত্তি আমি দিই। বিষয়কর্মেও মামলা-মকদ্দমা করি। তা বাপু একবার তোমার দোকানে বসব। কাগজ চাই, কলম চাই। দরখাস্ত লিখব। দরখাস্ততে আপত্তি দোব। লিখিত আপত্তি। নইলে ওরা সব লিখবে না।

—বেশ তো বসুন। কম্পাউণ্ডার রইল—কাগজ কলম সব দেবে। ওহে নবনী! এঁকে কাগজ কলম দাও তো।

—একখানা ভাল ফুলস্ক্যাপ কাগজ চাই। না থাকে তো কিনে আনুক। দেখ, এই যে সব কাণ্ড দেখছ সব নিজের পাতে ঝোল। সব নিজের গাঁয়ের রাস্তা হলেই বাস। তার ওপর চুরি। এক টাকা খরচ লেখে—চার আনা ছ আনার কাজ—দশ আনা ট্যাক-বন্দী। গতবারে—কংগ্রেসের ওপর ক্ষেপে—কম্যুনিস্টকে ভোট দিয়েছি। সে সব তখন কত ফতোয়া। ও দুই সমান। আমার গাঁয়ের একপোয়া পথ, এক হাঁটু কাদা বর্ষার সময়, খরাতে ধুলো—রাজপুতনার মরুভূমি। ঝড় যখন ওঠে তখন সে যদি দেখ! ও! তা দেবে না—ওই এক পোয়া রাস্তায় টাকা দিতে বলবে না দু পক্ষেই। আমি লিখিত আপত্তি দোব। আর গতবারে রাস্তা যা হয়েছে তার খরচের তদন্ত করতে বলব।

ডাক্তার মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে বললে—আমি যাই। কলে যাচ্ছি। আপনি বসে লিখুন।

—আচ্ছা। আচ্ছা। আমাদের ওদিকে কলে গেলে আমার বাড়ী যেও। বুঝেছ?

—যাব। নিশ্চয় যাব। নমস্কার।

—মঙ্গল হোক বাবা। আমি লিখি—তুমি যাও।

অয়েলস্কিনে মোড়া শোলা হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে আশু সাইকেল হাতে বেরিয়ে পড়ল।

সামনে অনেক লোক। বি-ডি-ও আপিসে এসেছে সব। এ অঞ্চলের বিশিষ্ট জনেরা। এখানে না চেপে সাইকেলটা ধ'রে নিয়েই হাঁটতে লাগল। চন্দনপুরের কুমোরের চাক ঘুরছে এখানে। পুরনো ভেঙে নতুন। মাঠ ভেঙে রাস্তা। মানুষ গাড়ীতে চড়ে ছুটবে, যেখানে যেতে চায়—কোথায় তা জানে না, তবে সামনে না হেঁটে উপায় নেই; নইলে পিছনের ধাক্কায় পড়তে হবে মরতে হবে—। পিছনে হটাও যায় না: কারণ মানুষের পায়ের পাতাগুলো সামনের দিকে লম্বা—চোখ দুটোও সামনের দিকে। তা যেখানে যেতে চায় (সেখানে সুখ আছে) সেখানে এমন পায়ে হাঁটা হেঁটে যাওয়া যায় না। যাবে না। তাই জীপে চড়ে ছুটবে।

এরই মধ্যে এক পাশে পুতুল নিয়ে বসে আছে ফটিকদাস। মধ্যে মধ্যে খাতা পেন্সিলে

ছকছে কিছু। অন্ত দোকান তো চন্দনপুরের জীবনযাত্রার যন্ত্রের সঙ্গে জোড়া হয়ে—পথের দুপাশে পাকা দোকানে পাতা অনেক দিন থেকে আছে। ফটিকদাস এবং ফটিকদাসের মত পথে বসা দোকানদার দু-চারজন।

সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলল ডাক্তার। কিন্তু নিজেদের মধ্যে লোকেরা এমন তর্কমগ্ন যে ঘণ্টাও কানে যাচ্ছে না।

—আশুবাবু! আপনি ডাক্তার আশুবাবু? পিছন থেকে কেউ ডাকলে।

—হ্যাঁ।

—নমস্কার। আমি—

—আপনাকে চিনি। আপনি আমাদের এম-এল-এ সীতানাথবাবু।

—হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে দু মিনিট কথা বলব।

—বলুন।

—এখানেই? কলে যাচ্ছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। একটু পাশে চলুন, দাঁড়াই। হবে না?

—না। চলুন বলতে বলতে যাই। নইলে আপনার দেরি হবে। কথা এমন কিছু নয়। একটা খবর নেব। শুনেছি আপনি মেয়েদের হোস্টেলে ডাক্তার। না?

—হ্যাঁ। ওখানে দেখি আমি।

—ঠিকই শুনেছি আমি। একটা খবর আমি চাচ্ছি।—বন্ধুভাবে, ভদ্রলোক হিসেবে—

—বলুন।

—অমর চক্কোত্তির মেয়ে সীমা। সে ওখানে থাকে।

—হোস্টেলে থাকে না, হেডমিস্ট্রেস ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।

—ওই হল।

—না, হল না। হেডমিস্ট্রেস ব্যক্তিগতভাবে আশ্রয় দিয়েছেন। ইস্কুল হোস্টেল—এ ধরনের দায়িত্ব নেয়নি। কারণ সকলে সীমার পালিয়ে আসা সমর্থন নাও করতে পারে। আপনি এখানকার এম-এল-এ। অমর আপনাদের লোক—

—প্রতিবাদ করব। অমর আমাদের লোক নয়। পার্টির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই।

—নেই? কিন্তু সে তো গতবার কংগ্রেসের টাকা খেয়েছে, আপনাদের কাজ করেছে।

—করেছে। হ্যাঁ করেছে। কিন্তু আমাদের পার্টির লোক সে নয়। ওরকম লোক—আমরা পার্টিতে নিই না। যেমন আগেকার কালে কংগ্রেস করত।—এখন তারা রুলিং পার্টি, তারা দল বাড়ানোকেই বড় কাজ ভাবে। তাই যে আসে তাকেই নেয়। সৎ অসৎ বাছে না। ডে-হট্টার অসীম চাটুজ্জে তিরিশ সাল থেকে খুনে পুলিস সাহেব সামসুদ্দোহার অনুচর ছিল। কোমরে রিভলভার বেঁধে ঘুরে বেড়াত। তার কীর্তি মুখে বললে পাপ হয়। সে লোকটা আজ গ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি। সেও গতবার কংগ্রেসের কাজ মুখে করেছে কাজে করেনি।

ওখানেই ভোট আমি বেশী পেয়েছি। তেমনি অমর চক্কোত্তি কংগ্রেসের লোক—বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে—আমাকে ভোট দিইয়েছে। তাতে সে আমার লোক না। আমার লোক সে নয়। কম্যুনিজমে ভগবান নেই। আমি কম্যুনিস্ট, কিন্তু বামুনের ছেলে, জাত মানি না, কিন্তু ছেলেমেয়ের বিয়ে বামুন ছাড়া দিইনে দিতে পারিনে। ভগবানও তাই। মানিও না, আবার না-মানাও নই। বাড়ীতে শালগ্রাম আছে—জমি আছে—সেবা চালাই। পলিটিক্সে মিথ্যে বলি। কিন্তু মিথ্যে যে বলে তাকে ঘেন্না করি। আর আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলছি না। অমর চক্কোত্তিও কংগ্রেসের লোক—রমেশও তাই। যারা কোন পলিটিক্যাল পার্টির লোক হতে পারে না। হওয়া উচিত নয়। আর আমি অমর চক্কোত্তির হয়ে কথা বলতে আসিনি। আমি খুশী হয়েছি—সীমার সাহসে, সে যা করেছে তাতে। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তা এই। শুনেছি—সীমাকে খেতে দেওয়া হয় হোস্টেলে—তার জন্যে তাকে ঝি বা রাঁধুনীর মত খাটানো হয়। একটা ভূতুড়ে ঘরে নাকি থাকতে দেওয়া হয়েছে। সেইটের সত্য মিথ্যে আমি জানতে চেয়েছি।

—ও চক্কত্তি মশাই। ও গো!—ডাকছে ওখান থেকে সীতানাথকে।

—যাচ্ছি।···সত্য কথাটা আমি জানতে চাই।

—দেখুন, আমি বললেও তো বিশ্বাস করবেন না আপনি।

—কেন করব না। নিশ্চয় করব।

—সীমা ওখানে গিয়ে একদিন পরে হেডমিস্ট্রেসকে বললে—দেখুন—আমি এখানে থাকব—খাব—তা এমনি কেন নেব এসব। আপনার রান্নার কাজটা আমি করে দিই। নইলে আমার ভারী খারাপ লাগবে। তবে আমার খরচও তো কিছু হবে। কাপড় বই এ সবে আপনি রান্নার লোককে খেতে দেন থাকতে দেন মাইনে দেন। আমাকে দেবেন। হেডমিস্ট্রেস তাতে রাজী হননি। বলেছিলেন, না, সে আমি পারব না। কথাটা হরিবিষ্ণুবাবুর কানে যায়। তিনি খুব খুশী হয়ে বলেন—তুমি গার্লস হোস্টেলে রান্নার তরকারী কি হবে—এসব যদি দেখাশোনা কর—তা হলে তুমি হোস্টেলে খাবে—থাকবে—মাইনেও পাবে দশ টাকা হিসেবে। কাজের লোক কাজ করবে—তুমি দেখেশুনে দেবে। আমাদের রাখতে হত এরকম লোক। তা তুমিই আরম্ভ কর। আর ভূতুড়ে ঘর-টর নয়। সেও প্রবাদ বাক্য। একটা ছোট ঘর পড়ে থাকত। ছোট এক কারণ, দ্বিতীয় কারণ ও-বাড়ী ভূতনাথ বাঁড়ুজ্জের বাড়ী—ভূতনাথের প্রথম স্ত্রী বিষ খেয়ে মরেছিল কিন্তু ও ঘরে নয়, তবে ওই ঘরটা ছোট বলে ওইটেতে ভূত হয়ে সে বাস করছে—এই আগে লোকে বলত। যেমন বড় বড় গাছ থাকতে শেওড়া গাছে ভূতের বাসা বলে থাকে লোকে। তাও হরিবিষ্ণুবাবু আপত্তি করেছিলেন। সীমাই ওটা বেছে নিয়েছে নিজে।

—ও চক্কোত্তি মশাই। মিটিং যে বসে গেল।

যথাসময়ে চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। ও থামে না।

পুতুলের দোকানের সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেছে। ফটিকদাস শুধু বসে আছে বাইরে

সীমা বসেছিল ঘরে। সেই যাকে বলছিল সীতানাথবাবু—ভূতুড়ে ঘর। সেই ঘরে নাকি ভূতনাথবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল—সে ভূত হয়ে বাস করত। কাঁদত। ছোট্ট ঘর। আগেকার চোরকুঠরী। লোকে নাকি সে কান্না শুনেছে।

বিচিত্র বিস্ময়। এই বাড়ী বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ী। যক্ষপুরীর বাঁড়ুজ্জেদের। তিন পুরুষ এক সন্তান। প্রথম পুরুষ কৃপণ। দ্বিতীয় পুরুষ মত্তপ ব্যভিচারী। তৃতীয় পুরুষ রোগগ্রস্ত বুদ্ধিহীন অক্ষম। তার মধ্যেও চলেছে ব্যভিচার। নারী-নির্যাতনও দু পুরুষের। লক্ষ লক্ষ টাকা নাকি ছিল। কোথায় উড়ে গেল ওই অক্ষমতার পথে, ব্যভিচার মত্তপানে এত যায় না এবং যায়নি। গেল অক্ষমতার পথে। সেই বাড়ী হস্তান্তরিত হয়ে চন্দনপুরের নতুনকালের গড়নের পথে হয়েছে গার্লস হাইস্কুলের হোস্টেল। কলকাতা ধানবাদ আসানসোল জামসেদপুর থেকেও মেয়েরা এখানে এসেছে।

যে বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেদনার্ত নারীর দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে থাকত—সেই বাড়ীর কোণগুলিতে ঘুরে বেড়ায় তরুণ কণ্ঠের কলহাস্য, কখনও কখনও কান্নাও ওঠে। ছোট মেয়েরা বাড়ী থেকে এসে প্রথম প্রথম কাঁদে। বিচিত্র একটি সংযোগ তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথম যখন এ বাড়ীতে গার্লস হোস্টেল হয় তখন নন্দুবালা ভাদুগান একটি বেঁধেছিল।—

ভাদু আমার বিবিসাহেব হবে গো।
যে বাড়ীতে কেউ শোনে নাই বউবিটিদের গলা—
বউ কেঁদেছে ঘরের কোণে বাবুর হাঁকাড় ছুই বাগানে—
সেই বাড়ীতে মেয়ের মেলায় এ কি হাসির পালা।
ভাদু আমার বিবিসাহেব হবে গো।

চোর-কুঠরিটার প্রথম জিনিসপত্র থাকত। এখন একটা জানালা কোটানো হয়েছে; সেটাই বেছে নিয়েছে সীমা। তার তক্তাপোশের তলায় এখনও জিনিসপত্র থাকে। ওর জিনিস আর কি? এক কাপড়ে এসেছিল। প্রথম ভবানীকিঙ্কর কিছু টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছিল ওর বই খাতা এবং দুখানা কাপড়ের জন্য। সেটা সীমা নিয়েছিল। এখন মাইনে পেয়ে একটা টিনের স্যুটকেস কিনেছে। ছিট কিনে দিদিমণির কাছে ব্লাউজ কাটিয়ে নিজেই সেলাই করে নিয়েছে। কেমন করে কোথা হতে কিভাবে সে এমন সৃষ্টিছাড়া হল তাও সে ভাবে মধ্যে মধ্যে। একলা হলে ভাবে। এই এখানে চাকরি নেওয়ায় যেতে তার দেরি হয় ইস্কুলে। ইস্কুলে তার নাম নেই। প্রাইভেট হিসেবে পরীক্ষা দেবে। সব সাবজেক্ট সে মোটামুটি জানে, কাঁচা সে ইংরাজীতে। দুবার ফেল সে ইংরাজীতেই হয়েছে। সংস্কৃতটা রেখে ভুল করেছে—ওটাতেই টায়ে-টায়ে তেত্রিশ পেয়েছে। কিছু বেশী হলে সেকেণ্ড ডিভিশন হত, কম্পার্টমেণ্টাল পেত। তাই সে ইংরাজীর ক্লাসের সময় যায়। সংস্কৃত ক্লাসেও যায়। সংস্কৃত ক্লাস প্রথম

দিকে। সংস্কৃতের ক্লাস সেরে হোস্টেলে ফিরে স্নান করে খায়, পড়ে। সেই অবসরে ভাবে।

নেলি বাড়ীতে দাদার চিঠি পেয়ে কাকার বাড়ী খবর দিয়ে ছুটে এসে সীমাকে খবর দিয়েছিল। সীমা খুশী হয়েছিল। কোন সন্দেহ কোন পক্ষে জাগেনি। নেলিরও মনে হয়নি সীমাকে ছুটে বলতে এল কেন? সীমারও হয়নি। সে প্রশ্ন করেনি, তা সে খবরটা এত লোক থাকতে আমাকে কেন বল তো? অত্যন্ত অসঙ্কোচে খুশী হয়েছিল। শুভেন্দুর তাকে ভালোবাসা সম্পর্কে কোন সন্দেহই ছিল না। শুভেন্দুর পত্রেও কিছু ছিল না। কচ দেবযানীর উপমা কচ দেবযানী অভিনয় নিয়ে—তার কোন দাগ তো উভয়ের মনেই পড়েনি। কতদিন তো তারপর দেখা হয়েছে কথা বলেছে। শুভেন্দুর ওটাতে প্রেমের কোন গন্ধ থাকলে শুভেন্দুই কি সেটা নেলিকে পড়তে দিত! তাই প্রথম চিঠি পাওয়ার দিন সে যেমন অসঙ্কোচে বলেছিল—দূর দূর; তেমনি অসঙ্কোচে খুশী হয়েছিল শুভেন্দুর চিঠি এসেছে সংবাদ শুনে। বলেছিল—বাবাঃ, বাঁচলাম নেলি। আমার মনে ভারী কষ্ট হয়েছিল। জানিস—ওকে যদি তখন সামনে পেতাম না খুব কষে যা-তা বলে দিতাম। বাড়ী থেকে না বলে পালানো খুব বাহাদুরি বুঝি! কাপুরুষ বলে দিতাম। তা তোর দাদা বাড়ী আসবে না? এলে আমি ঠিক বলব—দেখিস!

নেলি বলেছিল—দাদাকে লিখে দেব তাই। সীমা এইসব বলছিল।

—লিখিস।

নেলি চলে গিয়েছিল ইস্কুলে, সীমা ঘরে বসে ছিল। ঘণ্টাখানেক পর—হেডমিস্ট্রেস ক্লাসে এসে নেলিকে ডেকেছিলেন।—নেলি শোন।

নেলিকে সঙ্গে নিয়ে অফিস রুমের দিকে যেতে যেতে বলেছিলেন—আশুবাবু ডাক্তার এসেছেন, তোমার দাদার খবর বলতে। ওঁকে চিঠি দিয়েছে তোমার দাদা—সেটা পড়তে দেবেন। যাও, ভিজিটার্স্ রুমে রয়েছেন উনি।

আশু ডাক্তার অনেক ভেবেও এ ছাড়া পথ পায়নি। সে ইস্কুলে এসেছে—নেলি ছাড়া আর কারুর দ্বারা এ হয় না—হতে পারে না। একবার নেলিই শুভেন্দুর চিঠি সীমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় পত্রও সে-ই নিয়ে যাবে। নেলি যদি গররাজী হয়, তবে সে এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেবে অথবা শুভেন্দুকে ফিরে পাঠিয়ে দেবে।

নিজের চিঠিখানা নেলিকে দিয়েছিল—পড়। পড়ে দেখ।

নেলি চিঠিখানা পড়ে একটু বিহ্বল হয়েই তার দিকে তাকিয়েছিল। বোধ হয় ভেবে পায়নি কি বলবে! সেই অবসরেই আশু সীমার চিঠিখানা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেছিল—এটা দিয়ো। আর আমার চিঠিটা দাও।

নেলি তাই করেছিল। এবং আশু ডাক্তার যেতেই চিঠিখানা জামার মধ্যে পুরে হেড মিস্ট্রেসকে বলেছিল—আমি বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসব বড়দিমণি?

—যাও। তিনি পাশের ঘরে বসেছিলেন। ওই একটা কথা যা হয়েছিল—পড়। পড়ে দেখ। তারপর—নাও দিয়ো। আমার চিঠিটা দাও। এ সবই তাঁর কানে গেছে। তার

মধ্যে তো তিনি আপত্তির কিছু পাননি। কারণ সীমার নামগন্ধও তার মধ্যে ছিল না। তিনি তো চিঠিখানা বাপ-মাকে লেখা বাড়ীর চিঠি বলেই ধরে নিয়েছিলেন। নেলিকে বলেছিলেন যাও।

নেলির মনের মধ্যে তখন আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছে। তরুণ কৈশোরে—এই জীবনের এই পূর্বরাগের মাধুরীলীলায় সখীত্বে যে একটি সকৌতুক আসক্তি আছে সেই সকৌতুক আসক্তি জেগে উঠেছে তার মনে। সে দ্রুতপদে যেন ছুটতে ছুটতে এসে সীমার ঘরে ঢুকে বিছানায় বসেছিল—বাবা বাবা—তোমার আর দাদার জন্যে আমার এই নাজেহালের কি মজুরী আমি পাব তা জানি না। হয়তো লবডঙ্কা। কিন্তু আমি মলাম।

—কি ?

—কি ?—এই দেখ কি ? দাদার চিঠি। শ্রীচরণে নিবেদন। ধর।

—চিঠি ?—হাতে করে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিল নেলির দিকে।

নেলি বলেছিল—পড় না। সব মালুম হবে।

চিঠিখানা রুদ্ধনিশ্বাসে পড়ে গিয়েছিল সীমা। তারপর কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর চিঠিখানা ছিঁড়তে শুরু করেছিল। নেলি অবাক হয়ে দেখছিল। আধখানা ছিঁড়ে একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমেছিল সীমা—তারপর অত্যন্ত দ্রুত টানে চিঠিখানা কুচিকুচি ক'রে দিয়েছিল। আবার হেঁট হয়ে বসে কুচিগুলি কুড়িয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ আসেনি। নেলি বুঝেছিল—সীমা সেগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে গেছে। কিছুক্ষণ পর সীমা ফিরে এলে নেলি বলেছিল—ওতে কি লিখেছে দাদা আমি জানি না। তবে ভালবাসার কথা আছে সেটা জানি ; তবে—। কিছুক্ষণ থেমে বোধ করি সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা ক'রেই বলেছিল—তবে এ তো সংসারে আছে। লেখ চিঠি। খারাপ হলে নিশ্চয় আপত্তির কথা। কিন্তু দাদা তা লিখবে ? বিশ্বাস হয় না।

সীমা বললে—তোমার দাদাকে লিখে দিয়ো—আমার প্রেম করবার সময় নেই। বিয়ের জন্যে সীমা জন্মায় নি। তাহলে সে বিয়ের আসর থেকে উঠে আসত না। প্রেমের জন্যেও না। হলে তার প্রথম পত্রের উত্তরেই একখানি মস্ত লম্বা চিঠি লিখতাম। আমার লক্ষ্য আমার ভবিষ্যৎ অন্য রকম। তিনি যেন আমাকে উত্যক্ত না করেন। আমাকে পাস করতে হবে। পড়তে হবে। চাকরি করব আমি।

নেলি ফিরে এল। সে আর ইস্কুলে গেল না। মুহ্যমান হয়ে বাড়ী এল। বারোটা বাজে। তখন মা তার চণ্ডীতলায় পূজো দিয়ে সদ্য ফিরেছে। ছেলের খবর এসেছে। ছেলের চাকরি করে পড়ছে। খবর পেয়েই পূজোর জিনিস কিনে আনিয়ে পূজো দিতে গিয়েছিল। বাবা নীচে নেমে এসেছে।

* * *

বোর্ডিংয়ের ঘরে সীমা বসে ভাবছিল। হঠাৎ কে যেন তাকে ডাকলে। ভাবনার মধ্যে সে এতই মগ্ন হয়েছিল যে প্রথমটা আতঙ্কে চমকে উঠে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠেছিল।

সে সব ভুলেই গিয়েছিল, এমন কি নিজেকে পর্যন্ত।—কে ? কে ডাকলে তাকে ? এই দুপুর বেলা ?

চঞ্চলভাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, মনের ভয়টা যেন একটা বদ্ধপাত্র থেকে আকস্মিক ভাবে মুক্ত কোন উগ্র বাষ্পের মত তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। মনে হল এই চোরকুঠরীতে যে বউটির প্রেতাত্মা বাস করে—সেই বোধ হয় তাকে ডাকলে। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল।

পরক্ষণেই আবার সে ডাক শুনতে পেলে—সীমে ! অ—, সীমে !—

এবার সে সাহস পেল। না ঘরের ভিতর থেকে নয়, নিচে থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। —কে ? ঘরের ছোট্ট জানালাটা সে খুললে। নিচে থেকে সাড়া এল—আমি লো—ভাদুর-মা।

ভাদুর মা ! নসুবালা !—ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সীমা। কাজ নেই কর্ম নেই—এই একটা উপদ্রব—মেয়ে সেজে চিরকালটা একটা বিচিত্র অভিনয় করে গেল নসুবালা। কেন তা কেউ জানে না। কিন্তু সর্বত্র আছে ও। ওঃ! সেই যেদিন সে বিয়ের পোশাক পরে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে থানার বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল—সেদিনও ওই নসুই তাকে ঠিক এমনি ক'রে ডেকেছিল সীমে—সীমে ! অ-সীমে !

সে খুব রাগ করেই বললে—কেন ? কি—? কি বলছিস কি তুই ? এঁ্যা ?

—শুভেন্দু তোকে চিঠি নিকেছে ?

—কি ? কি ?

—শুভেন্দু তোকে চিঠি নিকেছে ?

—হঁ্যা নিকেছে ? তাতে তোর কি ?

—তাতে আমার কি বুন ? এই দেখ সীমে কি বলছে দেখ ! হেসে উঠল নসুবালা।—আমার অনেক—আমার অনেক তাতে সীমে—আমার অনেক ! এই দেখ্ তোর বিয়ে হলে বাসরে আমি গান করব। গায়ে হলুদের আসরে নাচব। একখানা কাপড় পাব। আর আমার মনে মনে খুব আনন্দ হবে। আর কি বল !

—না। তা তুমি পাবে না। কারণ বিয়ে আমি করব না।

—বিয়ে করবি না ?

—না। বিয়ে করব না !

—কি করবি ?

—লেখাপড়া শিখে চাকরি করব।

—চাকরি করবি ? বিয়ে করবি না ?

—না।

—বিয়ে করবি না তো চাকরি ক'রে কি করবি ?

—জানি না। যা।

—সীমে!

—না—না—না। তুই যা। তুই যা। খবরদার এমন ক'রে বিরক্ত করিস নে তুই। সশব্দে সে জানালা বন্ধ করে দিল।

—সীমে। অ—সীমে! সীমে—শোন। অ—সীমে!

সীমা উত্তর দিল না। চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়। মনে হচ্ছে যেন কেউ বা কোন অদৃশ্য শক্তি তার নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। একটা হাঁপানি ধরছে যেন।

এ কি প্রশ্ন? ওই মেয়ে-সেজে-থাকা নমুবালার এই প্রশ্নগুলো যেন সাংঘাতিক বলে তার মনে হল! তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এখনও সে প্রশ্নগুলো তার চারিদিকে যেন ফিস্ ফিস্ করে উচ্চারিত হচ্ছে। বিয়ে করবি না? কি করবি? চাকরি করবি? বিয়ে করবি না তো চাকরি করে কি করবি?

কি করব?—এই সারা দেশের মেয়েরা যারা এই নতুন কালে এইভাবে লেখাপড়া শিখছে—লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে তারা কি সকলেই বিয়ে করছে? না। করছে না। সেও করবে না।

এই তো কালের হাওয়া। কালের নিয়ম।

লেখাপড়া শিখবে মেয়েরা। স্বাধীন হবে তারা। পুরুষের মতই স্বাধীন হবে। চাকরি করবে। কি চাকরি করবে সে জানে না। তবে একটা চাকরি করবে। বড় একটা চাকরি। মস্ত বড় একটা চাকরি সে করতে চায়। মেয়েরা এখন উকীল হয়, ব্যারিস্টার হয়, ডাক্তার হয়, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট তাও হয়। মন্ত্রীও হয়। রাজ্যপাল গভর্নরও হয়। এর মধ্যে একটাও কি কিছু সে হতে পারবে না?

একটা তো অনায়াসে হতে পারে।—সেটা হল লীডার। রাজনৈতিক দলের লীডার। তার বাবা যা হতে গিয়ে হ'তে পারে নি। যা থেকে সে ভ্রষ্ট হয়ে একটা চিহ্নিত পতিত জনে পরিণত হয়ে গেছে। এই তো এখানকার সীতানাথ চক্রবর্তী এম-এল-এ—তার বাবার এক কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার কাছে গেলে সে তাকে সাগ্রহে তার দলে নেবে। কিন্তু না—তা সে যাবে না। না। লেখাপড়া শিখবে সে। একালের হাওয়াই এই। লেখাপড়া শিখবে, চাকরি করবে। স্বাধীন হবে,—সবার মত স্বাধীন। বাবার অধীনও থাকবে না। কোন পুরুষেরই অধীন থাকবে না।

বিয়ে?

বিয়ে সে তখন ইচ্ছে হলে করবে। যাকে তার পছন্দ হবে—ভাল লাগবে। যে তাকে ভালবাসবে—প্রমাণ দিয়ে সে ভালবাসাকে প্রমাণ করবে—তাকে সে বিয়ে করবে। সে জাত মানবে না—ধর্ম মানবে না—কোন মন্ত্র না—কোন তন্ত্র না,—শুধু বিয়ে—রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে করবে।

ম্যারেজ কণ্ট্রাক্ট। দরকার হলে ডাইভোর্স করবে।

ইচ্ছে না হয়—বিয়েই সে করবে না।

বিয়ে করাটাই সব নয়। না—নয়।

ওই যে বাবুদের ধনীদের আর একেবারে অক্ষরপরিচয়-হীন গরীবদের মেয়েগুলো বিয়ে ক'রে শাঁখা সিঁদুর পরে একপাল ছেলেমেয়ের মা হয়ে—নিজের কপালকে গাল দেয়—নিজের বাপকে গাল দেয় নিজের সব দুর্দশার মূল ওই স্বামীটাকে গাল দেয়—তা সে দেবে না।

না।

কালের হাওয়া। কালের হুকুম। কালের ফতোয়া।

১৯

কিছুদিন পর। আষাঢ় মাস, রথযাত্রার দিন। রথের ঢাক বাজছে। চৌধুরীদের ভাঙাবাড়ীর নড়বড়ে রথ।

কথাটা সতীশ ঘোষালের কথা। এমন কথা বানাতে কেউ পারে না। "চৌধুরীদের ভাঙা-বাড়ীর নড়বড়ে রথ—আজ ঢেঁকিস্তো ঢেঁকিস্তো ক'রে হেলতে হেলতে চলবেন। একবার এদিকে কাৎ হবেন—একবার ওদিকে হেলবেন ;—পড়লেও পড়তে পারেন, পড়াই উচিত কিন্তু মজার কথা পড়েন না। পড়ছেন না। শালা দশমুণ্ড রাবণের মত—কাটলে আবার গজায়। মন্দোদরীর কাছে গচ্ছিত আছে ব্রহ্মাস্ত্র—সে বাণ নইলে মরবে না। বেটা লর্ড কর্ণওয়ালিশ ছিল ব্রহ্মার অবতার—সেই বেটাই এই রাবণদের পত্তন করে গিয়েছে। এ যাওয়া কি সোজা কথা।"

আপন-মনে বাক্যের তুবড়ী ফোটাতে ফোটাতেই চলেছেন সতীশ ঘোষাল ঠাকুরবাড়ী। সংসারে এইটি ছাড়া তাঁর আর কর্ম নেই। যেখানে পর্ব সেখানে সে যাবেই এবং বকতে বকতে যাবে।

চৌধুরী বাড়ীর এজমালী ঠাকুরবাড়ীর কথা এখানকার সকলের কাছেই সুবিদিত। সকলেই জানে। এর পিছনে প্রবাদ আছে কাহিনী আছে ইতিকথা আছে—ইতিহাস আছে। গ্রাম-প্রান্তে অট্টহাস শক্তিপীঠ। ওই শক্তিপীঠকে প্রকট করেছিলেন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী নিজে ছিলেন বৈষ্ণব। সেই মন্তেই সাধনা করতেন তিনি কিন্তু তাঁকে দেবতা দেখা দিলেন শক্তিরূপা হয়ে। সন্ন্যাসী সিদ্ধ হলেন—ঈশ্বরকে মাতৃরূপে পেয়ে। কিন্তু কৃষ্ণ-মূর্তিকে নিয়ে পড়লেন বিপদে। তাঁর কাছে ছিল একটি কৃষ্ণমূর্তি এবং একটি শালগ্রাম শিলা। এই মূর্তি দুটিকে কিছুদিন মাতৃরূপা শক্তির সঙ্গে একসঙ্গেই পূজা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। কারণ শক্তিপূজার জন্য মৎস্য মাংস মদ্য প্রভৃতি উপকরণ একসঙ্গে পূজার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি এই গ্রামের ওই চৌধুরীদের শ্রীকান্ত চৌধুরীকে ডেকে তাঁকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে

এই বিগ্রহ এবং শালগ্রাম শিলা দান করেন। শালগ্রাম শিলা এবং বিগ্রহ দান ক'রে—পূজা তাঁদের উপর চাপিয়ে দেননি—সঙ্গে সঙ্গে ভূসম্পত্তির ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছিলেন। তখন মুসলমান আমল। এ অঞ্চল ছিল রাজনগরের নবাব—বা দেওয়ান সাহেবের দখলী অঞ্চল। মুর্শিদাবাদের নায়েব-নাজিমকে সামান্ত কর দিয়ে স্বাধীন নবাব সাহেবের মতই তিনি থাকতেন। এখানেও প্রবাদ আছে যে রাজনগরের নবাবদের আদিপুরুষ এখানকার হিন্দু রাজাকে বধ ক'রে যখন সিংহাসন দখল করেন, তখন রাজার ইষ্ট-দেবী কালীর কোপে পড়ে দেবীর কাছে এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর রাজ্যে হিন্দুর দেবতা ও দেবমন্দিরের কোন অনিষ্ট হবে না। হিন্দুর উপর হিন্দু বলে কোন অত্যাচার হবে না। এবং যথোচিত রাজদরবারের সাহায্য সর্বদাই প্রসারিত থাকবে। সে প্রতিশ্রুতি তাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে কখনও লঙ্ঘন করেননি। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই রাজনগরের নবাব সন্ন্যাসীর বিভূতি দেখে শ্রদ্ধাবশে এই দুই দেবতা অর্থাৎ শক্তিপীঠ এবং এই বৈষ্ণব বিগ্রহ দুয়ের জন্যই দু-দফা ভূসম্পত্তির সনদ দিয়েছিলেন। অবশ্য, আজকাল লেখাপড়া জানা লোকেরা বলে ও সব স্বপ্নটপ্ন কিছু না—দু-দফা সম্পত্তি পাবার জন্তই শাক্ত বৈষ্ণব দুই দেবতারই সৃষ্টি করেছিল ওই সন্ন্যাসী।

আর একদল বলে—বাজে কথা, সন্ন্যাসীই হল বাজে কথা। আসলে সব হল ওই সুচতুর শ্রীকান্ত চৌধুরী—সেই ওই এক সন্ন্যাসীকে সামনে খাড়া ক'রে এই বিরাট দেবোত্তর ব্যবসার পত্তন ক'রে গিয়েছিল। কারণ এই চৌধুরীরা সন্ন্যাসীর শিষ্য হিসাবে একদিকে হল বৈষ্ণব দেবোত্তরের মালিক, আর একদিকে এরাই হল জমিদার হিসেবে শাক্ত দেবোত্তর ওই অট্টহাসের সেবায়েত। সুতরাং ফেরালে কোঁৎকা ঘোরালে লাঠি। যাক সে কথা।

এরপর শ্রীকান্ত চৌধুরী চাকরি পেয়েছিল রাজনগরের নবাব দপ্তরে—এখানকার পরগণা কুতবপুরের নায়েবের অধীনে হিসাবনবীশ হয়েছিল শ্রীকান্ত চৌধুরী এবং হিসেবের কোন্ ফাঁক দিয়ে একটা লাটের ছ আনা অংশ দিয়ে একটা স্বতন্ত্র লাট তৈরী ক'রে নিজেদের বৈষ্ণব দেবতার নামে দেবোত্তর করে নিয়েছিল—তার সব বিশদ বিবরণ কারুর আর মনে নেই, কিন্তু নবাব দরবারে যখন এই লাট চুরি ধরা পড়ে তখন নবাব সাহেব চমৎকৃত হয়ে যা বলেছিলেন—তা কেউ ভুলে যায় নি। সে কথাটা চৌধুরীদের দু-চারজন প্রাচীনপন্থী তান্ত্রিক, আজও অহংকার করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে থাকে। তারা বলে—"নবাব বলেছিলেন—শ্রীকান্ত চৌধুরী নিমকহারাম.হারামজাদ লেকেন হিসাব জিন্দা আচ্ছা কলমবাজ! ইয়ে না.কচ কভি নেহি হো সকতা! লিখে দাও—"খাতে বকশিশ—কলমবাজীকা!" সেই হিসাব ভুলের বকশিশ ওই জমিদারী থেকে তৈরী হয়েছিল এই ঠাকুরবাড়ী। এই ফটক! ফটকের কথা আগে বলেছি।

রথের সময় থেকে এই ফটকের ভিতর দিয়ে ঠাকুরের উৎসব যাত্রার শুরু! রথযাত্রায় ঠাকুরের রথ বের হয়, তারপর এই ফটকের সামনে—ওই বকুলগাছের ডালে ঝুলন পূর্ণিমার দিন ঝুলন যাত্রায় গোবিন্দ ঝুলনে চাপেন। রাসের সময় পূর্ণিমার পরদিন ঠাকুর চতুর্দোলায় চেপে এই ফটকের ভিতর দিয়ে গাঁয়ের বাইরে বনভোজনে যান।—চৌধুরীবাড়ীতে ছেলে হলে সে

ছেলে প্রথম ষষ্ঠীতলায় যায় এই ফটকের ভিতর দিয়ে। পৈতেতে এই ফটকের ভিতর দিয়ে গিয়ে ঠাকুরপুকুরে চান ক'রে আসে। এই ফটকের তলা দিয়ে ছেলে বিয়ে করতে যায়। মা ফটকে দাঁড়িয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্ছ বাবা?

ছেলে বলে—তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি মা।

ছেলে বউয়ের পালকি এখানে এসে নামে। মা বউয়ের ঘোমটা খুলে বউয়ের মুখ দেখে ছেলে বউ নিয়ে গোবিন্দমন্দিরে গিয়ে প্রণাম ক'রিয়ে তবে ঘরে নিয়ে গিয়ে তোলে। চৌধুরী বংশে যে বাড়ীতেই কেউ মরুক শবদেহ নিয়ে যাবার সময় এখানে একবার নামিয়ে খানিকটা ধুলো মৃতের মাথায় দিয়ে বলে—ব্রজের ধুলো মাথায় নিয়ে চলে যাও।

শ্রাদ্ধের আগে ভষ্টীরাম ব্রাহ্মণেরা এসে ঘটির মধ্যে চাবি নেড়ে বাজনা বাজিয়ে গাইত—"ওগো বাবুগো তোমার বাবা দেহ ত্যাগ করে ব্রজের ধুলো কপালে নিয়ে সর্বাঙ্গে হরিনাম লিখে তিলক রচনা করে হরিপ্রেমে দরবিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণ করতে করতে বায়ুপথে বৃন্দাবনাভিমুখ গমন করলেন—ওগো···বাবুগো—বৃন্দাবন হতে তোমার পিতৃদেব— ।"

সতীশ ঘোষাল হাতের লাঠির উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে পথ চলে; অহরহই মনে হয় মাথা ঘুরছে, মনে হয় পড়ে যাবে কিন্তু এইসব মনে করতে করতে কখন যে সব ভুলে গিয়েছিল তা তার খেয়াল ছিল না। সে বেশ সরল পদক্ষেপেই চলতে চলতে পরম কৌতুকে আপন মনে খু-খু-খু শব্দ করে হেসে ফেলছিল।

"বৈকুণ্ঠে গমন করছেন। অহো।"

"ব্রজের ধুলো লেপন করছেন। বাহা-বাহা-বাহা।"

চৌধুরী বংশটার উপরেই তার ক্রোধের আর শেষ নেই। কেন সে তা বলতে পারবে না। সে নিজে চৌধুরীদের দৌহিত্র বংশের ছেলে; যেটুকু জমিজমা আছে তার সবটুকুই চৌধুরীদের দেওয়া। তার বাপ চাকরি করেছে। করেছে হরিবিষ্ণুবাবুদের বাড়ী। সেও কিছুদিন করেছিল—কিন্তু বনেনি। বনেনি ওই হরিবিষ্ণুবাবুর সঙ্গেই। হরিবিষ্ণুবাবু ওর স্কুলের সহপাঠী। স্কুল থেকেই দুজনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেই কারণেই হরিবিষ্ণুবাবুর কাছে চাকরি করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

—মারো পয়জার শালা নোক্‌রির মাথায় গোলামির মুখে। নেহি দরকার শালা যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাতে—। দুনিয়ার কারুকে সে ক্ষমা করবে না। দেখো না বাবা ভেল্কিকা খেল। জিন্দগী বদল গয়া, পিঁড়ি উলট গয়া— ।

হঠাৎ একটা গোলমাল কোথায় হল শুনে ঘোষাল চমকে উঠল। কি হল?

কলরব উঠছে।

একটা ব্যস্তসমস্ত ভয়গ্রস্ত কোলাহল। সরে যাও সরে যাও—সাবধান! সাবধান যেয়ো না। ওদিকে যেয়ো না।—এই এই!

* * *

সামনেই চৌধুরীদের প্রাচীনকালের গোপনব্রজ মাটির বৈকুণ্ঠ। এই নামই ছিল ওদের

ঠাকুরবাড়ীর। সামনে ঠাকুরপুকুরের পাড়ের উপর রথের মেলা বসেছে। মেলা মানে ঘণ্টা কয়েকের মেলা। বেলা দশটা থেকে বসতে আরম্ভ করেছে। চারটে খুঁটি পুতে মাথায় একটা চট বা ভেরপলের ছাউনি দিয়ে তক্তাপোশের উপর সুরো ময়রা, ভবা ময়রা, গিরি ময়রা, সুহাসী ময়রাণী—ওরা রসগোল্লা পান্তোয়া প্রভৃতি মিষ্টির দোকান সাজিয়ে বসেছে। বৈরিগীদের গোপেশ পাঁপর তেলে ভাজার আসর পেড়েছে, একটা টিনের উনোনে কয়লার আঁচ দিয়ে কড়ায় পাঁপর ভাজছে। ওপাশে কাঞ্চনী ময়রানী পাঁপর ভাজছে। ওদিকে আমওয়ালারা এসেছে আম নিয়ে। এখন মালদার আমের আমদানি। এবং পাকিস্তানে—ভারতে দেশভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গে আর মালদার আম যায় না। আমের ঠেলটা আসে এদেশে। কাঁঠালের আমদানি হয়েছে। কয়েকটা বাজীকর এসেছে। ঠাকুরবাড়ীর ভেতরের এলাকায় অ্যাম্প্লি-ফায়ার সহযোগে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজছে। চৌধুরীবাড়ীর ছেলেরা বাজাচ্ছে। গোপাল চৌধুরীর খুড়তুতো ভাইদের এখন চলতি ভাল। জমিদারী যাওয়ার জন্ম তারা বিশেষ ধাক্কা খায়নি। তারা তাদের মাতামহের অর্থ পেয়েছে, তা ছাড়াও লোকে বলে তারা নাকি গুপ্তধনও কিছু পেয়েছে মাটির নিচে থেকে। সেই মূলধনে তারা জমিদারী দণ্ডটিকে সুযোগ্যতার সঙ্গে বাণিজ্যের তোলদাঁড়ী বা মানদণ্ডে পরিণত ক'রে ভাল চালাচ্ছে। দিন-কাল এখন তাদের ভাল। তাদের বাড়ীর ছেলেরাই এ ব্যবস্থা করেছে।

আগে অনেক সমারোহ হত। আশা-সোঁটা নিয়ে—পাইক নগ্দী বরকন্দাজ ঢাক ঢোল কাঁসী বাঁশী বাজিয়ে রথের পুরোভাগে মিছিল চলত, খই-বৃষ্টি হত, বাতাসা থাকত, পয়সা থাকত। সে সব উঠে গেছে। আগে কয়েকখানা গ্রাম থেকে হরিনাম সংকীর্তনের দল আসত—তারা সকাল থেকেই গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে বেড়াত; এখানেই প্রসাদ পেতো, কিছু কিছু বিদায় পেতো; তারাও আর আসে না। রথযাত্রার উৎসব যেন ক্রমে ক্রমে নীরব বিষণ্ণ জরাগ্রস্ত স্তিমিত হয়ে এসেছিল—যুদ্ধের পরবর্তী এই নূতন কালের ধর্মে—; লোকজন অনেক আসে—আগের থেকে অনেক গুণে বেশীই আসে। হুল্লোড় হয়—মেলায় বেচাকেনা হয়, কিন্তু সে সবই সেই বিকেলে,—অর্থাৎ অকালে, যখন নাকি রথযাত্রার আসল অনুষ্ঠানের অনেক পরে। যেন তার সঙ্গে এই জনতার কোন যোগই থাকে না। সকাল থেকে রথের পূজার্চনার সময়টিতে সব স্তিমিত জীর্ণ পুরাতন বাতিল বলে মনে হয়। যা আকারে ইঙ্গিতে বলে—"চৌধুরীদের ডাকে কেউ আসে না, কেউ আসে না—ওদের আর কেউ পোঁছে না।" সেটা চৌধুরীদের মধ্যে যারা অন্ততঃ কিছুটা জীবন্ত—তাদের পীড়া দেয়। সেই হেতু এই গ্রামোফোনে অ্যাম্প্লিফায়ার লাগিয়ে গানের চব্বিশপ্রহর এবং 'মচ্ছব' অর্থাৎ মহোৎসব জুড়ে দিয়েছে। গোপাল চৌধুরীর ভাইপোরা দুজনে বসে রেকর্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এই পল্লী অঞ্চলের আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত যে শূন্যলোক সে লোকটির গাঢ় নির্জন কোলাহল এখানে সচরাচর থই পায় না, হারিয়ে যায়। কিন্তু এই যন্ত্রযোগে আজ আকাশ পর্যন্ত শূন্যলোককেও যেন গানে গানে ছেয়ে দিয়েছে।

সতীশ ঘোষাল কানে হাত দিয়ে আক্ষেপ করে বললে—রাধামাধব হে! কি কালই হল!

এই চীৎকারে মানুষের মাথা ঠিক থাকে? হরি—হরি—হরি। সুর নয়—অসুর। গান নয়—ঘেন্তা-ঘেচাং—ঘেতাং ঘেতাং। শালা—মারো ঝাড়ু, ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর এইসব বেলেল্লাপনা। থমকে দাঁড়াল সে ফটকের সামনে। সেই ভাঙা ফাটা ফটকটা। চৌধুরী পরিবারের লোকেরা বলে—'সিং দরজা' অর্থাৎ সিংহদ্বার।

সতীশ ঘোষাল বলে—শালা সিংহদ্বার—! সিং দরজা? গুষ্টির পিণ্ডি। 'কুত্তা মুড়ি'! অর্থাৎ কুকুর ঢুকবার গলি বা নর্দমা!

ফটকটার বাইরের দিকটায় ঠাকুরপুকুরের পাড়ের উপর মেলার এলাকা। ওই ফটকটা ঠাকুরপুকুরের পশ্চিম পাড়ের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। ফটক থেকে বেরিয়ে দুদিকে চলে গেছে দুটো রাস্তা। বা একটা পথই ফটকটাকে পাশে রেখে পুকুরপাড় ছাড়িয়ে চলে গেছে উত্তর ও দক্ষিণ মুখে। এইটেই গ্রামের ভিতরের সাধারণের ব্যবহার্য কুলি শড়ক। আগে এটা চৌধুরীদের নিজস্ব পথ ছিল—এখন সর্বসাধারণের।

ফটকটার ওপাশে অর্থাৎ ভিতর দিকে—চৌধুরীদের ঠাকুরবাড়ী চন্দনপুরের গুপ্ত বৃন্দাবন; সাধারণ প্রজাসজ্জনেরা বলত—'ন বেন্দাবন' অর্থাৎ নব বৃন্দাবন। বলবার কারণ আছে; চৌধুরীরা সে-কালে এই ফটকের ওপাশে লম্বা প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে কোথাও তৈরী করেছিলেন রাসমঞ্চ, কোথাও বা ঝুলনবেদী, কোথাও দোলমঞ্চ, কোথাও তমাল বন,—তালবনের জন্যে চেষ্টা করতে হয় নি—তালবন এখানে সর্বত্র। তমালবনের একটা তমাল গাছ এখনও আছে। এ ছাড়া সবই এখন ভাঙাভগ্ন ফাটা-ফুটো; এরই মধ্যে পার্বণগুলি পালিত হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম যাগযজ্ঞগুলি অনুষ্ঠিত হয়। আজও তাই হচ্ছে।

গোবিন্দবিগ্রহ এবং রাজরাজেশ্বরের পাকা দালানের সামনে এককালের পাকা নাটমন্দিরে ঠাকুরদের বসিয়ে রথযাত্রার যজ্ঞ হচ্ছে; পাশেই নড়বড়ে কাঠের রথখানা রাখা হয়েছে—কড়ি ভটচাজ পুজো করছে। সামনে পাতায় পাতায় নৈবেদ্যের আয়োজন, সে নৈবেদ্য অবশ্য যৎসামান্য,—চারটিখানি ভিজে আতপ চাল, একখানা বাতাসা, চিমটি দুই-তিন চিনি, টুকরো দুয়েক আম, এক আধ কোয়া কাঁঠাল। তবে তার পাশে চৌধুরী শরীকদের বাড়ী থেকে বাটীতে বাটীতে এসেছে নৈবেদ্য—তাতে আম আছে, কাঁঠাল আছে, দুধ আছে, মিষ্টান্ন আছে। মোটামুটি ভাল পরিমাণেই আছে। দু-চারজনের বাটীতে তো প্রাচুর্যের চিহ্ন রয়েছে। সেও ওই গোপাল চৌধুরীর ভাইদের এবং ওদের ভাগ্নে হরিবিষ্ণুবাবুদের বাড়ীর ভোগ বলে চিনতে কষ্টও হয় না দেরিও হয় না।

নাটমন্দিরের একদিকে চৌধুরীবাড়ীর গিন্নীবান্নীরা ময়লা এবং গন্ধওলা পবিত্র পুজোর পট্টবস্ত্র প'রে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। অধিকাংশই এঁরা বিধবা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা; এবং চেহারাগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। যারা সধবা তারা বরং অপেক্ষাকৃত শীর্ণ। অল্পবয়সী সে সধবা এবং কুমারী দুইই—তারা একটু অল্পদূরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় তারা মাত্র দর্শক। তাদের কাপড়ের রংয়ের বাহার এবং আভরণের ঝলমলানি এই ভাঙাচোরা পুরনো নাটমন্দির ও এই অপ্রচুর আয়োজনের সঙ্গে বিসদৃশভাবে সামঞ্জস্যহীন হয়ে চোখে ঠেকছে,

অসঙ্গত বলেও মনে হচ্ছে। বউদের মাথায় ঘোমটা থাকলেও সে আধঘোমটা—তাতেই অবশ্য চেনা যায় বউ বলে। মেয়েরা সে কুমারী বা সধবা যাই হোক—তাদের মধ্যে কিছুটা আট-পৌরে ভাব আছে কিন্তু বউয়েরা সবই যেন পোশাকী কাপড়ের মত পরিপাটীভাবে ইস্ত্রী করা। প্রায় সকলের নখেই নেলপালিশ লাগানো—ক'জনের ঠোঁটে লিপস্টিকের রঙ টুক্‌টুক্ করছে।

নাটমন্দিরের আর এক প্রান্তে বসেছে পুরুষেরা। পুরুষেরা অর্থে প্রাচীন প্রবীণেরাই বেশী। গোপাল চৌধুরীর মত যাঁরা প্রবীণ এবং যাঁরা প্রাচীন গৌরবের ছেঁড়া সাদা ছাতা মাথায় দিয়ে বেড়ান তাঁরা। গোপাল চৌধুরীর জ্ঞাতিভাই হরেকৃষ্ণ চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ব্রজকান্ত চৌধুরী বসেছেন শতরঞ্চির উপর। সকলেই ঘাটের উপর। কাঠের নল লাগানো দুটো পুরনো গড়গড়ার তামাক চলছে। দা-কাটা তামাক। কেউ কেউ বিড়ি খাচ্ছেন। কথাবার্তা বেশী হচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে টুক্‌রো টুক্‌রো কথা। সে কথাও কেউ কারও সঙ্গে বলছে না—যে যার আপনার মনে বলে যাচ্ছে।

—রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন—ন—ন বিদ্যতে।

—এবার আকাশ যে নীল হে। এক টুক্‌রো মেঘ নেই।

—হিসেব দিতে হবে পাই পয়সার। সব লুটে খাচ্ছে।

—এঁঃ···বিধবার পোশাক দেখ! বিধবা! রাম রাম রাম!

একটু দূরে বসেছিলেন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীর দল; এখানে তামাকের ঝঞ্ঝাট নেই—সিগারেটের আসর; মানুষেরা সকলেই চল্লিশ পারের মানুষ। গায়ে ফতুয়া বা গেঞ্জি—পরনে ধুতি, প্রান্ত খানিকটা তুলে কোমরে গোঁজা। হাঁটু পর্যন্ত বেরিয়ে আছে। এখানে কথাবার্তায় যোগাযোগ আছে—বিচ্ছিন্ন কাটা কাটা কথা নয়, শীতল হিম নয়, তাপ আছে।

আরও খানিকটা দূরে প্রায় ফটকটার সামনে ওই ঝুলনমঞ্চের আমগাছতলায় বসেছিল আর একটি দল। দলটির মানুষগুলি সবাই পঁচিশের নীচে। নাটমন্দিরের মানুষগুলির দিকে পিছন ফিরে সিগারেট টানছিল। মধ্যে মধ্যে উঠছিল হাস্যধ্বনি। এদের কয়েকজনেরই পরনে ঢিলা পায়জামা এবং শার্ট বা পাঞ্জাবি, কেউ কেউ হাওয়াই শার্টও চালিয়েছে। জনদুয়ের পরনে ফুলপ্যান্ট এবং শার্ট। কাপড় পরে খালিগায়ে বসে আছে একজন।

মধ্যবয়সীদের আসরে চলছিল—ল্যাণ্ড রিফর্ম থেকে কম্‌পেনসেশনের কথা। ব্লক-ডেভেলপমেন্ট আপিসের কথা; প্রধান বক্তা এখানে গ্রাম-অধ্যক্ষ। আলোচনার উত্তাপ এখানে পুরনো কালের ম্যালেরিয়া জ্বরের মত—শন শন করে একশো পাঁচে গিয়ে উঠেছে। কথাটা শুরু হয়েছিল—গ্রামের রাস্তা নিয়ে। গ্রামের রাস্তাটি খানাখন্দে এমন ভরে উঠেছে—যে গরুর গাড়ী ছাড়া আর কোন যানই নিরাপদ চলনে চলতে পারে না।

কথাটা তুলে দিয়েছে চৌধুরীবাড়ীর ভাগ্নেদের ভাগ্নে—ইস্কুলের মাস্টার মনোমোহন চাটুজ্যে। আজ রথের ছুটি। এখানে মেলা হয় বলে সকালে স্কুল বসেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটি হয়ে যায়। স্কুল থেকেই ফেরার পথে মনোমোহন চাটুজ্যে ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকেই গোপাল চৌধুরীর খুড়তুতো ভাই নেপাল চৌধুরীকে বলেছিল—এবার কি রথ আপনাদের মায়ের তলা পর্যন্ত যাবে

না নাকি মামা ?—পথ যে একেবারে দুর্গম গিরি কান্তার মরু—! রথের দিন এক পশলা বৃষ্টি যদি চেপে হয় তো দুস্তর পারাবারও হয়ে যাবে! যা—খানা-খন্দ দেখে এলাম!

নেপাল চৌধুরী মানুষটির অবস্থা ভাল হলেও উত্তাপ বা কর্কশতা নেই তার মধ্যে। প্রকৃতিতেই মানুষটি ঠাণ্ডা মিষ্টি। সে বললে—বলো এই পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষবাবুকে!

গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ চৌধুরী—নিরীহ ভালমানুষ। তার নিজের কোন রাজনীতি নেই—তবে তার শালা বামপন্থী, তার ছোট ছেলে বামপন্থী কিন্তু ভগ্নীপতি কংগ্রেসী পাণ্ডা—সে আবার এখানকার অঞ্চলপ্রধান। বিষ্ণুপদ বললে—গ্রামের লোক ট্যাক্স না দিলে অধ্যক্ষ কি করবে। কোত্থেকে টাকা আসবে হে?

—সে তোমার কংগ্রেসী বোনাইকে জিজ্ঞাসা কর। বাবা, ওপর থেকে টাকা আসছে—কাঁড়ি দরুনে,—বি-ডি-ওকে পকেটে পুরে কাটো ভ'উচার করো সই। ব্যাস। এদিকে ট্যাক্সো চালাচ্ছ। এই তো মার্চে টাকা আদায় করেছ ডিস্‌ট্রেসের ভয় দেখিয়ে, গেল কোথায় সে টাকা? শালা সব খেয়ে দিলে হে।

—দেবে না? বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে হে? বলিহারি বাবা এক নয়নের দিব্যদৃষ্টি! বাবা বেছে বেছে যত জোতদার আর ব্যবসাদার অর্থাৎ শাঁসালো এবং ধুরন্ধর ব্যক্তিকে বসিয়ে দিয়েছে জেলা কংগ্রেস থেকে মণ্ডল কংগ্রেস পর্যন্ত, ওদিকে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে থানা পরিষদ পর্যন্ত। জেলা পরিষদ বাকী। তা সেখানেও হয়ে যাবে মিলওনার বাবু; সে-ই তো কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট।

এই কথাতেই তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে—যেন হঠাৎ এক ঝলক উত্তাপ দমকা হীটওয়েভের মত এসে পড়েছে। এখানকার মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি উত্তপ্ত হয়ে বলে উঠেছে, আই প্রটেস্ট। স্ট্রংলি প্রটেস্ট! এভাবে পারসোনাল অ্যাটাক—

তার কথা শেষ হয়নি—দিবাকর চৌধুরী রাগী মানুষ, সে বলে উঠেছে—আই ডোণ্ট কেয়ার। আমি আবার বলব—

—বলো না দিবাকর। রিপোর্ট চলে যাবে—তুমি, তোমার গুষ্টি সব লাল মেরে গেছ!

—গেছি তো গেছি। কার কি সাধ্য আছে ক'রে নিক!

—সাধ্যি আর কি! থানা থেকে নজর রাখবে—

—রাখুক বাবা রাখুক। দেশের টাকাগুলো নিয়ে তছনছ করে দিলে বাবা! দেশে বলবার মানুষ নেই।

হেসে আবার নেপাল চৌধুরী বললে—মানুষ নেই মানে?—এতবড় সতীশ ঘোষাল মন্দ মানুষ জ্যান্ত কবি ছড়াদার থাকতে, অমর চক্কোত্তির মত গলাবাজ থাকতেও বলছ মানুষ নেই? বল কি হে!

—চুপ কর ঘোষাল আসছে। হাতে লাঠি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেছি আমি।

—আজকালকার ধুয়োটা কি তার বল তো? শুনতে কিছু পাই না।

—শুনবে কি? কিছুদিন চুপচাপ আছে—সেদিন পথের উপর ওকে ছেলেরা ধরে টাইট খুব

দিয়েছিল। ভাগ্যে সেদিন সুরেশ্বরবাবু ছিল তাই রক্ষে—না হলে করোনারী না-হয় সেরিব্রেল থ্রমবসিস্ একটা হত। শুনলাম—ওর মা ওকে খুব মিনতি করেছে। বউ খুব কেঁদেছে—। ঘোষাল প্রতিজ্ঞা করেছে কারুর কোন কথায় আর থাকবে না।

এখানে যখন পল্লী স্বায়ত্তশাসন বা গ্রাম-স্বরাজের বিতর্ক চল্‌ছিল, তখন পঁচিশ বছরের কমবয়সীদের আসরে চলছিল—ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল লীগের কথা—চিরকেলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের লড়াই—এবং তার সঙ্গে ছবির রাজ্যের উত্তম সুচিত্রা সুপ্রিয়া সৌমিত্র সত্যজিৎ রায়ের কথা—পাশাপাশি একসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে। আর তার সঙ্গে আসছিল নাটকের আলোচনা। গ্রামে হরিবিষ্ণুবাবুদের পূর্বপুরুষদের দাক্ষিণ্যে এবং উদ্যোগে তৈরী পাকা স্টেজটা অনাথ হয়ে পড়ে আছে। সেখানে এখন অভিনয় উদ্যোগের অভাব হয় না—সেখানে নতুন ক'রে অভিনয়ের কথা হচ্ছে। নাটক?—কোন্ নাটক হবে?

ছেলেগুলি যারা জমে আছে—তারা একালের ছেলে—বারো-চোদ্দজনের মধ্যে দু'তিনজন ছাড়া সকলেই মোটামুটি শিক্ষিত অর্থাৎ লেখাপড়া শেখা ছেলে। জনচারেক গ্র্যাজুয়েট। জনতিনেক এল-সি পাস; বাকীরা ম্যাট্রিক পাস। একজন আই-এ ফেল। এখানে তখন সেই মুহূর্তটিতে নাটকের কথার মধ্যে শুভেন্দুর ভাই বলে উঠল—কেন বাবা, নাটক নাটক করে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ বল? এখানে তো বেগুন গাছেও নাট্যকার ঝোলে—এবং নাটক ফলে। লাগাও না যা হোক একখানা। এন-এস-বি, এন-জি-এম, কে-কে-এম, টি-এস-বি, এন-এন-বি—শুনেছি এই পাত্র-ও একখানা নাটক লিখেছিল গরুচোর বলে—সেই নাটক চুরি করেছিল চৌধুরীবাড়ীর ছেলে। এ-কে-আর তো বসেই আছে নাটকের গাদা নিয়ে—যাও না।—

সকলের মুখেই হাসি দেখা দিল। হাসির কথাই বটে। চৌধুরীবাড়ীর ভাগ্নে এ-কে অর্থাৎ আর্যকুমারের মাথা খারাপ হয়ে গেছে—তিনি এখন বাড়ী বসে বসে শুধু নাটক লেখেন এবং লোকজন পেলেই বলেন—কি? একবার থিয়েটার-টিয়েটার কর তোমরা। এমন সুন্দর নাটক লিখেছি হে!

আর্যকুমার শুধু নাটকই লেখেন না, তিনি বলেন বাংলাভাষার সব ভাল নাটকই তাঁর লেখা। তাছাড়াও পাগলামি আছে। সকালবেলায় একবার উঠেই পোস্টাপিস গিয়ে একটা লেকচার দেন ইংরিজীতে—তারপর আসেন থানায়। সেখানে একটা লেকচার দিয়ে বাড়ী ফিরে বৈঠকখানায় বসে রাস্তার লোককে ডেকে বলেন—শোন তো হে! শুনে যাও তো নতুন নাটকের এইখানটা—কেমন হয়েছে বল তো!

উত্তর না দিয়ে, এমনি আপন মনে চলে যাওয়ার মত চলে গেলে বিশেষ কিছু ঘটে না, কিন্তু 'সময় নেই' বা 'না পারব না' বললে রক্ষা থাকে না—তিনি চীৎকার ক'রে আর একটা লেকচার দেন।

হাসিটা এই কারণে।

ঠিক এই মুহূর্তে উঠল একটা শব্দ—তার সঙ্গে একটা কোলাহল; কয়েকটা ক্রুদ্ধ চীৎকার বাদানুবাদ, একটা প্রচণ্ড শব্দ, যে শব্দ ওঠে বস্তু সংঘাতের ফলে, একটা ভয়ার্ত চীৎকার। সব

কটা একসঙ্গে। একটি মুহূর্তে একই সঙ্গে।

সকলেই চমকে উঠল—কি হল ?

ছেলেদের দল সচকিত হয়ে তাকাল। প্রৌঢ়ের দল উদ্গ্রীব হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করলে—কি কাণ্ড! কি হল ?

বৃদ্ধেরা বিরক্তিভরে বলল—আঃ ছি—ছি—ছি।

ফটকের ওধারে সতীশ ঘোষাল থমকে দাঁড়ালো।—কি হল ?

থমকে এবং চমকে গেল সকলেই যে যেখানে ছিল—সেখানেই সে এবং তারা চকিতভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলে কি হল ? তারপর প্রশ্ন সরব হয়ে উঠল।

সতীশ যেমন প্রশ্ন করলে তেমনিভাবে সকলেই প্রশ্ন করলে—এদল ওদলকে—কি হল ?

বিচিত্রভাবে শব্দটা যেন একটা নয়। অনেকগুলো শব্দ একসঙ্গে একই মুহূর্তে বিচিত্রভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা বড় অখণ্ড শব্দে পরিণত হয়ে ধ্বনি তুলেছে—প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

একটা যেন খুব বড়জাতের পটকা ফুটেছে। তার সঙ্গে আরও অনেক শব্দ, সম্ভবত কোন টিনের উপর ভারী একটা কিছু পড়েছে সন্দেহ নেই। অথবা টিনের চাল সমেত কোন ঘর ভেঙে পড়েছে।

সব থেকে বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন নাটমন্দিরের প্রবীণারা। গোটা চৌধুরীপাড়াটাই ভাঙা আর ফাটা পুরীর রাজত্ব। সেই কোন পুরানো আমলে তৈরী বাড়ী ;—দুশো বছরের বেশী বয়স ; দুশো বছরে ভেঙেচুরে আগাগোড়া নতুন কিছু হয়নি ; হয়েছে—মানে, পড়েছে বেশীর ভাগ পার্টিশনের দেওয়াল, কোথাও কোথাও বারান্দা ঘিরে খুপরীর মত ঘর, দু-চার বাড়ীতে দু-চারখানা নতুন ঘর হয়েছে, তাও ভিত্ খুঁড়ে নয়, একতলার মাথায় দোতলায়, দোতলার মাথায় তিনতলায়। এবং এই পুরুষে গত দশ পনের বা বিশ বছরের মধ্যে প্রায় প্রতি বাড়ীতে টিনের চাল দিয়ে হয় ছাদের উপর নয় উঠোনে বা ছাদে উঠোনে দুই জায়গাতেই তৈরী করা হয়েছে বাথরুম। ও নইলে মান থাকে না জাত বাঁচে না। জাত মানে জমিদারী জাত। তাই কার বাথরুমের চালের উপর কি পড়ল এই প্রশ্নটাই সকল প্রবীণার মনে যেন জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত মনের ব্ল্যাকবোর্ডে বেশ বড় করে আঁকা হয়ে গেল।

—বাবু মশায়রা!—মাসীর বাড়ীর পূর্ব পাশের দেওয়ালটা—।

নাটমন্দিরে বুড়োবাবুদের আসরের সামনে এসে দাঁড়াল সাঁওতালদের মেঘু সর্দার। এবং ডাকলে—বাবু মশায়রা! মাসীর বাড়ীর পূর্বদিকের দেয়ালটা—।

বড় আসরে বসেছিল চৌধুরীবাড়ীর প্রবীণেরা—তাঁদের দৌহিত্র বাড়ীর-মাতব্বরেরা সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল—কি ? কি হল ? কিসের শব্দ ?

—মাসীর বাড়ীর ঘরের পূবের দেয়ালটা গো—

—কি ?

—দড়াম করে পড়ে গেল।

—দেয়ালটা পড়ে গেল ?—আচমকা পাকা দেয়াল পড়ে গেল ?

—হাঁ। ওই ভুদের বাউড়ী পাড়ার উরা আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে এল। উরা আমাদের খাসী চুরি করে খেয়েছে। তাই নালিশ করেছি আমরা। তার উপরে উদের কাজটো আমরা করছি ভুদের কথায়—; এই সব লেগে উরা এল দল বেঁধে। বলে তুদিগে মেরে ভাগাব—। নিয়ে ওই স্কালের গোঁড়াতে একটা এই মোটা পটকা না বোমা কি বলে দিলে দুম্ করে মেরে। অমুনি দেয়ালটো কাঁপতে কাঁপতে হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

—বোমা মারলে—, দেয়াল ভেঙে দিলে—? বাউড়ীরা ?

চৌধুরী বংশের শ্রেষ্ঠ দৌহিত্রবংশের বংশধর ইস্কুলের সেক্রেটারী হরিবিষ্ণু বাঁড়ুজ্জে হাতের সিগারেটটা আছড়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেলে বললেন—এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ? এই তো অবশ্যম্ভাবী ! কুরুক্ষেত্রে কৌরব বংশ যখন ধ্বংস করলেন শ্রীকৃষ্ণ, তখনই যদু বংশেরও ধ্বংস নির্ধারিত হয়েছিল—এবং তারপরই এটাও নির্ধারিত সত্য হয়েছিল যে শবরেরা ব্যাধেরা একদিন দল বেঁধে এসে যদু বংশের বধূকন্যাদের ধরে নিয়ে যাবে।

—তার মানে ? ফোঁস করে উঠল হরেকৃষ্ণ চৌধুরী। গোপাল চৌধুরী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে হরিবিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করছিল—তার মাথার মধ্যে এখনও গোলমাল পাকিয়ে আছে। সে কাঠের গড়গড়ার নলটা হাতে ধরে বললে—কি ? কি ? কি হল ?

হেসে হরিবিষ্ণু বললে—ও তুমি বুঝতে চেয়ো না খুড়ো। ওতে অনেক ছেঁড়াচুল বটের আটা আছে—জটা বনে গিয়েছে। চিরুনিতে আঁচড়াতে গেলে চিরুনি ভাঙবে।

ব্রজকান্ত বলে উঠল—তা যদুবংশটা কোন বংশ শুনি ?

—কেন ? চৌধুরীরা। জবাবটা যেন হরিবিষ্ণুর ঠোঁটের ডগায় মজুদ হয়ে ছিল।

—হুঁ। আর তোমরা ? বেশ তিক্ত সুরে প্রশ্ন করলে ব্রজকান্ত।

—আমরা ধর—। আমরা আর কি, আমরা—। কথা শেষ হবার আগেই শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী বলে উঠল—ধরতে হবে না। তোমরা কৌরব।

হরিবিষ্ণু আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—তা হতে আর আপত্তি কি ? তবে গরমিল হচ্ছে তো। স্বাধীনতা হল দেশের ; বলা চলে কুরুক্ষেত্তর পার হয়ে গেল। রাজ্য অবিশ্যি গিয়েছে কিন্তু কৌরবেরা টেঁকে রইল যে গো ! আর তোমরা যদি নিজেরা যদুবংশ বলে দাবী কর তা হ'লে পরিণামেই বা মেলে কই। মা ষষ্ঠীর দয়ার তো অভাব নেই। খুড়ীমাদের কোলে তো বছর বছর নতুন খোকা দেখতে পাই। তাছাড়া ধর, যদি, তাই মেনে নিলাম আমরা কৌরব তোমরা যাদব, তা হ'লে পাণ্ডবটা দাঁড়ায় কে ?

এতক্ষণে সতীশ ঘোষাল সরস কৌতুকদীপ্ত মুখে বললে—হম জানতা হ্যায় বাবা। আর কেউ জানতা নেই। ওটি হল—লোকাল কংগ্রেস-লীডার জেলখাটা অর্থাৎ বনবাস প্রত্যাগত ভবানীকিংকর।—হুঁ—হুঁ !

রহস্য-রসিকতার সুগারকোটিং দেওয়া এই যে বাটুল যুদ্ধ চলছিল—এই যুদ্ধটি এই বহুক্ষেত্রে জমিদার ভদ্র বংশ অধ্যুষিত চন্দনপুরের একটা বিশেষভাবে চিহ্নিত ধারা। চমৎকার পৌরাণিক তুলনার মধ্য দিয়ে মিষ্ট ভাষায় জ্ঞান-গাম্ভীর্যের নামাবলী বা উত্তরীয় গায়ে দিয়ে পরস্পরকে মর্মান্তিক অভিসম্পাত দিয়ে থাকেন। জমিদারী বিগত হতে বসেছে; সে একরকম গেছেই। বাড়ীগুলো ফেটেছে, বংশাবলী জ্যামিতিক হারে বেড়েছে—তবু এই অভিজাত যুদ্ধপ্রথাটি যায় নি। এবং এই যুদ্ধে তারা যখন মাতে তখন আর সব ভুলে যায়। সে হিসেবে একে কুরুক্ষেত্রের পালার সঙ্গে তুলনা না করে পাশা খেলার আসরের সঙ্গে তুলনা করাই ভাল—কারণ তখন আর এদের জ্ঞান গম্যি থাকে না—দ্রৌপদীকে পণ রাখার মত প্রমত্ততাও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে।

এ আলোচনাটা আরও চলত হয়তো। কারণ শব্দটা আর দ্বিতীয়বার উঠে তাঁদের ব্যাঘাত ঘটায়নি—এবং শব্দটার কারণ যা পাওয়া গেছে—তাতে কারুর কোন ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়নি; মোটামুটি বোঝা গেছে—'সাজার মা' অর্থাৎ বহুজনের—মালিকানি বিশিষ্ট 'মাসীর বাড়ী' নামক ঘরখানার পূর্বদিকের দেওয়ালটা সশব্দে পতিত হয়েছে। বাউড়ীদের কারা এসেছিল মারামারি করতে সাঁওতালদের সঙ্গে।—তারা পটকা বা বোমা ছুঁড়েছিল।

কিন্তু মেঘু সর্দার আবার বাধার সৃষ্টি করলে—বললে—বলো গা বাবুরা! এক শালোকে ধরেছি—উকে কি করব?

—ধরেছিস একজনকে?

—হঁ গো। আরও দুজনাকেও ধরেছিলাম—তা সেই সাঁপটো বেঁরায়ে পড়ল; এই ফেণা, এই মোটো, আর বেঁড়ে পারা—সেই টো। কুথা ছিল—উইখানে—

—হ্যাঁ বাস্তুসাপটা ওখানেই থাকে আজকাল।

—হঁ ওই দেয়াল পড়ল—আর উটা কুথা ছিল কুন ঝোঁপে-ঝোড়ে বেঁরায়ে পড়লো। বেঁড়ে সাঁপ, ছুটো হঁয়ে গেইছে, এই মোটো—ছুটতে লারে, কি করবে ফেণা তুলে দাঁড়ালেক। কামড়াতো আমাদের একটো ছেলেকে;—তা পিটায়ে মেরে দিলাম—তো ছেলেটা বাঁচলো কিন্তু উরা পাঁলায়ে গেল!

অর্থাৎ বোমার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালটা ভেঙে পড়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন্ গর্তে বা ঝোপে-জঙ্গলে সাপটা ছিল বেরিয়ে পড়েছিল। বুড়ো সাপ প্রকাণ্ড ফণা তেমনি মোটা কিন্তু বয়সের জন্য লম্বায় ছোট হয়ে গেছে, লেজের দিকটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এসেছে। সেটা চলে মন্থর গমনে। ছুটতে পারে না। অগত্যা এতগুলি লোকের মধ্যে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং একটা ছেলেকে আক্রমণ করেছিল। তখন সাঁওতালরা সাপটাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে দিয়েছে। সেই সুযোগে—বাউড়ীদের আর দুজন যারা ধরা পড়েছিল তারা ছুটে পালিয়ে গেছে।

"সাপটাকে মেরে ফেলেছিস—?"

একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর থেকে একই প্রশ্ন উচ্চারিত হল।—"সাপটাকে মেরে ফেলেছিস!"

একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে বলে মনে হল। কণ্ঠস্বর যেন হতাশায় ভেঙে পড়ল। "সাপটাকে মেরে ফেলেছিস।"

সাপটা বাস্তুসাপ। চৌধুরীদের বাস্তুদেবতার প্রতীক; কেউ বলে ওর বয়স পাঁচশো বছর; কেউ বলে—ওর থেকে কিছু কম। কতকাল পত্তন হয়েছে এই ঠাকুরবাড়ীর, গোপনব্রজের—ততকাল ও এসে ঢুকেছে এই ঠাকুরবাড়ীতে।

লোকপ্রবাদ—যে সন্ন্যাসী নবাবদপ্তর থেকে মা চণ্ডীর জন্য নিষ্কর জমির সনন্দ নিয়ে এবং চৌধুরীশিষ্যদের রাজরাজেশ্বরের নামে জমিদারী কিনে চন্দনপুর আসেন—সেই দিন এই বাস্তুদেবতা এসে চৌধুরীবাড়ী ঢুকেছিল।

সেই বাস্তুদেবতাকে মেরে ফেলেছে?! আজ এই রথের দিনে?! হে রাজরাজেশ্বর—হে ভগবান।

মেঘু আবার বললে—বুল গা বাবুরা! উরা আবার ফিরে আসবেক। মারামারি করবেই উরা। বুল—! উ বাউড়ীটিকে তুরা নে—যা করবার কর, আমরা বাবু চলে যাছি। উয়াদের সাতে মার আমাদের হবেই। হঁ। উরা আমাদের খাসী খেয়েছে চুরি করে, আর বুলছে—এ সব কাম উদের কাম,—ই কাম করতে আমরা পাব না। হঁ!

ব্যাপারটা বড্ড জড়ানো ব্যাপার। আজ বছর চারেক থেকে একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মত চন্দনপুরের জীবনকে আক্রমণ করেছে। চৌধুরীবাবুদের এবং মা চণ্ডীর স্থানের আশ্রিত এক দল বাউড়ী সেই পুরনো কাল থেকে এখানে বসবাস করছে। তাদের সঙ্গে আছে ঘর কয়েক বাগ্দী, কয়েক ঘর ডোম।

মা চণ্ডীর নিষ্কর পুকুরের পাড়ে এরা বাস করে। কোন খাজনা নেই; শুধু মা চণ্ডীর থানে বছরে একদিন বেগার দিতে হয়। এ ছাড়া এরা পুরুষানুক্রমে চৌধুরীদের বাড়ীতে বাঁধাধরা কাজ করে আসছে। এক এক চৌধুরীবাড়ীতে এক এক ঘর ওরা বাঁধা চাকর। বংশানুক্রমে চৌধুরীরাও বেড়েছে এরাও বেড়েছে। এরা রাখালী করে মাহিন্দারি করে—কৃষানি করে, মেয়েরা বাড়ীতে বাসন মাজার কাজ করে; উঠোন ঝাঁট দেয়; আঁস্তাকুড়ও পরিষ্কার করে। চৌধুরীরাই ওদের খাবার ধান দেয়—ঘর ছাইবার খড় দেয়, রোগে অসুখে চার আনা আট আনা থেকে দু টাকা পাঁচ টাকা ঋণও দেয়; এরা তা শোধ করে চলে বংশানুক্রমে। চৌধুরীদের ঠাকুর বাড়ীতে এই গোপন ব্রজে ওদের নেমন্তন্ন দেওয়া আছে রথের দিন একদিন রাসের দিন একদিন ও দোলের দিন একদিন এই তিনদিন রাজরাজেশ্বরের প্রসাদ পেতো বৎসরে এবং দুর্গাপুজোর সময় নবমীপূজার দিন একদিন মায়ের প্রসাদ পেতো তার সঙ্গে নবমীপূজার

যে মহিষ বলি হত সেই বলিটা পেতো। আরও পেতো বিজয়া দশমীর দিন চণ্ডীতলায় বলির মহিষের ধড় ও মুণ্ডটা। এ ছাড়া দশমীর দিন চণ্ডীতলায়—মায়ের মাংস ও মসুরী কলাইয়ের একটা ভোগ হয়—সেই ভোগের প্রসাদও পেতো। রাত্রে এক হাঁড়ি মদের দাম পেতো। এসবের বদলে ওদের রথে রাসে দোলে—এক-একদিন ঠাকুরবাড়ী পরিষ্কারের কাজ করতে হত। এবং বিজয়া দশমীর দিন এদের দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের জন্য কাঁধ দিতে হত।

বর্তমানে ওদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে; চৌধুরীবাড়ী নিমন্ত্রণ বন্ধ করেছে; ওরা বেগার বন্ধ করেছে; কিন্তু নিমন্ত্রণের দাবী ছাড়ে নি। তার সঙ্গে আর একটা গোলমাল বেধেছে—সেটা হল রথ টানার ব্যাপার নিয়ে একটা বিচিত্র গণ্ডগোল। নিয়ম ছিল চৌধুরীদের গোপন ব্রজ বা ঠাকুরবাড়ীর 'সিংদরজার' ও-পাশে অর্থাৎ ভিতরে রথ টানবে ব্রাহ্মণ থেকে জলচল জাতি যারা তারাই—সেটা ক্রমে ক্রমে ভদ্র জাতিতে পরিণত হয়েছিল—এবং সিংদরজার বাইরে গ্রামের মধ্যে রথ টানত এই বাউড়ীরা। এখন বাউড়ীরা ক বছর থেকে দাবী ধরেছে রথ টানতে হলে তারা ওই ঠাকুরবাড়ীর ভিতর থেকেই টানবে। চার বছর থেকে গোলমাল বেধে রয়েছে। প্রথম দু বছর কথা কাটাকাটি করেও শেষ পর্যন্ত পুরনো নিয়ম বজায় থেকেছিল। গত দু বছর বাবুরা নিমন্ত্রণ বন্ধ করেছে, বেগারও নিচ্ছে না; এবং গ্রামের পথে রথ বের করাও বন্ধ করেছে। রথ ঠাকুরবাড়ীর এলাকার মধ্যেই টেনে শেষ করে; রশিখানেক দূরে বহুকালের ওই 'মাসীর বাড়ী' নামক টিনে ছাওয়া একটা দুয়ার-হীন ঘর, সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে রথের পরব শেষ করে।

বাউড়ীদের এইখানেই ঘোরতর আপত্তি। কেন তারা ঠাকুরবাড়ীর ভিতরের এলাকা থেকেই রথ টানতে পাবে না? ওরা ঠাকুরবাড়ীর ভিতর ঢুকতে পায়—সেখানে কাজকর্ম করে। এমন কি—চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকে বেদীর উপর থেকে ওরাই দুর্গাঠাকরুণ নামিয়ে ঘর থেকে বের করে আনে; তবে কেন ওরা রথ টানতে পাবে না?

গোলমালটা এখানেই শেষ নয়, আরও আছে, গতবার বিজয়া দশমীতে দুর্গাঠাকরুণ প্রতিমা বিসর্জন নিয়েও একটা জট পাকিয়েছে। বিসর্জনের জন্য এখানে প্রতিমা বের ক'রে বাঁশের চারখানা সাঙের উপর চাপিয়ে ঢাক ঢোলের বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে চলে বাহকেরা। তার জন্য বাবুদের অন্যান্য বরাদ্দের সঙ্গে বরাদ্দ আছে এক জালা বা এক হাঁড়ি পচাই মদের। তার স্থলে ওরা এখন আকণ্ঠ মদ্যপান করে প্রতিমা বাঁইচ করে। তাতে প্রায় প্রতিবারই প্রতিমার কিছু কিছু ভাঙে। কয়েকটা আঙুল—একটা হাত বা চালচিত্তিরের খানিকটা যায়। আগের কালের ভয় আর নেই। বাউড়ীরাও মানে না—বাবুরাও নিরুপায়। তাঁদেরও আগের কালের প্রতাপ নেই। ফলে গতবার যা হয়েছে তা মনে করতে শরীর শিউরে ওঠে; বাহকদের পা ট'লে গিয়ে প্রতিমা প্রায় ডানদিকে কাত হয়ে পড়ো পড়ো হয়ে কোন রকমে বেঁচেছে, কিন্তু পুরো বাঁচেনি। গণেশের মুণ্ডটা এবং ডানদিকের হাত দুটো একেবারে খসে পড়ে গেছে।

তার প্রতিকারের জন্য তখন হয়েছিল অনেক কিছু। কিন্তু 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' এই সূত্রানুযায়ী শেষ পর্যন্ত হয়নি কিছু। সে সব দিক থেকেই। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী কোন পূজার্চনাও করাননি বাবুরা এবং বাউড়ীরাও মৌখিক একটু লজ্জা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছু করেনি। বিচিত্র একাল—বিচিত্র এ কালের ধর্ম। ওই বাউড়ীরা এর জন্য এতটুকু শঙ্কিত বা ভীত বা উৎকণ্ঠিত হয় নি। দেবতা-ব্রাহ্মণে বিশ্বাস যে নেই ওদের তা নয়। তবে সার্কাসের বাঘ-সিংহীর মত যেন ওদের অনেকটা নিরীহ করে এনেছে। একটা কথাতে প্রমাণ পাওয়া যায়। যে বাউড়ীটি গোপাল চৌধুরীর উদ্যত জুতো কেড়ে নিয়েছে—সেই বলেছিল—ওরে ওরা কিছু লারবে রে, চুপ ক'রে গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। যাক ক্যানে, ওরা নিজেরা কাঁধে ক'রে ওই মাটির ঠাকুরের ওজন বয়ে নিয়ে যাক! দেখি! হুঁ। বলে সেই—নড়তে নারে বন্দুক ঘাড়ে। আর হবে কচু! ছাই হবে!

চোরের অনুমান অভ্রান্ত। বাবুরা কোন হাঙ্গামা করে নি। শুধু বলে দিয়েছে—"আগের ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেল বাবা। আমরা বেগার নেব না। আর নেমন্তন্ন-কেমন্তন্নও না।"

তা ছাড়া নবমীর দিন মহিষ-বলি উঠে গেছে। বিজয়া দশমীর মহিষ-বলিও বাতিল হয়েছে। এক-একটা মহিষের বাচ্চার দাম এখন একশো, একশো পঁচিশ; মোটামুটি উঠিয়েই দেওয়া হয়েছে। এ উঠিয়ে দেবার জন্য বাবুরা ব্যস্তই ছিল, এবার একটা ছুতো পেয়ে বর্তে গেছে।

ঝগড়ার শিকড় এই এমনি ভাবে, দুর্গা নবমী, বিজয়া দশমী থেকে রথযাত্রা রাসযাত্রা দোলযাত্রা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে; তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সারা বছরটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় চালিয়ে দিয়েছে। ঠিক এই সময়ে হাউমাউ করতে করতে এসে উপস্থিত হল নসুবালা। হেই মারে। কি হবে রে! ও দাদারা তোমরা এর বিধেন কর—লইলে ছিষ্টি আর থাকবে না গো। রসাতলে যাবেগ।

* * *

মাঝিদের একটা খাসী বাউড়ীদের ছোকরারা চুরি করে খেয়েছে—এটা সত্যি; তার দায়ে জনকয়েকই দায়ী, সকলে নয়। তার খেসারৎ নিয়ে মামলাটা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রও এটা নয়—যুদ্ধক্ষেত্রও নয়। আসলে বাবুরা ঠাকুরবাড়ীর সিংদরজা বন্ধ করে দিয়ে যে বাউড়ীদের দাবীটা অগ্রাহ্য করে দেবেন সেটা তাদের সহ্য হয় নি। দেবদ্বিজে ধর্মে ভগবানে বিশ্বাসের স্বরূপটা তাদের যেমনই হোক, সেটা খাঁটি সোনা বা রূপা বা তামার মত কোন ধাতুর তুল্য না হোক, অন্ততঃ লোহা বা টিন বা সীসের মত কিছুর তুল্য বটে তাতে সন্দেহ নেই। তার মূল্য বাজারে না থাকে, তাদের নিজের জীবনে আছে। তারা ঠাকুরঘরে ঢুকে পুরোহিতের পদ চায় না, বামুন-কায়েতদের মত পাটের কাপড় পরে পুষ্পাঞ্জলিও দিতে চায় না কিন্তু বাবুদের বাড়ীতে পাটকামের অঙ্গ হিসেবে ওরা যখন ঠাকুরবাড়ীর উঠোন চেঁচে পরিষ্কার করে ঝাড়ু দেয়, মেরামত করে, তাদের মেয়েরাই নিত্য অঙ্গনে মাড়ুলী দেয়, তখন রথ টানবার জন্য তারা ঠাকুরবাড়ীর এলাকার মধ্যে ঢুকতে পাবে না কেন? দুর্গাপুজার সময় একে-

বারে চণ্ডীমণ্ডপের ঘরের ভেতর থেকে তারা প্রতিমা বের করে আনে; তবে?

বাউড়ীদের মাতব্বর বলেছে, আমাদের প্রেস্টিজ। প্রেস্টিজ শব্দটা তারা শুনে শুনে শিখে ফেলেছে। নসুবালা বললে—দাদাবাবারা কি বলব গ। বলছে আমাদের পেস্টিজ থাকবে না। পেস্টিজ কি—না, বললে মান্তি। মান্তি থাকবে না।

আজকের এই রথের দিনে মশগুল মজলিশগুলোকে চকিত করে দিয়ে যে মাসীর বাড়ীর টিনে ছাওয়ানো ঘরখানার পূর্বদিকের দেওয়ালটা প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙে পড়ল—তার হিসেবও ঠিক তাই; অর্থের ক্ষতি খুব একটা কিছু নয়। পুরনো আমলের রথের ঘর; কাদায়-ইটে গাঁথা দেওয়াল, তাও দেওয়াল চারখানা নয়, সাড়ে তিনখানা, অর্থাৎ সামনের দরজাটা রথ ঢুকবার মত প্রশস্ত হওয়ায় আধখানা দেওয়াল জুড়েই দরজাটার পরিসর। মাথার উপরে এককালে পুরনো আমলের টালির ওপর পেটানো ছাদ ছিল; কড়িবরগা ছিল তালকাঠের বা কাঁড়ির, সেগুলো বয়সের সঙ্গে বুড়োমানুষের পিঠের মত বেঁকতে শুরু করেছিল; ক্রমে যখন খানিকটা খানিকটা করে ভাঙতে লাগল, তখন ওই ছাদটাকে ফেলে দিয়ে করোগেটেড শীট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। বছরে মাত্র সাতদিন কাজে লাগে। পুরীর নিয়মানুযায়ী রথ টেনে গ্রাম ঘুরিয়ে এনে ওই মাসীর বাড়ীতে রথখানা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং সাতদিন পর উল্টোরথের দিন রথখানাকে মাসীর বাড়ী থেকে বের করে আর এক পাক গ্রাম ঘুরিয়ে এনে রথের ঘরে তুলে দেওয়া হয়। এমন একটা ঘরের একটা দেওয়াল খসে পড়ায় আর্থিক ক্ষতি কত হয়েছে তা অঙ্ক কষলেই বের হয়ে পড়বে। এবং তার সঙ্গে একটা সাপ মরেছে—অনেক দিনের বুড়োসাপ। তাতেও ক্ষতি বলতে গেলে সে কিছুই হয় নি। তবু যেন একটা আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সবাই। ওই ঠাকুরবাড়ীতে সমবেত চৌধুরীদের ছোট বড় নারী-পুরুষ সবাই এবং তার সঙ্গে তাদের দৌহিত্র বংশীয়েরাও সবাই—। বাঁড়ুজ্জে মুখুজ্জে চাটুজ্জে এমন কি ঘোষাল পর্যন্ত। হরিবিষ্ণু বাঁড়ুজ্জে থেকে দুর্মুখ ঈর্ষাজর্জর সতীশ ঘোষাল পর্যন্ত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

একটা যেন ভয়ানক কিছু হয়েছে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কিছু।

যে-হরিবিষ্ণু একটু আগে মহাভারতের যদুবংশ বধূদের পরিণতির সঙ্গে উপমা দিয়ে চৌধুরীদের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত করছিল, সেও এখন সেই সত্যটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন হতবাক হয়ে গেছে! নসুবালা বললে, পাড়াতে সব 'আয়জন' (আয়োজন) হচ্ছে আমি শুনে এলাম। সকাল বেলাতে আমাকে বলেছিল, আমার সই ওই বাঁকা বাউড়ীর বউ। বলেছিল, আজ রথ নিয়ে হাঙ্গাম হবে সই।

আমি বলি, হাঙ্গাম! হাঙ্গাম কিসের? করে কে? ঠাকুরের রথ!

তা বাঁকার বউ বললে, আমরাও তো ভাই তাই জানতাম। তা সবাই বলছে—ঠাকুরের রথ, ঠাকুরের বাবার রথ। মানুষে টানে তাই রথ চলে। মানুষ মানে—তাই ঠাকুর ঠাকুর, নইলে পাথর। কই, বের করুক তো হাত-পা দেখি।

আমি বললাম, হেই মারে! এমন কথা বলতে আছে না বলে? জিভ খসে যাবে না?

তা বাঁকার বউ বললে, শুধি আয়গা সীমেকে, ওই অমর চক্কবত্তীর বিটি সীমেকে, গায়ে হলুদ নিয়ে যে পালিয়ে এসে থানা এসেছিল—ওকে শুধিয়ে আয় বুন—সে বলেছে ছিদেমের দেঁতোনী বউকে, সে এসে আবার পাড়ায় বলেছে। সীমে বলেছে, এত কথার দরকার কি, চোখে তাকিয়ে দেখ্ না কেনে আমার বাবার দিকে; আমার বাবা মা-চণ্ডীর পিঠের উপর চড়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলে—তাতে হল-টা কি? বাবা মরে নাই, বাবার কুষ্ঠ হয় নাই, বাবার হাত-পা পঙ্গু হয় নাই, বাবা কানা হয় নাই—দিব্যি বরং এখন নতুন জামাইয়ের বাড়ী থেকে ভালমন্দ খেয়ে-টেয়ে শরীর সেরেছে। ছিদেমের বউ বলছিল, সে কি হাসি সীমের!

সতীশ ঘোষাল হাতের তর্জনী আস্ফালন করে বলে উঠল—She is a Communist and you—you শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু হরিবিষ্ণু ব্যানার্জী স্কুল and কলেজের রেসপেকটড সেক্রেটারী, you have given shelter to her. She is a Communist.

* * *

না। তা সত্য নয়। সীমা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই কোন রকমে যুক্ত নয়। কোন রাজনৈতিক মতবাদে সে তালিম নেয় নি। তার বাবা কখনও কংগ্রেস কখনও কম্যুনিস্ট কখনও হিন্দু মহাসভা করে বেড়ায়। তার প্রয়োজন টাকার। যে টাকা দেয় তার হয়েই ভোট ক্যানভাস করে বেড়ায়। বলতে পারে, কইতে পারে, হাত-পা ছুঁড়ে শ্লোগান দিতে পারে এই পর্যন্ত। সীমা তারই মেয়ে, কোন রাজনৈতিক আদর্শে তার বিশ্বাস জীবনগত নয়। তবে একালের মেয়ে সে তার উপর অমর চক্রবর্তীর মেয়ে, তার বিশ্বাসের রঙও চড়া হবেই, গন্ধও কড়া হবেই, স্পর্শের মধ্যেও যে হাতের ছাপ পড়বে তা মিহি বা মোলাম হাতের ছাপ নয়।

ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক; মেয়ে-হস্টেলে কাজ করে দেঁতোনী, ছিদামের বউ। তার দাঁত দুটো যত উঁচু তত সে আহ্লাদী। বাঁজা মেয়ে, ছেলে-পিলে হয় নি—তার উপর তার স্বামী ছিদেম সে একজন নিতান্ত নিরীহ লাজুক এবং দেহে-মনে অতি দুর্বল মানুষ। দেঁতোনীর সঙ্গে তার বয়সের তফাৎ অনেক। নিরীহ স্বামীর সেই পরিচালক। ছিদেম মনিবের বাড়ী কাজ করে—মাইনে হিসেব করে নেয় দেঁতোনী, দেরি হলে সেই তাগাদা দেয়। মাসের খোরাকির ধান—তাও দেখে শুনে বস্তাবন্দী করে ছিদেমের মাথায় তুলে দিয়ে বলে—চল নে মুনসে। অসময়ে কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেই এসে তাগাদা দেয়—কাপড় ছান বাবু। কাপড় ছিঁড়েছে। অসময় তা হয়েছে কি? তাহলে ছেঁড়া কাপড় পরে থাকবে, না ন্যাংটা হয়ে থাকবে শেষ? এ্যাঃ—। বলে একটা ঠ্যাকারও দেয়।

এই দেঁতোনী হস্টেলের ঝি। এঁটো-কাঁটা পরিষ্কার করে বাসন মাজে। মেয়েদের সঙ্গে দিদিমণিদের সঙ্গে তার খুব ভাব। ওদের সকল সুখের সকল দুঃখের সহভাগিনী। সীমার সঙ্গে বেশী ভাব, কারণ সীমা হস্টেলের জিনিসপত্র খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির দেখাশুনা করবার

চাকরি করে। তার উপর এই মাস তিনেক—পরীক্ষা দেওয়ার পর—অখণ্ড অবসরের মধ্যে দেঁতোনীর সঙ্গে সীমার আলাপটা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত গাঢ়। নানান বিষয়ের আলোচনা করে। দেঁতোনী জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা হা সীমে দিদি, তুমি বিয়ে ক্যানে করলে না বল দিকিনি?"

—দূর, এত অল্প বয়সে বিয়ে করে নাকি? লেখাপড়া না শিখে বিয়ে করে নাকি?

—করে না? তবে এতকাল হল কি করে? এই ধ্যারোগা (ধরোগা) গিয়ে সেক্রেটারী বাবুর বউ ছিল, সে তো নেকাপড়া জানত না। ওই তোমার বি. ডি. সাহেবের বউ, সে নেকাপড়া জানে না—

—কে বললে? বি. ডি. ও. সাহেবের বউ আই-এ পাস।

—পাস! তবে সি চাকরি করে না ক্যানে?

—চাকরি করে না—। অনেক ভেবে সীমা বলে, করে না খারাপ করে।

—খারাপ করে?

—নিশ্চয়!

অনেক ভেবে-চিন্তে সীমার মনে পড়ে 'বুর্জোয়া' কথাটা। সে বলে—ওরা হল বুর্জোয়া।

বার কয়েক কথাটা উচ্চারণ করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হি হি করে হেসে নিয়ে বলে—সেটো কি বটে?

—কি, বুর্জোয়া?

—হ।

—কথাটা হল—। একটু ভেবে-চিন্তে সহজ উত্তরটি পেয়ে গেল এবং সেই উত্তরটিই দিয়ে বসল—এই এ গাঁয়ের বাবুরা যা—তাই—তাকেই বলে। বসে বসে বাপুতি ধনে খায়, সব লোককে ছোট দেখে। বামুনরাও তাই বট—যারা তোদের ছোটলোক করে রেখেছে। তোদের ছুঁলে চান করে, তোদের দিয়ে ছোট কাজ করায়—

দেঁতোনী অবাক হয়ে শোনে।

এই সূত্র থেকেই কথাটা উঠেছিল। দেঁতোনী বলেছিল—তাই বটে সীমে দিদি, এই আমাদের পাড়াতেই দেখ ক্যানে, মরদরা বলছিল, বাবুরা সব রথের নেমন্তন্ন উঠিয়ে দিলে——দশমীর—বেসজ্জনের পাব্বণী মেরে দিলে—

সঙ্গে সঙ্গে সীমা বলেছিল—তোরাও তাহলে কাজ করিস নে।

—হেই মা! অপরাধ হবে না?

—কার কাছে?

—দেবতার কাছে।

—মরণ। দেবতা ঠাকুর-ফাকুর ইসব আছে নাকি? এ যুগে কেউ মানে নাকি? দূর!

দেঁতোনী হেসে প্রায় ভেঙে পড়ে বলেছিল—হেই মা, তোমার বাবা মা-চণ্ডী থানের পাণ্ডা—

সীমা এবার চটে উঠে বলেছিল—পাণ্ডা! পয়সা পায় তাই পাণ্ডা-গিরি করে। পাণ্ডা!

জানিস বাবা মদ খেয়ে চণ্ডীর মাটির ঢিবির উপর ঘোড়ায় চড়ার মত চড়েছিল—

দেঁতোনীর চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল—দাঁতগুলির বত্রিশটিই বেরিয়ে পড়েছিল এবং সীমা এই উত্তাপের মুখে একটি উত্তেজনাময় বক্তৃতা নিয়ে ঈশ্বর দেবতা ধর্ম প্রভৃতির উপর মোশন অব নো কনফিডেন্স মুভ করে—দেঁতোনীর ভোটটি পর্যন্ত আদায় করে নিয়েছিল।

এরপর ঘটনাগুলি অতি সহজ এবং স্বাভাবিক। ১৯৫৮ সালের যে-কাল সে-কালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে-বাতাস বয়—সেই বাতাসে যারা নিশ্বাস নেয়, সে মানুষেরা যেই হোক, বামুন হোক কায়স্থ হোক বাগ্দী বাউরী হাড়ি যেই হোক, তাদের কাছে এই সব ধরনের চিন্তার ক্রিয়া উর্বর ভূমিতে বর্ষাকালে পড়া বীজের মত অঙ্কুরিত হয়ে হু-হু করে বেড়ে উঠেছিল।

এর বেশী কিছু নয়।

না আরও কিছু আছে। এই মাসখানেক ধরে এই কথাটার আলোচনা প্রায় নিত্যই কিছু না কিছু হয়ে আসছে।

দেঁতোনী এই সীমা-মুখ-নিসৃত কথাগুলি যথাসাধ্য আত্মস্থ করে পাড়ায় গিয়ে উদ্‌গীরণ করেছে। প্রথম স্বামীর কাছে, তারপর ওর সহোদর ভাই এবং আরও কয়েকজনের কাছে। অতঃপর গোটা পাড়ায় সেটা ছড়িয়ে পড়েছে। দেঁতোনীর ভাই একালের ছোকরা, স্বাস্থ্যবান সবল এবং বিশেষ দলের লোক, যার পাণ্ডা হল ওই চোবে বাউড়ী; যারা স্টেশনে কুলি-গিরি করে; মদভাঙ খায়, আবার চায়ের দোকানে চা খায়, রাত্রিকালে হুল্লোড় করে গান করে এবং গ্রামের সকল লোককে গাল দেয় এবং পয়সা-কড়ির অভাব হলে পুকুর থেকে কাঠ তুলে বেচে দেয়; গোয়াল থেকে ছাগল ভেড়া এনে কেটে খায়, আবার বেচেও দেয়। এদের কাছে দেঁতোনীর বহন ক'রে আনা বাণীগুলি—অঙ্কুরিত হয়ে বর্তমানে রীতিমত চারাগাছে পরিণত হয়েছে।

ওরা কম্যুনিস্টও নয় কংগ্রেসও নয়, হিন্দু মহাসভাও নয় মুসলীম লীগও নয়, ওরা হল কালের সহচর, ওরা মহাকালের সঙ্গে চিরকাল দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে বেড়ায়।

২১

—কালটাই যে এমনি নসু।

—ঠিক বলেছ দাদাবাবু, যেমন কলি তেমনি চলি।

—কালের নাম কলি হলে কলিকালের ধারাটা এই বটে। এ-কালের সে-কালের কোন কিছু চলবে না।

কথাটা বললেন শ্যামাকিঙ্করবাবু।

নসু চুপ ক'রে বসে রইল। কোন এক অগাধ ভাবনার সমুদ্রে সে পড়ে গেছে, তার আর কূল-কিনারা নেই। অনেকক্ষণ পর সে সেই কথাটাই বললে—এর আর কূল-কিনারা নাই,

নাকি বল দাদাবাবু ?

শ্যামাকিঙ্করবাবু হাসলেন। বললেন—চিরকালই মানুষ এমনি কূলকিনারা-হীন হয়ে ভাসছে রে নসু। তবে এক-একসময় তুফান ওঠে ; তখন মনে হয়—এমনিতর। মনে হয় পরাণপাখীর খাঁচা বোঝাই মহাজনী নৌকোর মত এই পৃথিবীখানার বুঝি ভরাডুবি হল। কিন্তু হয় না। ঝড় তুফানে কিছু কিছু খাঁচা ভেসে যায়, কিছু পাখী জলে পড়ে ডুবে মরে। তারপর আবার ঝড় থামে, কাল-সমুদ্র শান্ত হয়, তখন আবার পৃথিবীর মহাজনী নৌকো দিনরাতের পাল তুলে চলতে থাকে, মনে হয় পার পাব, পাব সেই দ্বীপটা। যে দ্বীপে দুঃখ নাই, বিপদ নাই, ঝড় নাই, বাদল নাই, মরণ নাই।

—আ মরি মরি। দাদাবাবু—কি শোনালে গো !

—কি শোনালাম—? তার থেকে তোর গান যে অনেক ভালো! কি গাইছিলি এতক্ষণ—বেতারে বাজিয়ে ফ্লুট—

নসু হেসে মিহিগলায় সুর তুলে গান ধরলে—

—বেতারে বাজিছে ফ্লুট—
মন-রসনা—থামা কদমতলার বাঁশী
লে ভাদু লে চটি পরে—পথে কাদা নাই লো।
পিচ ঢালা রাস্তায় চল মন রসনা কলিকাতা যাই লো !

—তারপর ?

—তারপর !—শোন তাহ'লে—

সান কাড়তে হবে নাকো সান গিয়েছে উঠি
আলতাপরা ঘুচেছে লো তার বদলে চটি
ও মন রসনা আমার—হায়—গো
আমার সীমে কি যাবে ভাসি ?

শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—যাক চাকরি, সীমে তোর ভেসে যাবে না।

—যাবে না ?

তার আগে সীমার কথা বলি। দিন সাতেক পর। রথের পর সেদিন আকাশে ঘন বর্ষার মেঘ দেখা দিয়েছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। গরমের ছুটির পর ইস্কুল খুলেছে—হস্টেল খুলেছে।

সীমা হস্টেলের মধ্যে তার জন্যে নির্দিষ্ট সেই খুপরীর মত কুঠরীর জানালাটায় চুপ করে বসেছিল। মন তার বিষণ্ণ। দৃষ্টিও বিষণ্ণ। সেই দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলে চেয়ে আছে।

তার চাকরি গেছে। হরিবিষ্ণু তাকে জবাব দিয়েছেন। দিয়েছেন ওই অপরাধে, কিন্তু মুখে কিছু বলেন নি।

ওদিকে তাদের বাড়ী থেকে খবর এসেছে, বাবার খুব অসুখ।

অমর চক্কোত্তী, তার বাবা, গতকাল অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। গাড়ীতে তুলে বাড়ী নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে রমেন্দ্র। নইলে হয়তো হাসপাতালে যেত। মদ খায় চক্রবর্তী, সে কথা বিশ্ববিদিত। কাল বেশী খেয়েছিল ঝগড়া করবার জন্ত। চণ্ডীতলা নিয়ে ঝগড়া। সামান্ত কারণে ঝগড়া নয়, চণ্ডীতলা নিয়ে প্রকাণ্ড সমস্তা উপস্থিত হয়েছে। সেই সমস্তা ভিত্তির উপর ঝগড়া। অমর চক্রবর্তীর ঝগড়া ইচ্ছা করে। তার ফল—।

দেশের নতুন আইনে—জমিদারি জমি থেকে খাজনা যত রকমের আছে—সব গিয়েছে গবর্ণমেণ্টের হাতে। পুরনো মতে চণ্ডীমায়ের সেবাইত বল সেবাইত, মালিক বল মালিক—ছিল জমিদারেরা। তারা একজন সাধু-সন্ন্যাসীকে গদীয়ান নিযুক্ত করত। সেই পরিচালনা করত সমস্ত—পুজো-ভোগ, খাজনা আদায় ইত্যাদি। এ ব্যবস্থা আশ্চর্য রূপে অচল হল—উপযুক্ত সাধু-সন্ন্যাসীর অভাবে। সন্ন্যাসী মেলে, সাধু মেলে না। তখন হয়েছিল এক ম্যানেজিং কমিটি। দেশ স্বাধীন হবার পর—ম্যানেজিং কমিটি জমিদারে তৈরী করলে না—করলে হিন্দু জনসাধারণ। কিন্তু সেটেলমেণ্টের সময় জমিদার করলে দাবী—সেবাইত তারা। আপত্তি দিলে সেটেলমেণ্টে। ফলে—যে টাকা অন্তবর্তীকালে অ্যানুয়িটি পাবার কথা সরকারের কাছ থেকে তা বন্ধ হয়ে গেল। মা-চণ্ডীর দরবার—জমিদার বাড়ীর সমান হল। মায়ের অনাহারের অবস্থা। এই অবস্থায় মাছ বিক্রি ধান বিক্রি করে ম্যানেজিং কমিটি ভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই চলছিল। হঠাৎ কমিটিতে ঝগড়া লাগল। কমিটির সভাপতি রামসুন্দর গণ্যমাণ্য লোক হলেও—তাকে দায়ে ফেলল কমিটি। কয়েকটা অবিবেচনার কাজ তিনি করেছিলেন। তাঁরা কমিটি থেকে তাকে দায়ী করে শুধু অপদস্থ নয়—পদ থেকে অপসারিত করবার জন্য কোমর বাঁধলে। সভাপতির দল অবশ্যই একটি ছিল। কিন্তু তারা মুষ্টিমেয়। এবং তারা খুব শ্রদ্ধেয় নয়। শক্তিমানও নয়। বিপক্ষে যারা, তাদের মধ্যে বড় বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর শিবশঙ্কর, শিবনাথ দে, নিত্য চৌধুরী, ভবানীকিঙ্কর সকলে আছে। সভাপতি সঙ্কট বুঝে কলকাতায় গিয়ে ধরেছিলেন শ্যামাকিঙ্করবাবুকে। শ্যামাকিঙ্কর এখানকার কোন কলহ সমস্যায় থাকেন না। আসেন—দুদিন থেকে সকলের সঙ্গে হেসে খেলে গল্প করে চলে যান। তিনি এলে হস্টেলের মেয়েরা যায়—শিক্ষয়িত্রীরা যায়—প্রণাম করে—গল্প করে চলে আসে অন্য লোক এলেই। মঞ্জু রঞ্জু দুই বোন ভাল গান গায়—তারা গান শোনায়। বন্ধুরা আসে—তার মধ্যে সুরেশ্বর প্রধান, নিত্য চৌধুরীও থাকে। বাইরের লোকও আসে। শ্যামাকিঙ্করবাবুর নতুন নেশা—গাছের ডাল—বট অশ্বত্থের ঝুরি থেকে সুন্দর পুতুল তৈরী করেন। চমৎকার সেগুলি। কিন্তু কোন সমস্যা বা কলহের সমাধান করতে বললে—হাত জোড় করে বলেন—আমি তোমাদের ভালোবাসার আদুরে ভাই। আমাকে তোমরা, আর চন্দনপুরের মাটির মধ্যে যে মা আছেন—সেই মা বিদেশে পাঠিয়েছেন—তোমাদের মহিমার কথা বলতে। আর সারা দেশ থেকে যে দান—যে ঋণ তারা পাঠিয়েছে—তাই শোধ করতে। আমি তোমাদের ভালবাসায় ধন্য। আমাকে এসবে টেনো না। এবার কিন্তু তিনি ঠেলতে পারেন নি এঁর কথা। কারণও ছিল। প্রথম সাহিত্যিক জীবনে—যখন তিনি সামান্য—যখন তিনি পথের

মানুষ তখন—বছর দেড়েক—কলকাতায় গিয়ে এই রামসুন্দরবাবুর বাসায় থাকতেন—মাসে পাঁচদিন সাতদিন কখনও দশদিন। তারও পেছনে একটু কথা আছে। এই সভাপতি—রামসুন্দরবাবুকে একবার গ্রামের প্রধানেরা পতিত করবার আয়োজন করেছিল; করেছিল বিলেতফেরতের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবার জন্য। তখন শ্যামাকিঙ্কর ছিলেন। জেলফেরত কংগ্রেসকর্মী। তখন তাঁর চোখে বহ্নিকণা বের হত এবং সে বহ্নিকণায় গ্রাম জুড়ে আগুন লাগতেও পারত। সেদিন তিনি রামসুন্দরের পক্ষ নিয়ে সারা গোঁড়া সমাজের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কথা ছিল—বিলেত গেলেই যদি জাত যায়, সে জাত যায় হিন্দুর অখাদ্য-কুখাদ্য খেলে; তবে বাড়ীতে যাঁরা সাহেব ভোজন করান এবং তাদের সঙ্গে অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজন করেন—তাদের পতিত কর সর্বাগ্রে। আমি কারও পক্ষে নই কারও বিপক্ষে নই। আমার যুদ্ধ নীতির জন্য। এতেই রামসুন্দররক্ষা পেয়ে গেলেন। এরপরই রামসুন্দর শ্যামাকিঙ্করকে সমাদর করে বাড়ীতে আহ্বান করেছিলেন। এবং অপরিসীম যত্ন করেছিলেন এই কালটিতে। তাঁর স্ত্রী মায়ের যত যত্ন করতেন স্নেহ করতেন। সেই সময় হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই হৃদ্যতার আকর্ষণেই—রামসুন্দরের অনুরোধে তিনি এসেছিলেন এই গ্রাম্য বিরোধ মিটিয়ে দিতে। কাল ছিল সেই সভা। বহুলোক এসেছিল। রমেন্দ্রও এসেছিল।

ঘটনাটা সম্মান রক্ষা করেই মিটিয়ে দিয়েছেন শ্যামাকিঙ্করবাবু। কিন্তু মাঝখান থেকে মদ খেয়ে প্রমত্ত হয়ে ঝগড়া করেছিল অমর চক্রবর্তী—অন্য একজনের সঙ্গে। নিতান্ত তুচ্ছ কারণে। সে মদ্যপ গালাগাল দিয়ে বলেছিল—তুই আর লাফাসনে। তোর কীর্তি মার্কামারা। শালা, তোর নাকে চুন গালে কালি—তুই আর বলিসনে।

—খবরদার। শালা—শুয়ার কি বাচ্চা চুপ রহো।

—চুপ রহেগা? শালা—তুই চণ্ডীমাকে কিল মারিসনি!

—মেরেছি। আলবৎ মেরেছি, ফিন মারেগা। হম পাণ্ডা হ্যায়। সিদ্ধপুরুষ।

—ওরে শালা সিদ্ধপুরুষ। তুই সিদ্ধ, তোর মেয়ে ইস্কুলে সিদ্ধ হচ্ছে।

—খবরদার—

আর কথা বের হয়নি। লাফ দিয়ে পড়তে গেছে লোকটার উপর, কিন্তু তার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।

রমেন্দ্র জামাই। সে তার নিজের মান-সম্মান বজায় রেখে—তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে দেখিয়েছে। ডাক্তার বলেছে—সাবধানে রাখবেন। কোন রকম উত্তেজনা যেন না হয়। রমেন্দ্রও মদ খেয়েছিল। বলতে গেলে—রমেন্দ্রের কাছে কলহকারী দুই মদ্যপই মদ খেয়ে প্রমত্ত হয়েছিল। এবং মদের নেশার উদারতায় দীর্ঘ দশ মাস পর শ্বশুর জামাইয়ে এই প্রথম মিল হয়েছিল। দুজনেই নাকি চণ্ডীতলার জঙ্গলে বসে মিটিংয়ের পূর্বে চোখের জলও ফেলেছিল অনেক।

খবরটা সীমা পেয়েছে। বাপ সম্পর্কে এই কয়েকমাস তার কোন আবেগ কেউ লক্ষ্য করেনি—কিন্তু চাপা সীমার মনে মনে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা খচখচ করেছে যখনই কোন স্পর্শ তাতে

পড়েছে। বাবা তাকে ভালোবাসতো, একথা সে অস্বীকার করতে পারবে না। কখনও ভেবে দেখেও তার মনে হয়েছে—বাবার মধ্যে যা গুণ ছিল—তা তো কম ছিল না। সে অভিনয় করতে পারে, সে বক্তৃতা করতে পারে, রাজনীতিও জানে বোঝে। দেশপ্রেম—দরিদ্রের প্রতি মমতা এও তো তার ছিল। সে তো জানে। তবু কী মানুষ কী হয়ে গেল! কেন হয়ে গেল? না—আরও কিছু আছে! আছে! সে যদি স্থান পেত—ছোট হোক খাটো হোক একটুখানি বিশিষ্ট স্থান—যদি একটি উচ্চ মার্গে ওঠার প্রথম ধাপটিতে সে একটু দাঁড়াবার স্থান পেত—তবে হয়ত এমন হত না। আরও আছে, যদি ওই কালের, ওই কালই বা কেন, নারী-লালসা সকল কালের, নারী-লালসা তার না থাকত। যদি পবিত্র হত তবে এমন হত না! তিনটি অভাব ত্র্যহস্পর্শের মত তার বাবার জীবনকে এমন ব্যর্থ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। ওঃ!

বার বার তার ইচ্ছা হয়েছে, বার বার—ছুটে গিয়ে বাবাকে দেখে আসে। কিন্তু পারে নি। সাহস হয় নি। একটা সঙ্কোচ, অজেয় দুর্নিবার সঙ্কোচ তাকে জড়িয়ে ধরেছে নাগপাশের মত! সেই কারণেই তার মন বিষণ্ন। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বসে আছে। মধ্যে মধ্যে মেঘ ডাকছে। বর্ষার গম্ভীর গুরু গুরু ডাক।

পাশেই রাস্তার ওপাশে শ্যামাকিঙ্করবাবুর বাড়ী। ওদের বৈঠকখানার কাছারিটিকে উনি নিজের মত অদলবদল করে নিয়েছেন। যখন আসেন ওইখানেই থাকেন। ওখান থেকে হাসির শব্দ আসছে। আনন্দ হচ্ছে। কথার মধ্যে আনন্দের স্রোত। একখানা মোটর এসে দাঁড়াল। জিপ। কোন অফিসার এসেছেন,—শুনেছেন শ্যামাকিঙ্করবাবু আছেন এখানে—দেখা করতে এসেছেন। হয়ত স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কেউ হবে। আজ এখানে প্রথম ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে।

নসুবালা তার ভাদু গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে। ইলেকট্রিকের ভাদু।

চল ভাদু যাই চন্দনপুরের
অবাক কাণ্ড দেখে আসি।

সে গান সকালেই সীমার কানে গেছে। এই মেয়েদের হস্টেলেই সে গেয়ে গেছে। কিন্তু সীমা বের হয় নি। ইচ্ছা হয় নি, পারে নি। মধ্যে মধ্যে কান্না পাচ্ছে। তার পরীক্ষার খবর বের হবার সময় হয়েছে। সেই নিয়েই ছিল তার উদ্বেগ। কিন্তু সে উদ্বেগও তার আজ নেই। তার বাবা—হতভাগ্য বাবা—। ওঃ, কারুর চেয়ে খাটো নয় মানুষটা, অথচ কি পরিণতি হয়ে গেল তার! এমন শোচনীয় পরিণতি আর সে দেখে নি!

হঠাৎ মনে হল সতীশ ঘোষালের কথা। ওই আর একটি। অবশ্য তার বাপের মত দুর্ভাগ্য তার নয়। সংসারে মা আছে স্ত্রী আছে তার গুণমুগ্ধ। আর সে তার বাপের মত পতিত নয়। হীন সে নয়। তবে ওই প্রতিষ্ঠার উদগ্র কামনায় এ লোকটি ব্যর্থ হয়ে গেল। পরশু সে অবাক হয়ে দেখেছে তার কাণ্ড। শ্যামাকিঙ্করের নিন্দা করছিল, শ্যামাকিঙ্কর নাকি পথ বন্ধ করেছে। মিথ্যা কথা সে নিজে জানে। মেয়েদের স্নানের ঘাটের উপর দিয়ে সাইকেল চড়ে যেতে তিনি বারণ করে বলেছেন—মেয়েদের স্নানের ঘাট মেয়েদের পথ। এ

পথে পুরুষের যাওয়া ঠিক নয়। চন্দনপুর এখনও পল্লীগ্রাম, এখনও মেয়েরা ঘাটে স্নান করে!

বিচিত্র লোক। লোক বিচিত্র নয়। বিচিত্র মানুষের ব্যর্থ প্রতিষ্ঠা-লিপ্সা তাকে এমনি উদ্ধত অহঙ্কারী করে তোলে। তার জন্ম কষ্ট পায়—নিন্দিত হয় তবু উদগ্র প্রতিষ্ঠা-কামনায় চীৎকার করে তারস্বরে। আর একদিনের কথা মনে পড়ছে।

ঘোষাল বসেছিল রাস্তার ধারে—একা। কথা বলবার লোক মেলে না। খানিকটা দূরে—ক'টি ছেলে গল্প করছিল। একটি ছেলে বলছিল—গতরাত্রে সে সাপের উপর পা দিয়েছিল। পুণ্যের জোর ছিল তাই বেঁচে গেছে।

ঘোষাল তৎক্ষণাৎ ডেকে বলল—মূর্খ কোথাকার। তুমি বলতে চাও—পাপীকেই সাপে কামড়াক?

ছেলেরা সন্তুষ্ট নয় ঘোষালের উপর। তার কথা শুনে ছেলেরা বলেছিল—তবে কি—পুণ্যাত্মা হলেই সাপে কামড়ায়?

ঘোষাল বলেছিল—মহাভারত পড়েছ? অকালপক্ক—মূর্খের দল!

—কি আছে মহাভারতে? তাই লেখা আছে বুঝি?

—নিশ্চয়! সত্যবান—অর্থাৎ—সত্য ছাড়া যে মিথ্যা বলে না—পরম পুণ্যাত্মা—তার কিসে মৃত্যু হয়েছিল? জান?

—কিসে?

—সর্পাঘাতে।

অন্য একটি ছেলে তৎক্ষণাৎ বলেছিল—না।

—হ্যাঁ।

—না।

—তুমি মূর্খ। তুমি মূর্খ। তুমি মূর্খ।

—না—না—না। দাঁড়ান, আনছি মহাভারত। সে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত এনে খুলে ধরেছিল—পড়ুন।

—পড়। তুমি পড়। আমার চশমা নাই। আমার পড়া আছে।

—না—নেই। শুনুন আমি পড়ি—"বীর্যবান সত্যবান কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে করিতে সাতিশয় ব্যায়াম হওয়াতে তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদ বিনির্গত হইতে লাগিল ও মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন তিনি প্রাণ-প্রিয়া প্রণয়িনীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন—সাবিত্রী প্রভূত পরিশ্রম হওয়াতে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। ফলতঃ আমি নিতান্ত অসুস্থ হইয়াছি। আর মস্তকে যেন শূল বিদ্ধ হইতেছে।" শুনলেন? সাপ ত্রিসীমানায় নেই। মূর্খ আমরা নই। মূর্খ—

আমি? না? মূর্খ আমি? হে ভগবান!

থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিলেন ভদ্রলোক। প্রতিবেশী সুরেশ্বর এসে ছেলেদের নিরস্ত করে তাকে ঘরে—

—টেলিগ্রাম!

টেলিগ্রাম! কোন দিদিমণির না কোন ছাত্রীর! কার কি হল। সীমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। সে বেরিয়ে এল। হ্যাঁ। পিওন দাঁড়িয়ে।

—আপনার টেলিগ্রাম।

—আমার?

—সীমা দেবী।

—হ্যাঁ। আমি। কই? দাও।

—সই করুন। ভাল খবর। বকশিশ নেব। পাশের খবর।

—পাশের খবর?

সে পাশ করেছে! কোন রকমে সই করে দিয়ে টেলিগ্রাম খুললে—

Passed second division—congratulation. All school candidates passed except roll 26. 29. 30. Subhendu.

উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল। সব সে ভুলে গেল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘ ছিঁড়ে যেন সূর্য উঠল।

কাকে বলবে? কাকে? স্কুলের সময় মেয়েরা দিদিমণিরা সব স্কুলে। কোন একটি মেয়ে মাথা ধরেও হোস্টেলে নেই—কাকে বলবে? সামনে ছিল রতন ঠাকুর। তাকেই সে বললে—রতন আমি পাশ করেছি। তারপর ছুটে গেল ভবানীবাবুর বাড়ী। ভবানীবাবুর মাকে বলে ঠাকুমা। এ পাড়ায় ঠাকুমা তিনি—তাঁর পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করে বললে—ঠাকুমা, আমি পাশ করেছি। জোরে চিৎকার করে বললে। কারণ ঠাকুমা কালা।

—পাশ করেছ? বৃদ্ধার চিবুকটি স্নেহের আবেগে কাঁপতে লাগল। খুব ভালো, আরও পড়। আরও।

—কাকীমা পাশ করেছি। ভবানীবাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করলে। তারপর ছুটল ইস্কুলে।—দিদিমণি আমি পাশ করেছি—সেকেণ্ড ডিভিশন।

মিস্ট্রেসরা বেরিয়ে এলেন। সে সকলকে প্রণাম করলে।—আমি পাশ করেছি। স্কুলের তিনটি পাশ তিনটি ফেল।

—কোথায় খবর পেলে?

—টেলিগ্রাম। এই দেখুন!

হেডমিস্ট্রেস টেলিগ্রাম পড়লেন—বললেন—শুভেন্দু! মানে নেলির দাদা!

কমলাদিদি হেসে বললে—কচ? দেবযানী পাশ করেছে?

এতক্ষণে খেয়াল হল সীমার। শুভেন্দু টেলিগ্রাম করেছে। তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল মুহূর্তে। ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল।—কেন? শুভেন্দুর এ হিতৈষীপনার কি দরকার ছিল। ভারী অন্যায়।

দিদিমণি বললেন—যাও প্রণাম কর সকলকে।

—করেছি দিদিমণি। ঠাকুমাকে, কাকীমাকে পাড়ার যাকে দেখেছি সকলকে প্রণাম

করেছি।

—করেছ! বেশ! শ্যামাকিঙ্করবাবুকে করেছ? তিনি এখানেই আছেন।

—যাই নি, যাব?

—যাও!

—আর—। একবার বাড়ী গিয়ে তোমার বাবাকে প্রণাম করে আসবে না? তাঁর তো অসুখ। তা ছাড়া—। চুপ করে গেলেন দিদিমণি। সেও তাঁর কথার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

দিদিমণি বললেন—যাওয়া উচিত। তুমি—ওঁকে শ্যামাকিঙ্করবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিয়ো।

সে হাঁপাচ্ছিল, ছুটেই এসেছে স্কুল থেকে। এসে ঠুক্ করে প্রণাম করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। শ্যামাকিঙ্কর তাঁর বসবার প্রিয়স্থান নিমগাছতলার বেদীটির উপরে বসে কাঠের পুতুলে রং দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে দেখে হেসে বললেন—

ধন্যা কন্যা সীমা অনন্যা?
দুখবিজয়িনী চিরপ্রসন্না?
দুর্বার যার জীবনবন্যা?

কি সংবাদ গো। হঠাৎ নমো কেন? এ্যাঁ?

ওই ছড়া বলেই তিনি বরাবর তাকে অভিনন্দিত করেন। তার মাথায় হাত দিয়ে বলেন—এমন মেয়ে হয় না।

হেসে সীমা বললে—আমি পাশ করেছি। সেকেণ্ড ডিভিশনে।

—অভিনন্দন—কনগ্র্যাচুলেশন্। বসো, মিষ্টি খাও। রাম, মিষ্টি আন—চা আন। সীমা ইস্কুলের সীমা পার হল—পুকুর থেকে নদীতে পড়ল। আন মিষ্টি আন।

লজ্জায় আনন্দে তার জীবন যেন বিগলিত হচ্ছিল। সার্থকতা যখন শ্যামাকিঙ্করবাবুদের মত বড় মানুষের অভিনন্দনে ধন্য হয়—তখন জীবন যেন হয় বিগলিতশিলা। হিমালয়ের পাথর গলে গঙ্গা নির্গমনের মত চোখের গোমুখী থেকে গঙ্গা যমুনা পাশাপাশি নেমে এল সীমার মুখ বেয়ে বুকের উপর।

শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—চন্দনপুরের জয়যাত্রার পথে আজই ইলেকট্রিক জ্বলবে; তুমি পেলে পাশ করার খবর। এ একটা রেকর্ড। এখানকার নারী জীবনের ইতিহাসে—তুমি তেনজিং নোরকে। তেনজিং যেমন এক অখ্যাত নেপালী পল্লীর অধিবাসী এভারেস্ট জয় করলে—সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিং বললে তেনজিং আমার। তেমনি চন্দনপুরও আজ নবীনপুরের কন্যাটিকে আত্মসাৎ করলে—বলবে নবীনপুর আমারই অংশ—ও আমার কন্যা—ধন্যা ধন্যা—সে যে অনন্যা!

সে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। শ্যামাকিঙ্করবাবুর পরিচারক একখানি প্লেটে মিষ্টি এবং কাচের

গ্লাসে জল এনে নামিয়ে দিল। শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—খাও।

—না। এখন খেতে পারব না। আমি প্রণাম করে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।

—না খাও! পাশে পেট ভরে না। পেট ভরবার ওটা একটা ভাঁড়ারের চাবী মাত্র। নাও খাও।

সে খেতে বসল। শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—তোমার প্রশ্ন আমি সম্ভবত অনুমান করতে পারি।—যাবে, নিশ্চয় যাবে বাবাকে প্রণাম করতে, দেখতে।

থেমে থেমে তিনি বলেই গেলেন—, শুনতে শুনতে তার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল—। শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—তোমার বাবার কাছে তোমার অনেক ঋণ। সাধারণ সন্তানের পিতৃঋণ থেকে বেশী। এই দুর্ধর্ষতা তার থেকে পেয়েছ তুমি। অমর দুর্ধর্ষ চিরকালের।

আবার বললেন—কাল এমন অকস্মাৎ ঘটে গেল ঘটনাটা যে—কেউ আমরা এগিয়ে যাবার সময় পেলাম না। মদটা বেশী খেয়েছিল কাল। আমাকে দাদা বলে—ভক্তি করে—কাল নেশায় তাও যেন—। চুপ করে গেলেন।

আবার বললেন—আমি নিজে অপরাধ বোধ করি অমরের এই পরিণতির জন্য। তোমরা জান না। উনিশশো সাঁইত্রিশ সাল—তখন রাজনীতি ছেড়েছি, সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। এ অঞ্চলে অমর তখন কর্মী। জেলা কংগ্রেস ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ইলেকশনে নেমেছে। অমর চাইলো প্রতিনিধিত্ব, আর চাইলেন—রামসুন্দরবাবু। হ্যাঁ এই রামসুন্দরবাবু। কংগ্রেস কর্মী অমরকে দিল নমিনেশন। রামসুন্দরবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন। এই এবারেরই মত।—থেমে গেলেন।

হেসে আবার বললেন—জান, ভুল সংসারে সবাই করে, মানুষকে মানুষ ওই যুক্তিতে ক্ষমাও করে। কিন্তু যে ভুল করে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। কারণ ওর মাশুল না দিয়ে তার নিজের নিস্তার নেই। বছর কয়েক আগে—রামসুন্দরবাবুকে বিলেতফেরতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া নিয়ে পতিত করতে চেয়েছিলেন গ্রামের প্রধানেরা—

এবার সীমা বললে—জানি। আপনি ওঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

—না। আমি দাঁড়িয়েছিলাম—একটি নীতির জন্যে। এবং বিপক্ষে বলতে গেলে কোন বা কয়েকটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়—দাঁড়িয়েছিলাম সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। জিতলাম। কিন্তু তারপরই করলাম ভুল। তখন কলকাতায় যাই—দু'চারদিন সাতদিন বড়জোর দশদিন থাকি চলে আসি। রামসুন্দরবাবু সমাদর করে আহ্বান করলেন—এস আমার এখানে ভাইয়ের মত থাকবে। আমি গ্রহণ করলাম নিমন্ত্রণ। বছর দেড়েক এই ভাবে—কখনও তিনদিন—কখনও সাতদিন কখনও দশদিন থেকেছি। তারপর বুঝলাম—না—এটা আমার ভুল হচ্ছে। ভুল হয়ে গেছে। গোটাটাই দাঁড়িয়ে গেছে উল্টো। মনে হল আমি যা সমাজের জন্য করেছিলাম, সেটা রামসুন্দরের জন্যে করা হয়ে গেছে এবং তার ঋণ শোধ হয়ে আমি ঋণী দাঁড়িয়ে গেছি। তাই সেদিন যখন রামসুন্দরবাবু অনুরোধ করলেন—এ নমিনেশন আমাকে করে দিতেই হবে,

তখন আমি কর্তাদের বললাম। কর্তা সুরেন আমার বন্ধু। কিন্তু তিনি নিরুপায়, তিনি বললেন—আমার হাতে আর নেই। আপনি অমরকে ধরুন। সে আপনার কথা নিশ্চয় শুনবে। আমি একবার ভুল করেছিলাম—আবার ভুল করলাম। চন্দনপুর এসে অমরকে ডেকে বললাম—তুমি এবারের মত ওঁকে আমার অনুরোধে ছেড়ে দাও সিট; অমর আমার অনুরোধে ছেড়ে দিয়েছিল। বিনিময়ে দেড়শো কি দুশো টাকা রামসুন্দর দিয়েছিলেন—তোমাদের গ্রামের স্কুলের জন্য—দিয়েছিলেন অমরেরই হাতে। অমর তখনকার মত খুশী মনে গেল। কিন্তু তার ভিতরের প্রতিষ্ঠা কামনার উত্তাপ আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। ভুল সেও করেছিল আমার অনুরোধ রেখে। সেই আগুন তাকে পুড়িয়ে দিল। সেদিন যদি সে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার হয়ে প্রতিষ্ঠার সিঁড়ির প্রথম ধাপে স্থান পেত, তবে সে উঁচুর দিকেই উঠত, নীচে নামত না। তার জন্যে দায়ী আমি খানিকটা এ তো ভুলতে পারি না।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন শ্যামাকিঙ্করবাবু। সীমার চোখ থেকে দুটি অশ্রুর ধারা নেমে এল। আর সে খেতে পারলে না, খাবারের থালাটি রেখে দিলে। শ্যামাকিঙ্করবাবু দেখলেন—বললেন—জল খাও।

আবার বললেন—যাও। তুমি সেদিন রাত্রে চলে এসেছিলে—ভুল তোমার হয় নি। বিয়ে করলেই ভুল করতে। শেষ মুহূর্তেও সে ভুল তুমি সংশোধন করেছ—তাই তুমি অনন্যা। কিন্তু আজ তুমি যদি না যাও বাবাকে প্রণাম করতে—তবে ভুল করবে। এবং চিরজীবন অন্তত মনে মনেও আমার মত মাশুল দেবে। তবে—।

হেসে বললেন—বাবা অসুস্থ। মনে রেখো। আবেগের বশে একটা এমন কিছু করো না —যাতে অমরও আবেগের বশে—উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বোধহয়—। গোড়াতেই অমরের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। বাইরে খবর নিয়ো তোমার—সেই—

—তিনি সত্যিই আমার মা। বাবা তাকে বিধবা বিবাহ করেছেন। বিয়ে ঠাকুমা দিয়ে গেছেন। শুধু চণ্ডীতলার সেবাইতগিরি যাবে বলে গোপন রেখেছেন কথাটা।

নীরবে শ্যামাকিঙ্কর কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন সীমার মুখের দিকে—তারপর বললেন—তোমার মাকে আমার আশীর্বাদ দিয়ো, নমস্কার দিয়ো। যাও।

২২

ভাগ্যক্রমে সেদিন চণ্ডীতলার ডাক্তার ছিল। তারা অমর চক্রবর্তীকে দেখেছিল এবং বাঁচিয়ে ছিল। ঐ মিটিঙে উপস্থিত ছিল আশু সিংহী আর যোগপুর থেকে এসেছিল—ধ্রুব ডাক্তার।

অসুস্থ অমরকে দেখে ধ্রুব ডাক্তার বলেছিল—শক্ত মানুষ লড়ুয়ে মরদ, বেঁচে গিয়েছে। ক্ষতি হয়েছে, তবু দাঁড়াবে। স্ট্রং ম্যান—ফাইটিং সোলজার। কেবল ভাগ্যদোষে হয়ে গেল

এমনটা!

বাড়ীতে আনার পরও রমেন্দ্র ধ্রুব ডাক্তারকে 'কল্' দিয়েছিল। ক্ষমা এসে সেবা করছিল। বলতে গেলে সমস্ত ভার রমেন্দ্র নিয়েছে।

রমেন্দ্র ধ্রুবকে বলছিল—খাড়া করে দেন একবার। আমি নিয়ে যাব—বনচাতরাতে থাকবেন। আলাদা বাড়ীতে থাকবেন। বলতে গেলে আমিই তো ছেলে। আর তো কেউ খোঁজও করে না। আর এক মেয়ে তো—

সীমা এই সময়ে এসে দাঁড়াল। আশু বললে—সীমা!

ধ্রুব ডাক্তার বললে—তুমি সীমা! আচ্ছা! তোমার বাবা ভাল আছে।

রমেন্দ্র চুপ করে রইল। ধ্রুবই বললে—কি হে রমেন্দ্র! কথা বল! তোমার শ্যালিকা!

রমেন্দ্র বললে—আসুন।

সীমা বলে ফেললে—আমি পাশ করেছি সেকেণ্ড ডিভিশনে।

ধ্রুব বললে—গুড নিউজ। ভেরী গুড নিউজ। দাঁড়াও। আমি গিয়ে চক্রবর্তীকে তৈরী করে দিই। তারপর তুমি আসবে। ঠিক হয়ে যাবে। হি ইজ এ ভেরী স্ট্রং ম্যান। মদ ছাড়লে এখনও বিশ বছর বাঁচবে। আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

সত্যই শক্ত মানুষ—অসাধারণ প্রাণশক্তি এই অমিতাচারী উচ্ছৃঙ্খল—ব্যর্থতার তাড়নায় অধীর এই হতভাগ্য মানুষটির। সে কাঁদল সংবাদটা শুনে। ধ্রুব ডাক্তার বললে—তাকে ডেকে পাঠাব? দেখতে ইচ্ছে তো হয়!

—হয়। কিন্তু—।

—কি?

—সে আসবে?

—নিশ্চয় আসবে। আসবে না? সে কন্যা তো তোমার গুণবতী কন্যা।

—নিশ্চয়! জান ডাক্তার, ও বি-এ পাশ করুক, আমি ভাল হয়ে উঠি। উঠব, সেরে উঠব আমি। আমি ওকে এখানে অ্যাসেম্বলীর জন্যে দাঁড় করাব। দেখবে ঠিক রিটার্ন হয়ে যাবে।

ধ্রুব হেসে বললে—সে হবে। ওসব চিন্তা এখন ছাড়। এখন ডেকে পাঠাই?

—দাঁড়াও। রমেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি! তার অমতে কিছু করতে পারব না আমি।

—রমেন্দ্র আপত্তি করবে না আমি বলছি।

—না। তাকে ডাক।

রমেন্দ্র এসে হেসে বললে—দেখুন দিকি। আমি আপত্তি করব? কেন? উনি আপনার যেমন—তেমনি আমাদেরও গৌরবের জিনিস। উনি তো এসেছেন। এতক্ষণ তো কথা বলছিলাম। ডাকি আমি, ডাকি।

ধ্রুব বললে—খবরদার, নো ইমোশনাল আউটবার্স্ট।

সীমা এসে ঘরে ঢুকল।

ধ্রুব বললে—নো ইমোশান সীমা। মনে কর এক্ষুনি তোমাকে টি-এ-বি-সি-ইনজেকশন দেওয়া হবে—খুব আস্তে। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে ছোট্ট একটি প্রণাম। এবং একটি কথা—আমি পাশ করেছি বাবা! আর একটা কথা বলতে পার—আমাকে ক্ষমা কর বাবা! ব্যস! চক্রবর্তী—তোমার ওয়ান ওয়ার্ড, ওনলি ওয়ান ওয়ার্ড।—বসো। ব্যস। কই চক্রবর্তী-গিন্নী—সীমাকে জল খেতে দাও। ব্যস চলি এখন।

ডাক্তার চলে গেল। ক্ষমা, মনোরমা ঘরে এসে ঢুকল। ক্ষমা সীমাকে প্রণাম করলে। বললে—তুই পাশ করেছিস? ধন্য তুই।

রমেন্দ্র বললে—আমিও তাহলে একটা প্রণাম করি! বড় শালী! সম্পর্কে বড়!—

—না। লাফ দিয়ে উঠল সীমা—না! বাবাঃ!

সকলে হেসে উঠল। আশ্চর্য একটি প্রসন্নতা সেদিন—অমর চক্রবর্তীর লক্ষ্মীশ্রীবর্জিত রুক্ষকেশা-ছিন্নবাসা ভিক্ষুণীর মত ঘরখানিতে ফুটে উঠল। যেন ভিক্ষুণীর ভিক্ষার ঝুলি কোন্ লক্ষ্মীর প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উছলে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পর—সীমা বললে—আমি যাই এখন।

—না। আজকের দিনটা থাক। আনন্দ করি। বস্, আমার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দে, আমি ঘুমুই।

পরিবর্তনশীল জগতের কোন গভীরে একটি স্থির চিরকালের পৃথিবী আছে। পরিবর্তনের সকল আবেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসে। সেইটিই বোধ হয় মানুষের অনন্তকালের সংসার। বিরোধ মতভেদ রুচিভেদ সব দূর হয়ে গিয়ে শুধু হৃদয়ের আনন্দই সেখানে আছে!

* * * *

তবে সে বড় স্বল্পক্ষণস্থায়ী।

ওই আনন্দ আলোকের ছায়ার মধ্যে—তার বিপরীত ধর্ম জাগে। কালো অন্ধকার।—নিঃশব্দতার মধ্যে বিকট চীৎকার করে এই কালো অন্ধকার জেগে ওঠে। দিনের আলোকে মুছে দেয়।

তখন মধ্যরাত্রি! এমনি চীৎকার উঠল চক্রবর্তী বাড়ীতে। একটা বিপুল ভারী কিছু যেন ভেঙে পড়ল। চক্রবর্তী বাড়ীর ভাঙা দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। ছুটে বেরিয়ে গেল সীমা। সে অন্ধকারের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে। চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক।—অন্ধকার ভেদ করে সে খুঁজছে পথ। প্রায় এক বছর আগে সে যেমন একদিন পালিয়ে এসেছিল—নবীনপুর থেকে চন্দনপুরে।

চন্দনপুরে ঢুকেই সে আলো পেলে।

আজ এখানে ইলেকট্রিক আলো জ্বলেছে।

আলোতে এসে দাঁড়াল। তার কাপড়ে রক্ত। অনেক রক্ত। বেশভূষা বিপর্যস্ত। হাঁপাচ্ছে সে। মধ্যরাত্রির আলোগুলি স্থির হয়ে জ্বলছে। শুধু একটি বাড়ীর উঠোনে গান

হচ্ছে এখনও। ফটিকদাসের বাড়ী রাস্তার ধারে। ওইখানেই একটা লাইটপোস্ট। তারই আলোয় ফটিক এবং নস্থ আজ সারা রাতের পালা জুড়েছে। চাঁদের আলোয় জেগে থাকা গান গাওয়া পাখীর মত তাদের চোখে ঘুম নেই। তারা আজ শিবনাথ দে'কে বলে তার হুকুম পেয়েছে।—দে হেসে বলেছে—তা যখন তোমাদের ইচ্ছে, আর আলোতে ঘুমই আসবে না—তখন গেয়ো গান। আমি না হয় জানলা বন্ধ করে পাখা খুলে শোব!

তারা গান গাইছে—

ইলেকট্রিরির আলো এলো ; ও ভাদু তুই
কেমন করে কদম তলায় যাবি।
নিশে চোর মরে বেঁচেছে—
আলো করা রাতের বেলা আঁধার কোথা পাবি ?
মন রসনা কেমন করে কদমতলা যাবি!

সীমা এসে থমকে দাঁড়াল।—ভাদুর মা!

—কে ? হেই মা! সীমে ? টলছ! ধর-ধর আমাকে ধর, একি ; সর্বাঙ্গে রক্ত! হেই মা।

—আমাকে থানায় নিয়ে চল ভাদুর মা!

—থানায় ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ থানায়। থানায়।

২৩

—বেয়াই!

—বেয়ান!

—ই কি হল ?

—কি হবে ? যা হয়েছে—তাই হল। বিধেতার খেলা বল—তাই—

—না। এমন খেলা সে কেনে খেলবে ? তা হলে তো কানার খেলা!

—তা হবে বেয়ান।

—না তা হলে সি মরুক। কানার আবার খেলার সাধ কেন ? আমরা তা মানব কেনে ? আজ আর নস্থবালার খেয়াল নেই সে 'ক্যানো'কে 'কেনে' বলছে।

ফটিকদাস হেসে বললে—তা সি মরেছেও হতে পারে। চণ্ডীতলার বাগে তাকিয়ে দেখ!

—তা বটে। ভোগ হয় না সময়ে। সাঁজ পড়ে না সময়ে। মাটির ঢিপ—ঢিবি হয়ে পড়ে আছে—নড়ে না—চড়ে না। আগে কালে শিবাভোগ না হলে চন্দনপুরে সব গেরস্তের উপোস হত। কান্না পড়ে যেত। আজ কেউ খোঁজও করে না। তা যাক ভাই—কিন্তু এ হ'ল কি!

—দেখ—এঁকে রেখেছি পটে। এই দেখ, রমেন্দ্র সি একটা পাষণ্ড পিশাচ তার ওপরে বড়লোক মহাজনের বেটা—তার যত লালস তত আক্রোশ। দেখ তুমি, মুখটা দেখ! সীমেকে এতদিন বাদে দেখে অবধি তার বুকে ওই দুটো জোড়া সাপের মত ফোঁসাচ্ছিল। বেরিয়ে আসতে পথ খুঁজছিল। রাত্রে সীমা থাকল—আঁধারে সাপ দুটো উঁকি মারলে। বললে—আচ্ছা সুযোগ। এই লাও অপমানের শোধ। আর ক্ষমাটা শুধু একটা মাংসপিণ্ডি। ওতে কি কোন সুখ আছে? সীমের মত মেয়ে নইলে সুখ। সীমে রাজী হবে না? তা কি সহজে হয়! তবে টাকা-গয়না এত কি সহজ? আগে কাবু কর। তারপর মুখ বন্ধ টাকাতে গয়নাতে হবে। এই দেখ মদ খাচ্ছে ঘরে বসে। ক্ষমাই দিচ্ছে। ও তো দিত। ওটা তো মাংসপিণ্ড। জানত শুধু গয়না পরতে সাজতে আর খেতে। রমেন্দ্র বলেছিল—বন্ধ করে, দরজা বন্ধ করে। সীমা যেন বুঝতে না পারে। হাজার হলো পাশ করা মেয়ে—তার ওপর সম্বন্ধে বড়।

—ওঃ কুপাক! হায় দুর্বুদ্ধি! ই শুনি নাই কোন কালে। ই কি কাল! ই কি কাল? কলিকাল!

—তা বলো না। ই সব কালেই আছে। রামায়ণে সীতাহরণ মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। সতী যারা তারা সীতার মতন নড়াই করে। দেবতাকে মানুষকে চীৎকার করে ডেকে বলে—আমার অপমান করছে সাক্ষী থাক। তবে জলে পাথর ভাসে—রাবণ বধ হয়। সীতা অগ্নিপরীক্ষে দিয়ে বেরিয়ে আসে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র হয়, দুর্যোধনের একশো ভাই মরে। যারা চেঁচায় না—ভয়ে হোক লজ্জায় হোক—তাদের কথা কেউ জানতে পারে না, ঢাকা থাকে। বিচার হয় পরকালে—ধর্মরাজের আদালতে। মেয়ের সাজা হয় গোপন করেছে বলে—এমন পুরুষের সাজা হয় অত্যাচার করেছে বলে। তা সি সব তো উপকথা। মিছে কথা। ভুয়ো কথা! এই চন্দনপুরে এমন পাপ কত হয়েছে। জান তো তুমি। তুমি বলে চন্দনপুরে শুকসারীর সারী—তুমি জানো না। এ কন্তে আচ্ছা কন্তে—ওই যে শ্যামাকিঙ্কর বলে—ধন্যা কন্যা অনন্যা তাই।

এ কথা হচ্ছিল ছ মাস পর। হচ্ছিল—নস্তুবালা আর ফটিকদাসের মধ্যে। নস্তু বললে—উ কথা রাখ ভাই। এখন ক্ষমার সিঁথির সিঁদুরটা থাকলে হয়।—আঃ,কচি মেয়ে হে! কাল জজ যে কি রায় দেবে—ভগবান জানেন।

* * * *

আদালতের বিচারে রায়েও তাই বললেন জজ সাহেব। "এই মামলার প্রধান সাক্ষী শ্রীমতী সীমা চক্রবর্তী একটি আশ্চর্য মেয়ে। এমন মেয়ে সমাজের গৌরব। অসাধারণ সাহসের অধিকারিণী, দৃঢ়চিত্ত, সত্যবাদিনী। তাহার প্রতিটি বাক্য আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। জুরীরাও করিয়াছেন। রাত্রির অন্ধকারে পিতৃগৃহে আত্মীয়-পরমাত্মীয়দের মধ্যে নিদ্রামগ্ন কুমারী কন্যা নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। দীর্ঘকাল পর পিতার সঙ্গে মাতার সঙ্গে ভগ্নীর সঙ্গে এবং এই আসামী রমেন্দ্রর সঙ্গে বিবাদ মিটিয়া মিলন হইয়াছে। কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সুন্দর স্বপ্ন

দেখিবারই পরিবেশ। অসুস্থ পিতা কিছু সুস্থ হইয়াছেন। নীচের ঘরে মা-বাপ। উপরে দুখানি পাশাপাশি ঘর। একখানি ঘরে এই সীমা একা, অন্য ঘরে তাহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি এই আসামী রমেন্দ্র। আসামী পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়। একখানি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে কূটবুদ্ধি এবং সম্পদের শক্তিতে অজগরের মত প্রকৃতি নিয়া রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে। অতীতকালের সমাজ এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিততম জীব। এ কালেও এরা কূটবুদ্ধিতে নিজেদের বাইরের রঙ পরিবর্তন করিয়া অতীত প্রকৃতি লইয়া সুযোগ মত জঘন্যতম অপরাধ করিয়া যায়। আসামী সীমাকেই বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, সীমা অসহায়ভাবে প্রথম সম্মতি দিয়াও বিবাহের দিন পলাইয়া গিয়া থানায় আশ্রয় লয়—পরে আশ্রয় পায় গার্লস স্কুলে। রমেন্দ্র মৃত অমর চক্রবর্তীর কনিষ্ঠা কন্যা ক্ষমাকে বিবাহ করে। উভয়েই বিচিত্র জীব। মৃত পিতা অমর চক্রবর্তী—একজন ভ্রষ্ট রাজনৈতিক কর্মী—একজন ভ্রষ্ট মানুষ। কিছু কিছু সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও ভ্রষ্ট মানুষ। অভাবী—মদ্যপ। ক্ষমা অতি সাধারণ একটি মেয়ে। তাহার নিকট সত্যের অপেক্ষা স্বার্থ বড়। স্বামীর প্রতি তাহার আনুগত্য—অন্ধ, হয়তো জৈব। মিথ্যা বলিতে দ্বিধা নাই। পুণ্যের ধর্মের চেয়ে সম্পদ বড়। সে লোভী। এই রমেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহে সে খুশী হইয়াছিল; স্বামীর ব্যভিচার দোষ তাহাদের ঐ দূর পল্লীর অন্ধকারে অবাধে চলিত ব্রাত্য নারীদের সঙ্গে—তাহা জানিয়াও তাহার আনুগত্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অসুখী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত তাহার পিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সে এই দেখার অভ্যাসে ইহাতে দোষ দেখে নাই। ঘটনার দিন কিন্তু স্বামীর মন্দ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারার জন্য দায়ী নয়। কারণ আসামী তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় শিকল্ বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। আসামী রমেন্দ্রকে সে প্রথম রাত্রে অভ্যাসমত মদ্য পানের আয়োজন করিয়া দিয়াছিল। রমেন্দ্র আকস্মিক-ভাবে এই মন্দ প্রবৃত্তিতে উন্মত্ত হইয়া এই কাজ করিতে উদ্যত হয় অথবা গোড়া হইতেই মতলব করিয়াছে—ইহা সঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে একটি আক্রোশ বা প্রতিশোধস্পৃহা সহজেই আবিষ্কার করা যায়। যাহা হউক ঘটনা এই: মধ্যরাত্রে ঘুমন্ত সীমা অনুভব করে তাহার উপর যেন কেহ বা কিছু চাপিয়া বসিয়াছে এবং তাহাকে নগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিতেই মুখ চাপিয়া ধরিয়া আসামী বলে—চুপ! আমি। চীৎকার করিলে—যে কলঙ্ক তোমার হইবে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। আমি বলিব—তুমি আমাকে ডাকিয়াছ। তোমাকে অনেক টাকা দিব। চুপ।

সীমা অসাধারণ মেয়ে। সে আসামীকে মুখে কিল মারে। নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করে—সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে থাকে। হঠাৎ তাহার হাতে ঠেকে মাথার বালিশের পাশে একটা পাথর—মশারি খাটাইবার পেরেক পুঁতিয়া ওটাকে শিয়রে রাখিয়াছিল, ভুলবশত। সেই ভুলই তাহার পরম মঙ্গলজনক হইয়াছে। ওই পাথর দিয়া সজোরে সে অন্ধকারেই আসামীর মুখে মারে। সেটা লাগে আসামীর নাকে। প্রচুর রক্তপাত হয়। ইতিমধ্যে অসুস্থ হতভাগ্য অমর চক্রবর্তী জাগিয়া উঠিয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়া উপরে আসে। তাহার পিছনে আসিয়াছিল তাহার স্ত্রী বা রক্ষিতা মনোরমা। তাহার হাতে আলো ছিল। হতভাগ্য অমর চক্রবর্তী নিজে

পাষণ্ড—সে পাষণ্ড জামাতার চরিত্র জানিত। সুতরাং সীমার চীৎকারে ঘুম ভাঙিবামাত্র সে অনুমান করিতে পারিয়াছিল ঘটনাটা। নিহত অমর চক্রবর্তী অসুস্থ ছিল, উত্তেজনা তাহার সহজেই হইবার কথা; সেই ক্ষেত্রে এমনই এক বীভৎস নিষ্ঠুর অপমানজনক অপরাধ—তাহারই কন্যার উপর ঘটিতে দেখিয়া ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল ওই নরপশুর উপর। অমর আক্রমণ করিতেই নরপশু সীমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এবং অসুস্থ অমর চক্রবর্তীকে আক্রমণ করিয়া ঠেলিয়া সহজেই মাটিতে ফেলিয়া দিয়া লালসা অতৃপ্তির ক্ষোভে তাহার বুকের উপর বসিয়া পাইয়াছিল সীমার পরিত্যক্ত পাথরটা। তাহা দিয়াই সে তাহাকে আঘাত করে। ইহার ঠিক আগে নেশায় রক্তের চাপে অমর চক্রবর্তীর মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়াছিল—ইহা আমরা ডাক্তারদের সাক্ষ্যে পাইয়াছি। সুতরাং এই পাথরের এক আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইবার কথা। রমেন্দ্র তাহাকে কয়েকটি আঘাতই করিয়াছিল। ডাক্তারী রিপোর্টে—মাথায় তিনটি—মুখের উপর দুইটি পাথরের আঘাতের কথা পাইয়াছি। সব কয়টিই রমেন্দ্র করিয়াছে নিঃসন্দেহে। এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

সাক্ষীদের মধ্যে মনোরমা বিচিত্র মানুষ। সে প্রথম এজাহারে সীমাকে বাঁচাইয়া—রমেনকে বাঁচাইয়া দোষ নিজের ঘাড়ে লইতে চাহিয়াছে। বলিতে চাহিয়াছে—রমেনের সহিত এই কুৎসিত ঘটনা তাহার ঘটিয়াছিল এবং অমর জানিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিলে রমেন ছুটিয়া পলায়—অমর তখন গলা চাপিয়া ধরে। মনোরমা প্রাণের দায়ে পাথর লইয়া অমরকে আঘাত করে। তাহাতেই ব্যাপারটা ঘটিয়াছে। পরে সে জেরায় সব সত্য স্বীকার করিয়া বলিয়াছে—তাহার জীবনে কি প্রয়োজন; ক্ষমা তাহার অনুগত স্নেহের পাত্রী। রমেন বাঁচিলে ক্ষমার তবুও স্বামী থাকিবে—সে সধবা থাকিবে—এইজন্যই বলিয়াছে।

ক্ষমা শিকলবদ্ধ ছিল। তাহার সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই। তদুপরি স্বামীর মোহে যে কোন মিথ্যা বলিতে পারে এবং বলিয়াছে।

সীমা ছুটিয়া দুই মাইল দূরবর্তী চন্দনপুর আসিয়া নম্বুবালাকে সঙ্গে লইয়া থানায় আসে এজাহার দেয়। আমি তাহার সাক্ষ্যের প্রতি বর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি। রমেন বলিয়াছে—সীমা তাহাকে ডাকিয়াছিল। দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। রমেন্দ্রের পক্ষ হইতে এইটির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু পুলিশ সকল লোকের সমক্ষে একটি লোহার শিক—যাহা দিয়া বন্ধ দুয়ারের দরজা খুলিয়াছিল—তাহা পাইয়াছে।

সীমা সর্বত্র এক কথা বলিয়াছে। সুতরাং জুরীদের সহিত এক মত হইয়া আসামী রমেন্দ্রকে দোষী স্থির করিয়া—"

রায়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দিলেন জজ। বিচারে ছ মাস কেটে গেল। এ ছ মাস নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে সীমার। ইস্কুলে হোস্টেলে থাকা আর সম্ভবপর হয়নি। নিজেই থাকেনি সে। গ্রামে যাওয়াও অসম্ভব হয়েছিল। তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন—সেই হেড-মিস্ট্রেস। বলেছিলেন—কোন মেয়ের এমন বিপদে যদি মেয়েরা আশ্রয় না দেয়—পাশে না

দাঁড়ায় তবে মেয়েদের মুক্তি কোথায়—গতি কোথায়? এতে যদি ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাকে না রাখেন—রাখবেন না। আমাকে শ্যামাকিঙ্করবাবু বলে গেছেন তোমার জন্ম খরচ তিনি দেবেন। তুমি যেন না বলো না। এ অনুরোধও করে গেছেন।

রায় হয়ে গেলে সংবাদটা তার কাছে এসে পৌঁছুল পরদিন। সে এতদিনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। কেউ তার কাছ দিয়ে যায়নি। সান্ত্বনা দেয়নি। কি বলবে? মেয়েটির বর্তমান শূন্য হয়ে গেছে—নিজে হাতে শূন্য করে ও-ই মুছে দিয়েছে। কোথায় দাঁড়াবে? কি হবে?

হঠাৎ তার মাথায় কে হাত দিলে।

—সীমা!

চমকে উঠল সে। শ্যামাকিঙ্করবাবু।—ওঠ মা। কেঁদো না ওঠো!

আস্তে আস্তে উঠে বসল সীমা। শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—এখানেই আমি শিবকিঙ্করকে বলেছি। তোমাকে একটা চাকরি দেবে। তুমি মাথা উঁচু করে চাকরি করবে। তুমি সত্যকে কোনদিন অসম্মান করনি—এতটুকু বিকৃত করনি। তুমি সৎ—তুমি সতী। গ্লানিহীন।

আশ্বস্ত হল সে।

দিন চারেক পর সে বসেছিল—শ্যামাকিঙ্করের ওখানে। কথা হচ্ছিল—এইসব কথাই। সে চলে যেতে চায় অন্য কোথাও। শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—না—না। এইখানেই তোমাকে থাকতে হবে। পড়াতে পড়াতে পড়। আই এ পাশ কর—বি এ পাশ কর। এখানকার লোক তোমাকে মানুক—। তবে—তবে এখান ছাড়বে।

—সীমা রয়েছিস?

—কে?

—আমি নেলি।

—কি?

—শোন্ না।

শ্যামাকিঙ্করবাবু ডাকলেন—তুমি এস না নেলি! কি ভয়? এস।

নেলি এসে দাঁড়াল। শ্যামাকিঙ্কর বললেন—কি সংবাদ? গোপন?

সে হাসলে, উত্তর দিলে না। শ্যামাকিঙ্কর বললেন—তাহলে তুমিই উঠে যাও।

সীমা উঠল। চলে গেল ঘরের দিকে। নেলি সঙ্গে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি শুনতে পেলেন—সীমার উত্তেজিত কণ্ঠ—না—না—না!

বেরিয়ে এল সে। শ্যামাকিঙ্করবাবুকে বললে—আপনি বাবার চেয়ে বয়সে বড়। মানে তো বটেই। হয়তো স্নেহেও বড়। আপনার কাছে আমি নালিশ করছি, শুভেন্দুকে আপনি বারণ করুন। বারণ করুন। বুঝিয়ে বলুন। আমি বিয়ে করব না। তাকে ধন্যবাদ। সে আমাকে ত্রাণ করতে এসেছে। এই এত কাণ্ডের পর—। কিন্তু না। না।

বলে দুই হাতে মুখ ঢাকল। নেলি নিঃশব্দে চলে গেল। শ্যামাকিঙ্কর দেখলেন ফটকের

পাশ থেকে বেরিয়ে এল শুভেন্দু—তারপর ভাই-বোনে দুজনে চলে গেল। নেলিকে বলতে হয়নি কিছু—শুভেন্দু সবই শুনতে পেয়েছিল।

শ্যামাকিঙ্কর চুপ ক'রে বসে রইলেন—আকাশের দিকে তাকিয়ে।

কিছুক্ষণ পর সীমা উঠে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—তারপর একটু হেসে বললে—কেন বোঝে না বলুন তো ?

শ্যামাকিঙ্কর এরও উত্তর দিলেন না। সে উঠে চলে গেল। নতুন চন্দনপুর নতুন কাল—নতুন মানুষ। কোন লজ্জা কোন সঙ্কোচ তার নেই। পুরানো কালের বিশ্বাস সংস্কার বদলে গেছে পথঘাটের মত। তবে কেন—কেন থাকবে সেই পুরনো প্রেম—পুরনো বিয়ে।—কেন ?—

২৪

পাঁচ বছর পর।

এই ক'বছরে অনেক জল সমুদ্র থেকে বাষ্প হয়ে উঠে গেছে এবং আবার মেঘ হয়ে পৃথিবীর বুকে জল ঢেলেছে। তার মধ্যেও পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিচিত্রভাবে পুরনো মানচিত্র পাণ্টাচ্ছে। আজকের সঙ্গে কালকের রেখার মিল থাকছে না। পৃথিবীর এলাকা বাড়ছে শূন্যলোকের মধ্য দিয়ে। স্পুটনিক লুনা-জেমিনী শূন্যলোক পরিভ্রমণ ক'রে ফিরে আসছে। চাঁদে গিয়ে নামছে পৃথিবীর পাঠানো যন্ত্রযান। সেখান থেকে বার্তা আসছে ছবি আসছে।

মানুষের দেশগুলোর পুরনো সবকিছু মুছে যাচ্ছে। যেন বন্যা এসে, ঝড় এসে একেবারে ভাসিয়ে উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। চিরন্তন বলে বুকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাচ্ছে মানুষ, কিন্তু পারছে না।

ছোট্ট চন্দনপুর স্ফীতকায় হচ্ছে এক দিকে। অন্যদিকে পুরনোকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে মানুষ মরছে। তবু ছাড়ছে না। এখনও ফাল দিয়ে জমি শেলাই করে এর জমি ওকে দেওয়া চলছে, বেনাম করা চলছে। এবারও বাউড়ীরা রথ টানেনি রথ বার হয়নি পথে।

পুজোর সংখ্যা বাড়ছে।

এখনও পুজো হচ্ছে। বাড়ীর পুজো নমো নমো করে হচ্ছে; বারোয়ারীতে ধুমধাম হচ্ছে। বাউড়ীরা মদ খাচ্ছে তা, হোক, তবু পাণ্টাচ্ছে—অত্যন্ত দ্রুত পাণ্টাচ্ছে। মেয়েদের ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে হচ্ছে না। তারা এখনও নিজেরা স্বাধীন মতে বিয়ে করবার সাহস বুকে পায়নি। চালের দাম, ধানের দাম, ডালের দাম, তেলের দাম, কাপড়ের দাম, জামার দাম বাড়ছে। তবু চলছে সব। সিনেমা এসে বসেছে। ভিড় হচ্ছে। আবার হাহাকার উঠছে। মিছিল হচ্ছে। ধান চাই চাল চাই। চাকরি চাই। জমি চাই। সব চাই।

ধ্বনি উঠছে—ইনকিলাব—

—জিন্দাবাদ!

—ইনকিলাব

—জিন্দাবাদ!

—ইনকিলাব

—জিন্দাবাদ!

এরই মধ্যে একদিন চন্দনপুরে ফিরে এলেন শ্যামাকিঙ্করবাবু। সেদিন এসে চন্দনপুর পৌঁছুলেন বেলা একটায়। বিকেলবেলায় আস্তে আস্তে এসে বসলেন তাঁর সেই শখের বাঁধানো নিমতলায়। খবর পেয়ে অনেকে এসেছিল তাঁর খোঁজ নিতে।

এল গেল। গেল এল। ছেলে-মেয়ে। নবীন-প্রবীণ। এর মধ্যে বন্ধু সুরেশ্বর বসে রইল তাঁর পাশে।

শ্যামাকিঙ্কর কিছুদিন আগে কলকাতায় এসে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। কাগজে বেরিয়েছিল। চিকিৎসক তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছে। তিনি এখানে এসেছেন। সঙ্গে স্ত্রী এসেছেন। এসেছেন ভোরে। জিনিসপত্র এখনও গোছানো হয় নি। গোছানো হচ্ছে। আকাশ মেঘমেদুর। চুপ করে বসে আছেন। মধ্যে মধ্যে কথা বলছেন।

এরই মধ্যে একসময় গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ক'জন এল, সকলের সামনে কমলা। প্রণাম করে সে বললে—শরীর কি খুব খারাপ?

—হ্যাঁ।

—ওদিকে অন্য সকলে টুক্‌টাক্ প্রণাম করে চলেছে।

কমলা বললে—এখানেই থাকুন কিছুদিন।

—থাকব! হয়তো বরাবর থাকব।

—তাই থাকুন! তাই থাকুন।

শিক্ষয়িত্রীদের পেছনে পেছনে মেয়েরা এল দল বেঁধে। প্রণাম চলতে লাগল। তিনি প্রতি-প্রণাম জানিয়ে চললেন।

ডাকলেন—বড বউ! এদের মিষ্টি দাও। যাও না, সব যাও।

সুরেশ্বর বললে—এই ভাবটা তুমি ছাড।

—কোন্‌টা?

—এই—আর যাব না আর যাব না।

হাসলেন তিনি। কথাটা ঘোরাবার জন্যেই বললেন—কমলা, সীমার খবর কি? তার খবর অনেকদিন পাইনি।

হেসে কমলা বলল—আপনার চন্দনপুরের বিদ্রোহিনী ঠিক আছে সে বেশ আছে। ভাগ্যও ভাল। বি-এ পাশ করেই বি-টিতে এ্যাডমিশন পেয়ে গেল। তবে একটু গোলমাল শুনছি। আমার এক বন্ধু ওখানে পড়ান। তিনি লিখেছেন—রামকৃষ্ণ মিশনে বড় যাচ্ছে। নিবেদিতা

স্কুলে চান্স পেলে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে—ওখানে চাকরিও করবে। ওর মতিগতিও তো ওই রকম। আপনার নেলির খবর জানেন তো? সে আই-এস-সি পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিসনে। ওর দাদা ওকে মেডিকেলে ভর্তি করেছে।

—খুব ভাল।

একটু বসে থেকে কমলা উঠে গেল।

এক সারি তিনখানা জিপ চলে গেল রাস্তা দিয়ে।

সুরেশ্বর বলল—তুমি শোও গিয়ে। আমি যাই।

—বসো—বসো। থাকতে কেউ আসেনি। ওই শোন!

—কি?

—শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? জিন্দাবাদ!

১৯৬২-এর ইলেকশনের রব উঠেছে!

আকাশে সন্ধ্যা নামছে। কৃষ্ণপক্ষ পিতৃপক্ষ চলছে।

রাস্তায় আলো জ্বলল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার কাটিয়ে চাঁদ উঠলেই রাস্তার আলো নিভবে। ট্রেন আসছে। কলকাতার ট্রেনের প্যাসেঞ্জার আসবে।

—দাদাবাবু!

—কে? নস্যুবালা?

—দাদাবাবু—তুমি কখন এয়েচো? নোকে বলে গেজেটে লিখেছে—তোমার খুব অসুখ। হেই মাগো! দেখ দিকি মিছে কথা!

—নারে, অসুখ হয়েছিল।

—এখন তো ভাল হয়েছ। আসতে পেরেছ। বাবাঃ!

হাসলেন শ্যামাকিঙ্করবাবু।

—এবার আমাকে একখানা খুব ভাল শাড়ী দিয়ো। পরে ভাদু শুনিয়ে যাব। চন্দনপুরের ভাদু। আমার বেয়াই যে মুখচোরা! সি-সি: এই গ্যাকো!—সে যে—সে যে! সে যে বেরুবে না ঘর থেকে। তাকে তুমি ডাক না কেন? তাহলে শুকসারী কথা শুনিয়ে যাই।

—সেটা আবার কিরে?

—হ্যাঁ, সে বলবে—কি আইন হ'ল কি পথ হ'ল—কিরকম এইসব বদল হল। আর আমি শোনাব রঙের কথা।

হঠাৎ শ্যামাকিঙ্করবাবুর দৃষ্টি পড়ল ফটকের দিকে। একজন পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচির পোশাক পরা কেউ দাঁড়িয়ে আছে। পড়ছে সদ্য লাগান মারবেল ট্যাবলেটটা। বিদেশী কেউ। আগন্তুক এখানে। ওটা তো এবার তাঁর জন্মদিনে লাগান হয়েছে। এখানকার লোকের কাছে তো পুরনো। তিনি ডাকলেন—কে? আসুন ভেতরে আসুন!

ধীর পদে সলজ্জ হেসে দাঁড়াল একজন সবল সুন্দর জোয়ান ছেলে। তিনি মুহূর্তে চিনলেন।

—আরে শুভেন্দু!

—হ্যাঁ?

—কখন এলে?

—এই ট্রেনে।

—বসো। কতদিন পরে?

—ছ-বছর।

—বাড়ী যাওনি?

—না।

—কেন?

—আছে। কারণ আছে। নেলী গেছে, ফিরে এলে যাব।

শ্যামাকিঙ্করবাবু চুপ করে রইলেন। শুভেন্দু বললে—কাগজে আপনার অসুখের খবর দেখেছিলাম। কলকাতায় তখন ভিড় করতে যাইনি। ভেবেছিলাম আপনি সুস্থ হলে খবর নিয়ে যাব। পরে যেতামও। তা এখানে আজ নেমেই শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন। তাই এলাম। দরজায় ঢুকতে ট্যাবলেটটা দেখলাম। পড়ছিলাম। মাটি থেকে আকাশ ভাল?

হাসলেন শ্যামাকিঙ্কর।

—বলবেন না?

—বলবো না কেন? মৃত্যুর মত আকাশ ধ্রুব। সুতরাং মাটিকে জানার পর তাকে তো জানতেই হবে। হবে না?

—জানি না। বুঝি না।

—বয়স হলে বুঝতে অবশ্যই হবে। তাছাড়া স্পেস এক্সপ্লোরেশনের যুগে আকাশের দিকে তাকাব না বললে তো চলবে না।

শুভেন্দু হাসলে, বললে—দুটোকে এক করছেন যে?

শ্যামাকিঙ্কর বললেন—দুটো কি এক নয়?

—না। কিন্তু ও কথা থাক। বাইরে শুনছিলাম আপনি এখানে থাকবার জন্য এসেছেন? সত্যি? রিটায়ারমেণ্ট!

—হ্যাঁ।

—সে তো আরও কোন ভাল জায়গায় থাকলে পারতেন। এই পিছনে পড়ে থাকা গ্রামখানায় কেন?

তার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন শ্যামাকিঙ্কর—কি হ'ল গ্রামের উপর চটলে কেন?

শুভেন্দু যেন ক্ষেপেছে, সে বললে—এ গ্রামের উপর সদয় হবার কোন কারণ আছে? আকাশকে জানতেই যদি হয় তো কোন তীর্থে গেলেই পারতেন!

শ্যামাকিঙ্কর বললেন—আকাশকে জানতে হলে আমাদের শাস্ত্রবিজ্ঞান মতে স্থির হয়ে

মাটিতে আসন পাততে হয়। এই চলমান ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীতে সকলেরই একটি স্থির বিন্দু আছে শুভেন্দু। ছেলের যেমন মায়ের কোল। জীবন সেখানে দোলার মধ্যেই স্থির। তার মধ্যেই ধ্যান-ঘুম। মা চলছে—মা দোলাচ্ছে তাকে। তবু স্থির। সেই স্থির বিন্দু হল আমার চন্দনপুর। এখানে বসে আমি দেখতে পাই পৃথিবী ঘুরছে। চলছে।

শুভেন্দু বলল—একটু ডিস্টার্ব করব ?

—কি—?

—আর একজন ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

—কে ?

শুভেন্দু ডাকলে বাইরে যে দাঁড়িয়েছিল—এস। ভেতরে এস। বলতে বলতে একটু এগিয়ে গেল এবং সঙ্গে করে নিয়ে এল একটি মেয়েকে, বললে—প্রণাম করো।

শ্যামাকিঙ্করবাবু প্রশ্ন করলেন—কে ?

—আমার বউ।

—বউ ? বিস্ময়ের সীমা রইল না শ্যামাকিঙ্করের।

—হ্যাঁ, বিয়ে করেছি আমি।

—বিয়ে করেছ ? কবে ?

—গত কাল বিয়ে হয়েছে—আজ এসেছি—। এই তো সন্ধ্যের ট্রেনে। এখনও বাড়ী যাইনি। রাস্তায় ঘুরছিলাম আপনার বাড়ীতে উঠলাম। নেলী বাড়ী গেছে। জানি না কি বলবেন বাবা।

নিরুত্তর হয়ে রইলেন শ্যামাকিঙ্করবাবু। শুভেন্দু বলে গেল—আমরা একসঙ্গে চাকরি করতাম ইস্কুলে। আমি এম-এ দিলাম প্রাইভেটে ও বি-এ দিয়েছিল—। একটু সাহায্য-টাহায্য করতাম।

হাসলে শুভেন্দু।

শ্যামাকিঙ্কর হেসে বললেন—গুড, ভেরী গুড !

বধূটি লজ্জায় মুখ ফেরায়নি ! শ্যামাকিঙ্কর তার দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখলেন—বেশ মেয়ে। শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে। এমন মেয়েদের কলকাতায় সকালে বেশ সপ্রতিভভাবে সহজ সজ্জায় সেজে আপিসে ইস্কুলে কলেজে যেতে দেখা যায়। বিচিত্র কথা মনে হল তাঁর—সেই মেয়ে বউ হয়ে এল চন্দনপুরে। হরিবিষ্ণুর পুত্রবধূ আছে এম-এ পাশ। কিন্তু সে সেই পুরনো কালের সেই চৌধুরীদের বাড়ীর তাদের ভাগ্নেদের বাড়ীর বউয়ের মতো। তার বেশী কিছু নয়। এক গা গয়না পরে আভরণের ঝঙ্কার তুলে—সেণ্টের বাস ছড়িয়ে আলতা পায়ে জুতো পরে অন্য কালের বউদের সঙ্গে চলেছে।

শুভেন্দু বললে—এসে মনে হল ভুল করেছি।

শ্যামাকিঙ্কর বললেন—কেন ?

—আমরা রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছি। ও কায়স্থ।

—বসো, জল খাও। বসো, নতুন বউ বসো।

*　　*　　*

জল খেয়ে তারা উঠল। শুভেন্দু ফিরেই যাচ্ছে। নেলী বাড়ী গিয়ে কথা বলে ফিরেই এসেছে। ওর মা বলেছে ফিরে যেতে। খবরটা নিয়ে পাড়াগ্রামে গোল করতে বারণ করেছে। বলেছে—একেই তো মাথার গোলমাল সারেনি। এরপর শুনলে তো মাথা ঠুকে হয়তো অজ্ঞান হয়েই যাবে।

শুভেন্দুর ভাইও তাই বলেছে।

নিঃশব্দে চুপি চুপি চলে যেতে হবে তাদের।

হেসে শুভেন্দু বললে—ওই ভাঙা ফটক দিয়ে আমরাই ঢুকব না জামাইবাবু।

শ্যামাকিঙ্কর হেসে বললেন—এস ভাই। কিন্তু একটা খবর জিজ্ঞাসা করতাম তোমাকে।

—কি খবর? একটু আগে কমলাদি তো বলছিল আপনাকে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। সীমার খবর সীমার কথা লতা জানে। বলতে বাধা নেই। কমলাদি মোটা-মুটি বলেছে সত্যি খবর, তবে গেরুয়া রঙটা অকারণ চড়িয়েছে। সন্ন্যাসিনী সে কোন দিন হবে না।

—তবে?

—বিয়ে না করে ছেলেরা যেমন থাকে এযুগে তেমনি ভাবে মেয়েরাও তো বিয়ে না করে থাকবার কথা ভাবতে পারে? না পারে না? অথবা চলতে চলতে যদি আই-এ-এস ফরেন সার্ভিসের স্বামী মেলে। মন্দ কি?

হাসলে শুভেন্দু। তারপর বললে—তাকে অনেক বলেছি—অন্ততঃ তিনবারের উপর একবার চারবার। কিন্তু সে আমাকে 'না' বলে দিয়েছে।

আরও দেড় বৎসর পর।

শ্যামাকিঙ্করবাবু সেই নিমগাছতলায় তাঁর স্থির বিন্দুটিতে বসে ছিলেন। শুভেন্দুদের বাড়ীতে শাঁখ বাজছে উলু পড়ছে।

শুভেন্দু ফিরে গিয়েছিল—সে আজ ফিরল; শুভেন্দুর বাপ শেষ শয্যা পেতেছে—আর খুব বেশীদিন নেই। মৃত্যুশয্যায় ছেলে বউ নাতিকে দেখতে চেয়েছে চৌধুরী।

বিচিত্রভাবে চৌধুরীর মাথা যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে। ডাক্তারেরা বলেছে—এমন হয়।

চৌধুরী আরও একটা বিস্ময়কর কাজ করেছে। সেই ফাট-ধরা পুরনো ফটকটা ভাঙিয়ে দিয়েছে।

বিস্ময়কর কিছু নয়। শ্যামাকিঙ্কর জানেন, বুঝতে পেরেছিলেন, চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চৌধুরী স্বীকার করেছিল। চৌধুরী সকলকে বলেছিল—আমি স্বপ্ন পেয়েছি। ঠাকুর আমাকে বলেছেন, ফটক ভাঙিয়ে দে। নইলে সর্বনাশ হবে। ভাঙিয়ে দে।

এমন আবেগের সঙ্গে বলেছিল চৌধুরী যে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি, সম্মতি দিয়েছিল। অন্তদিকে ফটকটা আপনা-আপনি যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারত। শ্যামাকিঙ্কর একসময় একলা বিছানার পাশে বসে চৌধুরীকে প্রশ্ন করেছিলেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—কি ?

—স্বপ্ন তুমি সত্যিই দেখেছ—? না— ?

—না ? স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল চৌধুরী বন্ধুর দিকে।

—না ভয় হচ্ছে—।

—হ্যাঁ, ভয়ই হচ্ছে। শুভেন্দু যেই ঢুকবে সেই সময়টিতেই যদি হুড়মুড় ক'রে—। বলো না কাউকে।

—না তা ভাল করেছ। বড্ড পুরনো হয়েছিল।

—ওঃ পুরানো বলে! ভাঙুক—। ভেঙে দিক।

শুভেন্দুর ভাই ঠিকেদারী করতে আরম্ভ করেছে, সেই ভাঙাল। অনেক কষ্টে অনেক কৌশলে। প্রকাণ্ড ফটকের খিলেনটা একটা বিপুল শব্দ তুলে গ্রাম কাঁপিয়ে মাটিতে পড়ল।

নম্নবালা গান বেঁধেছে—

চন্দপুরের গুপ্ত ব্রজধাম
ভেঙে ভেঙে মিশল মাটিতে
হায়রে কপাল বাকী কেবল নাম
ও সব নিশানা হারিয়ে গেল—হায় রে আমার মন
কোথায় আমার তমাল কুঞ্জ কোথায় নিধুবন ?
হায় রে— !

বেঁধেছে ওই মাত্র, গেয়ে বেড়াতে পারে না। সেও শয্যা পেতেছে। সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু সাহায্য পাঠান শ্যামাকিঙ্কর। নম্নু বলে পাঠায়—আর বেশী দিন বাকী নাই। দাদাবাবুকে বলো। কালের পালা শেষ। দাদাবাবুকে পালা নিকতে বলো। আর বলো ফটক ভাঙল, শুভেন্দুর অন্ত্যজাতের বউ এলো ; বাউড়ীরা রথ টানতে পারে না ক্যানে ? বলো তাকে বলো।

শ্যামাকিঙ্কর ভাবছিলেন আর শুনছিলেন শাঁখের শব্দ, উলুর শব্দ।

সন্ধ্যাবেলা শুভেন্দু এলো।

সে খবর দিল—সীমা বিদেশে যাচ্ছে। হেসে শুভেন্দু বললে—বললাম, বিয়ে-টিয়ে করবে না ? সে বললে, ভেবে দেখিনি। চিনতেই পারবেন না তাকে দেখলে।

শ্যামাকিঙ্করবাবু তাঁর সেই স্থির বিন্দুটিতে বসে দেখলেন সীমা এবং চন্দনপুর এক হয়ে গেছে —সীমার সঙ্গেই চন্দনপুর চলছে—চলছে—। আরও চলবে। আরও পালটাবে।

—বাবু !

কে এসে দাঁড়াল।

—কে ?

—আমি ফটিক দাস।

—ফটিক ? পুতুলওয়ালা ফটিক—নম্মুর বেয়াই।

ফটিক বললে—বেয়ান নম্মুবালা মারা গেল।

চমকে উঠলেন শ্যামাকিঙ্কর—মারা গেল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পালা শেষ হল তার।

ফরিয়াদ

শ্রীমান সন্তোষকুমার ঘোষ

পরম কল্যাণীয়েষু

এক

হঠাৎ যেন বর্ষারাত্রির রিমিঝিমি বর্ষণসিক্ত অন্ধকারকে পটভূমিকে রেখে প্রেতিনী এসে সামনে দাঁড়াল। একেবারে সামনাসামনি। দরজার ওপাশে বারান্দার উপর সে আর এপাশে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে সুধাংশুবাবু।

১৯৬০ সাল জুলাই মাস—আমাদের শ্রাবণ। আজ দু'দিন থেকে ঘনঘোর বর্ষা নেমেছে। আজ বিকেলবেলা থেকে বর্ষণ ধরেছে কিন্তু রিমিঝিমি বর্ষণের বিরাম নাই। শহরের পথঘাট জনহীন বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। হাওড়া শহরের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বড় রাস্তা। এ রাস্তার উপর আগের কালে দোকানপাট বড় একটা ছিল না কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে যেকালে কলকাতা বাড়ছে স্ফীতকায় দৈত্যের মত সে-কালে তার ছোঁয়াচে হাওড়াও প্রায় তার সঙ্গে তাল রেখেই বাড়ছে। সেকালে হাওড়াব এসব রাস্তার উপরের লোকেরা কথায় কথায় বলত—কলকেতার চাল এখানে মেরো না।। এ হল হাওড়া। এখানে যা ইচ্ছে তাই চলে না। সমাজ আছে। এখনও শোনা যায় দু'চারজন প্রবীণ বা প্রবীণা বলেন—পাড়ায় কি আর সমাজ আছে না মানুষ আছে। বলব কাকে? এখন এই রাস্তাটার উপরের বাড়িগুলোর নিচের তলার ঘরগুলো ক্রমে ক্রমে দোকানে পরিণত হচ্ছে। সাইন-বোর্ড পড়েছে—তাব মাথায় আলো জ্বলছে। আজ দোকানগুলো এর্ মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। আলো নিভেছে। রাস্তার আলোর কতকগুলো জ্বলছে কতকগুলো জ্বলছে না। ফলে রাস্তাটা আবছা আলো-আঁধারিতে থমথম করছে। সেই আবছা আলোআঁধারিকে পিঠেব দিকে রেখে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। দরজা খুলতেই ঘরের আলো গিয়ে পড়ল ওপাশেব বারান্দায়। বারান্দায় দাড়িয়ে ছিল মেয়েটি। মেয়েটিকে দেখে বিরক্তি এবং অস্বস্তির সীমা রইল না সুধাংশুবাবুর! মেয়েটির চেহারার মধ্যেই ছাপ ছিল। মুখে চোখে ঠোটে বেশে ভূষায় একটা পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সে পরিচয় ওই প্রেতিনীর পরিচয়। বেশ পরিপাটী করে পরা পরিচ্ছন্ন ফিতেপাড় কাপড়ে, চিকনের কাজকরা সাদা টাইটহাতা ব্লাউজে, ব্লাউজের নিচে ব্রেসিয়ারের আভাসে, মুখের চারি-পাশে খোলা চুলের রাশি অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে থাকলেও সমস্ত কিছুর মধ্যে এমন একটা ছন্দবিন্যাস পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে যা বলে দেয় এ মেয়ে সধবা হোক বিধবা হোক এ মেয়ে স্বভাবে প্রেতিনী। আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টিতে এবং চোখের কোল ঘিরে কালো একটি ছায়াবেষ্টনী দেখলেই বোঝা যায় যে, এ কালো ছায়াবেষ্টনী বহু রজনীর অন্ধকারের কাজললতা থেকে আহরণ করা ছোপ। ঠোট দুটির উপরেও পড়েছে শ্যাওলার মত একটা কালো ছোপ। এ ছাড়াও মেয়েটিকে সুধাংশুবাবু চেনেন। সত্যিই তার যে পরিচয় তা প্রেতিনীর পরিচয় ছাড়া কিছু নয়।

সুধাংশুবাবু ওকে চিনেছেন।

দু'পা পিছনে সরে এলেন তিনি।

মেয়েটি কিন্তু নড়ল না। মুখখানা তার আশ্চর্যভাবে সকরুণ হয়ে উঠেছে। সুধাংশুবাবু বুঝতে পারছেন না কি বলবেন! বলবেন—কে তুমি? কেন তুমি এসেছ? কিন্তু তা' বলতে পারছেন না। মনে পড়ছে আর এক রাত্রির কথা।

মেয়েটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়েই ছিল; বোধ করি সুধাংশুবাবুর এতটুকু সস্নেহ অনুগ্রহসূচক কোন একটা কথার প্রতীক্ষা করছিল। তা' না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই কথা বললে। বাঁ হাত দিয়ে মাথার ঘোমটাটা একটু সামনে টেনে দিয়ে বললে—আমি—।

বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। থেমে গেল, কথা আটকে গেল।

সুধাংশুবাবু অত্যন্ত তিক্তকণ্ঠে বললেন—বল। আমি—। ধরিয়ে দিলেন কথাটা।

মেয়েটি বললে—আমার নাম—।

সুধাংশুবাবু আরও তিক্তকণ্ঠে বললেন—তুমি চাঁপা। ভাল নাম বোধ হয় রত্নমালা।

তাঁর কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা জেগে উঠেছে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে।

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ।

সুধাংশুবাবু বললেন—এই রাত্রে কি দরকার তোমার? আজ যাও। কাল সকালে এস।

মেয়েটি ডানহাতে কাপড়ের আঁচল খানিকটা মুঠো করে ধরে মুখের উপর চেপে ধরলে। তাতে কান্নার শব্দ চাপা দেওয়া গেল কিন্তু চোখের জলের অস্তিত্ব গোপন করা গেল না। দু'চোখের কোল থেকে বাঁধভাঙা জল নেমে আসছে।

সুধাংশুবাবু বললেন—একি? কাঁদছ কেন তুমি?

এবার চাঁপা বললে—আমার বড় বিপদ বাবু! বড় বিপদ! এরপরই আকুল আর্তিতে হাত দুটি জোড় করে অতি কাতর করুণ কণ্ঠে সে বললে—আমাকে আপনি বাঁচান!

আবার বিরক্ত এবং তিক্ত হয়ে উঠলেন সুধাংশুবাবু। বললেন—কি বিপদ! সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তখন অনেক বিচার তাঁর হয়ে গেছে। এই মেয়েটির কোন্ বিপদ হতে পারে? এবং কোন্ বিপদ থেকে তিনি তাকে বাঁচাতে পারেন? এর উত্তর স্বতঃসিদ্ধ। কোন কেসে পড়ে থাকবে। ফৌজদারী কেস। যে জীবন সে যাপন করে তাতে কেসে পড়াই স্বাভাবিক। এবং তিনি অ্যাডভোকেট। হাওড়া কোর্টে ক্রিমিন্যাল সাইডে প্র্যাক্‌টিস তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত। সেসনস্ কোর্টে বড় বড় কেস—মার্ডার কেস ডাকাতি দাঙ্গার কেসে তিনি আসামী পক্ষে থাকেন। এবং শতকরা ষাটটা কেসে তিনি জেতেন। সুতরাং যে-বিপদে তিনি বাঁচাতে পারেন সে-বিপদ ওই ধরনের কোন কিছু ছাড়া আর কি হতে পারে। তিনি বললেন—কোন কেসে পড়েছ বুঝি?

মেয়েটি আবার কেঁদে উঠল।

সুধাংশুবাবু আবার বললেন, এবার কণ্ঠস্বর রূঢ়তর হয়ে উঠল, বললেন—এতদিন কিছু হয়নি এই আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে জিভ দিয়ে করুণাব্যঞ্জক একটি শব্দ করে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। সেটা আক্ষেপও বটে আবার তিরস্কারও হতে পারে।

চাঁপা মাটির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। শুধু এই তিরস্কারের ফলে তার চোখের জল শুকিয়ে গেল; সে শুকনো চোখে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুধাংশুবাবু আবার তিরস্কার করলেন—জীবনটাকে নিয়ে কি করলে বল তো? এবার তাঁর কণ্ঠস্বর যেন অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু তৃপ্তি পেলেন তিনি। আজ বারো বছর এই তিরস্কার এই মেয়েটিকে করবার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন।

সুধাংশুবাবু বলে গেলেন—কি কেস জানি নে। তবে তোমাদের কেস—। থেমে গেলেন তিনি। প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—তুমি কাল সকালে এসো। আজ শনিবার। আজ সন্ধ্যেবেলা কোন কাজ আমি করি নে। তোমার অন্ততঃ জানা উচিত। এ পাড়ার তো সকলেই জানে এ কথা! অন্ততঃ বারো বছর তোমাকে আমি দেখছি। তুমি নিশ্চয় জান যে আমি শনিবারে কোন কাজ করি নে!

সুধাংশুবাবু—সুধাংশুমোহন চক্রবর্তী নামজাদা অ্যাডভোকেট। হাওড়া জজ কোর্টে সেসনস্ কোর্টে যাঁরা প্রথমসারির আইনজ্ঞ তিনি তাঁদেরই একজন। হাওড়া জেলারই লোক, হাওড়া জেলা স্কুলেরই ছাত্র, বাপ ছিলেন নরসিংহ কলেজের অধ্যাপক—তিনি হয়েছেন উকীল। এককালে দেশের মুক্তি-আন্দোলনেও যুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু সে কথা থাক। সে সব পুরনো কথা।

শনিবার সন্ধ্যা এবং রবিবার সকাল তাঁর ছুটি। পেশাগত কাজ থেকে ছুটি—মক্কেলের কাগজ-পত্র ছোঁয়া দূরের কথা তাদের সঙ্গে দেখাও করেন না। এই ছুটি বেলা তিনি মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নেন। তাঁর ক্লার্করা আসে কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা তিনি করেন না। শনিবার সন্ধ্যে-বেলাটা একা থাকেন। ভাবেন, লেখেন। লেখা অভ্যাস আছে—প্রবন্ধ লেখেন। স্টেটস্‌ম্যান অমৃতবাজার পত্রিকায় রাজনৈতিক দার্শনিক বিষয়ে লিখে থাকেন ছদ্মনামে। কখনও কখনও বড় বড় বই নিয়ে একমনে পড়ে যান। তারপর তার উপর নিবন্ধ লিখে থাকেন। সন্ধ্যেবেলা বসেন—ওঠেন সেই রাত্রি বারোটায়। কাপ ছয়েক চা খেয়ে থাকেন আর সিগারেট পোড়ান চার ঘণ্টায় ষোলটা থেকে কুড়িটা। সাড়ে এগারটা থেকে স্ত্রী এসে তাগিদ দিতে থাকেন—ওঠো ওঠো।

উঠি উঠি করেও আধঘণ্টা কাটিয়ে ক্লক ঘড়ির বারোবার ঢং ঢং ঘণ্টার তাগিদে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে আড়ামোড়া ছাড়েন।

আগের কালে অর্থাৎ প্রথম জীবনে—প্র্যাকটিসের যখন প্রথম এবং তারা স্বামী-স্ত্রীতে যখন নবীন নবীনা তখন স্ত্রী বলতেন—আর কত বসে থাকব আমি? এখন বলেন—কাল কি তোমার কোর্ট নেই বলে অন্য কাজকর্মও নেই? বাগানে যেতে হবে না? বা গ্রামে যাবে না?

রবিবার সকালে তিনি গ্রামের বাড়িতে যান কোনদিন, কোন রবিবার যান তাঁর বাগানে। মাইল বিশেক দূরে বাগান বা চাষবাড়ি করেছেন সুধাংশুবাবু।

শনিবার সন্ধ্যায় সুধাংশুবাবু প্রফেশনাল কাজ করেন না এটা হাওড়ার লোকে জানে। তার বাড়ির বাইরে ফটকের গায়ে বারান্দায় এসব বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। আজ নেমপ্লেটের পাশে লেখা আছে -বাড়ি নেই। বারান্দার গায়ে একটা বোর্ডে লেখা আছে—শনিবার সন্ধ্যায় কোন কাজ হয় না।

চাঁপা বারো বছরেরও বেশী কাল এই পথ ধরে যাতায়াত করেছে। চাঁপার মা সামনে ওই

বাড়িতে, অধুনা মৃত নিত্যবাবুর বাড়িতে কাজ করত। এই রাস্তার উপর সুধাংশুবাবুর পৈতৃক বাড়ি তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ হয়েছে। দোতলা থেকে তেতলা হয়েছে। গ্যারেজ হয়েছে। গাড়ি হয়েছে।

চাঁপা বললে—শনিবার জেনেই আমি এসেছি।

বিস্ময়ের আর সীমা রইল না সুধাংশুবাবুর। বললেন—শনিবার জেনেই এসেছ? কেন?

চাঁপা বললে—জেনেই নয়, জেনেও এসেছি। আমার যে উপায় নেই। কি করব?

ক্রুদ্ধ হয়ে সুধাংশুবাবু কিছু বলতে গেলেন কিন্তু মেয়েটি বাধা দিয়ে বললে—কিছু মনে করবেন না। একটি মেয়ের বাড়ি। হয়তো সে খারাপ মেয়েই। বাইরে দাঙ্গাহাঙ্গামা। সেই সময় রাত্রিকালে কোন বিপন্ন পুরুষ যদি সেই মেয়ের বাড়ি আশ্রয় চায় তবে বুঝতে হবে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আশ্রয় চাচ্ছে। আশ্রয় দিলে মানুষটা বাঁচে। আর ক্ষতিও তাতে কিছু হয় না।

সুধাংশুবাবুর অন্তরাত্মা রাগে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ফেটে পড়তে চাইলে; সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংবরণ করলেন তিনি। বললেন—মনে করিয়ে দিতে হবে না। সে কথা আমার মনে আছে। আমি ভুলি নি।

এবার এই কথায় সে-এক আশ্চর্য বিষণ্ণ হাসি মেয়েটির মুখে ফুটে উঠল। মাত্র দুটি ঠোঁটের তটপ্রান্ত-রেখাতেই তা আবদ্ধ। তার সঙ্গে তার দুই চোখে জল। গ্রীষ্মের সমুদ্রে ভাটির শেষতম মুহূর্তটিতে ক্লান্ততম ঢেউটি এসে লুটিয়ে গড়িয়ে পড়ার মতই এ হাসির চেহারা। অদ্ভুত তো বটেই তার সঙ্গে লজ্জাও অনেক। লজ্জিতভাবেই সে বললে—না, সে কথা আমি মনে করিয়ে দিতে চাই নি। সে আপনি ভাববেন না। আমার সে স্পর্ধা নেই। বারো বছর ধরেই তো আপনার সামনে দিয়ে গিয়েছি ওই ও'দের বাড়ি—কোনদিন আপনার সঙ্গে কথা বলতে তো চাই নি। আমি যা তা' তো আমি জানি। সেদিন সেই বারো বছর আগে সেই রাত্রে সেই ক'ঘণ্টার জন্যে শুধু ঘরের মধ্যে বসতে দিয়েছিলাম —আমার সারাজীবনে সেইটুকুই একমাত্র পুণ্য। সে আমার থাক। আমি এমনি এসেছি—কত লোককে তো বাঁচান—।

সুধাংশুবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

বারো বছর আগের কথা। ১৯৪৮ সাল তখন। সারা দেশটা তখন জ্বলছে। ইংরেজ চলে যাচ্ছে। দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীন হচ্ছে। বাংলাদেশ কেটে দু'ভাগ হয়েছে -পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ব পাকিস্তান; পূর্ববঙ্গে হিন্দুর বাড়ি জ্বলছে, লুট হচ্ছে, পুরুষেরা খুন হচ্ছে, মেয়েরা হারাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গেও তাই। তবে মুসলমানের মেয়ে এখানে হারায় নি এটা বলতেই হবে।

কলকাতা হাওড়ায় সে আগুন পরিণত হয়েছিল রাবণের চিতায়। রাবণের চিতার আগুন অনির্বাণ। ও নেভে না। এই তো পঞ্চাশ বছর আগেও লোকে বিশ্বাস করত সে আগুন আজও জ্বলছে। সুধাংশুবাবুর বয়স তখন চৌত্রিশ। ১৯৬০ সালে অর্থাৎ আজ তাঁর পঞ্চাশ বছর চলছে। ষোল বছর আগে চৌত্রিশ ছিল। কথা চৌত্রিশ বত্রিশ 'ছত্রিশ নয়, কথা সে সময়ের সুধাংশুবাবুর কথা। বয়স যতই হোক তখন তিনি নবীন এবং দীপ্ত। তখন প্র্যাকটিসে

বসেছেন কিন্তু প্র্যাকটিস তখনও তাঁকে বাঁধতে পারে নি। তখনও তাঁর গা থেকে পলিটিক্যাল পার্টির ছাপ ওঠে নি, আটক-আইনে বন্ধ থাকলেও চেহারায় একটা যে ছোপ পড়ে সেটাও তখন সম্পূর্ণ মোছে নি। দেশ ভাগ হবার মাস ছয়েক আগে ছাড়া পেয়েছেন। এবং একটা অনিবার্য অভ্যুত্থান বা সশস্ত্র বিপ্লবের সংগ্রাম আসন্ন ধরে নিয়ে মনে-মনে তাতেই মেতে ছিলেন। হাওড়ার বার লাইব্রেরী বাংলাদেশে হাইকোর্টের বারের পরই গুরুত্বপূর্ণ বার। এখানে অনেক আইনজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্ব করে গেছেন। হাওড়া শহরও বাংলার রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের জটিল এক কেন্দ্র। এক সেকালের ফরাসীদের এলাকা চন্দননগর ছাড়া হাওড়ার মত শক্ত ঘাঁটি এবং আশ্রয় বিপ্লববাদীদের আর ছিল না। আবার অন্যদিক থেকে ই. আই. আর.—এখন ই. আর., বি. এন. আর.—এখন এস. ই. আর. এর টারমিনাস স্টেশন ও প্রধান স্টেশনের ইয়ার্ড হিসেবে ও তার সঙ্গে গঙ্গার ধারের জুট মিলগুলোর অস্তিত্বের জন্য হাওড়ার সাধারণ জীবন যেমন উত্তপ্ত তেমনি নিষ্ঠুর ও রূঢ়। আগুন এখানে সহজেই জ্বলে ওঠে। ব্লাস্ট ফার্নেসের উগরে দেওয়া জ্বলন্ত লোহার ময়লা, কিংবা বয়লারের ধোঁয়ানো ছাই-ফেলা জায়গার মত অবস্থা।

দেশভাগের আগুন তখন জ্বলছে। সে প্রায় দাউদাউ করে জ্বলা। রাজনৈতিক মতবাদে বামপন্থী সুধাংশুবাবুর দল সে-আগুন নেভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বাতাস যে আগুনকে শুকনো চাল-বস্তির উপর দিয়ে বইয়ে নিয়ে চলে মানুষ সেখানে ফায়ার ব্রিগেডের মত যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে লড়াই দিয়েও তাকে রুখতে পারে না। তার উপর খড়ের চালের ঘরগুলো যদি গরীবের সংগ্রহ করা খড়কুটো ডালপাতার জ্বালানিতে অথবা পাটে খড়ে বোঝাই থাকে তাহলে সে আগুনের সামনে মানুষকে ক্রমাগত পিছু হটতে হয়। হাওড়ার বস্তির কতক কতক জায়গার উপমা ঠিক ওই খড়কুটো ডালপাতার জ্বালানি বোঝাই খড়ের চাল-বস্তির মত। অপরাধ-প্রবণ একদল মানুষ, পুলিসের কালো খাতায় নাম লেখানো আসামী যারা, তারা এই সুযোগে সমাজের পরিত্রাণকর্তা সেজে বসে অপেন আপন অঞ্চলে অবাধ কর্তৃত্ব চালিয়ে চলেছে তখন। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন অনেক পরিত্রাতার অভ্যুদয় হয়েছে তখন।

এমন দিনে সে দিন; যে দিনটির কথা বললে চাঁপা; যে দিনের পর আর সে তার সামনে আসে নি; সেইদিন বিকেলবেলা নবীন সুধাংশুবাবুর কানে এল একটা নিষ্ঠুর খবর। হাওড়ার উত্তর অঞ্চলে আজ একটা সুরক্ষিত মুসলমান পল্লী আক্রান্ত হবে। পল্লীটি কয়েকবার আক্রান্ত হয়েও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। এবার আক্রমণকারীরা শপথ নিয়েছে আগামী কাল সকালে এই পল্লীটি কোনমতেই মাথায় চাল নিয়ে এবং বস্তির মধ্যে জীবনের স্পন্দন নিয়ে আর খাড়া থাকবে না। যা থাকবে তা খাপরা এবং খড়ের চালের ভস্মাবশেষ—ছাই আর কালো রঙধরা ভাঙা ঘরের দেওয়াল। মানুষগুলো মরবে—তাদের লাশ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে; যারা পালাবে তারা পালাক।

পল্লীটির কেন্দ্রে আছেন একজন পশ্চিমদেশীয় অবস্থাপন্ন মুসলমান ব্যবসায়ী। এখানে তাঁর কয়েকটা প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা আছে। দোতলা পাকা বাড়ি আছে এবং বাড়ির মধ্যে একটা বড় আয়রন-চেস্ট আছে যেটাকে তিনি টাকায় নোটে বোঝাই করে রেখেছেন। মুসলিম লীগ আমলে

লীগের কর্তাদের সঙ্গে তাঁর খাতির ছিল অনেক—এখন পুলিসের সঙ্গে খাতির জমিয়ে রেখেছেন। এ ছাড়া অনেকে বলে ওই একচেটিয়া ব্যবসার খাতিরে অকস্মাৎ ধর্মমতের ঊর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও মেলামেশা করেছেন। বোমা মজুত করে রেখেছেন। লোকজনও রেখেছেন।

এ সবকেই আজ উচ্ছেদ করতে হিন্দুদের একটা অংশ বদ্ধপরিকর। এ নাকি আজকের দিনে লজ্জার কথা। হার মানার লজ্জায় হাওড়ার মুখ কালো হয়ে গেছে। সেই লজ্জা মুছবার জন্যে সে বছরের সেদিনের আয়োজন কুরুক্ষেত্রে সপ্তরথী সমাবেশে চক্রব্যূহ রচনার মত একটা আয়োজন। টাকাকড়ি লোকজন পৃষ্ঠপোষক নেতা কিছুরই অভাব ছিল না।

খবরটা যেন কোর্ট এলাকা থেকেই ফিসফিস করে এ কোণে ও কানাচে উচ্চারিত হচ্ছিল। সময়টা গুজবের সময়ও বটে। সুতরাং সঠিক কোন সংবাদ পেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কোর্ট-ফেরত সুধাংশুবাবু কোর্টের পোশাক খুলেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের আড্ডার দিকে।

আড্ডায় কর্মীরা গুম হয়ে বসে ছিল। করার যেন কিছুই নেই। কতকগুলো ব্যবসাদার সমস্ত উদ্যোগের পিছনে দাঁড়িয়েছে; তাদের লক্ষ্য ওই মুসলমান ভদ্রলোকটির ওই একচেটিয়া ব্যবসা। তার সঙ্গে যারা নেতা হিসেবে দাঁড়িয়েছে তাদের লক্ষ্য ওই আয়রন-চেস্ট এবং আরও একদল আছে যারা চোখ রেখেছে আগামী কাল যে বস্তিটা পোড়াবস্তি হবে সেইটের উপর। এদের সবার পিছনে আছেন বস্তির মালিক যিনি তিনি। গোটা পাড়াটা খেপেছে। বাইরে থেকেও লোক আসছে।

আজও মনে আছে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল সুধাংশুবাবুর। শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি হবে ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের? মনে পড়ছে রবি বলে একটি অল্পবয়সী ছেলে বলেছিল - দেশটা কি ফ্যাসিস্ট হয়ে গেল সুধাংশুদা?

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মেয়েটি বললে—আপনার কাছে সেদিন রাত্রে আমার কুৎসিত চেহারা আমি লুকোই নি। লুকুতে আমি পারতাম। কিন্তু আপনার জন্যেই আমি লুকুই নি। আপনার ক্ষতি হত, অনিষ্ট হত।

—হ্যাঁ, তা হত।

ছুরি কিংবা বোমা কিংবা লাঠি ডাণ্ডার ঘায়ে জখম হতে হত। প্রাণান্ত হলেও হতে পারত। সেদিন রাত্রে তাদের দলের আড্ডায় বিপ্লবের ব্যাকরণ নিয়ে এবং ভারতবর্ষের এত পুণ্যের স্বাধীনতার তপস্যা নিয়ে আলোচনার মাঝখানেই বোমা ফাটতে শুরু করেছিল। ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা, বিনয় বাদল দীনেশ, চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্য সেনের দৃষ্টান্ত কোন্ ভুলে এমনভাবে দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাবাজদের বিক্রম ও প্রতাপের কাছে ম্লান হয়ে গেল সেই কথা হতে হতেই দমাদম বোমার আওয়াজ শুরু হয়ে গেল। বুঝতে বাকী থাকে নি বস্তিওয়ালা ব্যবসাদার এবং ধর্মান্ধ মানুষদের জোটের জেহাদ আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথম শব্দেই চমকে উঠেছিল সকলে।

—আরম্ভ হয়ে গেল ?

একজন ঘড়ি দেখে বলেছিল—এই তো সবে সাড়ে আটটা—এত সকালে—

—তার মানে পুলিস একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে।

ওদিকে কোলাহল উঠেছিল। তার অর্ধেকটা পৈশাচিক হিংসার উল্লাসের কোলাহল আর অর্ধেকটা আর্ত সকরুণ।

সকলেই প্রায় একসঙ্গে এক সংকল্পে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

সংকল্প—এই বর্বর হৃদয়হীন পৈশাচিক আক্রমণকে বাধা দিতেই হবে। রাজনৈতিক চেতনায় সচেতম মন—দুর্ধর্ষ সাহস—নূতন যৌবন, তাঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন ঘর থেকে।

তখন আগুন জ্বলছে। এবং মানুষেব সে বীভৎস-উন্মত্ততা, হিংসার সে প্রচণ্ড ভয়াল রূপ বস্তির চালের দাউদাউ আগুনের মত ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতব হয়ে উঠেছে। যে আগুন আলোর মুখে শিখা হয়ে জলে, অন্ধকারে পথ দেখায়, সেই আগুন ঘরেব চালে লাগলে মানুষেব ভয় হয়। সেই আগুন যখন এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয় তখন দূর থেকেই তার আঁচে মানুষের দেহ ঝলসায় আত্মা সংবিৎ হারায়। তাদেরও সংবিৎ হারিয়েছিল সেদিন। ওদিকে তখন পাকাবাড়ি থেকে থেকে বর্ধিষ্ণু মুসলমানটি গুলি চালাচ্ছেন।

একজন শান্তিকামী বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই গুলিতে আহত হযেছেন। তাকে হাসপাতালে নিযে যাওয়া হয়েছে। এমনই অবস্থায় জন সাতেক— ।

হ্যাঁ, তাঁরা সাতজনই ছিলেন। সাতজনেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পাড়াটার সামনে। মনে পড়ছে চীৎকার উঠেছিল পাড়ার ভিতব থেকে "নাবায়ে তকদীর। আল্লা হো আকবর।" তার সঙ্গে ছেলেমেয়েদেব ভয়ার্ত কান্নাব শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এদিকে বাইরে আক্রমণকারীর দল চেঁচাচ্ছিল। অর্থহীন ভাবে কয়েকটি অতি পবিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করে তার সঙ্গে বুকের কথা প্রকাশ করছিল, অকুতোভয়ে কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে চীৎকার করে বলছিল—মার মাব মার। লাগাও আগুন। জ্বালাও।

এঁরা সাতজনেই চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন—না না— । শোন— শোন ভাই সব—

মুহূর্তে একটা বোমা এসে আছড়ে পড়েছিল সামনে। বোমা নয়, ক্র্যাকার। প্রচণ্ড শব্দ করে ফেটে ঠাঁইটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। গুণ্ডার দল কুৎসিত ভাষায় তাদেব গালাগাল দিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল—নিকাল শালারা এখান থেকে নিকাল।

আর একজন বলে উঠেছিল—দে, শালাদের ধরে হাত পা বেঁধে ওই আগুনে ফেলে দে।

তাঁদের দলের সব থেকে ছোট ছেলেটি এই মুহূর্তটিতেই সব থেকে মারাত্মক ভুল করে বসেছিল। তার জামার তলায় লুকানো ছিল একটা—ক্র্যাকার নয় বোমা; সেই বোমাটা সে ছুঁড়েছিল ওই বক্তার দিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু হল বিপরীত। বোমাটা এমন ভাবে ফাটল যে তার স্প্লিন্টারগুলো এসে লাগল তাকেই এবং দুটো একটা লোহার টুকরো ওদেব দলের দু'একজনকে আহত করে দিলে। ছেলেটা নিজে রক্তাক্ত হয়ে সেইখানে লুটিয়ে পড়ে গেল। এরপর সে এক প্রেততাণ্ডব। গুণ্ডার দল ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের দলকে আক্রমণ করলে। সে আক্রমণের মুখে

দাঁড়িয়ে মরার মত সাহস ছিল কি ছিল না সে কথা সেদিনও ভাবেন নি, আজ অকস্মাৎ যেন ভেবে দেখতে ইচ্ছে হল একবার।

মন বলছে—হ্যাঁ, সাহস ছিল। কিন্তু অন্য সকলে সম্ভব অসম্ভব হিসেব করে বলেছিল—"লড়াই করা অসম্ভব। এবং এভাবে গুণ্ডার হাতে মরে কোন লাভ হবে না। আমরা মলে ওদের মনে এতটুকু দাগ কাটবে না।" সেই কারণেই সেদিন ঘুরে দাঁড়িয়ে ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াইয়ে যা হতে পারত তার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াতে পারেন নি।

সেদিন তা দাঁড়ালে এই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হত না। দেখা হয়ত হত কিন্তু তাকে ঠিক এইভাবে চিনতেন না! এ চেনা যে কত বড়— ; কি বলবেন—? লজ্জার ? দুঃখের ?

যাক, ছুটে পালিয়েছিলেন সকলে। জখম হওয়া ছেলেটাকে নিয়ে পালানো খুব সহজ কথা ছিল না। কিছুটা দূর এসেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিলেন সকলে। গোটা পাড়াটার রাস্তায় আলো তখন সব নিভে গেছে। নিভিয়ে দিয়েছে ওরা। বাড়িগুলির দরজা জানালা বন্ধ। ভিতরেও আলোর আভাস ছিল না। রাস্তা জনহীন। পিছনে ছুটন্ত হিংস্র গুণ্ডার দল। গুণ্ডারা চোরাগোপ্তা গুণ্ডামি করে—সে সহ্য হয়ে গেছে মানুষের, সেখানে গুণ্ডাদের ধরা পড়ার ভয় আছে। আর এ হল গুণ্ডার অবাধ অধিকার। গুণ্ডামি হল এখানে বিশেষ অধিকার।

সুধাংশুবাবু ছুটছিলেন অন্ধকারের মধ্যে। বড় রাস্তা ছেড়ে সংকীর্ণ পথ ধরে এলাকাটা পার হয়ে আসতে চেষ্টা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। গলিটার ওমাথায় উঠেছিল কোলাহল—সেই আস্ফালন—

মার শালাদের—দে জ্বালিয়ে।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। কি করবেন ? আবার পিছন ফিরবেন ? কিন্তু যাবেন কোথায় ? অতি সংকীর্ণ কোন গলিপথ—যে পথে মেথরেরা হাঁটে—এমন কোন পথও কি নেই ?

নিঃসীম অন্ধকার আর ওই দাঙ্গার ছোট পাড়াটা তখন অন্ধকারের মধ্যে যেন দিকদিগন্তহীন হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে তিনি অতল জলে তলিয়ে হারিয়ে যাবার মতই ওই অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একপাশের একটা বাড়ির নোনাধরা ইটের দেওয়ালের গায়ের সাবেকী আমলের ছোট একটা জানালা খুলে গিয়েছিল। সুধাংশুবাবু অনুভব করেছিলেন জানালার ওপাশে কেউ আছে! আর শুনতে পেয়েছিলেন একটি বাচ্চার কান্না। বুঝতে দেরি হয় নি, যে ওপাশে রয়েছে সে কোন মেয়েছেলে। তবুও সুধাংশুবাবু বলেছিলেন বা বলে ফেলেছিলেন—আমাকে একটু আশ্রয় দিতে পারেন ? গোলমালটা একটু থামলেই চলে যাব!

ফিসফিস করেই মেয়েটি বলেছিল—তুমি কে ?

—নাম বললে কি করে চিনবেন ? তবে আমি হিন্দু কিন্তু গুণ্ডার দলের হিন্দু নই। গুণ্ডারা আমাকে তাড়া করেছে। গলির দু'মুখে ঢুকে খুঁজছে।

শেষকালটায় হঠাৎ নামটা বলে ফেলেছিলেন—আমার নাম সুধাংশু। আমি হিন্দু।

—সুধাংশু! সেদিন মনে হয় নি কিন্তু পরে মনে হয়েছিল শব্দটি উচ্চারণের মধ্যে বিস্ময় ছিল।

সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—হ্যাঁ। মিথ্যে বলি নি আমি। কিন্তু দরজাটা খুলে দেন তো দিন নইলে পাশ দিয়ে কোন রাস্তা বলে দিন। ওরা গলিটার দু'মুখ আগলেছে।

খুব দ্রুত উচ্চারণে চাপা গলায় গৃহমধ্যবর্তিনী বলেছিল—দরজার সামনে আসুন। এই ডাইনে দরজা।

ঘরের মধ্যে এ পর্যন্ত সেই কাঁদুনে ছেলেটা এক-ধরনের ঘ্যানঘেনে কান্না কেঁদেই চলেছিল—হঠাৎ সে এবার ককিয়ে উঠল। কে যেন বললে, সেও মহিলা, একটু ভারী গলায় বললে—ছেলেটাকে মেরে ফেল তুই, ছেলেটাকে গলা টিপে শেষ করে দে! এ তরফ থেকে বলেছিল—তুমি থাম তো! চেঁচিয়ো না বেশী।

—ওকি—দরজা খুলছিস কেন? আজকের দিনেও কি তোর—

এবার মেয়েটি চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল—থাম বলছি মা তুমি থাম! দরজা খুলে না দিলে মানুষটাকে ওরা মেরে ফেলবে!

—ও মা—! তাই বলে তুই—। ও চাঁপা—চাঁপা—।

এদিকে দরজাটা খুলে গিয়েছিল। অন্ধকার দরজার মুখটায় শ্বেতবস্ত্রাবৃতা মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিলেন সুধাংশুবাবু। মেয়েটি বলেছিল—ঢুকে পড়ুন, দেরি করবেন না।

বাড়ির মধ্যে এসেও তিনি মেয়েটিকে চিনতে পারেন নি।

কেরোসিনের ডিবে আর একটা কালিপড়া হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল মেয়েটির প্রসাধন এবং সজ্জাবিলাস বেশ একটু অসংগত। এই বাড়িতে এই পরিবেশে যারা বাস করে তাদের পক্ষে এ বিলাস এ সজ্জা শুধু বেমানানই নয়—মানে খুঁজতে গেলে একটা খারাপ অর্থই বার বার মনের মধ্যে গর্ত থেকে সাপের মত মুখ বাড়ায়।

তখন ওর বয়স ছিল বোধ করি বছর কুড়ি কি বাইশ, তার বেশী নয়।

মেয়েটি যে ঘরের জানালা থেকে কথা বলেছিল সেই ঘরেই সে তাঁকে এনে বসতে দিয়েছিল, বলেছিল—বসুন এইখানে।

হঠাৎ এতক্ষণে সুধাংশুবাবুর মনে হয়েছিল মেয়েটিকে যেন তিনি চেনেন—অন্ততঃ দেখেছেন। ভ্রূ কুঞ্চন করে মনে করতে চেয়েছিলেন কোথায় দেখেছেন।

ঘরখানার মধ্যে দুখানা তক্তাপোশ জোড়া দিয়ে তার উপর দুজনের বিছানা পাতা। দুজনের না, আড়াইজনের বিছানা—অর্থাৎ একজনের বিছানার পাশে একটি ছোট ছেলের বিছানা। বিছানায় শুয়ে একটা রুগ্ন ছেলে কেঁদেই চলেছে। বিরাম নেই—তার অসন্তোষের শেষ নেই, সে অসন্তোষ সে প্রকাশ করে চলেছে ওই কান্নার মধ্যে দিয়ে। ক্লান্ত তিক্ত—হয়তো তার সঙ্গে ক্ষোভও ছিল কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে যা ছিল তা দুঃখ এবং করুণা ভিক্ষা। ছেলেটার বয়স হয়েছে—বছর চারেক হবে। কিন্তু এত দুর্বল যে উঠতে পারছে না।

মেয়েটি কিন্তু তাকাচ্ছেও না তার দিকে। সে বাইরে চলে গিয়ে ঘরের কোণের রাণীগঞ্জ টাইলের বারান্দাটার উপর ঘরের দিকে একেবারে পিছন ফিরে বসে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সুধাংশু

বাবু ভাবছিলেন—মেয়েটি কে ? দেখা মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, দেখেছেন তিনি। কোথায় দেখেছেন ? কোথায় ? ক্রমশঃ মনে হচ্ছিল যেন বেশ চেনা। কিন্তু কে ? হঠাৎ ছেলেটা যাকে বলে একেবারে ককিয়ে ওঠা সেই ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল। সুধাংশুবাবু ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিছু হল নাকি ছেলেটার ? এবং প্রত্যাশা করছিলেন মেয়েটি এবার এসে ছেলেটিকে তুলে নেবে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়েটি চঞ্চল হয় নি। বাইরে সেই বয়স্কা মেয়েটি বলে উঠেছিল—দেখ কি হল ছেলেটার ? চাঁপা !

মেয়েটি তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাভরা কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল—মরুক—মরুক আপদটা মরুক। আমি পারব না—তুই দেখ ! ওটাকে ছুঁতে ঘেন্না লাগে আমার। সত্যিই সে নড়ে নি, যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই থেকেছিল। এসেছিল সেই বয়স্কা মেয়েটি, মাথায় ঘোমটা টেনে কালীতে কালো লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে ছেলেটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—ও মাঃ—মরে যাই মরে যাই—ওরে ডেয়ো পিঁপড়েতে কামড়ে ধরেছে রে। চাঁপা আয় আয়—ছাড়িয়ে দে ছাড়িয়ে দে।

আশ্চর্য মা।

সেই গাল সেই একমাত্র গাল বর্ষণ করতে করতে এবার এসে ঘরে ঢুকেছিল—মরুক। মরুক। মরুক। মরে যা তুই। মরে যা।

অবাক হয়ে সুধাংশুবাবু এই মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না।

মা বলেছিল —ওর অপরাধ কি বল।

অপরাধ যে কি তা' বলে নি সেই বিষাক্তজিহ্বা মা।

জিভে তার আশ্চর্য বিষ। কামড়াতে হয় না—জিভ থেকে যেন বিষাক্ত লালা ঝরে পড়ে, হয়তো ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই তিক্তমন এবং বিষাক্তজিহ্বা মা ছেলেটার কাছে এসে বলেছিল—কি হয়েছে ? ছেলেটা হাত তুলে দেখিয়েছিল। সে স্বল্প আলোতেও সুধাংশুবাবু দেখেছিলেন হাতের আঙুলে একটা ডেয়ো পিঁপড়ে কামড়ে ধরে ঝুলছে।

লণ্ঠনটা কাছে এনে মা নিষ্ঠুর টানে সেটাকে এবং আলোতে দেখেশুনে আরও একটা পিঁপড়েকে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে নিজের পা দিয়ে পিষে মেরেছিল নিষ্ঠুর আক্রোশে।

লণ্ঠনটা তুলে ধরে মুখ নামিয়ে যখন মেয়েটি ছেলেটার কোথায় পিঁপড়ে ধরেছে দেখছিল সেই সময় আলোর আভা বেশ উজ্জ্বল হয়ে তার মুখের উপর পড়েছিল। তার যে একটি অশোভন প্রসাধনবিলাসিতার ও বিলাসসজ্জার আভাস তাঁর এবাড়ি ঢুকবার মুখেই চোখে পড়েছিল এবার সেটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেটা আর সেটুকু বলে এতটুকু কিছু নয়, সেটুকু যেন অনেকটুকু।

মেয়েটিকে ভাল দেখতে পান নি তিনি। এবার দেখলেন মেয়েটি পূর্ণযুবতী এবং আশ্চর্য একটি আকর্ষণ আছে তার, তার উপর তার কেশপ্রসাধনে এবং বিলাসসজ্জায় একটি ঘোষণা আছে।

তবুও ঘরখানির মধ্যে বিপণি সাজাবার মত কোন আয়োজন নেই। একটা দৈন্য ফুটে রয়েছে চারিদিকে। গৃহস্থঘরের পরিবেশ চারিপাশে অত্যন্ত স্পষ্ট। এর মধ্যে বেমানান একমাত্র সেই মেয়েটি নিজে। হঠাৎ চোখ ফুটল তাঁর।

মেয়েটির বেশভূষায় প্রসাধনে বিলাসের ও লালসার যে ঘোষণাই থাক, মেয়েটির পরনের বেশভূষার রঙের ঔজ্জ্বল্য নেই। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কপালে টিপ নেই। সাদা সিঁথি ঘিরে একরাশি চুল নিয়ে যে পরিপাটী কেশপ্রসাধন সে করেছে তার কাছে সিঁদুর কুমকুম লিপস্টিক বিচিত্রিত অনেক মুখ লজ্জা পাবে। পরনে সাদা ব্লাউজ—সাদা জমি ফিতেপাড় শাড়ি।

ছেলেবেলা মনে পড়ল—মিনার্ভায় শাস্তি কি শান্তি নাটক অভিনয় দেখেছিলেন। তাতে বিধবা মেয়ে 'ভুবন' ভ্রষ্টা হয়ে সাদা থান আর সাদা সায়া ব্লাউজে যে অপূর্ব মোহিনী রূপ ফুটিয়ে তুলেছিল তাকে দেখে নায়ক মেয়ের বাপ চমকে উঠেছিলেন এবং বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে অর্থাৎ মেয়ের মাকে বলেছিলেন—"ভুবনের বিবি-রূপ দেখে এলাম। মেয়ের অলঙ্কার খুলতে সিঁথির সিঁদুর মুছতে কেঁদেছিলে তুমি। ভুবনকে এবার একবার দেখে এসে চক্ষু সার্থক কর।"

সেই রূপের আভাস এখনও মেয়েটির সর্বাঙ্গে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছে তাড়িয়ে দি। কিন্তু না, তা তিনি পারেন না। হ্যাঁ, তা তিনি পারেন না।

সেদিনও রাত্রে এ মেয়েটির উপর দারুণ ঘৃণায় তিনি চলে আসতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ছে -- ঠিক এই মুহূর্তেই—কেউ একজন সেই জানালা যে জানালাটা খুলে মেয়েটি তাঁকে দেখেছিল এবং তিনিও তাকে দেখে আশ্রয় চেয়েছিলেন সেই জানালায় টোকা দিয়েছিল কেউ। চমকে উঠে শঙ্কিত হয়েছিলেন তিনি।

তাঁর চোখের সামনে একটু দূরে মা এবং মেয়ে পরস্পরের দিকে নিষ্পলক নির্বাক হয়ে তাকিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। চারটি চোখের দৃষ্টি থেকেই যেন আতঙ্ক ডাক মারছিল।

টোকা বা শব্দ আরও জোরে পড়েছিল। মেয়ে এবার আর্তকান্নাকাঁদা ছেলেটাকে মায়ের কোলে দিয়ে বলেছিল—আরও জোরে কাঁদা এটাকে।

কাঁদাতে হয়নি—ছেলেটা আপনিই কেঁদেছিল। ছেলেটাকে ভাল করে দেখেছিলেন এবার; রোগা অযত্নশীর্ণ দেহ। দিদিমার কোল থেকে ভেঙে পড়ে ঝুঁকে মায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। কান্নার চীৎকার ক্রুদ্ধ এবং উচ্চ হয়ে উঠেছিল।

মেয়েটি জানালার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলেছিল—আপনি একটু নেমে বসুন---এই তক্তাপোশের নিচটায়। একটু আড়াল দিয়ে বসবেন। আমি জানালা খুলব —ওরা দেখতে পেলে বিপদ হবে।

সুধাংশুবাবু তাই বসেছিলেন।

মেয়েটি জানলা খুলে বলেছিল—কি? কি বলছ কি? এই দাঙ্গার মধ্যে আমি বাড়ি থেকে পা বের করব না।

—নেহি নেহি। মালিক সাব বলিয়ে দিয়েছেন কুছ ডর না করবেন। কুছ ডর নেহি না। কোই হামলা হোগা তো হমি লোক দেখে গা।

—আচ্ছা।

—আউর সাহাব তিন-চার রোজ আসবেন না।

—আচ্ছা। বলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল মেয়েটি।

বাইরের লোক দুটির আরও কিছু কথা এরই মধ্যে ছিটকে এসে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। যার অর্থ—মালিক সাহাব শারোয়ার উপর শয়তান খুশী হায়। দেখ্‌না ক্যায়সা এক ঔরৎ কব্জা করিয়েছে।

শেষ কথা শুনেছিলেন—হ্যাঁ, তবু বলতে হবে লোকটা জাঁদরেল বটে আর দিলওয়ার আদমী। কথাগুলো আশ্চর্যভাবে অর্থসমন্বিত হয়ে উঠছিল তখন সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে। তিনি তক্তা-পোশের ধারে গুঁড়ি মেরে মাথা নামিয়ে বসেছিলেন। প্রথমেই নাকে ভক করে একটা গন্ধ এসে পৌঁচেছিল। তারপরেই চোখে পড়েছিল একটি বোতল।

গন্ধ মদের এবং বোতলও মদের। কিন্তু মূল্যবান বিলিতী মদের। ওদিকে কানে আসছিল ওই সব কথাগুলি। মেয়েটি বিচিত্ররূপিণী হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে। জানালা বন্ধ করেই মেয়েটি বলেছিল—এবার উঠুন। বসুন ভাল করে। আর কেউ আসবে না।

সুধাংশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বসেন নি, দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলেছিলেন—না, আমি এবার যাব।

—যাবেন? চমকে উঠেছিল মেয়েটি। তারপরই তার কপাল কুঁচকে উঠেছিল এবং বলেছিল—যাবেনটা কোথায়?

—বাড়ি—আমার বাড়ি এখান থেকে খুব দূর নয়।

—সে জানি। কিন্তু তা হলেও এখন যাওয়া যায় না। যাদের ভয়ে এখানে ঢুকেছেন তারা গলিতে রয়েছে।

—তা থাক। সে ব্যবস্থা আমি করব। তার জন্যে ভেবো না তোমরা।

মেয়েটির চোখের পাতা দুটো চকিতে বিস্ফারিত হয়ে যেন ঝলসে উঠেছিল, বলেছিল—অ। তার জন্যে ভাবতে হবে না মানে আপনার জন্যে। তা না হয় ভাবলাম না কিন্তু আমাদের জন্যে আমরা ভাবব তো! না—তাও পাব না!

—মানে?

—ওরা যখন দেখবে কি জানতে পারবে আপনাকে আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম তখন আমাদের হবে কি সেটা ভাবতে পারেন না পারেন না!

সুধাংশুবাবু সেই মন্ত্রপড়া সাপের মত মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। রাত্রি দুটো পর্যন্ত বসে থাকতে হয়েছিল। তারা নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। তিনি মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। শুধু ওই ছেলেটা ক্রমান্বয়ে কেঁদে গিয়েছিল অশ্রান্ত কান্না।

আর এই বিষাক্তজিহ্বা নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর ক্রোধে বার বার বলেছিল—মর মর, তুই মরে যা।

সুধাংশুবাবু ক্ষুব্ধ চিত্ত নিয়েই অসহায়ভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন।

বাইরের গলিপথটাই একরকম দাঙ্গার কেন্দ্র, বস্তিটার দক্ষিণ সীমানার শেষ প্রান্ত। গলিটার ওমাথায় এমাথায় হাঁকাহাঁকি চলছে। কখনও ছুটন্ত মানুষের পায়ের শব্দে ফিসফাস কথায় হাসিতে মধ্যরাত্রি চমকে চমকে উঠছে। কখনও তীক্ষ্ণ শব্দে সিটি বেজে উঠছে।

আর একটু ওপাশ থেকে ভয়ার্ত মানুষের সাড়া উঠছে।

সুধাংশুবাবু ভাবছিলেন—মেয়েটি ঠিকই বলেছিল। বেস হয়ে পড়লে বিপদ ঘটতে পারত।

রাত্রি তখন দুটো বাজতে পনের মিনিট—তখন গলিপথটা নীরব নিস্তব্ধ হয়ে এসেছিল, স্পষ্ট মনে হয়েছিল, এবার আক্রমণকারী আক্রান্ত হিংসা ক্রোধ ভয় আতঙ্ক সব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর নিজের ডায়রীতে স্মরণীয় দিনের স্মরণীয় ঘটনা লিখে রাখেন। তিনি ঠিক এই কথাগুলিই লিখে রেখেছেন—আক্রমণকারী আক্রান্ত দু'দলই ক্লান্ত হয়েছে—হিংসা ক্রোধ তার সঙ্গে ভয় আতঙ্ক সব যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন এক আশ্চর্য ঘুম আসে। সে ঘুমের তুলনা ঈশ্বরের করুণার সঙ্গে।

এইবার তিনি উঠবেন ঠিক করেছিলেন।

তাকিয়েছিলেন ওদের দিকে। মেয়েটির মা ঘুমুচ্ছে মেঝের উপর শুয়ে। বিছানাটা খালিই পড়ে আছে। মেয়েটি ঘুমুচ্ছিল বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। লণ্ঠনের আলো পড়েছিল তার মুখের উপর। মাথাটি ঈষৎ হেলে পড়েছিল পিছনদিকে। মেয়েটির সত্যই একটা মোহ আছে।

কপালে দু'পাশে ঢলকো করে নামিয়ে পিছনে একটি এলো খোঁপা। পরনে ফিতেপাড় শাড়ি গায়ে সাদা ব্লাউজ। বোজা চোখে কাজলের রেখার আভাস। গলায় বিছেহার কানে টাপ হাতে চারগাছা করে চুড়ি। শুধু জেগে ছিল সেই ছেলেটা। কাঁদুনে ছেলেটা আর কাঁদছিল না। তার ঘুমন্ত মায়ের কোলে বসে আপনমনে লণ্ঠনের আলোতে খেলা করছিল।

সেই মেয়েই আজ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

১৯৪৮ সাল—আর ১৯৬০ সাল।

আজও দেখলেন সেই আভরণগুলি। কিন্তু বেশভূষার মধ্যে আজ আর প্রসাধন নাই পারিপাট্যও নাই তবে অভ্যস্ত ছাঁদ ছাড়ে নি তার বেশভূষা। চোখের পাতায় আজ আর কাজল নেই কিন্তু কোলে কোলে মর্মান্তিক শোকের অসহনীয় দাহ বা হাহাকারের একটা কালো আভাস জেগে উঠেছে।

সুধাংশুবাবু তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিন্তু তাঁর মন চলে গিয়েছিল সেই অতীত কালে—এখন থেকে চৌদ্দ বছর আগে। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মনের মধ্যে স্মৃতিস্মরণে সমস্ত ছবিগুলো পরের পর ভেসে গেল।

মেয়েটির সে রাত্রের ছবি আজও জলজল করছে।

বিধবা মেয়ের ওই প্রসাধন ওই পোশাক, ঘরের তক্তাপোশের তলায় মদের বোতল, সেই অন্ধকার এবং গোলমালের রাত্রেও জানালায় টোকা, তারপর সেই সব কথাবার্তা তার পরিচয়ের কোন একটু স্থানও গোপন রাখে নি। মেয়েটা পরিচয় দিতেও এতটুকু সংকোচ করে নি। পরবর্তীকালে সুধাংশুবাবু চাঁপাকে ভাল করে না হোক—তাই বা কেন মোটামুটি বেশ চেনাই চিনেছেন। হিসেব করে দেখলে বলতেই হবে যে, ওই যে প্রথম রাত্রির সেই চেনা বা দেখা তাই পরবর্তীকালে বেশী করে সত্য এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

না, পরের দিনই ওর আর একটা পরিচয় পেয়েছিলেন। এবং তাতেই সম্পূর্ণ হয়েছিল মেয়েটির পরিচয়।

পরের দিন সকালবেলা তিনি খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন—দেখছিলেন কাল রাত্রের হাওড়ার বস্তির ঘটনা সম্পর্কে কি রিপোর্ট বেরিয়েছে। শাক দিয়ে মাছ যেমন ঢাকা যায় না—মাছের চেহারা দেখা না গেলেও যেমন গন্ধে ধরা পড়ে তেমনিভাবেই একথা আজ প্রমাণিত যে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদের যে ফোড়ং দিয়ে সংবাদ-ব্যঞ্জন পরিবেশন করেন তা থেকে হিন্দুদের তেলকাটার গন্ধ ওঠে। একটু চেষ্টা করলেই কাঁটা বেরিয়ে পড়ে। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'র পূজোকে নামে সর্বজনীন করে তুললেও মিথ্যা এবং সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি থেকে মুক্তি এ জাত পায় নি। ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম বলে ভজন গাইলেও অন্তিম সময়ে গান্ধীজী হায় রাম বলেই বিলাপ করেছিলেন।

সন্দেহটা তাঁর অমূলকও ছিল না। কাগজে সম্পন্ন মুসলমান ভদ্রলোকটির উপরেই প্রথম দোষ চাপানো হয়েছে। তিনি গুলি চালিয়েছিলেন এই খবরটাকেই বড় করে ধরে সুকৌশলে এই ধারণাই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, গুলি চালানোই হল গতকালের বস্তি আক্রমণের প্রথম হেতু। এবং একমাত্র হেতু।

বিশেষ কিছু করতে হয় নি ; শুধু মোটা হেডলাইনে ঘোষণা করেছেন—'সাম্প্রদায়িক কলহে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার।' 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনৈক ধনী কর্তৃক চৌদ্দ রাউণ্ড গুলি ব্যবহার।' তারপর দেওয়া হয়েছে—'দলবদ্ধভাবে উত্তেজিত অপরপক্ষ কর্তৃক বস্তির উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ। গৃহে অগ্নিসংযোগ। সমস্ত বস্তিটি ভস্মীভূত।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে কাগজখানার ওই ছাপা লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং গত রাত্রের সেই ভয়াবহতা স্মরণ করছিলেন। হঠাৎ নজরে পড়েছিল বাড়ির সামনের রাস্তাটা ধরে একটি মেয়ে চলে গেল। একটি গলিপথ ধরে মেয়েটি রাস্তার উপর পড়ল এবং হাত তিরিশেক সোজা হেঁটে গিয়ে ওপারের একটা গলিপথে ঢুকে গেল।

পরনে ফিতেপাড় শাড়ি—সায়া ব্লাউজও আছে কিন্তু তা সাধারণ—তাতে কোন ফ্যাশন নেই ; পিঠের উপর পড়ে আছে ভিজে একপিঠ চুল ; তাতে চিরুনি দেওয়া হয় নি, চুলগুলি এখনও ভিজে ; মেয়েটি সদ্য স্নান করেছে। পাশ থেকে মনে হল চিরুনি দেওয়া না হলেও কেশ-বিন্যাসের একটি ছাঁদ অনেক দিনের পাট ও ইস্ত্রি করা জামার হাতা বা পেণ্টালুনের পায়ার দাগের বা ভাঁজের মত কায়েম হয়ে গেছে। বুকখানা ধ্বক করে উঠেছিল তাঁর।

এই তো সেই মেয়ে। সেই কালকের রাত্রের মেয়ে।

চঞ্চল হয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কাগজখানা ফেলে দিতে দিতেই কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

এ কি করছেন তিনি ! মেয়েটি ততক্ষণে উত্তরমুখে ওপারে গিয়ে পশ্চিমদিকের একটা ছোট রাস্তার মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ, বোধ করি মিনিট তিনেক পর তিনি নিজেকে আর সংবরণ করতে পারেন নি—

দ্রুতপায়ে পথের উপর নেমে এসে, এগিয়ে গিয়ে, যে-রাস্তায় মেয়েটি মোড় ফিরেছে সেই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু আর দেখতে পান নি। পশ্চিমমুখো রাস্তাটা প্রায় গজ পঞ্চাশেক গিয়ে একটা বাঁক বেঁকেছে—ততদূর পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তার আর কোন সন্ধান মেলে নি। রাস্তায় তখনও খুব লোকজনের সময় নয় এবং ওদিকটা একটু নির্জনও বটে। দুই রাস্তার মোড়ের উপর যে-বাড়িটা সেটা বর্ধিষ্ণু ধনীজনের বাড়ি, বাড়ির গেটে পাহারা আছে—গুর্খা দারোয়ান আছে—পালা করে পাহারা দেয়। সেই ফটকটার সামনে কলরব করছিল দাঙ্গায় বস্তি থেকে উচ্ছেদ হওয়া একদল মানুষ। অবশ্যই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক। এই ভোর-বেলা থেকে হতভাগ্যেরা ক্ষুধা অনুভব করছে। ছেলেগুলো কাঁদছে চেঁচাচ্ছে—বয়স্কেরা কাতর-ভাবে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে—মধ্যে মধ্যে হাঁকছে—বাবু! বাবু! বাবু মশা—য়!

আজও মনে পড়ছে দুটো কুকুর কয়েকটা কাক দুটো গরু এবং ময়লা টব মাথায় করে একজন জমাদারণী চলে যাচ্ছিল; এ ছাড়া আর লোক ছিল না রাস্তাটায়। রাস্তাটা ছোট রাস্তাই বটে। আগে এ রাস্তায় সবটাই বস্তি ছিল—এখন এই মোড়ের দিকটা ভেঙে খান দুই তিন বড় বাড়ি তৈরি হয়েছিল কিছুদিন আগে। পর পর দুখানা বাড়ির মালিকেরা যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে ওঠা বড়লোক।

এরই মধ্যে কোথায় যে গেল মেয়েটি, ভেবে পেলেন না তিনি। রাস্তার মোড় থেকে পর পর তিনখানা বড় বড় বাড়ি। তারপর রাস্তাটা আর রাস্তা নেই, একটা নোংরা গলিপথে পরিণত হয়েছে। তার দু'দিকেই বস্তি। এ সেই পুরনো কালের, বোধ করি মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে প্রতিষ্ঠা করা বস্তি। বস্তির ভিতরের রাস্তাটা বারো মাস কাদা হয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দুর্গমতম জায়গায় ইট পাতা। মাথার উপর সূর্য এলে তবে কিছুক্ষণের জন্যে রোদ্দুর নামে। এখানকার বাড়িগুলো বা ঘরগুলো বাড়িও নয় ঘরও নয়—ঝুপড়ির মত একটা অন্ধকূপ। মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে মেয়েরা, পুরুষদের মাথা নুইয়ে থাকতে হয়। এবং এই বস্তিতে যারা থাকে তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ। তাদের সঙ্গে তো এই মেয়ের কোন মিল নেই। এ বস্তিতে থাকে এদেশী ঘরামীর দল, কিছু রাত্রে-তার-কাটা ডাকাবুকো ছেলে, কিছু হিন্দুস্থানী মজুর আছে তারা মাটি কাটে, কিছু ওড়িয়া মজুর থাকে। একদিকের অংশটায় কিছু রাজমিস্ত্রী এবং মজুর-মজুরনী থাকত, তাদের এলাকার শেষে বিচিত্র সেই ইরানী বেদেরা এসে তাঁবু গেড়ে মধ্যে মধ্যে আড্ডা গাড়ত। এদের মধ্যে আরও আছে—খুনে গাঁটকাটা চোর, বে-আইনী গাঁজা আপিংয়ের কারবারী। এরা এখানকার পাকা বাসিন্দে নয় তবে একটা করে লুকোবার আড্ডা পেতে রেখেছে।

এই মেয়ের কাল রাত্রে যে-চেহারাই দেখে থাকুন সে-চেহারার সঙ্গে বস্তির বাসিন্দেদের কোন মিল নেই। ওই বস্তিতে সে গেল কোথায়? বিশেষ করে আশ্চর্য লাগল এই যে, মেয়েটি স্নান করেছে এই সকালে এবং একখানি পরিচ্ছন্ন ফিতেপাড় ধুতি পরে বেরিয়েছে। যার মধ্যে শুচি-শুদ্ধতার একটি আভাস আছে। ওই বস্তিতে যারা থাকে তারা থাকে—তাদের কথা আলাদা কিন্তু যারা থাকে না তারা ওই বস্তিতে ঢুকলে বেরিয়ে এসে স্নান না করে মনে মনে অশুচির

অশান্তি অনুভব করবে। স্নান করে ওই বস্তির মধ্যে ঢোকা অসম্ভব তাতে তার সন্দেহ নেই।

এ মেয়ে কালকের সেই মেয়ে কিনা তাই নিয়ে কৌতূহলের তাঁর অন্ত ছিল না। কেন যে সে কৌতূহল জেগেছিল সে প্রশ্ন সেদিন করেন নি—আজ কিন্তু না করে পারলেন না।

না, তা নয়। কোন আকর্ষণ ছিল না।

শুধু কৌতূহল। চকিতের মত মেয়েটির মুখের একপাশ দেখে তিনি চমকে উঠে বারান্দা থেকে নিচে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। ততক্ষণে মেয়েটি তাঁকে পিছনে ফেলে রেখে সামনে এগিয়ে গিয়ে চাটুজ্জেদের বাড়ি যে রাস্তায় সেই রাস্তায় মোড় নিয়েছে। তার পিছনটা দেখে মনে হয়েছিল, এ মেয়ে সেই মেয়ে। কাল রাত্রে আধো অন্ধকার ঘরখানা ও বারান্দার মধ্যে তাকে চলতে ফিরতে যতটুকু দেখেছেন তার সঙ্গে এ মেয়ের চলনের, পিছনদিকের আশ্চর্য মিল। তাই তাঁকে কৌতূহলী করেছিল সেদিন। রাস্তার উপর নামিয়ে এনেছিল। রোমান্স কিছু ছিল না। তবে এ কথা ঠিক যে গতরাত্রে যে-পরিচয়টি তার পেয়েছিলেন সে-পরিচয়টা না পেলেই ভাল হত। এবং কৌতূহলটা অহেতুকভাবে মাত্রা ছাড়িয়েছিল। আজও মনে রয়েছে তিনি ফিরে আসেন নি এগিয়েই গিয়েছিলেন। দু'পাশে তিনখানা বড় বাড়ি। সব থেকে বড় বাড়িটা পুরনো অনেক দিনের, তাদেরই বাড়ির সামনে খানিকটা জায়গা আছে, ফটক আছে, ফটকে দারোয়ান আছে। বাড়ির সামনে ভিখিরীর দল দাঁড়িয়ে আছে। বিপরীত দিকে পাকা বাড়ি দুখানা এবং অপেক্ষাকৃত নতুন। ওই বস্তি ভেঙেই এ দুখানা তৈরী হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। এরা একই বংশের তিন শরিক। লোহালক্কড়ের ব্যবসা আছে কারখানা আছে। বস্তি আছে। নতুন বাড়ির মালিক যারা তারা অল্প অংশের শরিক কিন্তু তারা মডার্ন—যুদ্ধের সময় কণ্ট্রাক্টারী করে নতুন ভাগ্য তৈরী করেছে।

বেশী দূর না, অল্প খানিকটা যেতেই হঠাৎ তাঁর ঠিক সামনেই ওই দুখানা বাড়ির দ্বিতীয় বাড়িটার দরজা খুলে মেয়েটি বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল দাওয়া বারান্দার উপর। মেয়েটি বোধ হয় প্রত্যাশা করে নি যে, তিনি এতদূর এগিয়ে তাকে দেখতে আসবেন। সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্রীমতী মেয়ে। তখন বয়স বোধ হয় বাইশ-তেইশের বেশী ছিল না। পূর্ণ যৌবন তখন। কিন্তু সর্বাঙ্গে অপুষ্টির শীর্ণতা ছিল। কিন্তু মুখে একটি সকরুণ কিছুর আবেদন ছিল। নারী পুরুষকে যে লাবণ্য দিয়ে আকর্ষণ করে সে লাবণ্যকে আরও যেন বেশী মিষ্ট করে তুলেছিল।

মনে পড়ছে আগের দিন রাত্রের তার যে কেশবিন্যাস, তার যে ছন্দ সে তার স্নান করা এলো চুলের মধ্যেও জড়িয়ে এবং ছড়িয়ে ছিল। শুধু চুলে কেন, তার স্নান করা তেল-চকচকে কপালে, তার চোখের কোলেও কি কিছু ছিল না যাকে গতরাত্রের পরিচয়ের আভাস বলা চলে? ছিল, কিন্তু তাকে আজকের মত প্রেতিনীর পরিচয় বলে ধরে নেওয়া যেত না। মেয়েটির মুখ সেদিন মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যাকে বলে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে। তার ভাঁজকরা বাঁ হাতের চেটোর উপর একটা পিতলের থালায় কিছু ছিল। আধমিনিটখানেক লেগেছিল তার আত্মসংবরণ করতে। তারপরেই তার মুখখানা

লাল হয়ে উঠেছিল। শ্যামবর্ণ মেয়ে—মাধবীর টকটকে কচি পাতায় মত হয়ে উঠেছিল মুখখানার রঙ। চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের থালাখানাকে নামিয়ে কতকগুলো বাসী ফুল আর বেলপাতা একখানা শালপাতায় মুড়ে বাড়িখানার দক্ষিণে বস্তির পাশ দিয়ে গরু দুটোর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছন ফিরে গিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। একসঙ্গে ছুটে এসেছিল গরু দুটো—ওদিক থেকে কুকুরটা এবং পথের কাক কয়েকটাও লাফ মেরে মেরে এগিয়ে এসেছিল।

এর পর ব্যাপারটা এবং মেয়েটির পরিচয় আর খুব অস্পষ্ট মনে হয় নি। মেয়েটি এ বাড়ির নয়—এ বাড়ির মেয়ে ওই ভাঙা একতলা বাড়িতে নিশ্চয় যাবে না, যাবার কথা নয়। ওইটেই হয়তো ওর বাড়ি। এ বাড়িতে সকালে এসেছে কাজ করতে। এ বাড়ির পূজোর বাসী ফুল ফেলা বোধ করি ওর প্রথম কাজ। পূজোর বাসী ফুল তাতে ভুল নেই, নইলে ফুলের মধ্যে জবা থাকত না এবং তার সঙ্গে বেলপাতা থাকত না।

হায় দেবতা, তোমার ভাগ্য! এবং তোমার শুচিতার কপাল!

ফিরে এসেছিলেন তিনি সেদিন। প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েই ফিরে এসেছিলেন। তবুও সুনিশ্চিত হতে লেগেছিল আরও কিছুদিন। কারণ সেদিন রাত্রে তার সেই আচরণ—যে-আচরণ অন্ততঃ সে তাঁর সঙ্গে করেছিল তার মধ্যে তো কোন গ্লানি ছিল না। তিনি তাকে বিপন্ন হয়ে আশ্রয় চেয়েছিলেন—সেও তাঁকে সেই আশ্রয়ই দিয়েছিল। কোন সংকীর্ণতা তার মধ্যে ছিল না। এবং সারাটা ক্ষণ—সে তো কম সময় নয়—রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে প্রায় দুটো পর্যন্ত সাড়ে তিন ঘণ্টা। এর মধ্যে সে তাঁর দিকে কি একবারও অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল?—না। এবং পরের দিন সকালে ওই দাওয়ায় দাড়িয়ে তার ওই যে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়ার সবিনয় অপরাধ স্বীকৃতিকেও তিনি তো অপবিত্র অশুচি বলে মানতে পারেন নি। তিনি জানতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরের দিন সকালে আর মেয়েটিকে দেখতে পান নি। তিনি সকালে উঠে খবরের কাগজ হাতে তাঁদের বাড়ির বারান্দায় বসে রাস্তার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন—কিন্তু সে আসে নি। দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন পর বুঝতে পেরেছিলেন সে যায় না—তার বদলে যায় একটি আধবয়সী বিধবা মেয়ে। একটু লম্বাটে মাথায়, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে ব্লাউজ সায়া নয় শুধু শেমিজ; শেমিজের উপর আধ-ময়লা থান-কাপড় পরে মেয়েটি ঠিক ওই সময়েই তাঁর সামনে দিয়ে গিয়ে ওই রাস্তায় ঢোকে। চতুর্থ দিন সুধাংশুবাবু তাকে অনুসরণ করেছিলেন। এবং দেখেছিলেন এ মেয়েটিও ঠিক সেই বাড়িতে ঢুকে সর্বপ্রথম পূজোর থালা হাতে বাসী ফুল বেলপাতা ওই সেই গরু দুটোর মুখে দিয়ে খালি থালা হাতে বাড়ি ঢুকেছিল গিয়ে। চিনতে বাকী থাকে নি এ বিধবা তারই মা। তার সঙ্গে আরও একটা ছোট সত্য তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল যে, ওই গরু দুটো ওই ভোরে এসে ওই ফুল বেলপাতাগুলোর লোভেই এই বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

দিন পনের পরে আবার একদিন সকালে দেখেছিলেন মেয়েটিকে। সেদিন আর তিনি উৎসুক হন নি। একবার মুখ তুলে দেখে আবার মুখ নামাতে চেষ্টা করেছিলেন খবরের কাগজের

উপর। কিন্তু তাও পারেন নি। বসে থেকেই আবার চোখ তুলে দেখতে চেয়েছিলেন সেই মেয়ে কিনা এবং সে গলির ভিতর মোড় ফিরল কিনা।

বিস্মিত হয়েছিলেন। মেয়েটি মোড়ে মোড় ফিরতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল তার তাঁরই উপর।

তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

এরপর পর পর দিন তিন-চার এসেছিল মেয়েটি। রবিবার পড়েছিল একদিন—অর্থাৎ কোর্ট ছিল না। সেদিন প্রায় বেলা বারোটার সময় মেয়েটিকে ফিরে যেতেও দেখেছিলেন। যাবার সময় মেয়েটির দৃষ্টিতে সতর্কতার প্রচ্ছন্ন আড়ালে যৌবনের আহ্বান উঠেছিল যেন। বাঁকা চাউনির মধ্যে যেমন সে দেখছিল কে তাকে অনুসরণ করছে—কে তার গা ঘেঁষে চলতে চেষ্টা করছে, তেমনি ছিল ঠোঁটের কোণে ক্ষুরের ধারের মত হাসি। সেই রবিবার দিন বেলা চারটের সময় আবার এসেছিল ও একবার। এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে গিয়েছিল।

আরও কিছুদিন পর পূর্ণ পরিচয় মিলেছিল।

বোধ হয় আরো মাস ছয়েক পর। একদিন ওই লম্বামাথায় বিধবাটি, সেদিন রবিবার, সেই সকালেই এসে তাঁর বারান্দার উপর উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ঘোমটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল —বাবু!

একান্ত অপরিচিতের মত তিনি বলেছিলেন—কি চাই?

হাত জোড় করে মেয়েটি বলেছিল—আমরা বড় গরীব বাবা। আমার এই কাগজটি যদি দয়া করে দেখে দেন। আপনি উকীল।

বিধবার মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাংশুবাবুর মায়া হয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুপকারের একটি সুযোগ পেয়েও তিনি খুশী হয়েছিলেন। হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে দেখেছিলেন। হাওড়া মুনসেফী আদালতের একখানা সমন। তার সঙ্গে খান পাঁচ-ছয় কাগজ জুড়ে একটা নালিশের আর্জির নকল।

কোন এক মৃত প্রণবকুমার চক্রবর্তীর ওয়ারিশন নাবালক পুত্র স্বপনকুমার ও তস্য অভিভাবিকা মাতা মৃত প্রণবকুমারের বিধবা পত্নী রত্নমালা দেবীর উপর পাঁচশো কয়েক টাকা কয়েক আনা হ্যাণ্ডনোট দরুন পাওনা বাবদ নালিশ করেছেন কোন এক বি. এন. মালিক—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বি. এন. মালিক অ্যাণ্ড কোং।

—কে? এই রত্নমালা কার নাম?

—আমার সেই হতভাগা মেয়ের নাম বাবু।

—কার?

—চাঁপার। তাকে দেখেছেন আপনি। অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে কথা ক'টি।—স্বপন ওর সেই ছেলেটা। ডাকনাম নীলু।

মনে পড়েছিল ডেয়ো পিঁপড়ের কামড়ে বিক্ষত সেই কান্নায় পৃথিবী মাথায় করা হাড়জিরজিরে ছেলেটার কথা।

হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন—তোমাদের নেবে কি? বাড়িটা কি তোমাদের? মানে প্রণবকুমারের?

—বাড়িটা আমার স্বামীর ছিল বাবা—তা সেও তো বাঁধা দেওয়া আছে। প্রণবকুমারের নয়। প্রণবের কিছু ছিল না বাবা, কিছু রেখে যায় নি।

ইতিমধ্যে মক্কেল এসে পড়েছিল। সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—দেখ এখন তো আমার সময় হবে না। আর মামলার দিনও এখন দূরে। অন্য এক সময় আসতে হবে। বুঝেছ—

বিধবা বলেছিল—আমরা বড় গরীব বড় অসহায় বাবা—দয়া করে যদি কমসম নিয়ে—

সুধাংশুবাবু কথায় বাধা দিয়ে বলেছিলেন—দেখ সেদিন তোমরা আমার উপকার করেছ। সত্যিই উপকার করেছ—

—না না বাবা—

—থাম। যা বলছি, শোন। আমি নিজে তো দেওয়ানী মামলা করি নে। আমি সব শুনব —শুনে যদি সামান্য ব্যাপার হয় তবে আমিই করে দেব। নেব না আমি কিছু। বুঝেছ। তবে জটপাকানো কেস হলে যাতে অল্প খরচে হয় সেইভাবে ব্যবস্থা করে দেব। তুমি সন্ধ্যেবেলা এস। ঠিক সন্ধ্যের মুখে।

উপকারের কিছু প্রত্যুপকার করতে চেয়েছিলেন সুধাংশুবাবু। সেদিনের রাত্রের সে উপকার তো অস্বীকার করা যায় না। সেদিন রাত্রে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে তিনজন মাথায় লাঠির আঘাত পেয়েছিল। একজন ছুরি খেয়েছিল হাতে। তাঁদের দলের সেই ছোট ছেলেটি যে প্রথম বোমা ছুঁড়েছিল সে নিজের বোমার লোহার টুকরোয় আহত হয়েছিল—তার উপর কেউ তার হাতখানা দুমড়ে ভেঙে দিয়েছিল—তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। তিনি এবং আর দুজন ফিরেছিলেন আহত না হয়ে, কোন আঘাত না খেয়ে।

এ ছাড়াও পরের দিন থেকে বিপক্ষপক্ষ, যাদের মধ্যে ধর্মান্ধ কুশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ বেশী, সেই সব মানুষদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর বাড়ির সামনে অনেক বোমা বা পটকা ফেটেছে; দেওয়ালে অনেক কুশ্রী বিশ্রী স্লোগান লেখা হয়েছে; ভয়ও অনেক দেখানো হয়েছে। রাস্তার লোকে মধ্যে মধ্যে টিটকারিও কেটেছে। তার জের আজ এই আট ন মাসেও শেষ হয় নি। হয়তো বা আবার কোনদিন রাজনৈতিক কৌশলে বা প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতার আগুন আবার জ্বলবে—এবং সেদিন আবার তাঁর বাড়ির সামনে তাণ্ডবের পুনরাবৃত্তি হবে। এবং এখনও এদেশে অনেক মুসলমান আছে—এমন কি ওই বস্তিটার খানিকটা অংশেও এখনও আছে, সেখানেই আবার আক্রমণ শুরু হবে। এর মধ্যেও তিনি ওই মেয়ে দুটির উপরকারকে এতটুকু খর্ব করে দেখতে পারেন নি। এদের সম্পূর্ণ ভিতরটা সেদিন তিনি দেখে এসেছেন এবং বাইরেটাও দেখছেন পরের দিন থেকে—এরা ভিতরেও কালো এবং বাইরেও এরা মলিন এবং ভীরু। এদেরকে নীতিগতভাবে স্নেহ কোনমতে হয়তো করা যায় না—কিন্তু এরা বড় দরিদ্র। শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্যই নয়, কোথায় যেন একটা মনুষ্যত্বের দারিদ্র্যেও এরা বড় দরিদ্র।

সেই কারণেই মমতা হয়েছিল এবং প্রত্যুপকারও করতে চেয়েছিলেন সুধাংশুবাবু। সে-সময় সে চলে গিয়েছিল এবং কথামত সন্ধ্যেবেলা আবার এসেছিল। এবার একলা আসে নি। সঙ্গে এসেছিল ওই মেয়ে। এবং সেদিনের সেই কাঁদুনে ঘ্যানঘেনে ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে এসেছিল। কোলে থেকেও সে কাঁদছিল। সেই খুনখুনে কান্না। এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা। এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা!—এঁ্যা—!

নিরন্তর একটা অভিযোগ যেন শূন্যমণ্ডলে বাতাসের প্রবাহের মত বয়ে চলেছে ওর জীবনে। আপিসঘরের একদিকে তখনও পর্যন্ত একখানা পুরনো কালের তক্তাপোশ পাতা ছিল, আর টেবিলের সামনে ছিল খানকয়েক চেয়ার। সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—বসো।

তারা ইতস্ততঃ করে ভাবছিল কোথায় বসবে।

সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—চেয়ারে বসো।

—না, আমরা এই মেঝের উপর বসি। বলেছিল মা।

—না না। ওই তক্তাপোশে বসো তাহলে। হ্যাঁ বসো।

মেয়েটি বসেছিল। মা বসে নি। সে মেয়ের সেই রুগ্‌ণ ছেলেটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল। মেয়ে মাকে বলেছিল—বস্‌। উনি বলছেন তো বসতে। আমরা তো ছোটলোক নই।

মা এবার মেয়েকে সামনে করে তার পিছনে বসেছিল। আপিসঘরে একশো ওয়াটের বাল্‌ব জ্বলছিল। তার আলো পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল মেয়েটির উপর।

আজও সেই মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। পিছনে তার বর্ষাকালের কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার; সামনের রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো আজ জ্বলছে না। জ্বলে না আজকাল—হয় বাল্‌ব যায়, নয় তার যায়, নয় আলোর সুইচ অন করার দায়িত্ব যাদের তারা জ্বালে না।

চাঁপা ওরফে রত্নমালা। বারো বছর পর তাঁর সামনে তাঁরই বসবার ঘরের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আজ নিওন জ্বলছে। নিওনের স্বপ্নালু আলোর ছটায় ওই অন্ধকার পটভূমির সামনে ওকে আজ প্রেতিনী মনে হচ্ছে। বারো বছর পর আজ ওর বয়স চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ। পূর্ণ যৌবন ওর সারা অঙ্গে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মফুলের মত দেখতেও নয়—সে রূপ ওর নেই—তবে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে পদ্ম যেমন প্রস্ফুটিত অবস্থায় বেশ কিছু-দিন থাকে ওর লাবণ্য-যৌবনও তাই—যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু সারা অঙ্গে সেই যৌবনরূপের ছন্দের মধ্যে এমন বিন্যাস আছে যা পুরুষচিত্তকে প্রলুব্ধ করে; কিন্তু লোভকে যে সংযত করতে পারে তার কাছে মনে হয় অশ্লীল। নারী যখন সারা অঙ্গে নিমন্ত্রণের সজ্জা চাপায় তখন তাকে নির্লজ্জা হতে হয়। এ মেয়ে অন্ততঃ আজ আঠারো বৎসর বিধবার আবরণের উপর দেহব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন বহন করে চলেছে। সেই বিজ্ঞাপন-বহন-করা যৌবনবতী চাঁপাকে প্রেতিনী ছাড়া কি মনে হবে তাঁর!

ওঃ!

সেদিনের সেই ক'টা কথা যেন স্তব্ধ পৃথিবীর কোন এক নিশীথ রাত্রে এক কালো ইস্পাতের তৈরী নারীমূর্তির কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, অর্থাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর বলে মনে হয় নি। সে

কথা ক'টা সুধাংশুবাবু আজও ভুলতে পারেন নি।—"বসুন জাত যাবে না।"

বারো বছর আগে সেই সেদিন রাত্রে।

মনে পড়েছে মেয়েটিই এগিয়ে এসে তাঁর টেবিলের উপর আদালতের সমন আর্জির নকল এবং তার সঙ্গে দশটাকার একখানি নোট নামিয়ে দিয়েছিল।

দশটাকার নোটখানা আঙুল দিয়ে ঠেলে দিয়ে তিনি বলেছিলেন—ওটা রাখো।

মেয়েটি নম্রকণ্ঠে বলেছিল—আবারও দেব—

মাঝখানে বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন—না।

মেয়েটি বিপন্নের মতই নোটখানা হাতে করে নিয়ে টেবিল ধরে দাঁড়িয়েছিল।

সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—তক্তাপোশে গিয়ে বসো। হ্যাঁ, তারপর বলো তো বিবরণ! তোমার স্বামীর নাম ৺প্রণবকুমার চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ।

—তিনি টাকা ধার করেছিলেন—

হঠাৎ মেয়েটা লেজে পা-দেওয়া সাপের মত ঝাপটা মেরে পিছন ফিরে ছোবল দেবার ভঙ্গিতেই ওর বাচ্চা ছেলেটাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠ্যালা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল। এক মুহূর্তে কোথায় চলে গিয়েছিল তার বিনম্র মিষ্ট কণ্ঠস্বর, বিনীত কথার ভঙ্গি, রুক্ষতর আক্রোশভরা কণ্ঠস্বরে বলে উঠেছিল—দূর হ আপদ কোথাকার। সে কথাগুলো সত্যই অবিস্মরণীয়-রূপে নির্মম এবং নিষ্ঠুর। ছেলেটার অপরাধ—সে পিছনে দিদিমার কোল থেকে খুনখুন করতে করতে এগিয়ে এসে মায়ের পিঠ ধরে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো বা কাঁধের উপর ফেলা আঁচল ধরে আকর্ষণও করে থেকেছিল। মা সেটুকুও সহ্য করে নি—তাকে 'দূর হ আপদ' বলে সাপের ছোবলের মত ছোবল দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। ব্যাপারটার ওজন ঠিক কতখানি তা' বলা সহজ নয়। যা ঘটেছিল তা' না ঘটলে ঠিক এমনভাবে মনে দাগ কাটত না। বছর চারেক বয়সের রুগ্ন দুর্বল শিশু, মায়ের হাতের ঝাপটায় টলে পড়ে গেল এবং পড়ে গেল তক্তাপোশের উপর থেকে মেঝেতে। সঙ্গে সেই সেই-রাত্রের মত কঠিনতম প্রতিবাদ এবং তার সঙ্গে সম্ভবতঃ করুণতম অভিযোগ জানিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল সে।

দিদিমা প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে ছেলেটাকে কুড়িয়ে বুকে তুলে নিয়েছিল। সুধাংশুবাবু প্রায় আপনা-আপনি বলে উঠেছিলেন—আহ্-হা। কিন্তু এই আশ্চর্য মা বলে উঠেছিল—মর মর মর। মরে যা তুই মরে যা!

মুহূর্তে বোমার মত ফেটে পড়েছিলেন সুধাংশুবাবু। এই নির্লজ্জা মেয়েটার এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা তাঁর কাছে শুধু অসহ্যই মনে হয় নি—তার সমস্ত ক্রোধকে আকস্মিকভাবে একমুহূর্তে পুঞ্জীভূত করে একটা সংঘাতের উত্তাপে ফাটিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলে উঠেছিলেন—এ—ই নির্লজ্জ মেয়ে কোথাকার।

দিদিমা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠে চাপড়ে চাপড়ে আদর করে থামাতে চাচ্ছিল। ছেলেটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। এই চিৎকার-করা তিরস্কারে মেয়েটি চমকে উঠে বিবর্ণ পাংশুমুখে

তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল।

কিছুটা নিজেকে সংযত করে তিনি বলেছিলেন—এমনি করে তুমি ছেলেটাকে ফেলে দিলে?

ছেলেটা তখনও কাঁদছে তারস্বরে।

তিনি তাকে দোষ দেন নি। তার জীবনে বঞ্চনার আর শেষ নেই। এই মা বোধ হয় তাকে স্তন্যেও বঞ্চিত করে রেখেছে।

মেয়েটা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে তা স্বীকারও করলে।

সুধাংশুবাবুর কথা শুনে মেয়েটা এবার স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। তার স্থিরদৃষ্টির সম্মুখে সুধাংশুবাবুর একবিন্দু অস্বস্তি অনুভব করার কথা নয় এবং তার পক্ষেও এই অভিযোগের সম্মুখে এমনভাবে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাও সম্ভবপর বা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মেয়েটা বোধ করি অস্বাভাবিক। সে তাকিয়ে ছিল। যার জন্য সুধাংশুবাবু তাঁর অভিযোগকে আরও জোরালো করে তোলার প্রয়োজন অনুভব করে বলেছিলেন—সেদিন রাত্রেও আমি দেখেছি তুমি ওই শিশুটার প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কর—মর্মান্তিকভাবে অভিসম্পাত কর।

মেয়েটি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কঠিন অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—ও আমার পথের কাঁটা।

একটু থেমে বোধ করি ভেবে নিয়েই বললে—ও আপনি বুঝবেন না—ওই আমার বন্ধন। ও ছিঁড়লেই আমার মুক্তি। ওকে উপড়ে ফেলতে পারলেই আমার পথ পরিষ্কার।

এর আর উত্তর খুঁজে পান নি সুধাংশুবাবু। নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়িয়ে মাকে বলেছিল—নে উঠে আয়।

মা সকাতরে বেশ ভয়ের সঙ্গেই অনুরোধ করেছিল মেয়েকে—চাঁপা!

—না। উঠে আয়।

মা উত্তর দিতে পারে নি। মেয়ে বলেছিল—তবে তুই থাক আমি চললাম। বলে মায়ের বুক থেকে কান্নায় ভেঙে পড়া ছেলেটাকে কাঁধের উপর ফেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর দাঁড়ায় নি বা কোন একটা কথাও বলে নি।

মেয়েটির মা হাত জোড করে বলেছিল—কিছু মনে করবেন না বাবা। আমার মেয়ে সম্পর্কে আমার বলবার মুখও নেই কথাও নেই। দিনরাত জ্বলছে বাবা, আগুনের মত জ্বলছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর আক্রোশ। সব থেকে বেশি ওই ছেলেটার উপর। হতভাগা অদৃষ্ট—এক বছর বয়সে বাপ খেয়েছে। অবহেলার শেষ নেই। তবু—।

বাইরে থেকে ডাক এসেছিল—মা! দাঁড়িয়ে থাকব কত?

সুধাংশুবাবুই বলেছিলেন—আচ্ছা তুমি যাও। কোন দেওয়ানী উকীলের কাছে যেয়ো। সামান্য কেস বলেই মনে হচ্ছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

সকাতর দৃষ্টিতে মার্জনা ভিক্ষা করে নিয়ে মা চলে গিয়েছিল।

পরের দিন সকালবেলা আবার বিধবাটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে চলেছিল ওই চাটুজ্জেদের বাড়িতে। থমকে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেও একটুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তারপর চলে গিয়েছিল চাটুজ্জেদের বাড়ি। কথাবার্তা বলতে বোধ হয় ভরসা করে নি। সুধাংশুবাবুরও ইচ্ছে হয় নি।

দুই

এতবড় ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো মেয়েটিকে তাঁর মনে থাকত না। একটা আবরণ পরে ওকে আড়ালে ফেলে দিত। নিত্য যে সব লোক তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করে—অথচ তিনি তাদের চিনেও চেনেন না -তাদের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে যেত। কিন্তু ওর ওই দু'দিনের আচরণের মধ্যে এমন একটি ক্ষুব্ধ মনের উত্তাপ ছিল যার ছেঁকা লাগার স্মৃতিটুকু তিনি ভুলতে পারেন নি। তার উপর এই মা অথবা ওই মেয়ে দুজনের কেউ-না-কেউ নিত্য ভোরবেলা তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে স্নান সেরে শুচিশুদ্ধ হয়ে চাটুজ্জেদের বাড়ি কাজ করতে গিয়েছে। আজ আর মা নেই কিন্তু মেয়ে আজও যায়। পরনে শৌখিন সায়া ব্লাউজ পরিচ্ছন্ন ফিতেপাড় শাড়ি, ভিজে এলো চুলে বিগত রাত্রির একটি বিলাসছন্দের চিহ্ন তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে যায় বা মনে রাখিয়ে দেয়—ভুলতে দেয় না। আজ বারো বছর যাচ্ছে। ভোরবেলা যায়, ফেরে যখন তখন তিনি কোর্টে চলে যান, ছুটির দিন দেখেন এগারটায় ফেরে। এই বারো বছরে—হ্যাঁ বারো বছরই হল ; দাঙ্গার ঘটনাটা ১৯৪৮ সালে আর আজ হল ১৯৬০ সাল। এই বারো বছরে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। এবং ক্রমে ক্রমে মেয়েটার যে সব পরিচয় পেয়েছেন তাতে ওর এই প্রেতিনীত্ব সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হয়েই একটি কঠিন বিরূপতা পোষণ করে আসছেন। ওর সেদিন রাত্রে করা উপকারটুকু তাঁর গলায় কাঁটার মত বিঁধে আছে। এবং এরপর যে সব আচরণ দেখেছেন তাতে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। সেই ক্ষোভে এবং বিস্ময় বশতঃই ওকে জানতে চেয়েছিলেন। বিচিত্রভাবে জেনেও ছিলেন।

এক শিবেন ভট্টাচার্যের মেয়ে। শিবেন ভট্টাচার্যকে লোকে ভুলে গেছে। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা-করা, দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্ রয়েছে ; শুধু রযেছেই নয়, বিরাট একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে।

অল্পবয়সে অনেক টাকা হাতে পেয়েছিল শিবেন। পেয়ে একেবারেই মডান হয়ে উঠল। বাপ ছিলেন মোক্তার। কৃতী মোক্তার। তাঁর বাবা ছিলেন খাঁটি ভট্টাচার্য। গ্রাম থেকে হাওড়া শহরে এসে ওই পৌরোহিত্য করেই ভটচাজবাড়ির ভিত গেড়েছিলেন। দেশে জমিজেরাতও কিনেছিলেন।

শিবেন ভটচাজের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনের কাছেই জেনেছিলেন। নিত্যবাবু। ওই প্রথম ঘটনার বছর দেড় কি এক বছর আট নমাস পর নিত্যবাবু এসে তাঁর প্রতিবেশী হয়েছিলেন। এবং সুধাংশুবাবু কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ না করলেও নিত্যবাবুই নিজে থেকে 'হায় হায়' করে মেয়েটি সম্পর্কে কোনদিন আক্ষেপ, কোনদিন বা কটুভাষায় বিক্ষোভ প্রকাশ করে, মেয়েটির বাপ ওই শিবেন ভট্টাচার্যের কথা বলে যেতেন। বলতেন—সইল না। বুয়েচেন না, সইল না। ভট্টচার্য বামুনের বংশ। একেবারে সেই ইতুসংক্রান্তির বামুনের ঘরের মত। বুয়েচেন না? নিত্যবাবুর মুদ্রাদোষ ছিল ওই 'বুয়েচেন না?' বুলিটি।

ইতুসংক্রান্তির ব্রতকথার দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পই বোধ হয় পুরনো বাংলাদেশের শতকরা

নিরানব্বই জন ব্রাহ্মণের গল্প। এক ছিল ব্রাহ্মণ আর তার ব্রাহ্মণী—আর দুটি ছেলে কি গণ্ডা দুয়েক ছেলেমেয়ে।

এক ছিল রাজা আর তার সুয়ো দুয়ো দুই রানী—এ গল্প বোধ হয় এদেশের বামুনদের নয়। দু'দশ ঘর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল—তারা জমিদার-টমিদার ছিল। বামুনের কপাল খুলল ইংরেজ আমলে।

নিত্যবাবুর ব্যাখ্যা বড় ভাল ছিল।

বলতেন—লক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে—এক ছিল পরমধার্মিক ব্রাহ্মণ, মহাতেজস্বী, এও বাংলাদেশের সচরাচর ব্রাহ্মণদের গল্প নয়। বুনো রামনাথ অবিশ্যি একটা-আধটাই হয়। বিদ্যেসাগর মশায়ের ঠাকুরদাদার মত গায়ের জোরওয়ালা রাগী মানুষও বেশী না। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণেরা সেকালে ছিল নিরীহ দরিদ্র। যজমান চরিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করত কোনরকমে। বৈশাখ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত মেয়েদের বারো মাসে তের ষষ্ঠী—সকল জনের জন্য স্নানযাত্রা রথযাত্রা থেকে দোলযাত্রা মেড়া-পোড়া ইঁদ-পুজো মনসা-পুজো দুর্গাপুজো কালীপুজো—জগদ্ধাত্রী থেকে নবান্নে অন্নপূর্ণা চৈত্রে বাসন্তীপুজো—তার সঙ্গে ঘরে ঘরে জন্ম-মৃত্যু নিয়ে দশকর্মের কাণ্ডকারখানা নিয়ে মোটমাট ভটচাজ পণ্ডিতদের যে আড়া এই চাষের দেশে পাতা ছিল তাতে রোজকারের মাছ যা ধরা পড়ত তা' কম নয়।

নিত্যবাবুর কথা মনে পড়ছে—বলেছিলেন—আড়া বোঝেন তো? আড়া হল বাঁশের শলার ঘের, মাঠের জলনিকাশী নালা জুড়ে পেতে মাছ ধরবার একরকম ব্যবস্থা।

নিত্যবাবু ব্যবসায়ে ছিলেন পাটের দালাল। শখে ছিলেন থিয়েটার এবং গান পাগল। তার সঙ্গে একটা নেশা জন্মেছিল—নাটক লেখার। নাটক লিখেও নাটক যখন অভিনীত হল না তখন তিনি প্রবন্ধ লেখা ধরেছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম কালে এদেশে যতগুলো বিদ্রোহ হয়েছিল তাই নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। ওই নাটকের সূত্র ধরেই নিত্যবাবুর সঙ্গে শিবেন ভটচাজের আলাপ হয়েছিল।

—বলি কি বলুন? বুঝেছেন না, কপাল ছাড়া কি বলব? শিবেনের মেয়ে! এ্যা! শিবেন বাপের টাকা পেয়ে 'দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্' খুললে। দধীচি নাম শুনেই বুঝতে পারছেন যে তার সঙ্গে বজ্রের সম্বন্ধ আছে। মানে বজ্র তৈরী হবে। মানে অস্ত্র। ১৯২৪-২৫ সাল। তখন স্বদেশীর উত্তাপে সারা দেশ তেতে উঠেছে। বোমার খোল তৈরী হবে। ছোরা তৈরী হবে। ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হবে। আর একটা টাটা তৈরী হবে। আর কল্পনা একটা থিয়েটার মানে স্টেজ প্রতিষ্ঠা করবে। তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ী থিয়েটারে নেমেছেন। এখন এমন একটা থিয়েটার গড়বে যেখানে শুধুই যাকে বলে আগুনের মত নাটক প্লে হবে। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ সেই জন্যেই। আমি মশাই বারণ করেছি কিন্তু শোনে নি। বলেছি—উন্মাদের মত খরচ করো না। সে বলত—নেভার মাইণ্ড। আমার ঠাকুরদা ছিল পূজুরী বামুন। বাবা হয়েছিলেন মোক্তার।

মেয়েটি সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঠোঁট দুটি যেন কাঁপছে।

চোখের দুই কোণে দু'ফোঁটা জল নিটোল হয়ে জমে উঠেছে এই মুহূর্তে।

হাত দুখানি জোড় করেছে।

নিত্যবাবুর কথা কানে বাজছে।—ভটচাজ বামুনের বংশ। সইল না।

তিনি নিত্যবাবু নন—ও কথাটা মানেন না। কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস বটে। তাকে অস্বীকারের পথ নেই।

প্রপিতামহ (মেয়েটির) পেশায় ছিলেন যজমানসেবী ব্রাহ্মণ। হাওড়া আমতা লাইনে গ্রামাঞ্চলে বাড়ি ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে হাওড়ায় এসেছিলেন বংশের শালগ্রাম শিলাটিকে নিয়ে। তাঁর দৌলতে সত্যনারায়ণ থেকে দশকর্ম পর্যন্ত যে ডেকেছে তার বাড়ি গিয়ে ক্রিয়াকর্ম করে হাওড়ায় একখণ্ড জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন। একতলা পাকা দালান একখানি—খাপরার চালের রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর তার সঙ্গে একখানা গোয়ালঘর পর্যন্ত করেছিলেন তিনি। তার সঙ্গে দেশেও ঘর করেছিলেন—জমি কিনেছিলেন। ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাস করিয়েছিলেন। মধুস্থদন ভট্টাচার্যের ছেলে হরিহর ভট্টাচার্য এণ্ট্রান্স পাস করে হয়েছিলেন মোক্তার।

কৃতী মোক্তার হয়েছিলেন। ভাল ইংরিজী লিখতেন, প্রয়োজন হলে ইংরিজীতে সওয়াল জবাব করতে পারতেন। ফৌজদারী আইন খুব ভাল বুঝতেন। তার সঙ্গে ছিলেন হিসেবী লোক। এক টাকা উপার্জন করে আগে আট আনা একটা চাবিহারানো কাঠের বাক্সের ডালার ফুটো দিয়ে ফেলে জমিয়ে রাখতেন। হিসেব করে তিন ছেলের জন্যে তিনখানা বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন হাওড়া শহরে। তাও এক জায়গায় নয়, একখানা শালকেতে একখানা হাওড়ায় এবং তৃতীয়খানা শিবপুরে।

জায়গাজমি বাড়ি সব ঠিক ঠিক হিসেব মিলিয়ে করেছিলেন হরি মোক্তার। বোধ করি কল্পনাও করেছিলেন, ছেলেরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মোক্তারী বা ওকালতী অর্থাৎ আইন ব্যবসায় করবে। যার জন্যে প্রতিটি বাড়িকে দু'ভাগে ভাগ করে তৈরী করিয়েছিলেন, যার সামনের ভাগটা খানিকটা বাগান নিয়ে বৈঠকখানা বা আপিসবাড়ি হতে পারত অনায়াসে এবং তার পিছনের অংশটায় ছিল বসতবাড়ি। একতলা করে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন বলতেন —ছেলেরা দোতলা তুলবে। এসবের জন্য হরিহর ভটচাজ হরিত্ব এবং ভটচাজত্ব থেকে প্রমোশন পেয়ে হয়েছিল শুধু হরি মোক্তার। লোকে হরিহর ভটচাজ আর বলত না, বলত হরি মোক্তার। বড়ছেলেকে ল' পরীক্ষার ইণ্টারমিডিয়েট পাস করিয়েও গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর আর আয়ু ছিল না। সামান্য তুচ্ছ হেতু, জুতোর কাঁটা উঠে পায়ে ফুটে ছোট ক্ষতের সৃষ্টি করে, দিন তিন-চারের মধ্যে ধনুষ্টঙ্কারে .মারা গিয়েছিলেন। অন্য দুটি ছেলের একটি তখন বার দুই বি-এ ফেল করেছে। ছোটটি আই-এ পড়ছে।

এই ছোট ছেলের নাম শিবেন।

এবং ছোট ছেলেরই মেয়ে রত্নমালা—ডাকনাম চাঁপা।

১৯২৪-২৫ সালে শিবেন পড়ত কলকাতার সিটি কলেজে। বাপ মারা যেতেই পড়া ছেড়ে বিষয়-সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিয়ে নিজের উন্নতি এবং দেশের উন্নতির জন্য ছোট একটা লোহার কারখানা খুলেছিল। দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্। বজ্রের খোল তৈরী হবে!

কল্পনা ছিল, একদা সে টাটানগরের মত এক শিবনগরের পত্তন করবে। ১৯২৪-২৫ সাল। গান্ধীজী এসেছেন—চিত্তরঞ্জন প্র্যাকটিস ছেড়ে সর্বত্যাগী দেশবন্ধু হয়েছেন। আজকের নেতাজী—সেদিনের বাংলাদেশের তরুণ নায়ক সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস চাকরি পেয়েও সে-চাকরি প্রত্যাখ্যান করে দেশবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়েছেন। কলেজের ছেলেরা তখন একদফা কলেজ বয়কটের পালা শেষ করে আবার নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে গিয়ে ঢুকছে। এই সময়ে পিতৃহীন শিবেন ভটচাজ বাপের শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন করে কলেজ ছেড়ে দিল এবং পত্তন করলে এক লোহার কারখানার। নামটা হয়েছিল জবর। দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্। কল্পনা ছিল বজ্র তৈরী করবে। কোথা দিয়ে কোন্ যোগাযোগে কার সঙ্গে শিবেনের নাকি বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তাদের জন্যে বোমার খোল তৈরী করবার গোপন অভিপ্রায় থেকেই এই নামটা মাথায় এসেছিল। কিন্তু সে থাক, সে কোনদিন হয় নি।

যে-চরিত্র ও যে-জীবন থেকে এমন কল্পনার উদ্ভব হয়, যে-ভাবনা যে-সংকল্প থাকলে মানুষ এমন স্বপ্ন দেখে এবং একে সম্ভবপর করে তোলে তা শিবেনের ছিল না।

শিবেন ছিল অতি সাধারণ আবেগসর্বস্ব সেকেলে বাঙ্গালীর ছেলে। দেশোদ্ধারের পাঠ বা ভাবনা সেকালে শিক্ষিতদের মধ্যে সকলজনই কিছু-না-কিছু গ্রহণ করত। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ বন্দে মাতরম্ থেকে তখন শরৎচন্দ্রের আমল পর্যন্ত সাহিত্যে, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদবাবুর নাটকে, দৈনিক সংবাদপত্রে সর্বত্রই ছিল এর ছোঁয়াচ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্রোত ছিল মূল উৎস সে বোধ হয় না বললেও চলে, কিন্তু শিবেনের স্বদেশ ও স্বাধীনতাপ্রীতির মূল উৎস ছিল সেকালের থিয়েটার। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এমন কোন নাটক সেকালে অভিনীত হয় নি যা শিবেন দেখে নি। এবং সে-দেখা একবার হয়েই ক্ষান্ত হত না। দুবার তিনবার, ক্ষেত্রবিশেষে একখানা নাটকের অভিনয় সে আট-দশবারও দেখেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দুখানা নাটক কলকাতায় খুব চলেছিল। একখানা মোগল পাঠান, একখানা দেবলাদেবী। ওই বই দুখানা দশবার করে দেখেছিল। তখন বাপের আমল—পড়ত ইস্কুলে, কোনরকমে বারো আনা হাতে এলেই চলে যেত থিয়েটারে। বসত আট আনার সীটে, খেতো আনা দুই তিনের, আর গঙ্গা পারাপারের জুটো পয়সা—ব্যাস। যাতায়াতের জন্য সে ট্রামে চড়ত না; বিডন স্ট্রীট থেকে গঙ্গার কোন ঘাটে এসে খেয়ানৌকায় এক পয়সা দিয়ে চলে যেত ওপারে।

শিশির ভাদুড়ী আসতেই মঞ্চে হল নবজীবন সঞ্চার। ওদিকে পিতৃবিয়োগ ঘটে শিবেন হল কাঁচা পয়সার মালিক। আই-এ পড়ে, বয়স আঠারো পার হয়েছে, সুতরাং নাবালক বলে কোন বাধানিষেধ আরোপ কেউ করে নি, করতে পারে নি। এবং তিন ভাই মিলেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নীতিটি সসম্ভ্রমে মেনেও নিয়েছিল তারা। বাপও ব্যবস্থাদি নানারকম করে গিয়েছিলেন—

বাড়ি নগদ টাকা উইলে লিখিতভাবে বণ্টন করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

বাপের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি চুকে যাওয়ার পাঁচ-ছ দিন পর পড়েছিল প্রথম শনিবার, সেদিন সে জনতিনেক বন্ধু নিয়ে দু'টাকার সীটের টিকিট কেটে শিশিরবাবুর আলমগীর নাটক দেখে এসেছিল।

আলমগীর নাটকখানি বোধ হয় দশবারেরও বেশীবার দেখা। আলমগীরবেশী শিশিরকুমারের প্রথম প্রবেশ, সেই ঈষৎ কুঁজো হয়ে বাঁ হাতখানা পিঠের উপর রেখে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে "মন্দ কি! দাম্ভিকা কাশ্মীরী বাঈয়ের দম্ভটা চুর্ণ করে দেওয়া যাক না" থেকে শেষ বক্তৃতা—"হে কবি, বছর যাক যুগ যাক, বহু শতাব্দী চলে যাক,— শতাব্দীর পারে একদিন তোমার তুলিকামুখে আলমগীরের এই মিলন-অভিলাষ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হোক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে এই চিরজাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর (ভীমসিংহের) সম্মুখে এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।" পর্যন্ত বহু স্থান সে সুর স্বর নকল করে মুখস্থ বলে যেতো। সীতা নাটক তার আগাগোড়া কণ্ঠস্থ ছিল। যখন তখন সে বলে উঠত—কার কার কার করে কণ্ঠস্বরে !—

ডি এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্তে'র—কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকস !—এই প্রথম দৃশ্যটা গোটাই সে একলাই বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন স্বরে অভিনয় করতে পারত।

কণ্ঠস্বর কর্কশই ছিল তবু স্বদেশী গান সে খুব ফিলিংস্ দিয়ে গাইত। কণ্ঠস্বর কর্কশ হলেও সুরে তার দখল ছিল। সুর ঠিক রেখেই গাইত। তার দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্-এর উদ্বোধনের দিনে সে একটা অনুষ্ঠান করেছিল—হাওড়া শহরেরই বিশিষ্ট নাগরিক, বড একটি কারখানার মালিক এবং আরও কয়েকটি ব্যবসার অংশীদার রায়বাহাদুরকে এনে অনুষ্ঠানটির পৌরোহিত্য করিয়েছিল—সে অনুষ্ঠানে সে কটি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নিজে উদ্বোধন সংগীত গেয়েছিল।

বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ—

... ...

আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য
মানুষ আমরা, নহি তো মেষ !

সেদিন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়েছিল রীতিমত হোমযজ্ঞ যথাবিধি শেষ করে তবে। সে হোমযজ্ঞ করেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত পরমনিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শেখর স্মৃতিরত্ন মশায়। রায়বাহাদুর মস্ত একটি বক্তৃতা লিখে এনেছিলেন। তাতে তিনি কলকারখানার কি আশ্চর্য অভ্যুদয় ইউরোপ আমেরিকায় এবং তার তুলনায় কি দৈন্য আমাদের তার বিবরণ ছিল।

নিত্যবাবু বলেছিলেন রায়বাহাদুর তাঁর ভাষণে নাকি প্রত্যাশা করেছিলেন যে হাওড়ার এই তরুণ যুবকটি এককালে এই দধীচি আয়রন ওয়ার্কস থেকে বজ্রের মত মজবুত এবং শক্তিশালী যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করবে—সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ বৃদ্ধি করে সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে।

সবশেষে বলেছিলেন—"শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।"

রায়বাহাদুর ছিলেন ওই চাটুজ্জেবাড়িরই বড়কর্তা।

সন্ধ্যায় ছিল খাওয়াদাওয়া। বন্ধুদের খাইয়েছিল—তার সঙ্গে আত্মীয়স্বজনেরাও ছিল। রাত্রি একটু গাঢ় মানে নটা নাগাদ একটু গানবাজনার আসর বসিয়েছিল শিবেন। গান সেকালের মডার্ন গান। তার মধ্যে স্বদেশী সংগীত ছিল না। রবীন্দ্রসংগীতও তখন সাধারণ জীবনে আসন পাতে নি। আজকালকার মত সাধারণ ঘরের মেয়েরা তখন গান শেখে নি; শিখলেও আসরে গাইবার কথা কল্পনা করতে পারত না।

এসব বিবরণ তাঁকে বলেছিলেন তাঁর বাড়ির সামনের প্রতিবেশী বর্তমানে মৃত নিত্যরঞ্জনবাবু। প্রতিবেশী তিনি ছিলেন না—নতুন করে হয়েছিলেন দশ বছর আগে। নিত্যরঞ্জনবাবু সেদিনের দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্ ওপনিং আসরে উপস্থিত জনেদের মধ্যে একজন। এসব কথাগুলি সেই নিত্যবাবুই বলেছিলেন সুধাংশুবাবুকে। বলেছিলেন—আজ থেকে অর্থাৎ ১৯৬০ সাল থেকে বারো বছর আগে ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে। মনে পড়তে বলেছিলেন—আরে তখন আপনার এই একাল তো না। তখন এখানকার এই সুনীতি মিত্তির সুচরিতা সরকার-টরকার কোথায় মশায়? তখন আপনার ইন্দুবালা আঙুরবালা দাসীদের আমল। কাজী সাহেব তখন খুব পপুলার। একেরে মাতিয়ে ভাসিয়ে দেয়। "কে বিদেশী মন উদাসী" গানখানা কি গাওযাই না গেয়েছিল মশাই সেদিন। বুয়েচেন না? কি বলব আপনাকে—মানে হাতের তালি আর ঘাড় নাড়ায় যাকে বলে মাতন তাই লেগে গেসল। অবশ্য 'রঙ' ছিল। মানে কিছু ড্রিংকের ব্যবস্থা ছিল। ভাল ড্রিংক। ছোট ঘরের বস্তু না। অভিজাত দ্রব্য। আর যে মেয়েটা সেদিন গাইতে এসেছিল তার গলাও ছিল আর দেখতেশুনতেও মেয়েটি ভাল ছিল।

একটু থেমে একটু একটু হেসে নিয়ে বলেছিলেন—শিবেনের চোখ ছিল। কানও ছিল। নিজে বাজাতে পারত ভাল। সেদিন আসর পাতলা হয়ে এলে বাঁয়া তবলা নিজেই টেনে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করেছিল। তখন লীলা, মানে সেই মেয়েটি আর কি, সে গান ধরেছিল বেঁকিয়ে। বেঁকিয়ে বোঝেন তো? বাজনদারের সঙ্গে তালের পাল্লায় আড়ি দিয়ে। অর্থাৎ ঠকাবার মতলব আর কি! রসের পাল্লা। মেয়েটার সঙ্গে শিবেনের তখন পরিচয়াদি হয়েছে। দু'চার রাত্রি ওর বাড়িও গিয়েছে এসেছে। পরিচয় ছিল। আসরে এসে শিবেনের কারখানার পত্তনটত্তন দেখে ওর প্রতি তার বেশ শ্রদ্ধাও হয়েছে। সুতরাং ভোজ-বাজির খেলায়, যাকে বলে সেই একদিনেই বীজ ফেটে অঙ্কুর থেকে ডালপালা-মেলা গাছ গজানোর মতো অনুরাগের ম্যাজিক বৃক্ষ তা বেশ ছত্রছায়া মেলে বড় হয়ে উঠেছিল। কল্পনা করেছিলেন শিবেনের কল্পনার থিয়েটারের বীজটিও একদা ঠিক এইভাবেই রাতারাতি রূপ নিয়ে একেবারে ফুলফোটা গাছ হয়ে গজিয়ে থাকবে। সকালে উঠে দরজা খুলেই দেখবেন বাড়ির সামনের দেওয়ালে তার নাটকের পোস্টার পড়েছে।

থিয়েটারটার নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

বসে বসে বিড়ি টানতে টানতে নিত্যবাবু বলেছিলেন—শিবেনের এই মেয়ে হল। এর নাম হল রত্নমালা; থিয়েটারের নামও রাখা হবে ঠিক হল রত্নমালা নাট্যালয়। নিত্যবাবু বলেছিলেন—ওর আদর কত ছিল! বিয়েতে টাকা খরচ করেছিল কত! দেখে দেখে পিতৃমাতৃহীন বুদ্ধিমান ব্রাইট ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিল। প্রণব চক্রবর্তী নাম ছিল। আমি সন্ধান দিয়েছিলাম। বিয়েতে আমি খেটেছি, পেটের উপর লুচির ধামা নিয়ে পরিবেশন করেছি। কোন আবদারের কথা বাবাকে বলতে না পারলে আমাকে ধরত। আজ সেই মেয়ে—। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন নিত্যবাবু। একটু চুপ করে থেকে খানিকটা উদাস হয়ে উঠে বলেছিলেন—মশায় আমাকে চিনতে পারলে না। ইচ্ছে করে, বুয়েচেন না, ইচ্ছে করে।

সুধাংশুবাবু অবিশ্বাস করেন নি নিত্যবাবুর কথা।

এ মেয়ে তা পারে।

তাঁকেও চিনতে পারত না; প্রায়ই তো যেত এই পথে; চাটুজ্জেবাড়ির কাজে ওর মা না গেলেও ও যেত। ইদানীং অর্থাৎ সে-সময় সেই ১৯৫০-৫১ সালে তার সেই রুগ্ন খ্যানখেনে ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে অথবা হাত পা ছুঁড়ে মাকে গালিগালাজ দিতে দিতে পিছনে পিছনে যেত। তিনি তাকিয়ে দেখতেন কিন্তু মেয়েটি কোনদিন তাকাতো না। কত দিন বর্ষার সময় সকালবেলা অকস্মাৎ বৃষ্টি নেমেছে, এ পথটার উপর এক তাঁর বাড়িতে গাড়িবারান্দা আছে, সেখানে অনেক লোক আশ্রয় নিতো কিন্তু ও কোনদিন আশ্রয় নেয় নি।

বিচিত্রচরিত্র মানুষ নিত্যরঞ্জনবাবু। পাটের দালালি করতেন। একটু প্রগল্‌ভ মানুষ ছিলেন। কিন্তু খারাপ মানুষ ছিলেন না। তার উপর খানিকটা সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত লোক ছিলেন। হৃদয়ের গড়নটাও ছিল কোন গভীর উপসাগরের মত। ভারী দুঃখের সঙ্গেই সেদিন বলেছিলেন—শিবেন ভটচাজের মহাসমাদরের মেয়ে তুই—তুই আজ চাটুজ্জেবাড়ি খেটে খাস, এতে কি কেউ খুশী হতে পারে? না এর জন্যে আমরা কেউ দায়ী? তোকে দেখে আমি ছুটে গেলাম। তার উপর তোর ছেলে—। আমাকে বললে কি জানেন? বললে—আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না। মাফ করবেন আমাকে। আমার ছেলেটার অপরাধ ক্ষমা করবেন। ও মরেও না—আমিও খালাস পাই নে। আমি মশায় হতবাক হয়ে গেলাম।

সেদিন নিত্যরঞ্জনবাবু দীর্ঘকাল পর বন্ধুকন্যাকে দেখে 'আরে আরে' বলে নিজে থেকে ছুটে গিয়েছিলেন ওর সঙ্গে কথা বলতে। তাঁর অর্থাৎ সুধাংশুবাবুর সঙ্গে তাঁর মাত্র দশ-পনের দিনের পরিচয়, তাতেও তাঁর সামনে এমন একটি দুর্নামযুক্ত মেয়েকে চেনেন একথা প্রকাশ করতে তাঁর সংকোচ হয় নি।

রাস্তার ওপারে তাঁর বাড়ির সামনে ওই যে ওই বাড়িখানা বিক্রি হয়েছিল এবং নিত্যবাবু

সেখানা কিনেছিলেন। কেনার সময় দিন দুই আলাপ করে গিয়েছিলেন। তারপর বাড়িটা সংস্কার করাতে শুরু করে নিত্য সকালে আটটা নটার সময় এসে হাজির হতেন। রাজমজুর লাগত, তাদের তদারক করতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে 'নেবার মশায়' বলে নমস্কার করে কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। রৌদ্রের উত্তাপ বর্ষার স্বল্পতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতেন। সুধাংশুবাবুর বেশ লাগত, উপভোগ করতেন তিনি। সেদিন এসেছিলেন বেশ ভোরবেলা। পাঁচটা বেজেছে। রাস্তায় লোকজন কম। খবরের কাগজওয়ালাদের সাইকেলের ঘণ্টা বাজছে, ছুটছে। ঝিয়েরা বাড়ি বাড়ি কাজ করতে যাচ্ছে। জমাদারদের নর্দমা ঠেলা হয়ে গেছে। নিত্যবাবু এসে এমনি সময় সেদিন হাজির হয়েছিলেন।

সুধাংশুবাবুই সেদিন নিত্যবাবুকে এত সকালে দেখে বলেছিলেন—আজ এত সকালে নেবার মশায়?

—ইয়েস স্যার, এত সকালেই বটে, বুয়েচেন না। কাল রাত্তিরে একজনের বস্তা চারেক সিমেণ্ট দিয়ে যাবার কথা ছিল। বিশ্বাসী আদমী, বুয়েচেন না। বলেছিল—ভাববেন না—মাল ঠিক পৌঁছে যাবে। বালির গাদার মধ্যে পাবেন। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।

একমুখ হেসে ফেলেছিলেন সুধাংশুবাবু।

মনে পড়েছিল খ্যাঁকশিয়ালীর ইংরিজী হল ফক্স। এবং বিশেষণ হল স্লাই। মানে চতুর। "A sly fox met a hen." হেসে মুখে বলেছিলেন—তা মিলল?

নিত্যবাবু বলেই চলেছিলেন—Yes yes yes. একেবারে অক্ষরে অক্ষরে কথা রেখেছে। জানেন, এ লোকগুলোকে যে যা বলবে বলুক—চোর ডাকাত গুণ্ডা অ্যাণ্টিসোসাল কথা উঠেছে আজকাল—তা যাই বলুক এরা যা কথা দেয় তার খেলাপ করে না। নে—ভা—র। ভদ্রলোক—দে—র চেয়ে অ—নে—ক—। হঠাৎ থেমে গেলেন নিত্যবাবু। বলে উঠলেন—আ—রে! বলে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। চলে গেলেন রাস্তা পার হয়ে ওপারে। সুধাংশু বাবু দেখলেন সেই মেয়ে সেই চাঁপা যাচ্ছে। সেই সদ্য স্নান করে ভিজে চুল পিঠে ফেলে—সুপরিচ্ছন্ন না হোক মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একখানি কাপড় পরে মুখ নিচু করে তির্যক দৃষ্টিতে আশে-পাশে দৃষ্টি রেখে সে চলেছে ধীর পদক্ষেপে।

নিত্যবাবু এই মেয়েটিকে দেখেই সবিস্ময়ে আরে শব্দটি উচ্চারণ করে বেরিয়ে গেলেন এবং হনহন করে গিয়ে ওই মেয়েটির কাছে দাঁড়ালেন। কয়েকটা কথা বললেন। চাটুজ্জেবাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে কি দেখালেন। তারপর একবার কপালে হাত দিলেন। মেয়েটি একটু পিছিয়ে গিয়ে যেন নিতান্ত অপরিচিতের মত ভ্রূকুঞ্চনের মধ্যে যে প্রশ্ন তুললে তার অর্থ হল—আপনি কে?

হঠাৎ এই মুহূর্তটিতেই ঘটল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। একটা ইটের টুকরো এবং কিছু বালি কেউ ছুঁড়লে এবং সেটা এসে খপ্ করে নিত্যবাবুর পিঠে পড়ল, পড়ল কিছুটা আশেপাশে। অতর্কিত এই আঘাতে—যদিও আঘাত তাতে কিছু ছিল না তবুও নিত্যবাবু "আরে বাপরে" বলে চীৎকার করে উঠলেন এবং পরমুহূর্তটিতেই নিত্যবাবু আঃ-উঃ ভুলে গিয়ে বালি-কাদার দাগ লাগা জামার

পিছনদিকটা সামনে টেনে এনে চোখের সামনে ধরে হতভম্বের মত দেখতে লাগলেন। মেয়েটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই চোখে আগুন জ্বলে উঠল। নিত্যবাবু তখন পিছনের দিকে তাকিয়ে সন্ধান করছিলেন এই কর্মের দুষ্কৃতিকারীটি কে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুবাবুও তাকালেন সেদিকে। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দা। শহর হলেও ঠাঁইটা বাজার নয় হাট নয়; এখানে একটা অতিক্ষীণ সমাজশৃঙ্খলা আছে। এবং সে শৃঙ্খলা এই স্থানীয় বাসিন্দাদেরই বাঁচিয়ে রাখতে হয়। যুগটা বিচিত্র যুগ শুরু হয়েছে। সুধাংশুবাবু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নূতন যুগের মানুষ। নতুনের এই অসহনীয় অশোভন অভ্যুদয়ের অবশ্যম্ভাবিত্বের কথা জানেন। এই নতুন জীবনস্রোতকে ভগীরথের মত শাঁখ বাজিয়ে সমুদ্রসঙ্গমে আনতে পারলে সৃষ্টি হবে মুক্তি-তীর্থের—আর সে স্রোত বিপথগামিনী হলে হবে কীর্তিনাশা—একথা তিনি জানেন। তবুও মস্তানীর জন্য পীড়া অনুভব না করে পারেন না।

দুষ্কৃতিকারীটিকে আবিষ্কার করতে দেরি হল না বা কষ্ট করতে হল না। যে এই দুষ্কৃতি করেছে সে পালিয়ে গেল না অথবা নিত্যবাবুর পিঠে কাদাবালির মুঠো লেগেছে বলে কোন সংকোচও অনুভব করলে না। সে যেন আরও কোন প্রবলতর আবেগে ভাল-মন্দ সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞানশূন্যের মত ওই ফুটপাথ ধরে এগিয়ে আসছিল।

একটা ছেলে। চিনতে দেরি হয় নি; এ সেই ছেলেটা। ওই মেয়েটার সেই ছেলেটা। সেই অহরহ খুনখুনে কান্না-কাঁদা ক্যাঁকলাসের মত রোগা সিঁটকে পাকানো চেহারার কটা চুল কটা চোখ ঘষা উজ্জ্বল তামার পয়সার মত গায়ের রঙ সেই ছেলেটা। ছেলেটা আগের থেকে একটু বড় হয়েছে—একটু শক্ত-সমর্থও হয়েছে। তার সেই চোখে হাত দিয়ে অসহায় এঁ্যা-এঁ্যা কান্নারও চেহারা পালটেছে। কান্নার সুরটা আর অসহায় নয়—তাঁর সঙ্গে ক্ষোভের ঝাল মিশেছে।

ছেলেটা দ্বিতীয়বার আক্রমণের উদ্যোগ করছিল। নিত্যবাবুকে নয়—নিত্যবাবুর সামনে তার মা তখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার চোখের দৃষ্টিতে তিক্ততার শেষ নেই, জ্বালায় সে চোখ নিষ্পলক হয়ে উঠেছে—যেন ছেলেটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাইছে। ছেলেটা তখন দ্বিতীয়বারের জন্য কুড়িয়ে নিলে একটা ইটের টুকরো। নিজের ঠোঁটের উপর দাঁতের খামচা কেটে মায়ের দিকে তাকালে।

সুধাংশুবাবু এবং নিত্যবাবু একসঙ্গে চীৎকার করে উঠেছিলেন—ফ্যাল্ ফ্যাল্—এই ছেলে ফ্যাল্—

সেই মুহূর্তেই তার মা তার সকল লজ্জা সংকোচকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে বলে উঠেছিল—মর মর—তুই মরে যা। তুই মরে যা। তুই মরে যা।

এবার ছেলেটা পালিয়েছিল। মায়ের ভয়ে নয়। সম্ভবতঃ সুধাংশুবাবুর ভয়ে। সুধাংশুবাবুর একটা পরিচয় ছিল ও অঞ্চলে।

সেদিন তাঁর কোর্ট ছিল না। হয়তো রবিবার ছিল। বা কোর্ট ছুটি ছিল।

নিত্যবাবু তাঁরই বাড়িতে ভিতরে গিয়ে জামাটা খুলে কলে কাদাটুকু ধুয়ে শুকুতে দিয়ে তাঁর

বসবার ঘরে এসে ঢুকেছিলেন, বাইরে থেকে কথা বলতে বলতেই আসছিলেন—যেন না বলে আর থাকতে পারছিলেন না। নিত্যবাবুর কথার প্রতি সেন্‌টেনসেই কয়েকটা করে 'বুয়েচেন না' শব্দ থাকত, সেই বলেই ঢুকেছিলেন—বুয়েছেন না সুধাংশুবাবু, অদৃষ্টের চেয়ে বলবান কিছু নেই মশায়। বুয়েচেন না, এই যে চামড়াঢাকা কপালখানা এইটেই হল সব। একেবারে মোক্ষম কথা—বুয়েচেন না। ওই যে মেয়েটা আর ওই যে ছেলেটা—বুয়েচেন না—তার একে বারে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সুধাংশুবাবু একটু আগ্রহান্বিত বিস্ময় অনুভব করেছিলেন। নিত্যবাবু ওদের জানেন অথচ ওদের পরিচয় তাঁর জানা হয় নি! ওর সে পরিচয় যত অপরিচ্ছন্ন এবং অপবিত্র হোক, ওদের বিশেষ করে ওই মেয়েটির কাছে তিনি উপকৃত। অযাচিতভাবে সে উপকার করেছে, তিনি নিয়েছেন। সেটা যেন একটা কাঁটার মতই বিঁধে রয়েছে তাঁর মনে। এবং বলেছিলেন—কে বলুন তো মেয়েটি? চেনেন? চাটুজ্জেদের বাড়ি কাজ করে, না?

নিত্যবাবু বলেছিলেন—বুয়েচেন না, হতভাগা মেয়ে। আমার চেনা মানে আমার বন্ধুর মেয়ে। আমার বন্ধু শিবেন ভটচাজ, বুয়েচেন না—এককালে হাওড়ার নামকরা ছোকরা। আমার বন্ধু। বলতে গেলে একগেলাসের ইয়ার। আমরা সেকালে, বুয়েচেন না, একটা দল ছিলুম। শিবেন আমি এবং আরও পাঁচ-সাতজন। আমাদের লক্ষ্য ছিল বেঙ্গলকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রভিন্স করে তুলব। ফ্যাক্টরী বানাব। তখন আপনার প্রথম মহাযুদ্ধের পর। বিপ্লবীদের কথা শুনে ব্লাড বয়েল করে ওঠে। তাদের মত তো প্রাণট্রাণ দিতে পারি না, তবে সাহায্য করতে পারি। আর তখন চাটুজ্জেরা কারখানা গড়ে তুলেছে, ১৯১০/১২ সালে ছোট একটা কারখানা ছিল—একটা পুরনো বয়লার, একটা ইঞ্জিন, দুখানা লেদ, তার থেকে যুদ্ধের ক'বছরে যাকে বলে মিলিয়নেয়ার। আরও সব বেশ কয়েকজন আরম্ভ করে ভালই করছে। মধ্যে মধ্যে স্যর পি-সির কাছে যেতুম। তিনি উৎসাহ দিতেন। ঘুষি মেরে খোঁচা মেরে যেন মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে বলতেন—কল-কারখানা গড়ে তোল্। হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। শিবেনের বাবা মারা গেল। হাতে অনেক টাকা এসে গেল। তাই দিয়ে পত্তন হল দধীচি আয়রন ওয়ার্কসের। শিবেনের বাবা ছিলেন খুব পসারওয়ালা মোক্তার। তিন ছেলে।—বেশ গুছিয়ে কথা বলতেন নিত্যবাবু। শিবেনের জীবনের কথাগুলি—ওই কারখানা পত্তনের কথা, শিবেনের দরাজ হাতের কথা—এই মেয়ের সমাদরের কথা বলে গেলেন। তারপর চুপ করলেন নিত্যবাবু। যেন হঠাৎ চুপ করে ভাবতে লাগলেন। বোধ করি ভাবতে লেগেছিলেন—তারপর কি?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—তারপর?

—তারপর?

—হ্যাঁ।

—তারপর বুয়েচেন না, ওই কপাল। ফেল পড়ল দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্। কিনলে ওই চাটুজ্জেরাই। ওই রায়বাহাদুর। বুয়েচেন না! এখন ওদের বাড়িতেই চাকরি করছে শিবেনের বউ। মধ্যে মধ্যে মেয়েটা একটিনি করে। শিবেনের দধীচি আয়রন ওয়ার্কসে একটাও বজ্র তৈরী হয় নি। খানকতক ছোরা তৈরী হয়েছিল। চা-বাগানের প্রুনিং নাইফের

অর্ডার নিয়ে তার সঙ্গেই তৈরী করেছিল। কারদিগে যেন দিয়েছিল। তারপর—।

আবার চুপ করে গিয়েছিলেন নিত্যবাবু।

সুধাংশুবাবু আবার বলেছিলেন অর্থাৎ কথা বলার ছলেই প্রশ্ন করেছিলেন—এত বড় ব্যাপারটা ফেল পড়ে গেল! পর্বত মূষিক প্রসব করেই দেউলে হয়ে গেল।

—তাই হল। পর্বতের মূষিক প্রসবই বটে। কি যে হয়েছিল তা বলতে পারব না তবে সাংঘাতিক কিছু। জালজালিয়াতি কিছু করেছিল শিবেন। প্রথমটা কারখানা করে ২৫/২৬ সাল থেকে কারখানা ভাল চালাতে পারে নি, অর্ডার ছিল চা-বাগানের অর্ডার। ওই চাটুজ্জে রায়বাহাদুরই ওঁর ছোট অর্ডারগুলো দিয়ে ওকে সাহায্য করতেন। ৩৪/৩৫ সালে হঠাৎ বাড়ি কারখানা চাটুজ্জেদের কাছে মর্টগেজ দিলে। মোটা টাকা নিয়ে এক সিনহার সঙ্গে জুটে একটা ব্যাঙ্ক করলে। ওদের সবার পিছনে ছিল এক মালিক। বুঝেচেন না! সে অগাধ জলের মাছ। লোকটা দালাল। জাপানী ফার্মগুলো তখন বেশ মজবুত করে ভিত গাড়ছে। তারা লোহা মানে পিগ্ আয়রন কিনবে—তার অর্ডার পাইয়ে দেবে বলেছে। ব্যাঙ্কেও টাকা রাখবে বলেছে। শিবেনের কারখানা ফাঁপতে লাগল। আমি নাটক লিখলাম। নতুন রত্নমালা স্টেজের প্ল্যান হয়ে গেল। হঠাৎ ব্যাঙ্কটা ফেল পড়লো, বেধে গেল জাপানী যুদ্ধ। জাপানীরা বললে, 'দিস টাইম উই গো বাট নেক্স্ট্ টাইম নট গো!' ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার দিব্যি জেলে চলে গেল। তার গেল না কিছুই। আর শিবেনের সব গেল। বাড়িঘর কারখানা মর্টগেজ ছিল—লিখে নিলে ওই চাটুজ্জেরা। কিছু টাকা দিয়েছিল চাটুজ্জেরা—সেও বহু অপমানের টাকা।

মাথা নিচু করে সত্য সত্যই লজ্জিত বেদনার সঙ্গে নিত্যবাবু বলেছিলেন—শিবেন কাপুরুষের মধ্যে বোধ হয় ওয়ার্স্ট কাপুরুষ। শিবেনের বউ ছিল সুন্দরী—১৯৪০।৪১ সালেও সে যুবতী ছিল। চাটুজ্জেদের বাড়ির বড়ছেলে—সে মারা গেছে—তার কাছে নাকি বিক্রি করেছিল শিবেন। চাটুজ্জে গিন্নী কথাটা জানতে পারে। সেই ভদ্রমহিলাই এর জন্যে শিবেনদের বসতবাড়ির পিছনদিকের খানিকটা ছেড়ে দিয়েছেন। এ চাকরিও সেই তাঁর চাকরি। শুনেছিলাম যতকাল শিবেনের বউ বাঁচবে ওদের বাড়ির ঠাকুরঘরের কাজ করে খেতে পাবে।

—কিন্তু এই মেয়েটি?

—সেই মায়ের কাছেই গেল বোধ হয়। আর আমাকে বলে গেল আপনাকে তো চিনি নে।

—না, তা নয়। জিজ্ঞাসা করছি—

—আমি সঠিক জানি নে সুধাংশুবাবু। বুঝেচেন না। তবে একাল তো সর্বনাশের কাল আত্মঘাতের কাল—।

চুপ করে গিয়েছিলেন নিত্যবাবু।

সুধাংশুবাবু বুঝতে পেরেছিলেন, মুখে আর কিছু বলেন নি। তাকিয়ে ছিলেন সামনের দিকে। মনে পড়েছিল সেই রাত্রির কথা। এবং ওর এই শুচিস্নাত রূপের মধ্যে রাত্রে ও যে রূপে ও ছন্দে রূপসী ও ছন্দময়ী হয়ে দাঁড়ায় তার আভাস সকালবেলায় জ্বলা আলোর মত জেগে থাকার কথা মনে পড়েছিল।

নিত্যবাবু হঠাৎ বলেছিলেন—শুনেছি she is the cause of her husband's death ; she sold herself,—আরও অনেক কথা শুনি। এর আগে আমি সেসব বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ দেখলাম she is a dangerous woman. ওইটে ওর ছেলে মশায়।

এর পরও আছে। এই মেয়েটির আর অনেক পরিচয় নৈমিত্তিক খুঁটিনাটির মধ্যে তাঁর কাছে এসে জমা হয়েছে। নদী যেমন বয়ে যাবার সময় বাঁকের মুখে খড়কুটো পলিমাটি রেখে যায়, তেমনিভাবেই ও সেসব পরিচয় রেখে গেছে।

নিত্যবাবু এরপর বাড়ি সম্পূর্ণ করে গৃহপ্রবেশ করলেন। স্থায়ী প্রতিবেশী হলেন। চার-পাঁচ দিন পরই একদিন এসে বললেন—জানলেন স্যার, শিবেনের স্ত্রীকে আমার বাড়ি রান্নার কাজের জন্য রাখলাম। বুঝেছেন না? মা'টা মেয়েটার মত না! হ্যাঁ। নাক চোখ ঘুরোয় না। বেশ বিনয়টিনয় আছে। আমি মশাই দাঁড়িয়ে ছিলাম বারান্দায়, শিবেনের স্ত্রী দাঁড়াল। চাটুজ্জে-বাড়ি থেকে ফিরছিল। আমাকে বললে—চিনতে পারছেন? বললাম—তা পারব না কেন। তবে ভয় হয় বাপু। সেদিন তোমার মেয়ে যে অপ্রস্তুতটা না আমাকে করলে! ওঃ, বললে, আপনাকে তো আমি চিনি না!

বললে—ও এমনি বটে। তবে কি বলব বলুন—সবই তো জানেন। বিস্তর দুঃখে পাথর হওয়ার মত এমনি হয়ে গেছে।...আপনাকে ওরা খুব চেনে। খুব সম্মান করে।...রান্নার লোক চাই তা বললাম—মেয়ে কি করে? চাটুজ্জেবাড়ির কাজ তুমি কর। ও সেই কাজেই মধ্যে মধ্যে যায়। তা ওকে দাও না আমার বাড়ির রান্নার কাজে। বললে—ওকে শুধিয়ে বলব। তা' কাল সন্ধ্যেবেলা বলে গেল আমার বাড়ির কাজ ও নিজে করবে। মেয়ে করবে চাটুজ্জেদের কাজ।

বললাম—সেই ভাল তাই কর।

এরপর থেকে ভোরবেলা মা এবং মেয়ে দুজনেই আসত একসঙ্গে—ওপাশের ওই নিত্যবাবুর ফুটপাথ ধরে হাঁটতো তারা আর পিছনে খানিকটা দূরে আসতো সেই ছেলেটা। সেই পা ঠুকে ঠুকে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে একটা দুর্বোধ্য গর্জন মেশানো কান্নার মত শব্দ করতে করতে আসতো সে।

মেয়েটির মা ঢুকত নিত্যবাবুর বাড়িতে। মেয়ে চলে যেত চাটুজ্জেবাড়ি। মেয়েটির মা-দিদিমা নিত্যবাবুর বাড়ি ঢুকবার সময় বলত—নীলু আয়—আমার সঙ্গে আয়। নীলু!

নীলু দৃকপাত করত না। সে সেই একভঙ্গিতে চলত মায়ের পিছনে পিছনে। মা সাধারণতঃ পিছন ফিরে তাকাতোই না। চলে যেত সামনে। বড় রাস্তার মোড় থেকে গলিপথে ঢুকে যেত। তারপর আর দেখতে পেতেন না সুধাংশুবাবু। তবে কোন কোন দিন কোর্টে বের হবার সময় দেখতে পেতেন ছেলেটা নিত্যবাবুর বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। কোনদিন বা নিত্যবাবুর বাড়িতে সংগৃহীত কোন একটা ছেঁড়া বই খুলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কোন কোন দিন দেওয়ালে মাথা ঠুকত। আর একটা খেলা করত সে। এখানকার কুকুরদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে খেলা করত। দু'তিনটে দেশী কুকুর তার সামনে উপু হয়ে বসে থাকত—

ছেলেটা তাদের সঙ্গে কথা বলত।

কোন কোন দিন মা দিদিমার দিকে বালি ঢেলা ছুঁড়ত।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতেন সুধাংশুবাবু। শুধু অবাক নয়, মনে মনে একটা অপরিমেয় ঘৃণা, তার সঙ্গে আরও কিছু, হয়ত মার্জনাহীন ক্রোধ, মেঘের মধ্যে লুকনো বিদ্যুৎপুঞ্জের মত আবর্তিত হত। দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেতেন একটা উগ্র পাপের মূর্তি যেন তিল তিল করে প্রতিদিন গড়ে উঠছে।

এক এক দিন এই মা— ;

এ কি মা? রাক্ষসী হয়তো। অথবা প্রেতিনী!

মনে একটা ছবি ভেসে উঠল। খোঁচাখাওয়া অথবা ঢিলখাওয়া সাপিনীর ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফণা তুলে উঠে দাঁড়ানোর মত ওই ছেলেটার দিকে ঘুরে দাঁড়াত।

বাল্যকালে এই হাওড়াতেও সাপ দেখেছেন সুধাংশুবাবু। মানুষকে দূরে রেখেই সাপ চলে যেত মাথা নিচু করে। পিছনে পায়ের সাড়া উঠলে গতি দ্রুততর করত। কিন্তু কোন কোন দিন ফোঁস করে ফণা তুলে ঘুরে দাঁড়াত। নিষ্পলক সাপিনীর দৃষ্টি। চেরা জিভ লকলক করত।

ঠিক তেমনিভাবেই এই প্রেতিনী অথবা সাপিনী মা এক এক দিন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতো এবং তিক্ত কটু কণ্ঠে সোচ্চারেই বলে উঠত—মর মর তুই মর—তুই মরে যা! আমি খালাস পাই!

ছেলেটাও থমকে দাঁড়াতো। সেও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত মায়ের দিকে। ঠোঁট দুটো নড়ত অথবা কাঁপত। দিদিমা এসে হাত ধরত; না—ধরতে চেষ্টা করত। ছেলেটা ধরা দিত না। ছুটে পালিয়ে যেতো। তারপর এ মেয়ে চলে যেতো চাটুজ্জেবাড়ি—এর মা ঢুকত নিত্যবাবুর বাড়ি।

এরপর ছেলেটার মুখ ফুটল। সেও বলতে শুরু করলে—তুই মর তুই মর—তুই মরে যা। তারপর তার সঙ্গে যুক্ত হল—হারামজাদী শুয়োরের বাচ্চা—! তারপর কোথা থেকে শিখলে—কুত্তি, কুত্তার বাচ্চি কুত্তি!

না। এ গালটা সুধাংশুবাবু ছেলেটার মুখে শোনেন নি। নিত্যবাবুকে বলেছিল মেয়েটির মা ছেলেটার দিদিমা। সেদিন সকালে ছেলেটা দিদিমার সঙ্গে এসেছিল কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। ব্যাণ্ডেজ তখনও কাঁচা রক্তে ভিজে ভিজে ছিল। ছেলেটার পদক্ষেপ ঠিক ছিল না, টলছিল। মা চলে গেল চাটুজ্জেবাড়ি—দিদিমা ছেলেটাকে নিত্যবাবুর বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে কাজে লেগেছিল। সেদিনটাও ছিল কোন ছুটির দিন। বাড়িতে বসে সুধাংশুবাবু তাঁর রাজনৈতিক কর্মী বন্ধুদের সাথে কথা বলছিলেন, হঠাৎ একটা গোলমাল উঠেছিল নিত্যবাবুর বাড়িতে।

সুধাংশুবাবু বারান্দায় বেরিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন ছেলেটার উপর ঝুঁকে পড়ে দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে ডাকছে—ওরে নীলু রে—ওরে! ওরে ভাই রে সোনা রে!

নিত্যবাবু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কপালের ব্যাণ্ডেজটা তখন কেমন করে খসে বা খুলে পড়েছে এবং খানিকটা জায়গায় খানিকটা রক্ত পড়ে জমে রয়েছে। সুধাংশুবাবুই ডাক্তার ডেকেছিলেন। মোড়ের

মাথাতেই ডাক্তার আছে। ডাক্তার এসে দেখে শিউরে বলেছিল—এ যে অনেকখানি কেটেছে। যেন কেউ কিচুতে করে কুপিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে।

কুপিয়ে দিয়েছিল এই রাক্ষসী অথবা প্রেতিনী মা।

কথাটা প্রকাশ করে দিয়েছিল দিদিমা। দিদিমা বলেছিল—কি করব বলুন। তখন অনেকটা রাত্রি। চাঁপা গিয়েছিল সিনেমা দেখতে। ফিরে এল। এসে, নিজের খাবারটা গরম করে নিচ্ছিল। শীতের দিন তো। উনোনে ঘুঁটে দিয়ে চাটু চড়িয়েছে ছেলে এসে বসল ঝগড়া করতে। এ বলে তুই মর—ও বলে তুই মর। এরই মধ্যে ছেলেটা মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে বললে—কুত্তি কাঁহাকা, কুত্তার বাচ্চি কুত্তি! এই হাতে ছিল খন্তি, সেই খন্তি বসিয়ে দিলে মাথায়, লাগল কপালে, এতখানি কেটে গেল। ভকভক করে রক্ত পড়েছিল তখন। তখন আবার ন্যাকড়া পুড়িয়ে করালী করে লাগানো হল, তারপর উঠোনে গাঁদা গাছ হয়েছে তা থেকে পাতা বেঁটেও ভাল করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ কিরকম আবার রক্ত পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে—দুর্বল হয়েছে তো!

সুধাংশুবাবুকে কথাগুলো বলেছিলেন নিত্যবাবু।

ছেলেটা ভুগেছিল কিছুদিন। মরত, মরাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু গরীব এবং দুর্ভাগা যারা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক রেহাইটা মেলে না। সেখানে উল্টোটা হয়।

এরপর ছেলেটাকে দেখা যেতো না।

নিত্যবাবুই বলেছিলেন ছেলেটা স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

দেখা যেতো মধ্যে মধ্যে। শনিবার দিন নটা বাজলেই ছেলেটা এসে দাঁড়াতো নিত্যবাবুর বাড়ির দরজায়—বাড়ির চাবি নেবে।

রবিবার কোন কোন দিন আগের থেকে প্রচণ্ডতর আক্ষেপ বা বিক্ষোভের সঙ্গে পা ঠুকে হাত ছুঁড়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে আসত।

একদিন মাকে মারলে ঢেলা ছুঁড়ে। তাঁর সামনে। ওই রাস্তার উপর। সেদিন ওদের এই পথে যাওয়া-আসার ছকে খানিকটা ওলোটপালোট হয়েছিল। ছেলেটা সেদিন রাগ করে হনহন করে চলে যাচ্ছিল, তার পিছনে ছিল দিদিমা; সে তাকে ডাকছিল—নীলু ফের, ফিরে আয়। নীলু!

নীলু পিছন ফিরেই বলছিল—না না।

—নীলু!

—না!

এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—নী—লু!

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা, সাপের মত না, বাঘের মত ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁতে খামচ কেটে একমুহূর্তের মধ্যে কুড়িয়ে তুলে নিয়েছিল একটা ইটের টুকরো। এবং সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল সেই ঢেলাটা। সে তাঁর চোখের সম্মুখে ঘটেছিল। ছেলেটার সে ঢেলা ছোঁড়ার ছবিটা চোখের উপর ভাসছে এই মুহূর্তে। ঢেলাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। সজোরে এসে

লেগেছিল নীলুর মায়ের হাঁটুতে। সে জোর আঘাতের একটা শব্দ উঠেছিল। সেটাও আজ মনে পড়ছে। মেয়েটি দুই হাতে হাঁটু ধরে বসে পড়েছিল। নীলুর মায়ের মা ছুটে গিয়েছিল মেয়ের কাছে।

যত সে "চাঁপা চাঁপা" বলে নাম ধরে ডেকেছিল ততই এ মেয়েটি ঘাড় বেঁকিয়ে মুখখানা যথাসাধ্য বুকের মধ্যে গুঁজে লুকিয়ে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল—না না না। ডাকিস নে ডাকিস নে ডাকিস নে। তার অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে তা কোনদিন সুধাংশুবাবু ভেবে দেখতে চান নি।

ঘটনাটা তো খুব কিছু অস্বাভাবিক নয়।

এরকমটা ওই ধরনের জীবন যাদের তাদের পক্ষে অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক। খালি পায়ে যারা চলে তারা প্রমত্ত হলে হুঁচোটের আঘাতটা তাদের প্রাপ্য।

ওদিকে তখন চাঁপার চারদিকে ভিড় জমে গিছল। তাঁর মনে আবার প্রশ্ন জেগেছিল—আঘাত গুরুতর হয় নি তো?

ইতিমধ্যে প্রতিবেশী নিত্যবাবু বেরিয়ে এসেছিলেন। এবং কি হল কি হল বলে ছুটে গিয়েছিলেন ওই ভিড়ের মধ্যে। এবং নিত্যবাবুই তার হাত ধরে তাকে ভিড় থেকে বের করে এগিয়ে নিয়ে চাটুজ্জেদের পথটায় পৌছে দিয়ে এসেছিলেন।

সুধাংশুবাবু তখনও দাঁডিয়ে ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ ওই ছেলেটিকে দেখেছিলেন। পিঙ্গল চোখ পিঙ্গল চুল শক্ত শীর্ণ দেহ। তারপর কখন যে নিত্যবাবু আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন তা খেয়াল ছিল না কিন্তু এরই মধ্যে ছেলেটা কোথায় চলে গিয়েছিল। সবশেষে সেদিন একটা আক্ষেপ হয়েছিল তাঁর—মনে পড়ছে মনে হয়েছিল যেন কোন অদৃশ্য বিচারকের আদালতের পিওন এসে তাঁকে বলে যাচ্ছে –এর কাছে তোমার দেনা আছে শোধ করছ না কেন?

রবিবার হলেও কয়েকজন মক্কেল এসে গিয়েছিল। তারাও ক'জন দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর কাছেই। ক'জন আপিসঘরে গিয়ে বসেছিল। তিনি তখনও ভাবছিলেন।

কি জানি কেমন করে এই ছেলে এবং এই মা মেয়েটিকে নিয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনা তাঁর সারা অন্তরময় ছড়িয়ে পড়ছিল। শুধু অন্তরময় কেন সারা দেশময়। একটা সহানুভূতি সেদিন অনুভব করেছিলেন এই হতভাগিনীর জন্যে।

কি হয়ে গেল সব?

ওই মেয়ে—ওই তো যেন চারিদিকে! গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে। ওঃ! ইংরেজ অ্যামেরিকা লাখে লাখে তাদের সৈন্যবাহিনী নামিয়ে দিলে। দেশের খাদ্যভাণ্ডার লুঠ করে দুষ্প্রাপ্য করে দিলে, হাওয়ায় নোট উড়িয়ে দিলে। ময়দানে বসে গেল দেহের বিক্রির হাট।

যারা বাজারে এসে পা দিল তারা আর ফিরে গেল না। দেশ স্বাধীন হল কি হল না কে জানে —হিন্দু ধরলে ছুরি মুসলমান ধরলে ছুরি—মারলে পরস্পরের বুকে—রক্ত ঝরল—সে রক্ত আজও ঝরছেই ঝরছেই। দেশ ভাগ হয়ে গেছে তবু ঝরছে। এখন আর হিন্দু মুসলমান বিরোধের

প্রয়োজন নেই—তোমার সঙ্গে আমার—তোমার সঙ্গে তার কিংবা তার সঙ্গে তার বিরোধ হলে সে বিরোধের মীমাংসা পৃথিবীর আদিম মীমাংসার পথে। খানিকটা রক্তপাত। পথে যেখানে দুজনে চলা যাবে না তখন একজনকে যেতে হবে।

ঠিক এই সময়েই চাঁপাকে চাটুজ্জেদের গলিতে অথবা দোরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছিলেন নিত্যবাবু। তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজের বাড়ি না ঢুকে নিত্যবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— দেখলেন কাণ্ডটা!

তিনি বলেছিলেন—আমি সবটাই দেখেছি। আর শুধু আজকের ঘটনা নয় রোজই দেখি। হঠাৎ আজ—

—পাখা গজায় নি এতদিন। আজ গজালো। একেবারে মস্তান হয়ে গেল।

একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—দিদিমাই ওর মাথা চিবিয়ে খেয়ে দিলে।

তিনি কোন উত্তর দেন নি।

এই হতভাগিনী মা-টির উপর করুণা করতে চেয়েও কোনমতেই এতটুকু করুণা তাঁর মনে সঞ্চারিত হয় নি। করুণা তো কেউ কাউকে করে না—করুণা আপনা থেকে সঞ্চারিত হয়। শুষ্ক হৃদয় আপনা-আপনি সজল হয়ে ওঠে। তার কারণ থাকে। এ মেয়েটির পক্ষে সে কারণ নেই। এর জন্যে তা হয় নি।

তিন

তারপর অনেক দিন চলে গেছে।

নিত্যবাবু নেই। তিনি গত হয়েছেন। এ মেয়েটির মা সেও নেই, মারা গেছে। মেয়েটি আছে। তার কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় নি।

এই অনেক দিনে বয়স তার বেড়েছে—চেহারায় কিছুটা যেন ভারী দেখায় কিন্তু তাতে তার ওই যে প্রেতিনী রূপ তার এতটুকু ইতরবিশেষ হয় নি। বরং প্রেতিনীত্বের মধ্যে যে একটি মোহ বা মোহিনীত্ব থাকে তা যেন বেড়েছে।

আজও চাটুজ্জেদের বাড়ির কাজটা সে রেখেছে। সে কাজ সে করে। ভোরবেলা সে যায়। সেই স্নান করে শুচিস্নাত হয়ে শৌখিন সায়া ব্লাউজের উপর ফিতেপাড় শাড়ি পরে যায় এবং আসে।

সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না। সুধাংশুবাবুও আর ভোরবেলা রাস্তায় এসে দাঁড়ান না। তবে যেদিন দাঁড়ান সেদিন ঠিক দেখতে পান সেই মেয়ে চলেছে সেই মনোহারী কেশবিন্যাসছন্দটি বজায় রেখে—সেই চুলের রাশির উপর আধঘোমটা টেনে মাথাটি একটু হেঁট করে চলেছে। আজকাল আর ছেলেটাকে দেখেন না। সে আর তার পিছনে পিছনে হাঁটে না। তবে তার কথা অনেক শোনেন।

পড়া ছেড়েছে। নেশা করে। আরও অনেক কিছু করে।

বোমা ফাটার শব্দ হলে ছেলেটার কথা ওঠে।

দু'দলে মারামারি হলে একদলে-না-একদলে ও থাকেই। মধ্যে মধ্যে পুলিসে ধরে নিয়ে যায় আবার ছেড়ে দেয়। মোট কথা সে তার জীবনক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে। মায়ের পিছনে সে আর হাঁটে না। বছর তিনেক থেকে হাঁটে না। মা এখন একলাই হাঁটে।

লোকে বলে—। লোকে অনেক কথা বলে।

যা বলে তার প্রতিটি অক্ষর সত্য না হলেও যা বলে তার অর্থ সত্য—সে সুধাংশুবাবু জানেন। তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠছে খাটের তলায় খালি মদের বোতল গড়িয়ে পড়ে ছিল। ভর্তি বোতলও ছিল।

সেই মেয়ে চোখে জল নিয়ে এই সন্ধ্যায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুধাংশুবাবু এখন অনেক বড় হয়েছেন। পুরনো বাড়ি সংস্কার করে নতুন হয়েছে। আর একটা তলা উঠেছে। পাশের দিকে বেড়েছে। গাড়ি হয়েছে। এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁর জীবনের গতিবিধি স্বভাব অভ্যাস সব কিছুর খবর রাখে। সপ্তাহের এই শনিবারের সন্ধ্যাটি তাঁর একান্তভাবে নিজস্ব। মিটিং- টিটিং হলে যান, রাজনীতির সঙ্গে যোগ তাঁর আছে। সেখানে কোন স্বার্থ তাঁর নেই কিন্তু একটা আদর্শ তাঁর আছে। এ ছাড়াও নানান প্রতিষ্ঠানও তাঁকে ডাকে। কখনও কখনও সিনেমা থিয়েটার দেখার নিমন্ত্রণও আসে। এ সন্ধ্যায় কারুর সঙ্গে তিনি দেখা করেন না—এ কথাটা বাইরে বোর্ডেও লেখা আছে।

চাঁপার ;—

হ্যাঁ, চাঁপাই ওর ডাকনাম—ভাল নাম রত্নমালা।

চাঁপার চোখের কোলে-কোলে জলের ধারার দাগ দুটি চিকচিক করে উঠল এই মুহূর্তটিতে। মধ্যে মধ্যে নতুন জলের ফোঁটা গড়িয়ে এলেই ঘরের আলোর ছটা প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। মিনিট কয়েকই দাঁড়িয়ে আছে। এমনই ভাবে হাত জোড় করে মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলতেও সাহস করে নি। তিনিও কথা বলেন নি। বিস্ময়ের আর তাঁর অবধি ছিল না।

প্রথমেই মনে হয়েছে এই প্রেতিনী তাঁর দোরে এসে দাঁড়াল কেন ?

প্রথমেই একবার মনে হয়েছিল দরজার পাল্লা দুখানা জোরে ঠেলে দিয়ে ওর মুখের ওপরই বন্ধ করে দেন। কিন্তু পারেন নি। কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়েছিল বারো বছর আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সেই বীভৎস এবং ভয়ানক রাত্রে অন্ধকার গলিপথের উপর দরজা খুলে দিয়ে তাঁকে একটি মেয়ে, সে-মেয়ে এই মেয়ে, বলেছিল তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে আসুন। তাড়াতাড়ি।

তারপর গভীর রাত্রি পর্যন্ত যতক্ষণ না দাঙ্গার আস্ফালন এবং বীভৎসতা স্তব্ধ হয়েছিল ততক্ষণ তাঁকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বাইরে বসে থেকেছিল।

আজও পর্যন্ত তার বিনিময়ে কোন দাবি সে করে নি। পরিচয়ের দাবিও না। একবার একটা মামলার কাগজ নিয়ে এসেছিল—টাকাপয়সা দেনাপাওনার পেটি কেস- কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিশ্রী

কাণ্ড ঘটেছিল। উপকারের প্রত্যুপকার তা সে যতটুকুই হোক তার সুযোগ দিতে এসেও এই উদ্ধত দর্পিতা মেয়েটি দেয় নি। হাত পেতেও হাত গুটিয়ে যেন প্রত্যাখ্যান করেছিল। আজ সে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে জল টলমল করছে। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না কি করবেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হয়তো তিন মিনিট -হয়তো তার থেকে বেশী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে ভাবছেন। মনে পড়ছে পিছনের কথা।

এ স্তব্ধতা ভঙ্গ সেই করলে প্রথম ভীত ও মৃদু কণ্ঠে সে তাঁকে ডাকলে—একান্ত দীনজনের মতই ডাকলে—বাবু।

সে কি তবে ভিক্ষাপ্রার্থিনী? অর্থ? অর্থ চাই?

তিন বা চার পা। গলায় সোনার বিছেহার চিকচিক করছে। কানে টাপ রয়েছে। হাতে তিন বা চারগাছি করে বরফি চুড়ি রয়েছে।

তিনি অত্যন্ত নীরস কণ্ঠেই বললেন—এত রাত্রে? কি প্রয়োজন তোমার? বল।

মেয়েটির চোখের কোল জলের উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। কিছু বলতে গিয়ে প্রথমটা পারলে না। তারপর বললে -আমাকে বাঁচান, বাবু, আমার--আমার—

কণ্ঠস্বর তার দ্বিতীয়বার রুদ্ধ হয়ে গেল। মুখের উপর কাপড় চাপা দিয়ে সে হুহু করে কেঁদে উঠল।

সুধাংশুবাবুকে স্পর্শ করল সে বেদনার ছোয়াচ। একটু সহৃদয় হয়েই তিনি বললেন—কেঁদো না, বল কি বলছ?

একটু অপেক্ষা করে বললেন—কি হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির চরিত্র এবং তাঁর ফৌজদারী আদালতে খ্যাতির সঙ্গে যোগাযোগ করে একটু বক্রহাসি না হেসে পারলেন না। বললেন—কি কেসে পড়েছ? ঘরে মদ বেরিয়েছে? না—। কি? কি হয়েছে বল।

এবার কোনমতে আত্মসংবরণ করে চাঁপা বললে—আমার নীলু—আমার নীলুকে আপনি বাঁচান বাবু। লোকে বলছে, আমিও জানি আপনি পারেন।

—নীলু? মানে? মনে পড়ল না প্রথমটা।

—আমার ছেলে। আমার নীলু।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ—।

মস্তান--।

আশ্চর্য! আরবী ভাষা পারসী ভাষা তুর্কী ভাষা যারা এনেছিল এদেশে, এদেশের ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে উর্দু ভাষা যারা তৈরি করেছিল তারা বাংলাদেশে বক্তিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ অধিকার থেকে পলাশীর যুদ্ধ উধুয়ানালা বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত কর্মদিন রাজত্ব করে নি—তারা এই পাঁচ ছ'শো বছরে দিয়েছে অনেক কিন্তু এই মস্তান শব্দটি এবং মস্তানী রূপটি তাদের রাজত্বকালে বাংলাদেশে চালু হয় নি—হঠাৎ এতকাল পরে শব্দটি এবং শব্দের বাস্তবরূপটি আরব্যউপন্যাসের কোন বোতলের ছিপি কাটিয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬০ সাল এখন -এখন বারো তেরো থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর পর্যন্ত সব মানুষই যেন

মস্তান হয়ে গেছে।

একজন পনের ষোল বছরের ছেলে যখন কোন বাড়ির মধ্যে ঢুকে অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বলে—মাসীমা, সতু কোথায় ? একবার ডেকে দেবেন !

তখন মাসীমা বিবর্ণ হয়ে যান নির্বাক হয়ে যান। মাসীমা সতুর মা। তিনি জানেন রামুর হাতে ছুরি আছে। এবং সে ছুরি সতুর বুকে বা পেটে বসিয়ে যখন দেবে তখন একবারও হাত কাঁপবে না।

১৯৬০ সাল পর্যন্ত রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত মহা-আবির্ভাবের সব পুণ্য ফুৎকারে উড়ে গেছে। কোন্ মহাশূন্যে ধুলো হয়ে উড়ে হারিয়ে গেছে ; তার উপর—

মনে পড়ল নীলুর এবং নীলুর মায়ের এবং নীলুর মাতামহের ইতিহাস। জন্মগত পাপ ছেলেটার রক্তের মধ্যে কীর্তিনাশার কুটিল ধ্বংসের প্রবৃত্তিতে আবর্তিত হচ্ছে।

আশ্চর্য কি ?

একটু বিষণ্ণ হাসির রেখা ঠোঁটের কোন এক কোণে ফুটে উঠল আপনাআপনি। জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু মারলে কেন ? কারণটা কি ? টাকাকড়ি ছেনতাই ? না জুয়োটুয়ো—?

—না না। বাবু কারণ আমি—।

নিজের কপালে হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে মেয়েটি বললে—আমি তার কারণ। আমার জন্যে—

—তোমার জন্যে ? বিস্ময়ের আর সীমা রইল না সুধাংশুবাবুর।

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, আমার জন্যে। ওই বরেন মল্লিক ছিল—। থেমে গেল মধ্যপথে। আকস্মিকভাবে।

দৃঢ়স্বরে সুধাংশুবাবু বললেন—হ্যাঁ—। ওই বরেন মল্লিক ছিল—। কি ছিল ? বল।

—ছিল—

কঠিন স্বরে সুধাংশুবাবু বললেন—হ্যাঁ—। কি ছিল তাই বল। মনে মনে বললেন—বুঝেছি। তুমি প্রেতিনী সে প্রেত। তা স্বীকার করতে এখনও তোমার লজ্জা !

মনে মনে অকারণে নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিলেন তিনি।

তবু সেই একটি রাত্রের কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। আবার তিনি কিছুটা কোমল হবার চেষ্টা করে বললেন—বল। আদালতের ব্যাপার—এখানে না বললে তো চলবে না !

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে—কি বলব তাই ভাবছি। কি ছিল ? এক বিচিত্র জাতের হাসি হেসে বললে—সে-কালে শুনেছি কেনা দাস-দাসী ছিল। বরেন মল্লিকের কাছে আমি ছিলাম তাই। আমাকে সে কিনেছিল। নগদ টাকা গুনে দিয়েছে। দলিলে সই করিয়ে নিয়েছে।

—দলিলে সই করিয়ে নিয়ে সে কিনেছিল তোমাকে ? চমকে উঠলেন সুধাংশুবাবু। চাঁপার কথার মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা ছিল না—এবং সুধাংশুবাবু একজন বড় অপরাধ আইন বিশেষজ্ঞ—তিনি বহু বিচিত্র প্রথা ও ঘটনার কথা জানেন তবু তাঁর প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময় প্রকাশ না পেয়ে

পারলে না। এবং সে বিস্ময় অনেক বিস্ময়। এমন কোন কথা তো তাঁর প্রতিবেশী নিত্যবাবুর কাছে তিনি শোনেন নি। না! কোন আভাসই সে তো দেয় নি।

চাঁপা স্পষ্ট ধীর কণ্ঠস্বরে উত্তর দিলে—একবার নয় দুবার। প্রথমবার বাবার সামনে দু'হাজার টাকার নোটের গোছা আমারই হাতে তুলে দিয়েছিল। বাবা বলেছিল—নে মা নে, আমাকে বাঁচা। নইলে আমাকে জেলে যেতে হবে। পুতুলের মতই আমি নিয়েছিলাম। মল্লিক বলেছিল—বাবাকে দাও ও গুনে নিক আর শোন—এ ছাড়াও তোমাকে গহনা দেব—পোশাক-আশাক কাপড়চোপড় দেব। তবে কোনদিন আমার স্ত্রীর দাবি করতে পাবে না। গহনাও সে আমাকে দিয়েছিল। সেও বাবা বেচেছে মা বেচেছে সে বেচেছে। আমি? আমিও বেচেছি। একটুক্ষণের জন্য চুপ করলে চাঁপা, তারপর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে গেল—কোন কথা আজ আপনার কাছে গোপন করব না। সেদিন যেদিন দু'হাজার টাকায় প্রথম বিক্রি হলাম, সেদিন ওই লোকটার কথা শুনে আমার শরীর যেন কাঠ হয়ে গিছল, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল—আমার গলাও যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনের মধ্যে কোন বলবার কথা খুঁজে পাই নি—হারিয়ে গিয়েছিল। আমি কোন কথা বলি নি বলতে পারি নি। শুধু বসেই ছিলাম। বাবা আমার হাত থেকে নোটের গোছাটা টেনে নিয়ে কখন একসময় নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিছল। তারপর—

দু'হাতে মুখ ঢাকলে চাঁপা।

সুধাংশুবাবুও নির্বাক হয়ে গেলেন। শুধু নির্বাক নয়, যেন নড়াচড়ার শক্তিও তাঁর ছিল না।

এত বড অপরাধ, আইনের উকীল, তিনি জানেন ভূমি আর নারী এই নিয়েই যত অনর্থ ঘটে পৃথিবীতে। ভূমির চেয়েও বোধ হয় নারীর হাট বেশী বিস্তৃত। বাপ বিক্রি করে কন্যাকে, মা বিক্রি করে কন্যাকে, স্বামী বিক্রি করে স্ত্রীকে, ভাই বিক্রি করে বোনকে, নারী নিজে বিক্রি করে নিজেকে।

পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ মহাভারতের শ্রেষ্ঠ ধার্মিক এবং মহৎ জন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশার জুয়াখেলায় পণ রেখে হেরেছিলেন।

অনেকক্ষণ পর সুধাংশুবাবু বললেন—এস ভিতরে এস। বস ওই চেয়ারে। বল তোমার ছেলের কেসের কথা!

—আমার নীলু--।

দু'চোখ থেকে দুটি জলের ধারা আবার গড়িয়ে এল। চেয়ারের উপর বসে হাত দুখানি কোলের উপর রেখে বলতে আরম্ভ করেছিল।—আমার নীলু—বলেই কিন্তু থেমে গেল। থেমে গেল বলা ঠিক হল না; কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা দুটি আপনি বন্ধ হল এবং দুটি জলধারা গড়িয়ে পড়ল দুটি চোখ থেকে।

—নিজেকে একটু শক্ত কর। ভেঙে পডলে চলবে না। শান্ত হয়ে আস্তে আস্তে বল। গুছিয়ে

পরিষ্কার করে বল।

—আমার নীলু আমার গরুড়।

—গরুড়? কি বলছ?

—পুরাণের গরুড়ের কথা বলছি। তার মা বিনতার দাসীত্ব মোচন করেছিল অমৃত এনে। মল্লিকের বুকে পেটে ছুরি মেরে তাকে ফেলে দিয়ে নীলু পালিয়ে যাবার সময় আমাকে বলেছিল —যা এবার তুই খালাস। ইচ্ছে করে তোকেও শেষ করে দি। তা থাক। তুই মা। এর পর কিন্তু তুই যদি এ পাপ করিস তাহলে আমি বেঁচে থাকলে তোর রক্তে আমি চান করব।

আমি পাথর হয়ে গেলাম। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলাম ফুটপাথের উপর। নীলু ছুরি উঁচিয়ে ছুটে ঢুকে গেল গলির মধ্যে। মল্লিকের রক্তে আমার কাপড়চোপড় লাল হয়ে গেল। লোকজন জমে গেল; পুলিস এল, গলিটার ওদিক থেকে কতকগুলো লোক নীলুকে ধরে নিয়ে এল—তারা ধরেছে নীলুকে।

আপনি দেখেছেন সে গলি।

আমার কাছে এসে আমাকে ফুটপাথের উপর রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে নীলু বললে —যাঃ, তুই এবার নিষ্কণ্টক। আমার ফাঁসি হবে। আর কেউ তোর পথ রুখে দাঁড়াবে না।

তারপর বললে—এরপরও যদি তুই এ-পাপ করিস তবে তোর যেন কুষ্ঠ হয়। যদি না হয় তবে ফাঁসি গিয়ে প্রেত তো আমি হবই। সেই প্রেত হয়ে ভগবানের বুকে গিয়ে ছুরি বসাব আমি। তারপর মরা ভগবানটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কবর দিয়ে দেব নরকের পাঁকের মধ্যে!

শিউরে উঠলেন সুধাংশুবাবু।

চাঁপা বললে—পাপ কার তা' আমি জানি না। তবে পাপের পাঁক আমি সর্বাঙ্গে মেখেছি। আপনি একদিন স্বচক্ষে দেখে এসেছেন আমার সে পাঁক-মাখা চেহারা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এমনি সেজে আমাকে বসে থাকতে হত। আর যে লোকটা সেদিন জানালায় টোকা মেরে কথা বলেছিল—যাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম সেই লোকটাই মল্লিক। সেদিন সেই দাঙ্গার অবস্থা বলেই সে ফিরে গিছল। নাহলে সে ফেরবার মানুষ ছিল না। সে একটা জন্তু। নিষ্ঠুর জন্তু। সাপের মত। কুমীরের মত। আমার বাবা টাকার জন্যে বিক্রি করেছিল আমাকে; সে আজকের কথা নয়। কুড়ি বছর আগে। তখন আমার বয়স ষোল। আজ পনের বছর ধরে ওই অজগরটা ওই কুমীরটা আমাকে তিল-তিল করে গিলেছে। কঠিন জীবন আমার, আমি মরি নি।—সে কেঁদে ফেললে এতক্ষণে। সুধাংশুবাবু একটু নড়েচড়ে বসলেন।

বহুদর্শী মানুষ তিনি। অনেক অপরাধী ঘেঁটেছেন—অনেক অপরাধ দেখেছেন; তিনি জানেন সত্য এবং ভাবাবেগ সূর্যের আলো এবং রঙিন চশমার মত অথবা আলো এবং রঙিন ফানুসের মত। রঙিন বাল্বের বিচিত্র খেলায় রঙ্গমঞ্চে পর্দার উপর ঘনঘোর মেঘপুঞ্জ ভেসে যায়; দূরে পাহাড়ের মাথা থেকে মিথ্যা নদীর জলপ্রপাত ঝরে পড়ে, মিথ্যা সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দিন রাত্রির মায়ার সৃষ্টি করা যায়। সে হয়তো রঙ্গমঞ্চের সত্য, নাটকের সত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা

ঘটনাবর্ত। তার পটভূমি আছে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত আছে, অকৃত্রিম দিন-রাত্রিতে একটা কাল আছে; অনেক হাসি-কান্নার আবেগও আছে। কিন্তু সে আবেগ চাঁপার আজকের আবেগ নয়। চাঁপার আবেগ আজ রঙ্গমঞ্চের রঙিন আলোর মায়াবিভ্রম হয়ে উঠে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাছাড়া নারী যখন দেহকে আঁকড়ে ধরে তখন সে ছলনাময়ী। মিথ্যাবাদিনী।

সুধাংশুবাবু বাধা দিয়ে বললেন—দাঁড়াও। একটা প্রশ্ন করব।

চাঁপা চুপ করলে এবং সুধাংশুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সুধাংশুবাবু বললেন —পনের বছর আগে তোমার বাবা মল্লিকের কাছে দু'হাজার টাকা নিয়েছিল—পনের বছর তুমি এই মল্লিকের রক্ষিতা হয়ে আছ—

দুই হাতে মুখ ঢাকলে চাঁপা।

সুধাংশুবাবুর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। তিনি বললেন—তুমি বলছ এতদিন তার কাছে থেকেও তুমি তার প্রতি অনুরাগিণী ছিলে না? তোমার আসক্তি ছিল না?

মুখ ঢাকা হাত দুখানা সরিয়ে নিয়ে ভুরু কপাল কুঁচকে বোধ করি ভেবে নিলে চাঁপা।

সুধাংশুবাবু বললেন—সব তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে, এই কথা বিশ্বাস করতে বল?

চাঁপা মুখ নত করলে এবার, তারপর বললে—না, তা বলব না। সংসারে দেহের একটা কামনা আছে—পেটের ক্ষিদের মত একটা ক্ষিদেও আছে। অভ্যাসেরও একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু এই তো সব নয়। দেহের পরে মন আছে। দেহের ক্ষিদে মিটে গেলে মন কেঁদেছে, দেহকে তিরস্কার করেছে। প্রতিজ্ঞা করতে বলেছে—কতবার প্রতিজ্ঞা করেছে—আর যাব না আর যাব না আর যাব না। সে চেষ্টাও করেছি। যাই নি। বাড়ি থেকে বের হই নি। বাড়ির দরজা বন্ধ করে থেকেছি। তারপর শুরু হয়েছে অদৃশ্য অজগরের পাকের চাপ।

আপনার মনে আছে? একবার মা আর আমি দেনার জন্যে নালিশের সমন নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম? ওই মল্লিকই নালিশ করেছিল। এ টাকা নিয়েছিল আমার স্বামী।

সুধাংশুবাবুর মনে পড়ে গেল আর একটি সন্ধ্যার কথা। তাঁর আপিসঘরে চৌকির উপর সামনেই বসেছিল এই চাঁপা। সেও প্রায় বারো বছর আগে। তখনকার চাঁপা ছিল তরুণী। মনে পড়ছে তার পিঠ ধরে তাকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিল সেই রুগ্ন ছেলেটা। মাথার চুলগুলি পিঙ্গল কোঁকড়ানো, চোখের তারাও পিঙ্গল, গায়ের রঙ তেমনি পিঙ্গলাভ গৌর; দুই হাত দিয়ে মায়ের মাথার কাপড় ধরে টেনেছিল; সঙ্গে সঙ্গে এই মা ফণাতোলা সাপের ছোবল মারার মত তার ডান হাতের ঝটকা দিয়ে ছেলেটাকে যেন ছোবলই মেরেছিল। ছেলেটা টাল সামলাতে পারে নি—তক্তাপোশের উপর থেকে মুখ ঠুকে পড়ে গিয়েছিল মেঝের উপর। আর্তনাদ করে কেঁদে উঠেছিল ছেলেটা। সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুবাবু ফেটে পড়েছিলেন নিষ্ঠুর ক্রোধে, বলেছিলেন —এই নির্লজ্জ নষ্ট মেয়ে কোথাকার!

মেয়েটা চকিতের মত দপ্ করে জলে উঠে তাঁর দিকে তাকিয়েই যেন নিভিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। এবং পরক্ষণেই বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে মাকে বলেছিল—বেরিয়ে আয় এখান

থেকে মা।

সেদিনও সুধাংশুবাবু তাকে বিচার করবার সময় সুবিচার করেন নি। মেয়েটির ওই আচরণের জন্য তাকে নষ্ট বলার হেতু ছিল না। সে কথাটা যেন আপনা থেকে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। হয়তো ওই বেদনা দুঃখে আহত মেয়েটির আজকের মাতৃরূপটিই আজকে তা মনে করিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, সুধাংশুবাবু আজ যেন সত্যই বাস্তবের চেয়ে কিছু বেশী অনুভব করছেন এই মুহূর্তে।

মনে পড়ল চাঁপার নাম রত্নমালা।

ওর স্বামী ছিল—তার নাম ছিল প্রণবকুমার চক্রবর্তী। সে তখন বিধবা কিন্তু সারা অবয়বে ছিল স্বৈরিণীর পরিচয়।

সেদিন চাঁপার জীবনের পাপের ছাপ গোপন ছিল না। তবে তার সঙ্গে একটা দর্পিত ঔদ্ধত্য ছিল। আজও সে পাপের ছাপ মোছে নি। অনেক চোখের জলে সে নিজেকে ধুয়েছে; তবু মোছে নি। কিন্তু সে ক্ষোভ তার নেই। ক্ষোভ তার মুছে গেছে।

চাঁপা বললে—রূপ আমার ছিল, তখন আমার অল্প বয়স—বয়স কত হবে? ষোল বছর। সদ্য বিয়ে হয়েছে। বছর ঘোরে নি। মা বাপের একমাত্র মেয়ে। বাপ তখনও একটা ফ্যাক্টরীর মালিক। জীবনে অনেক সাধ স্বপ্ন। যুদ্ধের ঝড়ে সে-সব উড়ে গেল। আমি উড়ে গেলাম না—ভেসে গেলাম না—না খেয়ে মরলাম না—বিক্রি হয়ে গেলাম। দেহ বিক্রি করে দিলে বাপ—দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করতে পারলাম না তাই আত্মাও বিক্রি হল আমার।

চার

বাবা ছিল বিচিত্র মানুষ। ফাঁকা শূন্য মাটির কলসীর মত মানুষ। বিয়াল্লিশ সালে যুদ্ধের বাজারে যখন সকলে লাভ করলে তখন বাবার হল দেনা। তার একটা কারণ হল সে সময় যে স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনের জন্য মিলিটারী কনট্রাক্ট নেয় নি। তার উপর চাটুজ্জেবাবুদের কাছে কোন একটা কনট্রাক্টের মাল দেয় নি বলে খেসারতের দায়ী হয়েছিল।

বাবার কথা হয়তো জানেন। বাবা সেকালের লোক। মদ খেতো, থিয়েটার-পাগল ছিল, চরিত্রদোষও ছিল কিন্তু তার সঙ্গে আশ্চর্য ভাবে স্বদেশীপাগলও ছিল। বিয়াল্লিশ সালে সাইক্লোন হয়ে বাংলাদেশ ভাসিয়ে দিয়েছিল উড়িয়ে দিয়েছিল—সারা কলকাতা শহরে মেদিনীপুরের আর চব্বিশ পরগণার মানুষেরা এসে ফ্যান আর এঁটোকাঁটা ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিল—পথের ধারে পড়ে মরছিল যখন, তখন বাবা আমার মাস কয়েক—তা মাস ছয় সাত একটা লঙ্গরখানা চালিয়েছিল।

থাক।

এসব বলে আজ কি লাভ?

কোন লাভ নেই। থেমে গেল চাঁপা।

সুধাংশুবাবু বললেন—বল। আমি শুনছি।

চাঁপা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নিজে আমি নিজেকে বিক্রি করি নি আপনি এইটুকু

বিশ্বাস করুন। এ দেশের সে-কালকে আপনি জানেন না—সে-কালে আমার মত অনেক মেয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিক্রি হয়ে গেছে। হয়তো সকল কালেই হয়। কিন্তু এই যুদ্ধের কালের মত এমন করে মা বাপের সংসারের পেটের দায়ে হাট বসিয়ে মেয়ে কখনও বিক্রি হয় নি। তাদের কার কি হয়েছে তা আমি জানি না। আমি আমার কথা বলছি। তাদের হয়তো অধিকাংশই মরে খালাস পেয়েছে। কত জনে এটাকেই জীবনে সইয়ে নিয়েছে। দিব্যি ঘর বাহির বজায় রেখেছে। কোন জ্বালা নেই কোন সংশয় নেই। শুধু আমিই মরতে পারি নি, মরি নি; বেঁচে থেকেও সইয়ে নিতে তো পারি নি। আজও পাপের পঙ্কে ডুবে আছি। সেই পাঁকের রসই আমি নিত্য পান করি। আমার সারা দেহ মন জ্বলে যায়। একটু থেমে তারপর বললে যেদিন বাবা আমাকে বেচলে, দু'হাজার টাকার নোট মল্লিক আমার হাতে দিলে, বাবা আমার হাত থেকে নিয়ে বেরিয়ে এল, আমি পঙ্গু হয়ে বসে রইলাম ঘরের মধ্যে, ঘরের আলোটা নিভে গেল। এরপর আমাকে বিশ্বাস করুন আমার দেহে মনে সত্যিই আগুন জ্বলল; আমি বাবাকে বললাম -বাবা আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচতে দাও। বাবা বেতমারা কুকুরের মত ছুটে পালাল। একদিন নয় দশদিন বলেছি— শেষে একদিন পাথর ছুঁড়ে মেরেছি বাবাকে। কপালটা ফেটে গেছিল তার। সে রক্ত আমাকেই আবার ধুয়ে মুছোতে হয়েছিল। বাবা আমার অভাবে লোভে দুঃখে জানোয়ারের অধম হয়ে পড়েছিল। মা ছিল অদ্ভুত মানুষ। সব অদৃষ্ট বলে মেনে নিত। বোবা বোকা অদৃষ্টের খেলার পুতুল।

বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ছিল। তাকে প্রথমটা বলতে পারি নি। শেষে তাকে ধরলাম। স্বামীকে বললাম—তুমি বাঁচাও। বাবা আমাকে বেচেছে—তুমি আমাকে ওর হাত থেকে খালাস করো।

চাঁপা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীরবে 'না' বলার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লে। জানালে, 'পারলে না' বা 'করলে না খালাস', অথবা 'হল না'।

বললে—এরা না সেই স্বামী না সেই পুরুষ। কীচকের হাত থেকে দ্রৌপদীকে ভীম রক্ষা করেছিলেন কীচককে মেরে। আমি আমার স্বামীর পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম, বলেছিলাম—তুমি বাঁচাও। কিন্তু আমার— ; কি বলব?

প্রশ্ন করে মেয়েটি কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—বাবা আমাকে ছুঁড়ে নরককুণ্ডে ফেলে দিয়েছিল—আমার স্বামীর দিকে আমি হাত বাড়িয়ে ডাকলাম, বললাম—আমাকে বাঁচাও; সে আমাকে বাঁচাতে এসে বুকে একখানা পাথর চাপিয়ে একেবারে এই দুঃসহ পঙ্ককুণ্ডটার পাঁকগোলা জলের তলায় পাঁকের উপর শুইয়ে দিয়ে গেল। আজও সেই সেইখানেই শুয়ে আছি আজ ষোল বছরের উপর। আশ্চর্য, মরি নি। মরণ তো এমনি এতে হয় না মরতে হয়—কিন্তু সে মরতে আমি পারি নি। এর জন্যে এত ঘেন্না নিজেকে করি যে কি বলব আপনাকে। একটু চুপ করে থেকে সে বললে—আমার বাবাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। আপনাকে কত বলব কলঙ্কের কথা লজ্জার কথা ঘেন্নার কথা; বাবার কলঙ্ককথা বলে শেষ হয় না—বাবা মদ খেতো, চরিত্রহীন ছিল—তার সঙ্গে দেশ দেশ করত—গরীবকে দেওয়ার নামে টাকা উড়িয়ে

বড়লোকগিরি করত। এই তো সব নয়; আমাকে বেচার আগেই বাবা আমার মাকে পাঠিয়েছিল চাটুজ্জেবাড়ি; সেখানে চাটুজ্জেবাড়ির বড়ছেলে মায়ের সর্বনাশ করেছিল। ছেলের মৃত্যুর পর চাটুজ্জে গিন্নী জানতে পারে ঘটনাটা। তার থেকেই চাকরি দিয়েছিল মাকে। তার পুজোর ঘর ঠাকুরের আসন পরিষ্কার করাতো। শুধু পেটের ভাতটা তাতে হতো। তার বেশী কিছু না। সংসারে অন্নের জন্যে মানুষ কি যে না পারে, না করে তা জানি না আমি। নিজেকে বেচেছি আবার মায়ের চাকরিটা তাও নিয়েছি। মায়ের পর আমি নিয়েছিলাম সে কাজ। নিতা যেতাম সকালে আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে সে আপনি দেখেছেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুধাংশুবাবু।

মনে হল কথাটা ইঙ্গিতে নিত্যবাবু যেন বলেছিলেন।

চাঁপা বললে --কিন্তু বাবার থেকেও আমি বেশী ঘৃণা করেছিলাম আমার স্বামীকে। সে আমার স্বামী। আপনি বিশ্বাস করুন ব্যভিচারে আমার প্রবৃত্তি ছিল না, অলংকার আভরণ সাজসজ্জা এতেও আমার লোভ ছিল না, আমার রূপ ছিল, তখন আমার সদ্য-যৌবন, নতুন জোওয়ান—সেও তখন নবযৌবনে, নারীর উপর তার লোভ ছিল--কিন্তু সে ওই রাক্ষসটার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারে নি। দুজনে আমরা পরামর্শ করেছিলাম—তাকে আমি তাতিয়েছিলাম, বলেছিলাম—তুমি ওকে খুন কর। ছোরা কিনবার টাকা তাকে আমি দিয়েছিলাম। ছোরা কিনেও সে এনেছিল। গিয়েও সে ছিল। কিন্তু খুন করে প্রাণ নেওয়ার বদলে সে টাকা নিয়ে ফিরে এসেছিল চোরের মত। কম টাকা নয়—তাকেও দু'হাজার টাকা দিয়ে বলেছিল—ব্যবসা কর। আরও সাহায্য করব আমি। কি হয়েছিল শুনুন।

আমার স্বামীর নাম প্রণব চক্রবর্তী। অবিকল নীলু।

একটু হেসে চাঁপা বললে—ভুল বলছি—নীলু অবিকল তার মত। ওই গায়ের রঙ ওই কটা গৌরবর্ণ কটাসে চুল, ওই খয়রা কটা চোখের তারা, ওই মুখ ওই সব।

থেমে গেল চাঁপা। হঠাৎ যেন তার ভেতর থেকে কেউ বা কিছু তাকে থামিয়ে দিলে। থমথম করে উঠল তার মুখ।

চাঁপা বলেছিল তার রূপ ছিল।

মিথ্যে বলে নি। তা ছিল। কিন্তু সে রূপের উপর বিচিত্রভাবে কিছুর যেন ছায়া পড়েছে। একটা গ্লানির আস্তরণ পড়েছে। সেই আস্তরণ ভেদ করে বিদ্যুচ্চমকের মত কিছু খেলে গেল। সেটা হয় ক্ষোভ নয় ক্রোধ অথবা একটা নিদারুণ কোন আক্ষেপ।

তারপর বললে—তার সঙ্গে নীলুর চেহারার এত মিল বলেই নীলুকে আমি তার জন্মকাল থেকে চোখে পাড়ি নি। তাকে ঘেন্না করে এসেছি—তার মৃত্যু কামনা করেছি। মায়ের কাছে ছেলের যা পাওনা তার, বলতে গেলে, কিছুই দিই নি। অহরহ কেমনভাবে মর মর বলে তাকে অভিসম্পাত দিয়েছি সে আপনি নিজে জানেন। কাছে আসতে চাইলে কিভাবে তাকে কুকুর বেড়ালের মত আঘাত করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছি তাও আপনি দেখেছেন।

নীলুর কপালে নাকে মাথায় পাঁচ-ছ'টা কাটার দাগ আছে। তার মধ্যে আমার নিজের হাতের আঘাত আছে তিন-চারটে। বাকি দু'তিনটে সেও আমারই অবহেলায় অথবা ঠেলায় কি হাতের ঝটকায় পড়ে গিয়ে কেটে গিয়ে দাগ রেখে গেছে। কত আঘাতের কত চিহ্ন যে নীলু আপন সহগুণে নিজেই মুছে ফেলেছে তার আর হিসেব নেই।

সুধাংশুবাবু বললেন—তুমি যা বলছিলে তাই বল। তোমার স্বামীকে তুমি সমস্ত বলেছিলে এবং দুজনে ঠিক করেছিলে যে, ওই মল্লিককে সে মানে প্রণব খুন করবে, কিন্তু সে তাকে খুন করতে গিয়ে আরও দু'হাজার টাকা নিয়ে ফিরে এসেছিল। বল কি হয়েছিল। তার আগে দাঁড়াও, কতদিন আগের ঘটনা? যেদিন তোমার বাবা তোমাকে বেচে দু'হাজার টাকা নিয়ে এসেছিল, তার কতদিন পর? হ্যাঁ। বিয়ের কতদিন পর এ ঘটনা ঘটেছিল? মানে তোমার বাবা তোমাকে এমনভাবে বেচেছিল? যখন বিক্রি করে তখনই বা সে কোথায় ছিল? মানে তোমার স্বামী? দেশ কোথায় ছিল তার? তাদের অবস্থাই বা কেমন ছিল? সংসারে স্ত্রী কন্যা ভগ্নী বিক্রির হাজার লক্ষ কোটি নজীর আছে কিন্তু তার পিছনেও থাকে নানান কারণ। মদ মানুষ খায়, নেশার লোভেও খায়, নিদারুণ শোকেও খায়, আবার ডাকাতি খুন করবার আগেও খায়।

মা-বাপ নেই, কলেজে পড়ে এমনি দেখেই বাবা আমার স্বামীকে পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিল। সে নাকি লেখাপড়ায় ভাল ছিল। ইচ্ছে ছিল, আমি তার এক মেয়ে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরে রাখবে; জামাই ছেলের মতই তার সব দেখবে—ঘরসংসার কারখানা চালাবে।

কারখানা তখনও চলছিল। তখনও বাবা বুঝতে পারে নি যে ভিতরে ভিতরে সর্বনাশ তার হয়ে গেছে।

চৌদ্দ বছরে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমার স্বামী তখন আই-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছে। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের তিন মাস পরে রেজাল্ট বের হল। খুব ভাল করে পাস করেছিল জামাই। বাবা তাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল। থাকত হোস্টেলে। রবিবারে ছুটিতে আসত, থাকত, চলে যেত। এক বছরের মধ্যে সব উলটে গেল পালটে গেল; ওই বিয়াল্লিশের ঝড়ে যেমন সারা দেশটা ভেসে গিছল উড়ে গিছল তছনছ হয়ে গিছল তেমনি-ভাবে আমাদের সংসার অবস্থা সব ভিতধ্বসা বাড়ির মত ভেঙে পড়েছিল—মাথার উপরের চাল উড়ে যাওয়ার মত উড়ে গিয়েছিল।

তবে বিয়াল্লিশ সালে নয়, দু'বছর পরে বাবার উপর ঝড়টা এল—১৯৪৪ সালে হঠাৎ একদিন বডি ওয়ারেন্ট এসে হাজির হল। আদালতের লোক পুলিস বাবার নামে বডি ওয়ারেন্ট দেখিয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলল। ওদিকে কারখানাতেও তালা চাবি দিয়ে সীল করে পাহারাওলা বসিয়ে দিয়েছে। বাবা কোনরকমে একশো টাকা ঘুষ দিয়ে বেরিয়ে পালাল।

সে অনেক কথা।

গহনাগাটি বিক্রি করে টাকা দেওয়া হল। বাড়ি বন্ধক পড়ল চাটুজ্জেদের কাছে। মা অনেক

সেবা করে এল চাটুজ্জেদের ঠাকুরের চাটুজ্জেদের বুড়ো কর্তার ; কিন্তু দায় তাতেও মিটল না। অবশেষে বাবা একদিন আমাকে বেচলে। ১৯৪৪ সালে।

আমি সর্বাঙ্গে একটা জ্বালা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। তিন দিন খাই নি। উপোস করে পড়ে ছিলাম। মা পুতুলের মত মাথার কাছে বসে ছিল। বাবা থিয়েটারে অ্যাকটিং করে যারা শোক করে, তাদের মত বুক চাপড়ে হায় হায় করলে। তিন দিন পর মল্লিকই এল, এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

সেদিন সে রাজ্যের জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। গহনা শাড়ি ব্লাউজ খাবারদাবার—সে যেন একটা নতুন বিয়ের পরের তত্ত্বতল্লাশী ভারভারোটা। সেন্ট পাউডার স্নো সাবান—সে থরে থরে সাজানো জিনিস।

ইচ্ছে হয়েছিল পায়ের লাথি মেরে সব ছুঁড়ে ফেলে দি—ভেঙে চুরমার হয়ে যাক। কিন্তু পারি নি। কেন শুনুন !

লোকটা আমার সামনে দাঁড়াবামাত্র আমার ভয়ের আর শেষ ছিল না। বুকের ভিতরটা যেন কাঁপছিল। মনে পড়ে গেল দু'হাজার টাকা সে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল। বাবা টাকাটা আমার হাত থেকে নিয়ে আমাকে তার কাছে রেখে চলে গিয়েছিল বেরিয়ে।

লোকটা আমাকে ভোগ করেছিল বুভুক্ষুর মত। রাক্ষসের মত। আমার চেতনা ছিল না—আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সে আমাকে গাড়ি করে এনে ওই আমাদের গলির মোড়ে, যে মোড় দিয়ে আপনি সেদিন ঢুকে পড়েছিলেন, যে মোড়ের মাথায় মল্লিক খুন হয়েছে সেই মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। মোড়ে বাবা দাঁড়িয়ে ছিল, আমার হাত ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ছে লোকটা আমাকে বলেছিল—তোমার বাবা তোমাকে বেচেছেন আমাকে। তুমি এখন আমার।

তখন আমার বয়স ষোল তো পৌঁছয় নি। আমি বোবার মত শুধু শুনেইছিলাম। এ কাল হলে হয়তো বলতে পারতাম, বলতাম মানুষ টাকায় বিক্রি হয় না। মানুষ কেনা-বেচার কাল চলে গেছে। কিন্তু সেকালে সে বোধও জন্মায় নি সাহস তো হয়ই নি।

তাই তিন দিন উপোস করে আছি যখন তখন সেই লোক, যে লোক সেদিন দু'হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে আমার অবশ বিবশ অসাড় দেহখানাকে ছিনিমিনি খেলার নজীর মনে পড়িয়ে দিয়ে আমাকে কিনেছে বলে মুখের কথার দলিল আমার সামনে ধরলে, তখন আমার মনে হল আমার বুঝি উপোস করে কি বিষ খেয়ে মরারও অধিকার নেই। লোকটা বোবা আমাকে দিয়ে যে মৌন সম্মতির সই বা টিপটাপ দিয়ে নিয়েছে তা আমার অস্বীকার করবার সব জোর একমুহূর্তে হারিয়ে গেল।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কেঁপে উঠলাম।

'—একটু জল দেবেন, আমি একটু জল খাব।'

চাঁপা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে কথা ক'টি বললে।

সুধাংশুবাবু একেবারে যেন আচ্ছন্নের মত বসে শুনছিলেন। চাঁপা চুপ করতেই এবং কথা কয়টার অর্থ তাঁকে বাস্তবে এই ১৯৬০ সালের জুলাই অর্থাৎ শ্রাবণের রিমিঝিমি বর্ষণে ভিজে ভিজে এই রাত্রির অস্তিত্বে সচেতন করে তুললে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দেওয়ালের ক্লক ঘড়িটার পেণ্ডুলামের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

চাঁপার মুখখানার উপর তাঁর দৃষ্টিও এতক্ষণে সচেতন হল। সত্যই চাঁপার একদা রূপ ছিল। আজও আছে—নেই তা নয়। তবে আজকের রূপ বাসী ফুলের মত। গন্ধেও তার সেই এক পরিচয়। বিকৃত এবং বাসী। চাঁপার মুখের উপর চোখের কোল থেকে চিবুক পর্যন্ত দুটো দাগ আলোর ছটায় চকচক করছে। যতক্ষণ এই কথা সে বলছে ততক্ষণ সে নিরন্তর আত্মসংবরণের চেষ্টা করে ধীরে ধীরে কথা বলেছে এবং এরই মধ্যে-মাঝে কেঁদেও চলেছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছে, গড়িয়ে ঝরে পড়েছে, চাঁপা তা মুছতে চেষ্টা করে নি; হয়তো তাঁর মতই তারও এ সম্পর্কে কোন সচেতনতা ছিল না।

তিনি একদিকে শুনেছিলেন অন্যদিকে তিনি বিচার করছিলেন মেয়েটির কথার সত্যাসত্য।

মেয়েটি?

মেয়েটি অকপট সত্য বলে যাচ্ছিল তার সাক্ষী ওই দুটি জলধারার চিহ্ন। সেও নিজেকে বিচার করে কথা বলছিল।

সুধাংশুবাবুর টেবিলের উপর পুঁতির ঝালর দেওয়া নেটের ঢাকনি ঢাকা কাচের গ্লাসে জল ছিল, গ্লাসটি তিনি নিজের হাতে তুলে বাড়িয়ে ধরলেন।

—খাও।

মেয়েটি বললে—এই গ্লাসে খাব?

—খাবে।

কিন্তু মেয়েটি তা খেলে না, গ্লাসটি হাতে নিয়ে বাইরে গিয়ে গ্লাসটা উঁচু করে ধরে মুখ তুলে আলগোছে ঢেলে জল খেয়ে নিলে, তারপর খসে পড়া ঘোমটাটি আবার মাথা ঢেকে বিন্যস্ত করে নিয়ে এসে সামনে বসল। জলের গ্লাসটি টেবিলের তলায় রেখে দিলে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে সুধাংশুবাবু চুপ করে বসে ছিলেন। তাঁর কাছে এই মুহূর্তে সব হারিয়ে গেছে। চোখে কিছু দেখছেন না—মনে কিছু ভাবছেন না। কানের কাছে শুধু শেষ কথা কয়টা ধ্বনিত হচ্ছে এবং এই হতভাগিনী মেয়েটার বলা কাহিনী, যে-পর্যন্ত সে বলেছে, তারই প্রভাব তাঁর চেতনা ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সামনে বারান্দার বাইরে পথের উপর বর্ষার রাত্রি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধ্যরাত্রির দিকে এগিয়ে চলেছে; রাস্তায় ইলেকট্রিক আলোর পোস্টে বাল্ব নেই, কেউ চুরি করেছে অথবা মিউনিসিপ্যালিটির যারা আলো দেয় তারাই ওটা দেয় নি। পরের পোস্টটার আলো থেকে একটু আলোর আভাস অন্ধকার শূন্য-মণ্ডলে জেগে রয়েছে, তাঁর ঘরের ভিতরের কিছুটা আলো বারান্দা পার হয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মশেছে, সেই সংযোগস্থলের আভাসিত শূন্যমণ্ডলে দেখা যাচ্ছে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে।

রাস্তা নির্জন হয়ে গেছে। তিনি প্রতীক্ষা করে রয়েছেন চাঁপা মেয়েটির কথা শুনবার জন্য।

১৯৪২।৪৩।৪৪ সালের কথা মনে পড়ছে।

১৯৪২ সালে তিনি নতুন উকিল। মনে পড়ছে সে সময়কার কথা। ১৯৪৩ সালের পূজা সাহিত্যে লেখাগুলো আজও বেঁচে আছে। মন্বন্তর উপন্যাসের গীতা বলে মেয়েটির ঠিক এই কথা। প্রবোধ সান্যালের অঙ্গার গল্পের সেই কটি মেয়ের বিলাপের মত সকরুণ আক্ষেপের সঙ্গে চাঁপার এই কথাগুলির এতটুকু গরমিল নেই। সেই সময়ের বাংলাদেশের এই সব হতভাগিনী-দের মর্মান্তিক বিলাপ এবং সহস্রমুণ্ড রাবণের মত কালোবাজারী অর্থশক্তিতে বলীয়ান মানুষের সে অত্যাচার নিষ্ঠুরতম সত্য বলেই, এই মুহূর্তে সুধাংশুবাবুর মনে পড়ছে। চিত্রায় জয়নাল আবেদিন সাহেবের কালো কালিতে আঁকা ছবিগুলো মনে পডছে। শুধু সাহিত্য শিল্প কেন, তাঁর নিজের ওকালতির ইতিহাসে তাঁর সেরেস্তায় খাতার পাতায় পাতায় এমনি ছোট বড কেসের কথা আছে।

চাঁপা মিথ্যা বলে নি। তার কাহিনীর সত্য ইতিহাসের পাতা খুলে দিয়েছে।

মনে পডল গ্রামাঞ্চল থেকে যারা বেরিয়েছিল পেটের জ্বালায় তাদের যারা মরেছে তারা বেঁচেছে—যারা আছে যাদের যৌবন ছিল রূপ ছিল তারা আর ফেরে নি। এবং সেই যে সেদিন যুদ্ধের দ্যূতসভায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করেছিল তার পালা আজও শেষ হয় নি।

চাঁপা এবার কথা বললে—এবার শুরু করলে সে।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুধাংশুবাবু। তার চিন্তার প্রবহমানতা খণ্ডিত হল। ছেদ পডল।

চাঁপা বললে—যতবার চেষ্টা করেছি সাহস আনতে চেয়েছি বুকের মধ্যে ততবার যেমনি ওই লোকটা সামনে এসে দাঁডিয়েছে অমনি ভেঙে বসে পডেছি। মনের সাহস চলে গেছে দেহের শক্তি চলে গেছে—আমি যেন হয়ে পডেছি সাপের মুখে ধরা পডা ব্যাঙের মত। আমাদের গলিটার নর্দমায় একটা খুব মোটা জলঢোঁডা সাপ আছে—সেটা রোজই প্রায় ব্যাঙটাকে কামডে ধরে মাথা উঁচু করে চলে যায় আমাদেরই উঠোনের মাঝখান দিয়ে। উঠোনের কোণে জঙ্গলের মধ্যে তার একটা গর্ত আছে। সেখানে গিয়ে সেটাকে নির্বিবাদে গেলে। আমি দেখেছি তার গেলা। ব্যাঙটা যদি বা কাতরায় কিন্তু হাত পা ছোঁডার বাধা দেবার শক্তি তার থাকে না। মধ্যে মধ্যে কোন একটা পা হয়তো থরথর করে কাঁপে।

হেসে চাঁপা বলে—জানেন লোকে বলে, মায়ের কাছে শুনেছি,—মা পাডাগাঁয়ের মেয়ে, বলে সাপে যখন ব্যাঙ ধরে তখন ব্যাঙটা যে ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দে কাতরায় তাতে বলে—কড়ি নে। কড়ি নে। তার মানে হল সাপটা হল গত জন্মের পাওনাদার আর ব্যাঙটা হল ওই গত জন্মেরই দেনাদার। পাওনাদারের দেনা দেয় নি। তাই এ জন্মে পাওনাদার হয়েছে সাপ ও হয়েছে ব্যাঙ! থাক। এখন যা ঘটেছিল বলি শুনুন। আমার স্বামীর কথা।

মাস চারেক পর একদিন এই লোকটাই শ্রীরঙ্গম থিয়েটারের টিকিট কিনে আনলে। আমার

স্বামী তখনও কিছু জানে না। সে তখনও হোস্টেলে থাকে। খরচ ওই মল্লিকই দিত। শ্রীরঙ্গমে সেদিন হচ্ছিল 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। শিশিরকুমার ভাদুড়ী করবেন 'ভীম'।

—কোথা থেকে যে কি হয়! কি থেকে যে মানুষ কি পায়! সে এক আশ্চর্য হাসি হাসলে চাপা। হেসে বললে—দ্রৌপদী ভীমকে কীচকের কথা বললে ভীম তাকে আশ্বাস দিলে—তারপর কীচককে বধ করলে। আমার বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠল। মনে হল এই তো আমি উপায় পেয়েছি। যুধিষ্ঠিরের উপর ঘেন্না হল—অর্জুনকে বলতে ইচ্ছে হল তুমি ওই বৃহন্নলা হয়েই থাক আজীবন!

• একটু থেমে সে বললে—আজও আমি ভীমের ভক্ত। মহাভারতে আমার কাছে ভীমের চেয়ে বড় বীর নেই—বড় মানুষ নেই।

—মনে আছে সপ্তাহের মাঝখানে বৃহস্পতিবারে পাণ্ডবগৌরব দেখতে গিয়েছিলাম। শুক্র-বার তাকে চিঠি লিখলাম—নিশ্চয়ই আসবে কাল। না এলে আমাকে আর বেঁচে থাকতে দেখতে পাবে না। কিন্তু শনিবার সে এল না, এল পরের দিন রবিবার। শনিবার কোথায় গিছল। চিঠি পৌঁচেছিল সন্ধ্যের ডাকে। তখন আর হোস্টেল থেকে আসবার উপায় ছিল না। শনিবার রবিবার লোকটার ডাক আসত না। ও দু'দিন তার অন্য আড্ডা ছিল। সে সব নাকি নাচগানের আসর।

সারাদিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে চিঠি লিখে তার হাতে দিয়ে বললাম—পড়ে দেখ।

চিঠিতে লিখেছিলাম—যদি আমাকে মরতে বল তবে তুমিই আমাকে মার, খুন কর। নয়তো বিষ এনে দাও—তুমি গুলে তুলে দাও আমি খাই—নয়তো মহাভারতের ভীমের মত তুমি ওকে খুন করে আমাকে বাঁচাও।

সারারাত সেও বোবা হয়ে বসে রইল আমিও বোবা হয়ে বসে রইলাম। যখন রাত্রি শেষ হয়ে এল—ক্লক ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে চারটে বাজল তখন আর আমি থাকতে পারলাম না, লজ্জার সব বাধাবন্ধন টেনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার দুটো পা জড়িয়ে ধরে বললাম—বল আমি কি করব। কে আমাকে বাঁচাবে? আমি কি এমনি করেই মরব জ্বলব আজীবন?

সে আমাকে—।

একটু থেমে আবার বললে—দু'হাতে সমাদর করে বুকে তুলে নিয়েছিল। ভরসা দিয়ে বলেছিল—কোন ভয় নেই। এ বাঁচানোর দায় আমার। আমিই বাঁচাব তোমাকে।

আমি বলেছিলাম—আমাকে ঘেন্না করছ না তুমি?

—না। তারপর খুব জোর করে বলেছিল—আমি একালের মানুষ রত্না। একটু থেমে মেয়েটি বললে—জীবনে কতকগুলো কথা মনে থেকে যায় কাটা দাগের মত। সে রাত্রের কথা আমার তেমনি যেন কাটা দাগ হয়ে বসে আছে। অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। সারারাত্রি দুজনে বোবার মত পড়ে থাকার পর ভোরবেলা এসব কথা হয়েছিল। ভোরবেলাতে সে হঠাৎ

আমাকে সমাদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। সোমবার সকালে উঠেও সে চলে যায় নি। সারাদিন শুধু এই নিয়েই কথা বলেছিল। অনেক কবিতা মুখস্থ ছিল তার। সত্যকাম জাবাল আর তার মা জাবালাকে নিয়ে কবিতা শুনিয়েছিল আমাকে। মহাভারতের অহল্যার গল্প বলেছিল। আর গল্প বলেছিল কলেজে পড়া নেপালী ছেলে 'খড়্গবাহাদুরের' কথা। খড়্গ-বাহাদুর নেপালী মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করবার জন্য—তাদের যুবতী মেয়ে কেনার গোপন ব্যবসা বন্ধ করবার জন্য একজন ধনী ব্যবসাদারকে খুন করে গিয়ে থানায় ধরা দিয়ে বলেছিল—আমাকে ফাঁসি দাও। আমার স্বামী বলেছিল—তুমি আমার স্ত্রী—তোমাকে কিনে তোমাকে যে শয়তান ভোগ করেছে তাকে খুন করে আমি গিয়ে বলব—দাও আমাকে ফাঁসি দাও!

সারাটা দিন নানান জল্পনা করেছিলাম।

সোমবার রাত্রিতেও সে আমাদের বাড়িতে ছিল। বিকেলে আমার কাছে টাকা নিয়ে কলকাতায় গিয়ে ছোরা কিনে নিয়ে ফিরে এসেছিল। সেটা একটা স্প্রিং-দেওয়া ছোরা। অনেকখানি লম্বা। ডগাটা ছুঁচলো আর ডগার দিকটার দু'দিকেই ধারালো। পরামর্শ করে ঠিক হয়েছিল পরের বৃহস্পতিবার আবার থিয়েটার দেখতে যাব। বাবাকে বলব—বাবা তাকে বলবে। এদিন তার সঙ্গে একলা যাব। সে তাতে খুশীই হবে। থিয়েটার শেষে সে আমাকে নামিয়ে দিতে আসবে এখানে। ওই গলির মোড়ে নামিয়ে দিলে আমি বলব আমাকে একটু দাঁড়িয়ে যাও। বাবা যদি থাকে দাঁড়িয়ে তাহলেও তাকে ডাকব। সে ছোরা নিয়ে গলিতে অপেক্ষা করে থাকবে। গলিতে ঢুকবামাত্র সে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দেবে।

তারপর কি হবে তা ভাবি নি। কি হবে এ চিন্তা আসে নি। শুধু এই মহাপাপ এই নরকের জ্বালা এই নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাব এইটেই মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিল। দেশে তখন আকাশের বাতাসের মধ্যে দিয়ে তুফান বয়ে গেছে, দুর্ভিক্ষের জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে, যারা অভাবী, যারা মরছে, যারা ডুবছে, যাদের বাড়িঘর মানসম্ভ্রম সর্বস্ব হারাচ্ছে তারা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চাচ্ছে—তাতে যা হয় হোক। আমরা দুজনে সদ্য বিয়ে হওয়া ছেলে এবং মেয়ে—তার বয়স সবে উনিশ, আমার বয়স ষোলতে আমি পা দিয়েছি—আমাদের দুজনেরই বুকে জ্বলছে আগুন। কি হবে তা ভাবি নি, ভাবতে চাই নি, সে ভাবনা মনে আসে নি। তবু মোটামুটি ঠিক হয়েছিল খুন করে সে পালাবে। প্রথম আমি বলব একটা গুণ্ডা লোক তাকে খুন করে পালিয়েছে—আমার গলার হার ছিঁড়ে ফেলে দেব গলির উপর। বলব—আমার হার ছিঁড়ে নিচ্ছিল দেখে সে তাকে বাধা দিয়েছিল, গুণ্ডাটা তাকে ছুরি মেরে পালিয়েছে।

আর ধরাই যদি পড়ি তাহলে আমি বলব সত্য কথা।

সেও বলবে—আমার স্ত্রীর সতীত্ব যে নষ্ট করেছে—যে শয়তান আমার স্ত্রীকে টাকার জোরে হরণ করেছে তাকে আমি খুন করেছি। রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল—রাম তাকে বধ করেছিলেন। আমিও আমার স্ত্রীর সতীত্বহরণকারীকে বধ করেছি।

সে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল।

আমিও পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস দেখে এসেছিলাম—ঠিক যেন দ্রৌপদীর উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। সারা রাত্রি সারা দিন ঘুম হয় নি। কিন্তু—

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে চাঁপা। এবং চুপ করে গেল কিছুক্ষণের জন্য। মুখের উপর চোখের জলের দাগ দুটো আবার চিকচিক করে উঠল। এরই মধ্যে একটু আশ্চর্য হাসি হেসে চাঁপা বার দুয়েক 'না'-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললে—হয় আমার কপাল, নয়তো নিতান্ত কাঁচা কাজ হয়েছিল। খুন করা যে কতটা কঠিন তা বুঝি নি। কিংবা—।

চুপ করে গেল চাঁপা।

একটু চুপ করে থেকে বললে—হয়তো সেই ছিল নিজে অত্যন্ত ভীরু! অত্যন্ত ভীরু। আমার চোখের সামনে নীলু তো তাকে মারলে। ঠিক যেমন করে মারবার কল্পনা করেছিলাম—যেখানটায় মারবার কথা হয়েছিল ঠিক সেইখানটায় নীলু তার পেটে বুকে ছুরি মারলে—পড়ে গেলে মুখে লাথি মারলে।

আবার চুপ করে গেল।

সুধাংশুবাবু বললেন—তুমি সেই দিনের কথা বল। থিয়েটার থেকে ফেরার পথে তোমার স্বামী কি করলে? ভয়ে পালিয়ে গেল?

—না। ছুরি তুললে। কিন্তু মল্লিক খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলল। হাতখানা তার আগে থেকেই কাঁপছিল এবার ধরার সঙ্গে সঙ্গে ছুরিখানা খসে মাটিতে পড়ে গেল। ঠিক গলির মোড়ে গ্যাস পোস্টটার নিচে। আমি দেখলাম মুখখানা সাদা হয়ে গেছে তার। বাবা চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল—প্রণব! প্রণব হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল।—ছেড়ে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন। আমি চলে যাব। আর কখনও আসব না।—ও- -ও—আমাকে—। আর আমি শুনি নি। ভয় বোধ হয় আমিও পেয়েছিলাম। আমিও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিছলাম।

সেই দিন রাত্রে আমি আবার বিক্রি হলাম।

এর আগেকার বিক্রি করেছিল বাবা। এবার প্রাণের দায়ে বিক্রি করলে স্বামী। তার সঙ্গে আমি নিজে বিক্রি করলাম নিজেকে।

আমাদের বাড়িতে আমারই শোবার ঘরে বসে নিজের হাতে আমার স্বামী লিখলে—সে এবং আমি ষড়যন্ত্র করে আমার রূপ-যৌবনের লোভ দেখিয়ে এ বাড়িতে এনে তাকে খুন করার প্ল্যান করেছিলাম। তাতে সই করিয়ে নিলে আমার স্বামীর, আমার; সাক্ষী রইল আমার বাবা আর তার ড্রাইভার।

আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিয়ে গেল নগদ দু'হাজার টাকা। বললে—এসব করো না। লাভ হবে না। টাকা নিয়ে ব্যবসা করো। আমার অধীনে সাবকন্ট্রাক্ট তোমাকে দেব আমি। এভাবে বদ মতলব করো না। গ্রামাদের দক্ষিণ অঞ্চলে গরীব লোকেরা ছোট জাতের বাঁ হাতের

বুড়ো আঙুলের নখে রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে টিপে উকুন মারে। তেমনি ভাবে নখের চাপে মরে যাবে।

হেসে বললে। তোমার বউ তোমারই থাকবে। থাকল। আমরা একটু-আধটু আনন্দ করব চলে যাব। এর জন্যে এত ফোঁসফোঁসানি কেন হে?

সে রাত্রে সারারাত সে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। মড়ার মত। নড়লে না কথা বললে না। আমিও উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম। আমি কাঁদলাম সারারাত। সে খাটের উপর আমি মেঝের উপর মুখ গুঁজে।

সকালবেলা সে উঠে কোন কথা না বলে চলে গেল। আমি দেখেও দেখলাম না। বাবাও বোবা হয়ে যাওয়া দেখলে। মা কাঁদলে আর দেখলে। বলতে কিছু পারলে না।

সেও বেরিয়ে গেল ঘাড় হেঁট করে। এ কথাও বলতে পারলে না যে তোমাদের মেয়ে রইল আর আমি আসব না।

এক মাস আর এল না। বাবা যেতেও পারলে না তার হোস্টেলে। বাবা পারলে না লজ্জায়। আমাকে মা বললে—চিঠি লেখ। কিন্তু আমি লিখলাম না। আমার লজ্জা হল না, ঘেন্না হল।

ঘেন্না তখন জন্মেছে। একতলা থেকে দোতলার মত ভারী ইমারত হয়ে গড়ে উঠেছে। ঘেন্নার একতলাটা ওর ভীরুতার জন্য। ওর সেই হাউ হাউ কান্নার জন্য। ও যে বলেছিল, আমাকে ছেড়ে দিন আমি চলে যাব—কখনও আসব না।—তার জন্য। ওর ওপর দোতলা ইমারত গড়ে উঠল তার পরের দিন, ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। দু'হাজার টাকা যেটা মল্লিক ওকে দিয়েছিল গতরাত্রে সেটা ও নিয়ে গেল সঙ্গে করে—এই খবরটা ফাঁস হবামাত্র একতলা ঘেন্নার ইমারত দোতলা হয়ে উঠল। সেটা তিনতলা হয়ে উঠল আরও এক মাস পর। আমাদের বাড়িতে নির্লজ্জ লোকটা পাকাপাকি বাস করতে এল। মল্লিকই ব্যবস্থা করে দিলে। বললে, পড়ে কি হবে। আমার আণ্ডারে সাবকন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করুক।

আমার মধ্যে তখন নীলু এসেছে। বুঝতে শুরু করেছি তার সাড়া। সারা শরীর মন ঘেন্নায় ঘিনঘিন করে উঠেছিল—রাগে মন হয়ে উঠেছিল তপ্ত কড়াইয়ের মত; কেউ কিছু বললে তাকে উত্তাপে ঝলসে দিতাম—নিজে জ্বলতাম—দেহে যেন মনে হত কেউ লঙ্কা বেঁটে মাখিয়ে দিয়েছে।

বার বার প্রতিদিন মনে মনে বলেছি ছেলেটা যেন গর্ভেই মরে যায়—ওকে পেটে নিয়েই আমি মরি। কিংবা ভূমিষ্ঠ হতে হতে মরে যায়। কার ছেলের মা হব আমি? ওই রাক্ষস মল্লিকের? না এই অক্ষম ভীরু অপদার্থ আমার ওই স্বামী ওই গোলামটার? হায় হায় হায়, ছ'মাস পর নীলু জন্মালো—তখন ওর বাবা মরেছে আমার বাবা মরেছে। ছেলেটা জন্মের মুহূর্ত থেকে অবিকল বাপের মত দেখতে। কটা চুল কটাসে রঙ চোখ দুটো তখন খয়রা রঙের ছিল না নীল রঙের ছিল।

মুখের দিকে তাকিয়ে আমার আর ঘেন্নার আক্রোশের অন্ত রইল না।

বাপ আর স্বামী মরবার পর মল্লিক আমাকে বলেছিল—আমি বাড়ি ভাড়া করি তুমি সেখানে গিয়ে থাকবে চল। কেন এখানে কষ্ট করবে!

আমি তা যাই নি।

আমাকে সে সুখ সম্পদ দিতে চেয়েছে—আমার তা পছন্দ হয় নি। তার উপর আমার সে ঘেন্না কোন দিন যায় নি। তাকে আমি ভয় করতাম। সে আমাকে কিনেছিল। আমার আর আমার স্বামীর সই করা একখানা কাগজ তার কাছে ছিল। স্বামীর সই করা টাকা ধারের দলিল সে বছর বছর আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে।

আমি এতটুকু মিথ্যে বলি নি বাড়িয়ে বলি নি। বিশ্বাস করতে হয় করবেন নইলে করবেন না। আমি পাপিনী এ কথা কেউ না-জানা নয়। পাপের কোন সাফাই নেই, সে সাফাই আমি গাইছি না। শুধু এইটুকু বিশ্বাস করুন যে, সারা সংসারের উপর আমার ঘেন্না। ঈশ্বরের উপর ঘেন্না—মানুষের উপর ঘেন্না—নিজের উপর ঘেন্না—মা বাপের উপর ঘেন্না—মল্লিক আমার শত্রু কিন্তু সব থেকে বেশী ঘেন্না আমার ওই অক্ষম ভীরু কাপুরুষ স্বামীর উপর। তার ছেলে বলে নীলুকে আমি জন্মদিন থেকে ঘেন্না করে এসেছি। একটা কথা বলি—জন্মের পর কতদিন কতবার যে মনে মনে চেয়েছি—মরে যাক ওটা মরে যাক আমার আপদ যাক। কতদিন ভেবেছি ছেলেটার মুখের উপর একটা বালিশ চাপিয়ে কিছু ভার চাপিয়ে দি। কিন্তু পারি নি আমার মায়ের জন্যে—আর পারি নি ওই মল্লিক লোকটার জন্যে। কেন জানি না সে এর বিরোধী ছিল। বলত—মহাপাপ। আমার সর্বনাশ করে তার পাপ হয় নি কিন্তু ছেলেটাকে মেরে ফেললে মহাপাপ হবে এ কথা যে কতদিন বলেছে তার ঠিক নেই। বলত—খবরদার! খবরদার! মহাপাপ হবে। এ যেন কখনও করো না।

চুপ করে গেল চাঁপা।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বেশ কিছুক্ষণ। বাড়ির ভিতর থেকে তাগিদ এল। সুধাংশুবাবু বললেন—মক্কেলের কথা শুনছি। দেরি হবে।

বাইরে বৃষ্টিটা চেপে এল কিছুক্ষণের জন্য। সুধাংশুবাবু রত্নমালাকে ভাল করে দেখলেন। তার অবয়বের ভাঁজে ভাঁজে বিশেষ করে এলানো চুল বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে থাকার মধ্যেও যে-একটি ছাঁদ রয়েছে এবং চোখে ও মুখে যে-একটি কিছু রয়েছে তাতে সে প্রেতিনী। তিনি বারো বছর আগে তাকে দেখেছেন,—তারপর তার ইতিহাস শুনেছেন। তার ছেলে নীলু, তাকে তিন-চার বছরের শিশুকালে অবহেলা অবজ্ঞার মধ্যে ডেয়ো পিঁপড়ের কামড়ের যন্ত্রণায় কাঁদতে দেখেছেন। এই মায়ের সেদিনের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে বাজছে। "মর। মর। মরে যা আপদ মরে যা!" সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সকালবেলা চার-পাঁচ বছরের ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে চলেছে পিছনে পিছনে। মনে পড়ল সাত-আট বছরের ছেলেটা পা ঠুকতে ঠুকতে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলেছে। তার সঙ্গে বিচিত্র এক কান্না—আঁ! আঁ! আঁ! তার পরেই মনে পড়ল নিষ্ঠুর আক্রোশে ঢেলা ছুঁড়লে ঢেলাটা লাগল মায়ের হাঁটুতে মা পা ধরে বসে পড়ল। এসবের অর্থ যেন বদলে যাচ্ছে আজ! চাঁপা যেন তার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়া, হাহাকারভরা জীবনের আবরণ উন্মোচন করছে।

মন তাঁর এখনো প্রশ্ন করছে—এ সত্য ? যা বললে তা সত্য ?

তাঁর পেশা ওকালতী। ওকালতীর দেওয়ানী মামলা তিনি করেন না। ক্রিমিন্যাল কেস নিয়েই তাঁর ওকালতী। একসময় রাজনৈতিক দলের বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনে অভিযুক্ত কর্মীদের স্বপক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ডাকাতি মামলায় অভিযুক্তদের খুনের মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করেছেন তিনি। এও খুনের মামলা। এর যে আসামী নীলু, সাধারণের মধ্যে তার যে পরিচয় তাতে সে এখানকার একজন বিখ্যাত মস্তান। তার এই মা—তার ইতিহাস সে স্বৈরিণী। সে নিষ্ঠুরা। তার সাক্ষী তিনি নিজে।

এ মামলা তিনি অর্থের জন্য নেবেন না।

একদিন একটি ক্ষুদ্র উপকার মেয়েটি করেছিল। হয়ত ক্ষুদ্র নয়—বৃহৎ। তাঁর প্রাণটা যেতে পারত সেদিন।

আর ওই মেয়েটি এতক্ষণ ধরে যা বললে—।

পুরাণের চরিত্রের মত পুণ্য চরিত্রবল ওর নাই। ও পতিতা। কিন্তু অপহৃতা নিগৃহীতা বন্দিনীদের মতই একটি করুণ সত্য আছে যা সমাজ শোনে নি শুনতে চায় না।

তার একটা আবেদন তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ চাঁপা দেখলে সুধাংশুবাবু তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সে এ দৃষ্টির সম্মুখে এতটুকু সংকোচ অনুভব করলে না। বললে—বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটি তার কেঁপে উঠল, —আমার নীলুকে আপনি বাঁচান। লোকে বলছে আপনি পারেন।

-- তার আগে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব।

—বলুন।

—আদালতে তোমাকে পুলিস সাক্ষী মানবেই। মানতেই হবে। তুমি আমার কাছে যা বললে যেমন অকপটে বললে তেমনিভাবে বলতে পারবে ? স্বীকার করতে পারবে ? হয়তো বিশ্রী প্রশ্নও করতে পারে। সরকার পক্ষ পারে আমিও পারি। সত্য উত্তর দিতে পারবে ?

মেয়েটি আস্তে আস্তে বললে—পারব।

সুধাংশুবাবু বললেন—তাহলে তোমার ছেলের কেস আমি নিলাম। তাকে বাঁচাতে চেষ্টা আমি করব। কি হবে তা জানি না। আজ আমি উঠব। বাকিটা পরে শুনব। পুলিস মামলা দায়ের করলে চার্জশীট দেখে সব জেনে নেব তখন।

—তাহলে আজ আমি যাই !

—এই রাত্রে—

—আমি পারব। পাড়ার ঘুঁটেওয়ালী বুড়ী আমার সঙ্গে এসেছে। একটু দূরে ওই পান বিড়ির দোকানে বসে আছে।

ড্রইংরুমের খোলা দরজা পার হয়ে সেই বর্ষারাত্রের স্বল্পালোকিত আবছায়ার মধ্য দিয়ে সে একলাই চলে গেল। পানবিড়ির দোকানটা একটু আগে। একটা বাঁকের মাথায়।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুধাংশুবাবু।

পাঁচ

মহামান্য বিচারপতি এবং জুরি মহোদয়গণ! এই এক নৃশংস এবং কুৎসিত হত্যাকাণ্ডের বিবরণ আপনাদের সমক্ষে বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য সহযোগে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আনুপূর্বিক সংঘটনের মধ্যে এতটুকু কোথাও ছিদ্র নেই।

ওকে দাঁড়িয়ে ওই যে তরুণ আসামী—বয়সে তরুণ আকারে অবয়বে যে কোন ভদ্রসন্তানের মত কিন্তু প্রকৃতিতে সে নিষ্ঠুর ক্রূর উদ্ধত ভয়হীন; যে অঞ্চলে সে বাস করে সে অঞ্চলে তার ডাকনাম 'টাইগার'। এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। যে নামকরণ করেছিল সে ভুল করে নি।

বাঘের মতই সে হিংস্র এবং নিষ্ঠুর। পুলিসের খাতায় তার বিবরণ আজ তিন বছর ধরে লেখা হচ্ছে। প্রথম বৎসর মাসে একবার—দ্বিতীয় বৎসরে মাসে দুই বা তিনবার এবং এই তৃতীয় বৎসরে সাত মাসে আরও বেশীবার রেকর্ড করা হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া, দলে দলে ঝগড়া, দলবদ্ধ হয়ে পাড়াতে আগন্তুকদের সামান্য অজুহাতে আক্রমণ করা, রাত্রির অন্ধকারে ছেনতাই, এমন কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও ইদানীং এ পাড়ার যারা সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করে; মহামান্য বিচারপতি, এইকালে 'মস্তান' বলে উর্দু শব্দটি বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, সমাজ এমন কি রাষ্ট্রের অবস্থাকে যারা সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে সেই এক কুখ্যাত মস্তানদের সে প্রধান। সার্বজনীন পূজার চাঁদা আদায়ে জবরদস্তিতে, বিসর্জনের সময় অন্য পাড়ার পুজোর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সামান্য অজুহাতে ঝগড়া বাধিয়ে সে এই অঞ্চলের পক্ষে একটা বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। হাতবোমা তৈরি করার দক্ষতায়, বোমা ছোঁড়ায় তার কথা লোকে সভয়ে উচ্চারণ করে। বোমা তৈরি করতে গিয়ে একবার বারুদ জ্বলে গিয়ে গোটা ডানহাতখানা জখম হয়েছিল। হাসপাতালে ছিল এক মাস। বোমা ছোঁড়ার অপরাধে পুলিস তাকে বারোবার অ্যারেস্ট করেছে কিন্তু সাক্ষী কেউ দিতে চায় নি বলে, ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ছুরি মারার জন্য পুলিস ওকে সন্দেহ করেছে কয়েকবারই। কিন্তু সেখানেও প্রমাণাভাবে গায়ে হাত দিতে পারে নি। ধরে নিয়ে গেছে—তাকে পুলিসী জিজ্ঞাসার সামনে এনেছে। কিন্তু তার ধাতু বিচিত্র ধাতু। যে উত্তাপে ইস্পাত গলে সে-উত্তাপের মধ্যেও ও অনমনীয় থেকেছে। এবং সে স্বীকারও করেছে যে এই খুন সে করেছে। এক্ষেত্রে বার বার আসামীর তরুণ বয়সের দিকে বিচারক ও জুরি মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব ওর মার দিকে। সে এই মামলার প্রধান সাক্ষী। আপনারা দেখেছেন আসামীর মাকে।

তার কপালে একটা কাটা দাগ আছে বিচারক সেটা দেখবেন। সেটা ওর মায়ের কপালে এই ছেলে তার নিজের হাতে আঘাত করে চিরদিনের মত একটা শিলালিপি এঁকে দিয়েছে। একখানা ভাঙা থালার কানা দিয়ে মেরেছিল কপালে। তাকেও হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল কয়েক দিন। ঘটনাটা ঘটেছিল ওদের বাড়ির ভিতর—মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অজ্ঞান অবস্থাতেই তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে-

ছিলেন কারণ পেশেন্টের অবস্থা ভাল ছিল না। প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। এবং তাঁরাই খবর পাঠিয়েছিলেন পুলিসে। পুলিস এখানেও সন্দেহ করেছিল এই তার টাইগার নামধারী মানুষের অবয়বে জন্তুর মত সন্তানটিকে। মা তখন একথা স্বীকার করে নি কিন্তু এখানে অর্থাৎ এই মামলায় স্বীকার করেছে যে ও আঘাত ওর ওই ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রকৃতির জন্তুর মত পুত্রটির। ওই সে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর ওই পিঙ্গলবর্ণাভ দৃষ্টি, ওর এই তরুণ বয়সেও এই তরুণ মুখের রেখায় রেখায় নির্মম কাঠিন্য ভ্রূর ভ্রূকুটিভঙ্গীতে, ওর দেহের কঠিন নিষ্ঠুর গড়নের মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে যা—

এবার সুধাংশুবাবু উঠে দাঁড়ালেন—আপত্তি করবেন তিনি। কিন্তু তার আগেই জজসাহেব বললেন—আপনি, আমার বোধ অনুযায়ী সীমানার বাইরে যাচ্ছেন; ওর এই অল্পবয়সের যে-সব ঘটনার ইতিহাস দিলেন তার উল্লেখ করলেন তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওর চেহারা নিয়ে এর সঙ্গে জড়াচ্ছেন—এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, **he is a born criminial, crime is in his blood.** কিন্তু আমার মতে জোর করে এটা আরোপ করা হচ্ছে।

সরকার পক্ষের অ্যাডভোকেট তাঁর বক্তব্য নিবেদন করছিলেন।

কোর্টে ভিড়ের আর শেষ ছিল না। ভিতর থেকে বাইরের বারান্দা পর্যন্ত লোকেরা দাঁড়িয়ে শুনছে। রুদ্ধশ্বাসে শুনছে।

হাওড়ার টাইগারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে মামলা হচ্ছে। ভ্রষ্টা মায়ের সন্তান। মায়ের উপপতিকে খুন করেছে। বরেন মালিক অর্থাৎ মল্লিক আজ ষোল-সতের বৎসরের উপর—নিখুঁতভাবে গণনা করলে আজ সতের বছর কয়েক মাস এই মেয়েটিকে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে রেখেছিলেন। লোকে বলে সংসারটাই সে পোষণ করত একরকম। কেউ কেউ বলে টাইগারের উদ্ভবও ওই বরেন মল্লিক থেকে। সুতরাং এর মধ্যে কোথাও যেন আছে প্রকৃতির সেই বিচিত্র খেলা বা লীলা, যার অমোঘ ঘাতে প্রতিঘাতে 'পিতা পুত্রহত্যা করে, পুত্র পিতৃহত্যা করে' প্রকৃতিরও অন্তরালবর্তিনী এক রহস্যময়ীর অভিপ্রায় পূর্ণ করে; অথবা সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে আছে এক আশ্চর্য নাটক যা অতিপুরাতন হয়েও আজও পুরানো হয় নি বা হবে না।

ডকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে হাওড়া শহরের টাইগার। আসামী নীলু।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে সেসনস্ সোপরদ্দ হয়ে দায়রা আদালতে বিচার বসতে প্রায় পাঁচ মাস সময় গেছে। এই পাঁচ মাসে নীলুর চেহারা যেন আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে। সরকার পক্ষের উকীল যা বললেন তার সঙ্গে এতটুকু মেলে না। নীলু এই বিচার মাথায় করেও জেলখানার মধ্যে নিয়মিত শান্ত জীবন যাপনের সুযোগে দেখতে যেন আর এক নীলু হয়ে উঠেছে!

পিঙ্গল বর্ণ আর নেই, তার মধ্য থেকে ফুটে উঠেছে একটি স্বর্ণাভ দীপ্তি। শরীর তার সবল এবং কঠিন—তাকে ঢেকে একটি প্রসন্ন পুষ্টির প্রলেপ পড়েছে। চোখের কোলে চারিপাশে ছিল একটি কালো ঘের—সে ঘেরটি আর নেই। সযত্ন মার্জনায় কেউ যেন আঁচল দিয়ে সে দাগ মুছে দিয়েছে। মুখে তার অল্প অল্প দাড়িগোঁফ বেরিয়েছে। চুল তার কটাসে অর্থাৎ পিঙ্গল। দাড়িগোঁফগুলি পিঙ্গল নয় স্বর্ণাভ। চোখ দুটি তার বড় জন্ম থেকেই। তার দৃষ্টি

বয়সের সঙ্গে হয়ে উঠেছিল উগ্র রূঢ় এবং হিংস্র ; সে দৃষ্টি এই ক'মাসে আশ্চর্য এক ঔদাসীন্যে উদাসীন হয়ে উঠেছে। কোন উদ্বেগ নেই কোন চঞ্চলতা নেই। ভকের মধ্যে যেন শূন্যদৃষ্টিতে অথবা গভীর এক আত্মমগ্নতায় মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হয়তো সওয়ালের সব কথা তার কানে পৌঁছুলেও সচেতন মনে পৌঁচুচ্ছে না। মাথার চুলগুলি দীর্ঘ এবং বিশৃঙ্খল ; তৈলহীন রুক্ষ ; গায়ে একটা রঙচঙে হাওয়াই সার্ট পরনে একটা চোঙা প্যান্ট। পরিষ্কার নয় ; জামাটা ক'জায়গায় ছিঁড়েও গেছে। ভ্রূক্ষেপহীন ভঙ্গিটার প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন গভর্নমেণ্ট প্লীডার।

সরকারী উকীল তৎক্ষণাৎ বললেন—আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করছি ইওর অনার। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই আসামী হাওড়া শহরে টাইগার নাম অর্জন করেছে তার এই ষোল বৎসরের জীবনের যে গৌরবে সে গৌরব তার মস্তানীর গৌরব।

মহামান্য বিচারক, মানুষ জন্তুর বা জীব ও প্রাণীর মতই দেহধারী জীব। কিন্তু জীবজীবনের জৈব ধর্মের নির্দেশ তার জীবনসত্য নয়। কাম ক্রোধ লোভ ক্ষুধা তৃষ্ণাকে সে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারে না এ কথা বৈজ্ঞানিক বাস্তব সত্য কিন্তু মানবধর্মে তা থেকেও অধিকতর সত্য যে এই জৈব বিধানগুলিকে সে আপন আয়ত্তাধীনে এনে মনুষ্যত্বে উপনীত হয়েছে। মানুষ এইখানেই জন্তু থেকে পৃথক।

বর্তমান মামলায় যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আপনার এবং জুরি মহোদয়গণের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে তাতে দেখতে পাবেন যে, ঘৃণিত প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে মনুষ্যধর্মের প্রথমতম বা প্রাথমিক সত্য বা বিধানকে কুৎসিতভাবে তুই পায়ে ছেটে-মেড়ে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যিনি হত হয়েছেন যাঁকে হত্যা করা হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম ছিল বরেন মল্লিক ; ১৯৬০ সাল থেকে সতের বছর আগে একটি যুবতী এসে আত্মবিক্রয় করেছিল এবং সেই ক্রয়বিক্রয়ের ঘটনায় সাক্ষী ছিল তার বাপ এবং তার স্বামী।

ঘটনাটি অসামাজিক। মনুষ্যত্বসম্মত নয়। কিন্তু জৈব প্রবৃত্তির গতি এবং মানুষের মনের নির্দেশের সঙ্গে দ্বন্দ্বসংকুল মনুষ্যত্বের বা মনুষ্যধর্মের যে-পথ সে-পথে এই ধরনের পতন ও স্খলন-গুলি নিঃসন্দেহে বিয়োগান্ত কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। এমন ঘটে থাকে। অতীতকালে ঘটেছে বর্তমানেও ঘটছে। ভবিষ্যতেও ঘটবে। তাছাড়াও এক্ষেত্রে আরও একটি কথা আছে। স্বামী ও পিতার সাক্ষাতে যেখানে একটি যুবতী নিজেকে বিক্রি করে সেখানে এমন কোন কারণ আছে যা নিষ্ঠুরতম বাস্তব সত্য। যা অলঙ্ঘনীয় যা অপরিবর্তনীয়, মাননীয় বিচারক মহোদয়, তার থেকেও বেশী কিছু। প্রকৃতির নির্দেশ। আজ সতের বৎসর ধরে এই মল্লিক এই যুবতীর সঙ্গে নরনারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক-স্থাপন করে এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে প্রতিপালন করে আস-ছিল। সর্বোপরি এই যুবতী মেয়েটি তার সঙ্গে অর্থাৎ এই মল্লিকের সংসর্গে আসবার এক বছর পর এই বালকের জন্ম। সুতরাং বলি এই মল্লিকই এই হত্যাকারী বালকের—

—না—না—না—না।

পর পর চারটে 'না' শব্দের প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর ধ্বনিতে দায়রা আদালতের প্রকাণ্ড ঘরখানা

চমকে উঠল।

চীৎকার করে উঠল আসামীটি। সমস্ত জনতা নিবিষ্ট মনে গভর্নমেন্ট প্লীডারের এই বক্তৃতা শুনছিল। তারা কৌতূহলে আকৃষ্ট ছিল, বক্তব্যের জটিল অর্থ অনুধাবনের জন্ত নিবিষ্ট-চিত্ত হয়েছিল। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এই ক্রুদ্ধ প্রচণ্ড এবং দৃপ্ত চীৎকারে চমকে উঠল তারা। তরুণ কৈশোরের ভাঙা চেরা কণ্ঠস্বরে সবল বুকের চীৎকার।

বিচারকও চকিত হয়ে আসামীর দিকে তাকালেন। সে দুই হাতে মুঠো করে চেপে ধরেছে ডকের বেষ্টনীর কাঠখানা। চোখ ছুটো তার জলছে। মনে হচ্ছে সে যেন হাঁপাচ্ছে।

জজসাহেব তার দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন। তাঁর ভুরু ছুটি কুঁচকে উঠল। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি ? কি না ? বল, তুমি কি বলছ ?

একজন কনেস্টবল এবং একজন কোর্ট সাবইন্সপেক্টর ছুটে এসে কাঠগড়ার সামনে দাঁড়াল। রূঢ়স্বরে ধমক দিয়ে বললে—চুপ। চুপ !

মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বড় বড পিঙ্গলাভ রুক্ষ চুলের রাশিতে নাড়া জাগিয়ে সে বললে—না না। আমি চুপ করব না।

কোর্ট চঞ্চল হয়ে উঠল। উকীল মোক্তার কর্মচারী জনতা সমস্ত লোকের মধ্যে একটা গুঞ্জন জাগল—একটা নড়াচড়ার ঢেউ জাগল। শুধু জজসাহেব একটি স্থৈর্যপূর্ণ ধীরতার সঙ্গে বসে রইলেন। তাকালেন তরুণ আসামীটির দিকে। টেবিলের উপরে রাখা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে শব্দ করে তাঁর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে জনতাকে স্তব্ধ হতে বললেন। অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—চুপ ! চুপ ! তারপর আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—বল তুমি কি বলছ ? কি না ? বল ?

উত্তেজিত কণ্ঠে জলন্ত দৃষ্টিতে পাবলিক প্রসিকিউটরের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল—হুজুর জজসাহেব—যে মল্লিক খুন হয়েছে—হুজুর—।

বুকে দুবার ডানহাতের চাপড় দিয়ে যেন আস্ফালন করেই বললে আমি তাকে খুন করেছি হুজুর—আমি। আমি তাকে খুন করেছি হুজুর। তিনবার ছোরা মেরেছিলাম তাকে। পেটে, বুকে—তারপর পড়ে গেল—তখন পিঠে।

থেমে গেল আসামী। যেন কি বলবে সে খুঁজে পাচ্ছে না। চোখ ছুটো শুধু দপ্ দপ্ করছে জলন্ত আঙরার মত।

পাবলিক প্রসিকিউটর তার এই কথা-হারানো বিভ্রান্তিকর অবস্থার সুযোগে বললেন—রক্তের সম্পর্ক ছিল না কিন্তু সম্পর্ক ছিল—বিধবা রত্নমালা নিহত মল্লিকের রক্ষিতা ছিল—

—না ! আবার চীৎকার করে উঠল আসামী !—না না !

—মল্লিকের লোক এসে রত্নমালাকে নিয়ে যেতো না ? মল্লিকের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত না সদর রাস্তায় ? রত্নমালা সেজেগুজে বেরিয়ে যেতো না ?

—না, রক্ষিতা সে ছিল না। সে তার কেনা বাঁদী ছিল। হুজুর জজসাহেব, এইকালেও মানুষ বিক্রি হয়। বাপ মেয়ে বিক্রি করে হুজুর—স্বামী স্ত্রী বিক্রি করে হুজুর—আর হতভাগিনী

ওই বিক্রি হওয়া মেয়েটা কেনা বাঁদীর মত, চিরকাল জন্তু-জানোয়ারের মতই খেটে মরে যায় তবু তার গলার বাঁধন খোলে না। দড়ি দিয়ে সে বাঁধা থাকে মরণকাল পর্যন্ত। মরে গেলে দড়ি-গাছাটা খুলে নিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেয়। তেমনি করেই আমার ওই মা—।

এইখানে এসে হা-হা করে কেঁদে ফেললে দুর্দান্ত ছেলেটা।

—কে বললে এসব কথা তোমাকে? তুমি কেমন করে জানলে?

—শুনেছি আমার ওই হতভাগিনী মায়ের কাছে।

—মা তোমাকে বলেছে এইসব কথা?

—হ্যাঁ হুজুর—মায়ের কপালে একদিন একখানা কানাভাঙা থালা দিয়ে মেরেছিলাম। কেটে বসে গিয়ে অনেক রক্ত পড়েছিল। সেই দিন বলেছিল—তবে শোন তোকে আজ সব বলে যাই। আমার নিজের ইচ্ছেতে আমি ওই পাপ করি নে। আমার বাপ আমাকে বিক্রি করে ছিল। দু'হাজার টাকা সে নিয়েছিল। এই লোকটাই আমার হাতে দিয়েছিল টাকা। আমি মাটির পুতুলের মত বসে ছিলাম—আমার হাতে লোকটা ধরিয়ে দিয়েছিল দু'হাজার টাকার নোটের গোছা। আমি মাটির পুতুলের মতই বসে ছিলাম। একসময় বাবা সেগুলো টেনে নিয়ে পকেটে ভরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। ওই ঘরখানার মধ্যে ওই লোকটার কাছে আমাকে ফেলে দিয়ে।

হুজুর, আমার বাবা প্রণব চক্রবর্তী—সে ঠিক আমার মতই দেখতে, সেও—সেও—; স্তব্ধ হয়ে গেল এই প্রচণ্ড ছেলেটি। দুই হাতে তার চুলের মুঠো ধরে কাঠগড়ার রেলিঙের উপর কনুই রেখে মাথা হেঁট করলে।

কিছুক্ষণ পর বললে—বাবার কাছে মা নাকি বলেছিল—তুমি আমাকে বিষ এনে দাও। আমি মরি। বাবা বলেছিল—না, লোকটাকে আমি খুন করব। কিন্তু ছুরি তুলেও ছুরি মারতে পারে নি—হাত থেকে পড়ে গিছল। লোকটা বাবাকে ধরে ফেলে তার কাছ থেকেও বিক্রির একটা দলিল লিখিয়ে নিয়েছিল। মাকেও তাতেই সই করিয়েছিল। সে কাগজখানা তার কাছে ছিল। বাবাকে এরপর আরও দু'হাজার টাকা দিয়ে একটা ধারের দলিল লিখিয়ে নিয়ে-ছিল।

হুজুর—জজসায়েব—বাঁচতে আমি চাই নে। মরতে আমার ভয় নেই। আমাকে ফাঁসি আপনারা দিন। আমি খুন ওই লোকটাকে করেছি। খুন করেই আমি পালিয়েছিলাম, ওইটে আমার দোষ হয়েছে। তবে ভোরবেলাতেই এসে আমি ধরা দিয়েছি থানায়। ফাঁসি যাবার জন্যেই ধরা দিয়েছি। উকীলবাবু বলছিল আমি মস্তান। হ্যাঁ হুজুর, আমি মস্তান। ওই ওই আমার মায়ের জন্যে! হুজুর—

হুজুর, সারা জীবনে আমার বয়স ষোল বছর হল—এই ষোল বছরে কোন দিন কখনও আমাকে আমার ওই মা,—

হুজুর, ওকে আমি রাক্ষুসী বলে ডাকতাম ছেলেবেলায়। এই দেখুন আমার কপালে একটা মস্ত কাটা দাগ। ওই মা আমাকে খুন্তি দিয়ে মেরেছিল। আমার মনে আছে হুজুর—রক্ত পড়েছিল অনেক—আমার দিদিমা ভয় পেয়ে কেঁদেছিল আমিও ভয় পেয়েছিলাম কেঁদেছিলাম। মা বলেছিল মর মর তুই মরে যা! ছেলেবেলা আমার পাঁচড়া হয়েছিল—আমার কষ্টের শেষ ছিল না। সর্বাঙ্গে তার দাগ। কখনও মা আমার মলম লাগিয়ে দেয় নি ভাল কথা বলেনি। সকালবেলা কাজে যেত—আমি কাঁদতে কাঁদতে পিছনে পিছনে যেতাম—পথে হুঁচোট খেয়েছি, পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটেছে হাঁটু ছড়েছে—কখনও হাতে ধরে তোলে নি কখনও আহা বলে নি।

ওই একটা কথা—মর মর মর—তুই মরে যা তুই মরে যা।

হুজুর পাঠশালায় গেলাম—ছেলেরা ক্ষেপাতে আরম্ভ করলে। বলত—বাবার নাম কি রে? বুঝতে পারতাম না প্রথম প্রথম। তারপর বুঝলাম। আবার বলত—তুই চক্রবর্তী কি করে হলি রে? তুই তো মল্লিক নাকি?

দিদিমা যতদিন ছিল ততদিন কিছু আদরযত্ন পেয়েছি হুজুর—তারপর সে মরার পর দুনিয়া আমার তেতো ছিল—এবার বিষ মিশল বিষাক্ত হল। ইস্কুল ছাড়লাম—মস্তান হলাম।

উকীলবাবু বললেন মস্তান। হাঁ হুজুর, মস্তানদের সর্দার হলাম আমি। সিগারেট বিড়ি আরও নেশা শিখলাম। মানুষ মারতে শিখলাম। মন খুব খুশী হল। মাকেও মারতে ধরলাম। প্রথম চড়চাপড়। চড় খেয়েও মা গাল দিত—তুই মর তুই মর।

সঙ্গে সঙ্গে আবার চড় মেরেছি আমি।

আবার বলেছে—মর মর।

আবার মেরেছি।

আবার বলেছে—মরে যা তুই মরে যা।

—ফের বলছিস? বলে আবার চড় মেরেছি।

ফের বলেছে—হ্যাঁ আবারও বলছি, তুই মরে যা! চণ্ডালের সন্তান চণ্ডাল তুই। তুই মরে যা আমি খালাস পাই।

আমি এবার ভয় পেয়ে হার মেনে চলে গিয়েছি ঘর থেকে। পথে গিয়ে কোন ফিরিওলাকে কি অন্য কোন মস্তানের সঙ্গে ঝগড়া করে মাথা ফাটাফাটি করে হাওড়া স্টেশনের ফুটপাথে কি গঙ্গার কোন ঘাটে গিয়ে বসে থেকেছি—সারা দিনরাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। ঘরে মা গাল দিয়েছে—মায়ের বেদনা বুঝি নি বুঝতে চেষ্টা করি নি—বাইরে গাল খেয়েছি তাই নিজে গাল দিয়ে মস্তানী করে ফিরেছি। মনে ছিল লজ্জা—হুজুর এমন লজ্জা আর হয় না। এর চেয়ে মরণ ভাল এর চেয়ে নরক ভাল—এর চেয়ে খুন হওয়া ভাল খুন করা ভাল : নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতাম—আমি চক্রবর্তী না মল্লিক? আমি কি?

বলতে বলতে থেমে গেল দুর্দান্ত ছেলেটি।

সমস্ত কোর্ট রুমটা থমথম করছিল। মানুষেরা রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনছে। একটা সূচ পড়লেও শোনা যায়। মাথার উপরে কয়েকটা চড়ুইপাখী উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। একটা মিনিট স্তব্ধতা

যেন অনেক কয়েক মিনিট দীর্ঘ মনে হল। তবুও তাকে প্রশ্ন কেউ করলেন না—তারপর ?

জজসাহেবও স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—তাঁর হাতে পেনসিল ছিল একটা, অকস্মাৎ সেটা হাত থেকে খসে টেবিলের উপর এবং টেবিল থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সেই শব্দে সজাগ হয়ে উঠল ছেলেটি। বললে—হুজুর, একদিন মায়ের বাক্স খুললাম। মায়ের জিনিসপত্র ছিল না কিন্তু ট্রাঙ্ক ছিল তিনটে। যত বাজে ভাঙা ফুটো জিনিস ভর্তি থাকত। একটা বাক্সের দরকার ছিল। বোমা তৈরি করেছিলাম—সেগুলো নিয়ে যাবার জন্যে বড় বাক্সেরই দরকার ছিল। খড় ন্যাকড়া নিচে দিয়ে আরও খড ন্যাকড়া দিয়ে প্যাক করে তার ওপর খানকতক কাপড বই দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে। বড একটা হাঙ্গামা আছে। দলে দলে হাঙ্গামা হুজুর। বাজারে বাক্স কেনার হাঙ্গামা ছিল। তাই বাড়ির বাক্স একটা খালি করে নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম। আমার মা সে-দিন—।

—সন্ধ্যের পর। মা বাড়ি ছিল না। একটা বাক্স খালি করে ফেললাম। হুজুর, তার মধ্যে পুরনো ছেঁড়া একটা গরম কোট ছিল। কতকগুলো কাগজ ছিল। একটা সিগারেটের কেস ছিল। পুরনো রুমাল ছিল। হুজুর, সব শেষে ছিল—একখানা ফটো। অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

হুজুর, আলোতে ছবিখানা দেখলাম, দেখে আমি চমকে উঠলাম। এ কে? এ কে? চেয়ারে বসে? আর পাশে দাঁড়িয়ে?

চিনতে পারলাম হুজুর।

মাকে চিনলাম আগে। বিয়ের কনে আমার মা। মাথায় মুকুট গায়ে গয়না পরনে দামী শাড়ি। তারপর চিনতে বাকী রইল না চেয়ারে যে বসে তাকে। সে আমার বাবা প্রণব কুমার চক্রবর্তী। দেখলাম হুজুর—অবিকল আমি।

আমার সব ভুল হয়ে গেল। আমি ভুলে গেলাম আমাকে ট্রাঙ্ক নিয়ে যেতে হবে। আমি ভুলে গেলাম। ছবিটা নিয়েই বসে রইলাম আলোর সামনে। কালীপড়া একটা লণ্ঠন। তারই আলোতে অবাক হয়ে দেখলাম। আমি শুনেছিলাম—দিদিমা মাঝে মাঝে বলত—আমি বাবার মত দেখতে। মা আমাকে দেখে হয় মুখ ফিরিয়ে নিত নয় বিরক্ত হত—তার চিহ্ন ফুটত তার মুখে। আমি এ ছবি কখনও দেখি নি। বাবা যখন মারা যায় তখন আমি এক বছরেরও নই। সেদিন এই ছবি দেখে আমার যে কি হল তা বলতে পারব না। মনে হল আমি যেন রাজা হয়ে গিয়েছি। মনে হল ছবিখানা নিয়ে সারা হাওড়ার পথে পথে দেখিয়ে আসি—চীৎকার করে বলে আসি—দেখ আমার বাবার ছবি দেখ।

দলের লোক ডাকতে এল—তাকে ট্রাঙ্কটা দিয়ে দিলাম—আমি গেলাম না। বললাম—যাব না আজ। আমাকে ডাকিস নে। খুনোখুনি হয়ে যাবে। পালা। সে চলে গেল। আমি ক্ষ্যাপার মত ঘরে ঘুরতে লাগলাম। ঠিক এই সময় এল আমার মা।

মাকে আমি রাক্ষুসী বলতাম। বলতাম তার ওপর রাগের জন্যে—যেভাবে সে মারত তার

জন্যে। পরে আর একটা চেহারার জন্যেও বলতাম। সে যে সাজ করে ওই একটা লোকের সঙ্গে বেরিয়ে যেত সপ্তাহে একদিন করে রাত্রে তার জন্যে। সে ঘরে তালা দিয়ে বাইরে যেত। আমার তো ঠিক ছিল না কিছু। আমি ঢুকতাম পাঁচিল টপকে। তারপর ঘরের চাবি খুলে নিতাম—সে চাবি আমার কাছে থাকত। ঘরের তালা খুলে মা ওই সাজে ঢুকতেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, কোথায় গিয়েছিলি?

মা চমকে উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

আমার রাগ চড়ে চড়ে উঠেছিল—বললাম—বল, আজ তোকে বলতে হবে। কেন তুই যাবি এমনভাবে? তোর লজ্জা নেই তোর হায়া নেই?

মা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—সরে যা—সরে যা নীলু—আমার মাথায় খুন চড়িয়ে দিস নি।

আমি সরি নি। পথ দিই নি ঘরে ঢুকতে।

মা বলেছিল—নীলু! সর আমি চান করব।

—হুজুর, বাইরে থেকে এসে মা চান করত। সে সেই বোধ হয় গোড়া থেকেই। আমি আজন্ম দেখে আসছি।

আমি বললাম—না। আগে তোকে বলতে হবে কেন তুই আমার বাবার মুখে আমার বংশের মুখে এমন করে কালী মাথিয়ে দিবি? আমার বাবা মরে গিয়েছে সে কি তার—

মা আমার কথায় বাধা দিয়ে বলেছিল—তোর বাবাকে আমি ঘেন্না করি তোদের বংশকে আমি ঘেন্না করি। আর তুই? তোকে পেটে ধরে আমার লজ্জার শেষ নেই। অথগু তোর পরমায়ু—তুই হয়ে হয়েই মরিস নি।

আমি ঠাস করে এবার মায়ের মুখের উপর চড় কষিয়ে দিয়েছিলাম; শুধু চড় মারাই নয় হুজুর; ছেলেবেলা থেকে মায়ের উপর অহরহ রাগ করে থেকে থেকে মেজাজ আমার রাবণের চিতার মত জ্বলে—আমার বাবাকে আমার বংশকে গাল দেওয়া আমার সহ্য হয় নি। শুধু চড়ই মারি নি খারাপ কথা বলে গালও দিয়েছিলাম।

মা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। হুজুর, মায়ের সঙ্গে সমানে মারপিট করেছি—মা মারলে আমিও মেরেছি—হাতে কামড়ে দিয়েছি, ঢেলা ছুঁড়েও মেরেছি কিন্তু এমনভাবে কখনও গালে চড় মারি নি।

কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে আমার মুখের দিকে সাপের মত তাকিয়েছিল মা। আমি মনে করেছিলাম মা ভয় পেয়েছে—মা এবার বলবে—আর করব না। আমি ভাবছিলাম ওকে গলা টিপে মেরে ফেললে কি হয়!

অনায়াসে তখন আমি খুন করতে পারতাম। আমিই মায়ের হাত ধরে তাকে ঘরে টেনে এনে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম—তারপর বলেছিলাম, বল কেন তোর পাপে আমার চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে? বল?

মা বলেছিল—আমি যেদিন মরব সেদিন তোকে ডেকে সব বলে যাব। আর তুই যদি

মরিস্ তবে—

আমি তখন মরীয়া। আমার হাতের কাছেই পড়েছিল একখানা কানাভাঙা রেকাবি সেই-খানা তুলে নিয়ে মায়ের কপালে মারলাম—ভাবলাম না কি হবে! রেকাবির ধারটা কপালে খপ্ করে বসে গেল। বললাম—সীতা সাবিত্রী আমার—হারামজাদী—কুত্তার বেটী কুত্তি—

কথা আমার শেষ হল না—শেষ করতে পারলাম না আমি—মায়ের কপাল থেকে গলগল করে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে মুখখানাকে ভয়ংকর করে তুললে। আমি বোবা হয়ে গেলাম। চেয়ে রইলাম মুখের দিকে।

মা বাঁ হাত দিয়ে সেই রক্ত নেড়ে আঙুলে মেখে চোখের সামনে ধরে দেখে আস্তে আস্তে বললে—রামের মত স্বামী পেলে আমিও সীতা হতে পারতাম নীলু। তোর বাপ রাম ছিল না রে! রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল—রাম সমুদ্র বন্ধন করে রাবণকে বধ করে তারপর সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছিল। তোর বাবা রাম ছিল না—আমাকে কুত্তার বেটী বললি—আমার বাবা কুত্তার চেয়েও অধম জীব ছিল। অর্থের জন্যে বড়লোক লম্পটের পা চেটেছে—তাদের কাছে স্ত্রী কন্যা বিক্রি করেছে। আমাকে যখন বিক্রি করলে আমার হাতে নগদ দু'হাজার টাকার নোটের গোছা ধরিয়ে দিয়ে বাবা নির্লজ্জের মত পাষণ্ডের মত সেই টাকা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে পকেটে পুরে বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজাটা মল্লিক বন্ধ করে দিয়ে—।

হুজুর, মা আমার হাউহাউ করে কেঁদে উঠল একবার। বললে—ওরে নীলু, আমাকে সেকালে দাসী বাঁদী যেমন বিক্রি হত তেমনি করে বিক্রি করলে প্রথমে বাপ। আমি তখন ষোল বছরের মেয়ে—আমি কি করব? অসহায় অবলার মত পড়ে রইলাম—লোকটা আমাকে রাক্ষসের মত গোগ্রাসে গিললে—।

তোর বাবাকে তখন আমি দু'হাত বাড়িয়ে ডেকেছিলাম—তুমি স্বামী—তুমি আমাকে বাঁচাও বাঁচাও। বলেছিলাম—ভীম যেমন দ্রৌপদীকে কীচকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল তেমনি করে বাঁচাও। শুধু বাঁচানো নয় তুমি শোধ নাও। তুমি ওকে খুন কর। করে যদি ফাঁসি যেতে হয় যাবে—তুমি ভেবো না—আমি বিষ খেয়ে মরব। কিন্তু তোর বাবা কাপুরুষের অধম কাপুরুষ—আমাকে উদ্ধার করতে এসে ছুরি তুলে কাঁপতে লাগল থরথর করে, ওই রাবণ তার হাত ধরলে, ছুরিটা পড়ে গেল। তোর বাপ তার পায়ে গড়িয়ে পড়ে বললে—আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে ছেড়ে দিন। ওই আমাকে বলেছিল—। তোর বাপ আমার দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

আমি মাটির পুতুলের মত অবশ হয়ে গিয়েছিলাম—চোখেও বোধ হয় পাতা পড়ে নি—মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু শুনেই গিয়েছিলাম—মায়ের কাছে লিখিয়ে নিয়েছিল—আমাকে আপনি কিনিলেন—তার দাম দিলেন আমার বাবাকে আমার স্বামীকে। আমি চিরদিন কেনা হইয়া রহিলাম। বাবা লিখে দিয়েছিল—আমার স্ত্রী রত্নমালাকে স্বেচ্ছায় আপনাকে বিক্রয় করিলাম এবং দুই হাজার টাকা বুঝিয়া পাইলাম। তারপর বাবা নিজে নাকি নিয়ে যেত

মাকে সঙ্গে করে।

কপাল থেকে রক্ত ঝরে ঝরে মুখ ভিজিয়ে বুক ভিজিয়ে দিয়েছিল—মধ্যে মধ্যে খাবলা খাবলা হয়ে জমেও উঠেছিল—সেদিকে তারও খেয়াল ছিল না আমারও ছিল না। সব বলা শেষ করে মা বলেছিল—ওরে নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না সেই বাপের মেয়ে বলে। সেই স্বামীর স্ত্রী বলে। তোকে ক্ষমা করতে পারি নি ওই কাপুরুষ বাপের ছেলে বলে। তুই পেটে না এলে আমি হয়তো মরতাম মরতে পারতাম। তোকে কোন দিন স্নেহ করি নি কিন্তু তোর জন্যেই মরতে পারি নি।

বলতে বলতে মা ঢলে পড়ে গিছল। রক্তক্ষয়ে দুর্বল হচ্ছিল সে খেয়াল ছিল না। তারও ছিল না। আমারও ছিল না। যখন পড়ে গেল তখন মা বললে—নীলু, তুই লোকজন ডাক রে—তাদের সামনে বলব আমি নিজে রাগ করে কানাভাঙা রেকাবিখানা নিজের মাথায় বসিয়ে দিয়েছি।

হুজুর, আমি সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর শোধ আমি নেব। আমার মা। হুজুর, লোকে আমাকে মস্তান বলে—যার মায়ের উপর এমন অত্যাচার হয়—যার চারিদিকে কোন আনন্দ নেই আশা নেই সে মস্তান না হয়ে কি করবে? উপায় কি তার? মায়ের কাছে সব কথা শুনে অবধি আমি ঘুরেছি—পাগলের মত ঘুরেছি। তারপর ছোরা নিয়ে তৈরী হয়ে সেদিন দাঁড়ালাম ওই গলির মোড়ে।

বলতে ভুলেছি হুজুর, মাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল। মা লোকেদের কাছে বলেছিল নিজের কপালে সে নিজেই ভাঙা রেকাবি বসিয়েছে—হাসপাতালে বলেছিল এমন কাটা নিজের হাতে হয় না। লোকজনে বলেছিল—তাহলে ওর ছেলেই মেরেছে। তাও লেখা আছে পুলিসের খাতায়। তারপর মা বাঁচল—হাসপাতালে সাতদিন থেকে ফিরে এল। এসে বললে—নীলু, তুই চলে যা। আমি তোকে টাকা দিচ্ছি, এই বাড়ি বিক্রি করে টাকা দিচ্ছি তুই চলে যা কোথাও।

আমি মাকে কিছু না বলে চলেই গেলাম। চলে গেলাম না, লুকোলাম কাছেপিঠেই। বুকে আগুন জ্বলত অহরহ। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া হল। তাদের আমি ছাড়লাম, তারা আমাকে ছাড়লে। ছোরাখানা নিয়ে তক্কে তক্কে থাকতাম। জানতাম মা সপ্তাহে একদিন যায়। ঠিক করেছিলাম প্রথম দিনেই রাক্ষসকে আমি বধ করব। আর এক দিন এক বারও সে আমার মায়ের গায়ে হাত দেবে তার থেকে আমার মৃত্যু ভাল। কিন্তু তা পারি নি হুজুর। সে আমার আপসোস। এত আপসোস আমার বাবা দাদামশায়ের কাজের জন্যেও হয় নি। প্রথম দিন গাড়ি এল কিন্তু সে এল না।

দ্বিতীয় দিন গলির মুখে অন্ধকারে দাঁড়ালাম।

একটা লোক নেমে ভিতরে গিয়ে মাকে ডেকে আনলে।

রাক্ষসটা নামলে। এগিয়ে এসে বললে—এস।

আমি লাফিয়ে পড়লাম। পেটে ছুরি চালালাম। তারপর বুকে বাঁদিকে আনাড়িকে।

লোকটা পড়ে গেল। যে লোকটা মাকে ডাকতে গিছল সে ভয়ে ছুটে পালাল। গাড়ির ভিতর থেকে ড্রাইভারটা চীৎকার করে উঠল। মা বলে উঠল—নীলু!

বললাম—হ্যাঁ। এই তোকে খালাস করে দিলাম। এরপরও যদি এই পাপ তুই করিস তবে তুই যা বলেছিস সব মিথ্যে আর তার জন্যে তোর কুষ্ঠ হবে জেনে রাখিস। যদি না হয় তবে ফাঁসি যাব আমি—আমি মরা ঈশ্বরকে নরককুণ্ডের পাঁকে পুঁতে দেব চিরদিনের মত।

আমাকে ফাঁসির হুকুম দিন।

আমি খুন করেছি। আমার মাকে যে টাকার জোরে জন্তু-জানোয়ারের মত কিনেছিল তাকে খুন করে আমার মাকে আমি খালাস করেছি।

ঠিক এই মুহূর্তে একটা গুরুভার কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে সারা আদালত ঘরটা চকিত হয়ে উঠল। কি পড়ল? আসামীও চুপ করলে এবং সেই দিকে তাকালে যেদিক থেকে শব্দটা উঠেছিল।

উঠেছিল সামনের দিক থেকেই।

একটি অতি বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

মা।

তার মা চেয়ারে বসেছিল—সে অজ্ঞান হযে পড়ে গেছে। কোর্ট অ্যাডজোর্নড হল সেদিনের মত।

ছয়

"মানুষের প্রতি কি মানুষের অন্যায় করবার অধিকার আছে? প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। এ অধিকার নাই। তবু অন্যায় ঘটে। মানুষ মানুষের উপর সজ্ঞানেই অন্যায় করে। তাহার প্রতিবিধানের জন্য দেশে আইন আছে কানুন আছে শাসন আছে শৃঙ্খলা আছে তবু অন্যায় হয়। এবং বহু ক্ষেত্রে সে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। আইন অসহায়ভাবে দুর্বল হয়ে মাথা নত করে। মানুষের ন্যায়বোধ নীতিবোধ সমস্ত কিছুকে মানুষেরই প্রবৃত্তি সরীসৃপের মত বিষাক্ত দংশনে বিনষ্ট করে। আইন শৃঙ্খলার লোহার বাসরঘর নির্মাণ করে মানুষ ন্যায়নীতির লখীন্দরকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সূচীপ্রমাণ ছিদ্রপথে কালনাগিনী প্রবেশ করে লখীন্দরের প্রাণ হরণ করছে যুগ যুগ ধরে। মানুষ অসহায়ভাবে মেনে নেয় এবং এই সরীসৃপ প্রবৃত্তিকে মাথা নত করে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে। বর্তমান ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আসামী নীলু চক্রবর্তীর জীবন নিষ্ঠুর অভিশাপে অভিশপ্ত জীবনের একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

জন্মের বোধ করি প্রথম মুহূর্ত থেকে সে তার মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত, সম্ভবতঃ ঠিক বলা হল না—মাতৃরোষের ধারা তিলে তিলে সে দগ্ধ। সমাজে সে চরমতম অপমানে অপমানিত, লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত। এক কামার্ত নরপিশাচের কুটিলতম অত্যাচারে অত্যাচারিত।

পাবলিক প্রসিকিউটর বলেছেন সাক্ষীদের দ্বারা তিনি প্রমাণিত করেছেন যে আসামী সুখ্যাত একজন মস্তান। স্থানীয় লোকেরা তার নামকরণ করেছে টাইগার। অর্থাৎ হিংস্র শ্বাপদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং হিংস্র শ্বাপদ।

হয়তো তাই।

এ সম্পর্কে আসামীপক্ষের অ্যাডভোকেট বলেছেন—হয়তো তাই। যার মায়ের অপমান হয় ধনী ব্যভিচারীর কলুষিত থাবার নীচে, যে বালকের জীবনে কোন সম্মান নেই সমাদর নেই সে যদি সত্যই প্রাণবন্ত হয় তবে বাঘের মত হিংস্র হয়ে নিষ্ঠুরভাবে বর্তমানের সব কিছুকে ভেঙে-চুরে চূর্ণ করে না দিয়ে তার পথ কোথায়? যাকে কেউ স্বীকার করে না তাকে আপন শক্তিতে স্বীকার করাতে হয়, সকল অত্যাচারকে রোধ করতে হয়।

মানুষের কাছে সকল অত্যাচারের চরম অত্যাচারে—মায়ের অপমান।

আসামীপক্ষের অ্যাডভোকেট বলেছেন—সারা দেশের অবস্থা এবং দেশের তরুণদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলতে ইচ্ছে করে যে এই বালক এবং তার মা তার প্রতীক।

এ কথা স্বীকার করতে আমারও ইচ্ছা হয়। এবং বলতে আমি বাধ্য যে এই বালকের মায়ের উপর যে কুটিল এবং কল্পনাতীতরূপে কুৎসিত অত্যাচার হয়েছে, আইনসংগতভাবে তার প্রতিকার হয়তো পেতে পারত কিন্তু এর শোধ নেবার অধিকার তার ছিল না। এ কথাও সত্য যে, বিচিত্র মানুষের সমাজের অতীত-কালের প্রভাবে ওই মিথ্যা দলিলে সই করিয়ে নিয়ে এই নারীর উপর যে অত্যাচার হয়েছে এবং যে অত্যাচারের মুখে অসহায়ভাবে তার পিতা ও তার স্বামী তাকে সমর্পণ করেছে তাতে তার এই পুত্রটি এইভাবে নিজের জীবনপণে ফাঁসিকেই স্থির পরিণাম জেনেই অত্যাচারীকে হত্যা করেছে; সে দুর্দান্ত, প্রাণবন্ত—তার পক্ষে বোধ হয় এই ছিল স্বাভাবিক। দেশের আইন এতে সম্মতি না দিলেও এই প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিতে উদ্যত হত্যাকারী পুত্রটিকে মানুষ শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়েই মনোলোকে অভিষিক্ত করবে।

আমি মহামান্য হাইকোর্টের কাছে এই বালকের সকল অপরাধের মার্জনার জন্য সুপারিশ করছি।"

দায়রা বিচারের রায়খানা পড়ছিলেন সুধাংশুবাবু। সুধাংশুবাবুর সেই বসবার ঘরে। সেই রাত্রিবেলা। সামনে দাঁড়িয়েছিল সেই চাঁপা—সেই রত্নমালা।

প্রেতিনী নয়, মমতায় বেদনায় জল-টলমল দুই চোখ নিয়ে সুধাংশুবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—মা। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

সকল গ্লানি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত মা।

সুধাংশুবাবু প্রসন্ন এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকালেন।

উৎসর্গ

তারাশঙ্করের শেষ রচনা ছাপার বাংলার সকল বাঙালীর হাতে তাঁর শেষ অভিপ্রায় অনুসারে তুলে দেওয়া হল।

—প্রকাশক

একটি কালো মেয়ের কথা

(ওপার বাংলা)

'ক্যাটস-আই' বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। অবিকল বেড়ালের চোখের মত। সাদা-ক্ষেত্রের মধ্যে খয়েরী রঙের গোল ঘেরের মধ্যে মণি দুটো ঠিক কালো নয় ঈষৎ নীলচে। এবং বেড়ালের চোখ যেমন আলোয় নিষ্প্রভ হয়ে আসে ও অন্ধকার হলেই জলজলে হয়ে জলে ওঠে এর চোখ দুটোও ঠিক তেমনি, কড়া কথা হলেই প্রদীপ্ত হয়ে উঠছিল। পিঙ্গলাভ গোল তারা দুটোর মধ্যে মণি দুটো যেন আলোর ছটা পাওয়া কালো পাথরের মত মনে হচ্ছিল।

চেহারাতে লোকটা কিন্তু বেড়াল নয়।

খাড়া নাক, লম্বা ধরনের মুখ; হাড়ে মাসে পেশীতে পাকানো শরীর, প্রায় পৌনে ছ'ফুট লম্বা, বুকের ছাতিখানা এতখানি প্রশস্ত, গায়ের রঙ তামাটের চেয়েও কালো কিন্তু কানের পেটীর ফাঁকে ফাঁকে—গলা এবং চিবুকের ভাঁজের রেখায় এককালের ফর্সা রঙের চিহ্ন শেওলাধরা পুরনো বাড়িব থামের মাথার পঙ্খের-কাজের সাদা ফালির মত চোখে পড়ে।

মাথার চুলগুলো নোংরা, রুক্ষ,—তার রঙ ধুলায় ঢাকা পড়লেও কালোই বটে, তবে ডগাগুলি লালচে। এবং তা মেহিদীর রঙের অবশেষ নয়।

পূর্ববাংলায় পশ্চিম-পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারে ভয়ার্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ মানুষের মধ্যে তাকে কোন রকমেই পূর্ব-পাকিস্তানী বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না।

পশ্চিম-পাকিস্তানী?

পাঞ্জাবী? সিন্ধি? বালুচ? অথবা গিলগিট অঞ্চলের লোক? দীর্ঘকাল বাস করছে পূর্ব-পাকিস্তানে—আজকের বাংলাদেশে? এমন লোক অনেক আছে আজ বাংলাদেশে। বেহার ইউ-পি অঞ্চল থেকে যেসব লোকেরা ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে বাস করছে তাদেরও কেউ হতে পারে।

পূর্ববাংলা থেকে পালিয়ে-আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে লোকটি সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশে এসে ঢুকেছে। অনুমান করতে পারেনি তার চোখ দুটো এমন বেমানান ঠেকবে। কয়েকজন উৎসাহী বুদ্ধিমান তরুণ তাকে গুপ্তচর সন্দেহ করে ধরে এনে পুলিসের হাতে দিয়েছে।

সঙ্গে একটি রুগ্ণ কালো মেয়ে। জরে বেহুঁশ মেয়েটির চলবার শক্তিও ছিল না, ওই লোকটি তাকে একরকম বয়ে নিয়ে এসেছে। এই মেয়েটির জন্য এবং পুলিসের তৎপরতার জন্যই বলতে হবে—সে পাকিস্তানী গুপ্তচর সন্দেহে ধরা পড়েও নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে গেছে। দিন কয়েক হল গুপ্তচর সন্দেহে দু'তিনজনকে ধ'রে লোকেরাই তাদের

পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। বর্ডার এরিয়ায় পুলিস অত্যন্ত সক্রিয় এবং সচেতন ছিল। লোকটি একটি গাছতলায় পীড়িত মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করছিল। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বুদ্ধিমান অল্পবয়সী সমাজসেবী-কর্মী ওর ওই চোখ এবং আকার অবয়ব দেখে সন্দেহবশে ফিস্‌ফাস শুরু করতেই ওদের ভাগ্যক্রমে পুলিস এসে পড়েছিল। পুলিসের দৃষ্টিও মুহূর্তে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তারা ওদের জীপে তুলে নিয়ে এসেছে থানায়।

* * *

মনের সন্দেহ অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট এবং শক্ত কঠিন হয়ে উঠছিল।

মাথায় এতখানি লম্বা, রুক্ষ চুলের ডগার দিকটায় পিঙ্গলাভাস, এমনি ছুটো চোখ। প্রশ্ন করলেন অফিসার—তুমি তো পশ্চিম-পাকিস্তানী ? নয় ?

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা তার উপর রেখে বললে—না। আমি পশ্চিম-পাকিস্তানী নই।

এবার প্রশ্ন করবার ভঙ্গিটিকে একটু তীক্ষ্ণ এবং রূঢ় করে তুলে অফিসার বললেন—তুমি বলছ তুমি পূর্ব-পাকিস্তানী ?

সে বললে—না, তাও নই।

—তুমি পাকিস্তানীই নও ?

—না সাহেব। তা কি বলতে পারি। আজ চব্বিশ বছর পাকিস্তানের রুটি নিমক খেয়েছি—ডাল ভাত খেয়েছি—আমি পাকিস্তানী নিশ্চয়ই। তবে আমি পূর্ব-পাকিস্তানী কি পশ্চিম-পাকিস্তানী নই ; আমি পাকিস্তানী। পশ্চিম পাকিস্তানে অনেকদিন থেকেছি, উর্দু খুব ভালো জানি। পূর্ব-পাকিস্তানে দশ বছর রয়েছি। এখন এদেশের মানুষই হয়ে গিয়েছি।

একটু থেমে থেকে হেসে আবার বলছিল—ভাত ছাড়া রুটি আর রুচে না মুখে—মাছ ছাড়া ভাত খাওন যায় না ; ই দ্যাশের ভাষায় কথা কইলি পর কোন্ মানু কয় যে আমি এই দ্যাশের ছাওয়াল না—

তার কথা শেষ হবার পূর্বেই পাশে সমবেত লোকদের মধ্য থেকে একজন উদ্ধত তরুণ ধৈর্য হারিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে তার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে রূঢ়স্বরে ধমক দিয়ে উঠল—Shut up you বদমাশ কাঁহাকা। চালাকি পেয়েছ ? না ?

সকলেই চমকে উঠেছিল। কেউ ঠিক প্রস্তুত ছিল না এর জন্তে। নইলে সকলেই মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ওই লোকটির উপর। সকলেরই মনে হয়েছিল লোকটা বাংলাদেশের ভাষাকে ভেঙিয়ে কথা বললে।

তরুণটি দ্বিতীয়বারও হাত তুলেছিল—কিন্তু লোকটি খপ ক'রে তার হাতখানা ধরে ফেলে বললে—কি চালাকি করলাম ? মারলেন কেন আমাকে ?

সঙ্গে সঙ্গে সূচীপতন-শব্দ শোনার মত নিস্তব্ধতা ঘরখানার মধ্যে থমথম ক'রে উঠল। পরমুহূর্তেই হয়তো একটা বিস্ফোরণের মত উচ্ছ্বাদী একটা কিছু ঘটতে পারত কিন্তু থানা

অফিসারটি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুজনের মাঝখানে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে প্রায় বাধা দিয়ে বললেন—Please, please, please.

আঘাতকারী তরুণটিকে বললেন—আপনি সরে আসুন। আপনারা বাইরে যান।

লোকটি চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই ছিল। তার সেই পিঙ্গল চক্ষুতারকা দুটি অস্থির দীপ্তিতে যেন ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

যে চড় মেরেছিল সে-ই হোক বা অন্য কেউ হোক এবার নিষ্ঠুর আক্রোশে এবং ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠল—He is a spy.

লোকটি প্রায় ক্ষিপ্তের মত ঝাঁকি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না; ততক্ষণে দুজন কনস্টেবল তার দুইপাশে সরে এসে তার দুই হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়েছে। লোকটা বুক ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—No. No. No! I am not a spy—I can never be a spy—No. I hate it—I hate it.

—Search কর ওকে।

দুই হাত তুলে দাঁড়িয়েছিল সে—আর একজন তার পোশাক-পরিচ্ছদে হাত পুরে খুঁজে খুঁজে দেখছিল। গায়ে একটা ছেঁড়া শার্ট। বুকপকেটে একটা ডটপেন, একখানা ছোট নোট বই। নিচের পকেটে সস্তাদামের দু'প্যাকেট সিগারেট দেশলাই একটা লাইটার।

তল্লাসীর সময় লোকটি হাত তুলে প্রায় চঞ্চল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল এবং আপনমনেই কথা বলেই যাচ্ছিল—না, আমি স্পাই নই। বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর traitor spy বড় ঘৃণিত জীব। আমি স্পাই নই। আমি মুসলমান নই আমি হিন্দু নই, পাকিস্তানে আমার জন্ম নয়; ধর্মে আমি কৃশ্চান। আমার জন্মস্থান কলকাতা। আমার বাবা ছিলেন Anglo-Indian—আমার মা ছিলেন বাঙালী কৃশ্চান—মায়ের বাবা ছিল 'বিশ্বাস'। তালতলায় বাড়ি ছিল আমার মায়ের বাবার। ওই বাড়িতে আমি জন্মেছি। আমার বারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি তালতলায় বড় হয়েছি। আমার বাবা ছিল রেলের Yard Officer—মা ছিল আমার P. G. Hospital-এ নার্স। এলিয়ট রোডে রিপন স্ট্রীটে ফ্রি ইস্কুল স্ট্রীটে মৌলালীতে খুঁজলে আমার চেনা লোকেদের নিশ্চয় পাওয়া যাবে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় my father wanted to go England or Australia or South Africa—but. কিন্তু হয়নি—হয়ে ওঠেনি। আমার বাবা adopted Pakistan, করাচীতে বাবা রেলইয়ার্ডে চাকরি পেয়েছিল; মা পেয়েছিল রেলওয়ে হসপিটালে চাকরি। বাবা আমাকে মিশন ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাবা চেয়েছিল আমি ভাল লেখাপড়া শিখে England চলে যাই। কিন্তু—

একটানা এতগুলি কথা লোকটি বলে গেল—এমনভাবে বলে গেল এবং তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন কিছু মানুষের মন এবং হৃদয়কে স্পর্শ করা কিছু ছিল, যার জন্য দশ-বারোজন সন্দিগ্ধচিত্ত সতর্ক তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ তাদের কপালে ভুরুতে কঠিন সংশয়ের কুঞ্চনরেখা নিয়েও

মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে শুনে গেল। অবিশ্বাসবশে বা অসহিষ্ণু হয়ে একটা প্রতিবাদও করলে না।

বরং একজন কেউ যেন নিরাশ হয়ে বললে—দূর দূর। যত সব বাজে কাণ্ড—

সঙ্গে সঙ্গেই একজন বাধা দিয়ে বললে—চুপ কর। শোন না কি বলছে।

'কিন্তু' বলে লোকটি দুই হাতের তালুই উল্টে দিয়ে বললে—মর্জি খোদার আর নসীবের ফের—কোথায় বা ইংল্যাণ্ড কোথায় অস্ট্রেলিয়া কোথায় সাউথ আফ্রিকা, আমি সেই পাকিস্তানেই রয়ে গেলাম। মা হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেল, বাবা আবার বিয়ে করলে শুকনো চেহারার নিষ্ঠুর মেজাজের এক আধবুড়ী খাস মেমসাহেবকে and I was left alone, a forsaken child. সারি দুনিয়ামে মেরা কোই নেহি থা। অবশ্য child তখন আর আমি নই। বয়সে পনের পার হচ্ছি—দুনিয়ার একটা আলাদা টান মনকে টানতে শুরু করেছে। জিন্দগীর অনেক মন্দ জিনিস গোপনে গোপনে জেনেছি। রাত্রে মিশন থেকে বেরিয়ে পালাতে গিয়ে ধরাও পড়েছি দু-চারবার। গানের গলা ছিল—সিনেমার গান শিখেছি। উর্দু গান ভাল লাগছে। গজল গাই। এসব ফাদারদের অজানা ছিল না। এর উপর বাবা হঠাৎ চলে গেল England—আমার খরচের জন্যে এক পয়সাও দিয়ে গেল না। তবুও মাসচারেক ফাদাররা কিছু বলেনি। পাঁচমাসের সময় আমি মিশনের electric জিনিসপত্র চুরি ক'রে ধরা পড়লাম।

পড়াশোনায় ভাল ছিলাম না। ঝোঁক ছিল গানে আর ইলেকট্রিসিটির কাজে। খুটখুটে ছেলে যাকে বলে এক ধরনের, যারা নিজেরাই খুটখাট করতে করতে কাজ শিখে ফেলে। আমি সে পালা শেষ করে মিশনে যে মিস্ত্রী ইলেকট্রিকের কাজ করত তার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে করতে তার assistant হয়ে গিছলাম প্রায়। কাজকর্মও ভালই শিখে ফেলেছিলাম। বাবা চলে গেলে মিশন টাকার তাগাদা না করলেও আমার নিজের অভাব হয়ে পড়েছিল। সিগারেট খাই—সিগারেটের পয়সা জোটে না; সিনেমা এলে যেতে পারি না। একখানা সাবান চাই—জোটে না। অগত্যা ইলেকট্রিক বাল্ব খুলে প্লাগ খুলে সুইচ খুলে নিয়ে বাজারে বিক্রী করতাম। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলাম একদিন। আমার সীটটার নীচে আমার সুটকেস খুলে দেখলে ফাদারেরা। সেই তল্লাসীতে ওরা পেলে খানকতক উর্দু সিনেমা সাপ্তাহিক—যার মধ্যে সিনেমা-স্টারদের তসবীর আছে। আরও আছে উলঙ্গ মেয়ের ছবি। আর সেই ছবির উপরে উর্দু গানের লাইন লেখা। যার মানে খুব খারাপ; লেখা আমারই—না বলবার উপায় ছিল না। ওইসব খারাপ লাইনগুলো লিখে উর্দুতে সই করেছিলাম 'আওয়ারা' বলে। রাজকাপুরের 'আওয়ারা' ছবিটার গল্প শুনে খুব ভাল লাগত। কিন্তু তার পরেও লিখেছিলাম—আওয়ারা 'ডেভিড'। উর্দু খারাপ গানের লাইনগুলো আমার নিজের তৈরী। উর্দুতে গজল বানাবার ঝোঁক আমার তখন খুব।

এরপর মিশনের রেকটর আমাকে বললেন—তোমার জিনিস সব গুছিয়ে নাও। এবং মিশনের যে ফটকটা বড় রাস্তার উপর সেই ফটকটা খুলে দিয়ে বললেন—Try your luck now, আমরা তোমাকে আর রাখতে পারব না। আমি লজ্জিত যে English

language, English culture তোমার ভাল লাগল না।

আমি ভয় পাইনি, বেরিয়ে এসেছিলাম। ঠিক করেছিলাম electric মিস্ত্রীর কাজ ক'রেই খাব। তার সঙ্গে গান আছে। গাইয়ে হিসেবে নাম করতে পারলে কথাই নেই। কোনক্রমে যদি দু'চারখানা গান রেকর্ড করতে পারি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

অফিসার বললেন—দাঁড়াও।

এবার সে অফিসারের দিকে তাকালে। অফিসার টেপ রেকর্ডার থেকে ফুরিয়ে-যাওয়া টেপের রীলের চাকাটা খুলে নতুন টেপ পরানো চাকী পরিয়ে দিচ্ছিলেন। লোকটি এতক্ষণে এ সম্পর্কে সচেতন হল। অফিসার যে কখন টেপ রেকর্ডারের মাইক্রোফোনটা টেবিলের উপর রেখেছিলেন সে সম্পর্কে সে কিছুই জানতে পারেনি। একটু হেসে সে শুধু বললে—ওঃ, you have not believed me!

আরও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে টেবিলের কোণটা ধ'রে বললে—I am not a spy—আমি স্পাই নই। Spying আমার বিচারে গুপার সামিল—পাপ। It is a sin.

অফিসারটি বললেন—আমরা তো তোমাকে ইতিমধ্যে কোন শাস্তি দিইনি।

সে বললে—কি বললেন?

অফিসার বললেন—তোমাকে তো spy ব'লে ধরে নিয়ে এর মধ্যেই কোন সাজাও তো দিইনি। Have we put you to any torture?

সে বললে—না—তা বলতে পারব না।

অফিসারটি বললেন—কিন্তু আমাদের কতকগুলো কর্তব্য আছে—কতকগুলো আইন আছে, নিয়ম আছে।

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলে সে। অস্ফুট স্বরেই একরকম বলেও ফেললে—হ্যাঁ তা আছে।

অফিসার বললেন—বস ওই টুলটার উপর।

পাশের খালি চেয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে টুলটার উপরেই বসল। অফিসার বললেন—বল, তারপর বল।

একটা সিগারেট খাব?

নিশ্চয়। ওই তো তোমারই সিগারেট রয়েছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে সে আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। বললে—সামান্ত কখানা বস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়েছিলাম খোলা কন্নাটীর পথে। ভয় আমি পাইনি। ভয় পাবার মত মনের গড়ন আমার নয়। My father was never kind to me. My mother—She was a queer sort of woman. কথায় কথায় তার ছিল কান্না। হাসপাতাল থেকে এসে রোগীর জন্তে কাঁদত। আমার বাবা বেশী মদ খেলে মা কাঁদত; বাবা কড়া কথা বললে কাঁদত। You see—এক-একটা দুঃখের ছবি দেখে এসে

তিন-চারদিন ধরে কাঁদত, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত। আমার জন্তে কান্না তো লেগেই ছিল। আমি বয়ে যাচ্ছি—তার জন্তে তো কাঁদতই, আবার আমি রাগ করলেও মা কাঁদত। She was very strange, আমি তার হদিস পাইনি কখনও and I did not like her. আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিলে।

অফিসার বললেন—তুমি শক্ত মনের গড়নের লোক। এখন তোমার কথা বলে চল।

—হ্যাঁ—বলছি। পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম সাহস ক'রে, তাতে ঠকলাম না। Screwdriver, tester, কতকগুলো পাত রেঞ্চ নিয়ে Electro mechano বলে একটা দোকানের সামনে বসে থাকতাম। জনকয়েক মিস্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। আমি কাজ জানি—কাজ ভাল ক'রে যত্ন ক'রে করি—তা ছাড়াও আমার জীবনের আর একটা মূলধন ছিল। আমি ভাল গজল গাইতাম। তাছাড়া নিজে উর্দু গজল তৈরী করতে পারতাম। সেগুলো কিছুটা ভালগার ছিল বলে মিস্ত্রী class-এর লোকেরা পছন্দ করত। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও। ওদের সঙ্গে আমি মিশে গেলাম। চেহারাতে West Pakistani লোকের সঙ্গে মিল ছিল। গায়ের রঙ চোখের চেহারা চুলের রঙ প্রায় একরকম—তাছাড়াও লম্বায় আমি ওদেশের মানুষের সমান ছিলাম। আরও ছিল—মেজাজের গড়ন, সম্পূর্ণ না হলেও, কতকগুলো জায়গায় অনেকটা একরকমই ছিল। আবার গরমিল ছিল এই মেজাজেই। মধ্যে মধ্যে আমার মায়ের এই ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মন কেমন ক'রে আমার মনে ছড়িয়ে পড়ত।

অফিসার বললেন—এত বাড়িয়ে বলো না। Facts বল—

সে বললে—Mr. Officer—তাই বলতে আমি চেষ্টা করছি। নাহলে সে সময়কার ঘটনা বলতে গেলে সে আর ফুরুবে না। আমি বলতে চাচ্ছি—অল্পদিনের মধ্যেই আমি ওদেশের মানুষদের একজন হয়ে গিছলাম। ওদের ভাষা বলতাম ওদের মত। ওদের গান গাইতাম ওদের মত। আমার খানকয় গান রেকর্ড হয়েছিল। কিন্তু bad luck, আমার গান লোকে পছন্দ করেনি। ওই গান গাইবার জন্তে একটা নামও নিয়েছিলাম আমি। কারণ একজন Anglo-Indianএর উর্দু গান পছন্দ না করতে পারে। এক বুড়োর কাছে থাকতাম। তার মরা ছেলের নাম ছিল মনসুর। নামটা সেই আমাকে দিয়েছিল।

—I see—কি নাম সেটা ?

—মনসুর।

—পাকিস্তানে রেকর্ড করেছিল H. M. V. ?

—হ্যাঁ। খোঁজ ক'রে দেখতে পারেন।

—তারপর বল।

—গানে কিছু হয়নি কিন্তু electricএর কাজে আমার পথ খুলে গিছল। দু'বছরের মধ্যে electric engineering সম্বন্ধে লেকেণ্ডহ্যাণ্ড বই কিনে পড়ে শুনে পরীক্ষা দিয়ে একটা ডিগ্রীও যোগাড় ক'রে নিয়েছিলাম। কাজ তখন চারিদিকে। পাকিস্তান নতুন স্বাধীন দেশ।

দুনিয়ার তার শক্তির অনেক। কায়দে আজম জিন্না সাহেবের নামে সারা দুনিয়া ঝুঁপি খুলে মাথা নোয়ায়। England America থেকে শুরু করে সব দেশই তাকে টাকা যোগাচ্ছে—গম যোগাচ্ছে—কলকারখানার সরঞ্জাম যোগাচ্ছে—লড়াইয়ের সরঞ্জাম যোগাচ্ছে। গরীব দেশ একটা, তাকে নতুন করে গ'ড়ে তুলতে হবে। নয়া জমানা—নয়া জিন্দগী—নয়া মুল্ক। পাকিস্তান। বড় বড় শহর কিছুটা ভেঙেচুরে—কিছুটা পুরনো শহরের পাশে নতুন ক'রে আরও বড় modern শহর তৈরী হচ্ছে। দশবিশতলা মোকাম। বড় বড় এরোড্রোম। বছরে বছরে নতুন কিস্‌মের হাওয়াই জাহাজ এসে নামছে এরোড্রোমে। কলকারখানা বসছে। পাটের কল—লোহার কারখানা—আরও শও রকমের হাজার কারখানা তৈরী হচ্ছে। মালিক সব খান সাহেবেরা, নবাবজাদা—পীরজাদা—জায়গীরদারেরা। রেডিয়োতে গান হচ্ছে, ক্লাবঘরে নাচ হচ্ছে। বড় বড় কনফারেন্স হচ্ছে। আবার নবাবজাদা পীরজাদাদের বাড়িতে বাইরা নাচছে। জলসা-জলুসের কামাই নেই। লাহোর থেকে করাচী পর্যন্ত প্রকাণ্ড চওড়া সড়ক তৈরী হয়েছে। সেই সড়কে সকালে শহরের কাজ সেরে আমীরেরা ঝকঝকে মোটরে চড়ে নাচগান মহফিলের ইন্তেজার নিয়ে চলেছে ওদের বাড়িতে, সন্ধ্যেবেলা মহফিল হবে। কারখানা opening হচ্ছে—বড় বড় রিসেপশন দেওয়া হচ্ছে, সেখানে আলো জ্বালাতে হচ্ছে, মাইক চালাতে হচ্ছে। আমি সারা পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে বেড়াচ্ছি ইলেকট্রিক মিস্ত্রী হয়ে—করাচী থেকে লাহোর। সারা পাকিস্তানে ইলেকট্রিসিটি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ন'বছর কাজ করলাম একটা বড় ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারস ফার্মে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। পুরো ন'বছর কাজ করলাম। আমার নিজের ধর্ম ভুললাম—ইংরেজী ভাষা ভুললাম—নাম পর্যন্ত ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম নয়—বদলে গেল—বদলে ফেললাম নিজেই।

ছিলাম ডেভিড আর্মস্ট্রং, হয়ে গেলাম মনসুর আলি, কোম্পানীর খাতায় আমার ওই নামই লেখা হয়ে গেল—আমিও ওই নাম সই করতাম আরবী হরফে। মাইনের খাতায় ওই নাম সই দিয়েছি। উর্দুতে রিপোর্ট পর্যন্ত দিয়েছি কোম্পানীকে। I wanted to be a West Pakistani. আট বছর সেই চেষ্টা করেছিলাম। তারপর হঠাৎ 'পিঁড়ী বদল গয়া'—সব বদলে গেল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এলাম পূর্ব-পাকিস্তানে। এখানে এসে আমার আবার একবার সব বদলালো। I may say I was reborn. Yes it was rebirth. আমি পূর্ব-পাকিস্তানে এসে একেবারে এদেশের মানুষ হয়ে গেলাম।

অফিসারটি বাধা দিয়ে বললেন—মিস্টার আর্মস্ট্রং—না মনসুর—কি বলব তোমাকে?

—যা আপনার ইচ্ছে হয়। Whichever you like. আমি আর্মস্ট্রংও বটে, মনসুরও বটে।

—ভাল—তুমি ওদেশে ওদেশের মানুষ হয়ে গিয়েছিলে—আবার এদেশের মানুষ কি ক'রে হলে? What do you mean by it?

হেসে মনসুর বললে—মানে আমি ঠিক জানি না। আমি ঘটনার কথা বলছি।

A fact. একদিন one morning I felt that I was a বাংগালী East Pakistani. বাংলার জলে রোদে বাতাসে আমার রঙ পুড়ে তামাটে হতে শুরু করলে ডাল ভাত মাছ লঙ্কা বড় ভাল লাগল—বাংলা বুলি শিখে গেলাম -ভাটিয়ালি গান শিখলাম—বাঁশের বাঁশী আর দোতারা বাজাতে শিখলাম—আয়নায় নিজের চেহারা দেখে শেখ আমিনুর রহমানের সঙ্গে এমন মিল দেখতে পেলাম যে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল আমরা দুজনে চাচাতো ভাই। জাফরউল্লা খাঁ আমার উপর খুব 'রঞ্জ' হয়ে গিয়ে বললে—ইয়ে তুম ক্যা কর রহে হো? ইয়ে ক্যা তুমহারা বেচাল? আমি—

—হুঁ। হুঁ। Stop, stop please. ইনস্পেকটার বাধা দিলেন।

লোকটি মুখ তুলে তাকালে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—Yes sir!

—Who is this Jafarulla Khan?

—I beg your pardon. I did not tell you about Jafarulla. I forgot to tell his name.

—হ্যাঁ। কে? জাফরুল্লা খাঁ?

জাফরউল্লা খাঁ লাহোরের এক দেউলে-পড়া খানদানী ঘরের ছেলে। রইস আদমী—বহুৎ বড়া দিল—দেনা করে বাই-বাড়িতে মুঠো ভ'রে টাকা উড়িয়ে দেয়। মদ খায় শিকার করে—ক্রিকেট খেলতে বাইরের দল এলে করাচী যায়, আবার লাহোরে আসে—আবার রাওয়ালপিণ্ডি যায়। আমার সঙ্গে দোস্তি হয়েছিল—যাকে বলে by chance, সেই by chance; যে কোম্পানীতে আমি চাকরি করতাম সেই কোম্পানীর সে ছিল অফিসার। লাহোর পিণ্ডির পথের ধারে electric lineএর কাজ হচ্ছে, সেখানে একটা তাঁবু খাটিয়ে মালপত্র নিয়ে আমি chargeএ রয়েছি, একদিন বেশ খানিকটা রাত্রে আমি বসে সিগারেট খাচ্ছি আর গজল গাইছি—জাফর সাহেবের কার এসে থামল। আমি ভাবিনি—আমাদের কোম্পানীর কেউ এসেছে, আমি গান গেয়েই গিয়েছিলাম, জাফর সাহেবের সেই গান ভাল লেগেছিল। And he took a fancy on me. সেরাত্রে আমার ওখানেই সে হল্ট করেছিল। সারারাত্রি গানবাজনা খানাপিনাতে কেটে গিয়েছিল। সকালে উঠে যাবার সময় বলেছিল—কোনদিন আমার গরীবখানায় তোমাকে পেলে খুশী হব। সেই দোস্তি আমাদের আরও জমে উঠল পূর্ব-পাকিস্তানে এসে। ১৯৬০ সালে—তখন জেনারেল আয়ুব খান সারা পাকিস্তানে জঙ্গীশাহী কায়েম করেছেন, সমস্ত Indian border জুড়ে মজবুত মিলিটারি ঘাঁটি তৈরী হচ্ছে। পাকিস্তান-কাশ্মীর বর্ডারে জোর কাজ চলছে, সেই সময় পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে হিন্দুস্থান বর্ডারে ঘাঁটি তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেল। জাফরউল্লা মতলব করলে সে নিজের কোম্পানী ক'রে ঠিকার কাম নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে আসবে। আমাকে বললে—মনসুর তুমিও চল। যাবে?

—পূর্ব-পাকিস্তান?

—হ্যাঁ। বহুৎ আরামের দেশ—বহুৎ মজা লুটবার দেশ।

—আরাবের দেশ? সে তো জলো দেশ। শুনেছি নদী নদী আর নদী। আর সাপ বাঘ বিচ্ছু—নদীতে নাকি গণ্ডায় গণ্ডায় কুমীর হাঙর কিলবিল করছে। তার উপর হাজারো বেমারীর দেশ। গরীবের দেশ—

—হবে অনেক। তকদীর বদলে যাবে, নসীব খুলে যাবে। চল না। বাঘ সাপের ভয় করো না—সে সব শহরে থাকে না, আর নদীতে আমরা লঞ্চে ঘুরব স্টীমারে ঘুরব। আমরা শহরে থাকব। প্রেসিডেন্ট হুকুম করেছেন শহরগুলো ঢেলে সাজো। আর গরীবের দেশ বলো না। পয়সা ওদেশে আছে। এই তো, আমার জানা সৈয়দ ইয়াকুব আলি খাঁ—মির্জা নাদের হোসেন—ওখানে গিয়ে ব্যবসা করে লাখো লাখো টাকা রোজগার করে ফিরে এসেছে। মস্ত বড় বিজনেস চলছে। খালি হাতে পায়ে গিয়ে বছর যেতে না যেতে you can earn more than enough. ওখানকার সরকারে বড় বড় অফিসার সবই এখানকার আদমী। এখান থেকে যারা যায় they get their ready help.

একটু থামল লোকটি। সম্ভবতঃ সেকালের সেই দিনটি স্মরণের আকর্ষণে অতীত থেকে উঠে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, সে তারই দিকে তাকিয়ে দেখছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকবার টান দিয়ে নিয়ে সেই কথাই সে বললে—বললে—আমার সেদিন সেই মুহূর্তে কলকাতার কথা মনে পড়েছিল—তালতলার গলিগুলো—করপোরেশন স্ট্রীট—ওখানকার আমাদের অ্যাংলোপাড়া রিপন স্ট্রীট—এলিয়ট রোড—মনে পড়ে গিছল। আমরা অ্যাংলোরা বাঙালী-বাবুদের ভাল চোখে দেখতাম না। আমাদের enemy মনে করতাম।

জাফরউল্লা বলেই চলেছিল ওখানকার কথা। প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ গোটা দেশটাকে বহুত মজবুত মুঠিতে ধরেছেন—ওদেশের লীডারদের জবরদস্তি দাবিয়ে রেখেছেন। একদিকে দোস্তি করেছেন চীনাদের সঙ্গে অন্যদিকে দোস্তি আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে; চীনারা ওদেশে দলে দলে আসছে—শহরে শহরে ছড়িয়ে পড়ছে—বিজনেস খুলছে। ওদের সঙ্গে পাকিস্তানের দুশমন হিন্দুস্তানের আধা লড়াই লেগেছে। এখন এক্টা মওকার সময়। বহুত মিলিটারি কনট্রাক্ট পাওয়া যাবে। আমার জানা লোক আছে সেক্রেটারিয়েটে। আমি যাব। তুমি চল আমার সঙ্গে। Working Partner হিসেবে চল।

জাফরউল্লা একা নয়; পশ্চিম-পাকিস্তানের fortune-hunter যারা তারা দলে দলে আসছিল East Pakistan.

আমি জাফরউল্লার সঙ্গে আসিনি। আমি মাসছয়েক পরে এলাম। East Pakistan Rifles-এর জন্যে নতুন নতুন military truck lorry wireless van আসছিল—চারিদিকে রব—কখন হিন্দুস্তানের সঙ্গে লড়াই বাধে তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো ওবেলায় বাধবে—এ বললেও কেউ চমকে উঠবে না; আমি এলাম ওই wirless vanগুলোর সঙ্গে। এখানে এসে পৌঁছে দিয়ে চালু ক'রে দিয়ে ছুটি। লোভনীয় ছিল টাকার অঙ্ক।

করাচী থেকে প্লেনে এসেছিলাম চিটাগং। ওখানে আমেরিকান জাহাজ এসেছিল—জাহাজ-বোঝাই যুদ্ধের সরঞ্জাম। সেখান থেকে আবার ভাগ হয়ে এসব যাবে [illegible],

যশোর, রাজসাহী, রঙপুর, কুমিল্লা—আরও অনেক জায়গায়—আমি এই কয়েকটা জায়গায় ঘুরেছিলাম। এবং কেটে গেল প্রায় আরও আট মাস। এই আট মাসের মধ্যে কখন যে আমি এই পূর্ববাংলার মানুষ হয়ে গেছি তা আমি বুঝতে পারিনি। I could not feel even. I did not know that I was changing. আজও বলতে পারব না how it happened—how it became possible!

একটু থেমে একটু ভেবে নিয়ে সে বলেছিল—The language—ওদেশের ভাষার কথা শুধু বলতে পারি,—পূর্ববাংলার ভাষার সঙ্গে কলকাতায় শেখা আমার মাটির ভাষার সঙ্গে এর খুব তফাৎ ছিল না। আমার মা বাংলা বলত তালতলার বাড়িতে; কেউ দরজার কড়া নাড়লে জানালায় মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করত—কাকে চান? কি বলছেন, বলুন। মনে পড়ে গেল। চাটগাঁয়ে নামার একদিন পর East Pakistan Rifles-এর ডাক্তারের কোয়ার্টারে গিছলাম, জ্বর হয়েছিল; কোয়ার্টারের বন্ধ দরজার কড়া নাড়তেই পাশে জানালা খুলে দেখা দিয়েছিল একটি মেয়ের মুখ। ডাক্তার সাহেবের মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কারে চান?

মুহূর্তে কি ক'রে যে সেই ছেলেবেলায় মায়ের কথা বলা মনে পড়ে গিছল বলতে পারব না – তবে আমি স্থানকাল হারিয়ে প্রায় বোবা এবং অন্ধ হয়ে গিছলাম। ভদ্রমহিলা আবার প্রশ্ন করেছিলেন—কি কইছেন? কন?

চট্টগ্রামে বেশীদিন থাকিনি। চলে এসেছিলাম ঢাকাতে। ঢাকা শহরের বড় রাস্তায় বেরিয়ে যেন অবাক্ হয়ে গেলাম। পথের মানুষের কলরবের মধ্যে থেকে যেন সেই কলকাতার ভাষার ধ্বনি শুনতে পেলাম। মনে হল—এদের ভাষা আমি সব বুঝি। ঢাকা রেডিয়োর প্রোগ্রামের মধ্যে ওই যে rural programme সে যে কি ভাল লাগল কি বলব। একটি মেয়ে একটি পুরুষ ঝগড়া করত শুনে আমার দিল মশগুল হয়ে যেত। বড় রাস্তায় গ্রামোফোন রেডিয়োর দোকানে রেকর্ড বাজত; আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতাম। সুরের সঙ্গে গলা মেলাতাম। উর্দু গজলের আমি খুব ভক্ত। বলতে গেলে উর্দু গজলের টানেই উর্দু ভাষাটাকে আমি শিখেছিলাম। এখানে এসে ভাটিয়ালী শুনে সেই নেশা ধরে গেল। গান জানি, গলা আছে—সুর শিখতে দেরি লাগল না। ভাষা শিখতেও না। 'কোথায় যাবে' আর 'কনে যাবা' 'কইরা মইরা' আর 'ক'রে ম'রের তফাৎ কতটুকু? এ তফাৎ জ্যাট করে নিতেই বা কতক্ষণ লাগে? তবে লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা কইলে বুঝতে ধাঁধায় পড়তাম —কষ্ট হত; কিন্তু গানের ভাষা শিখতে কোন কষ্ট হল না। ভাটিয়ালী সুরে নেশা আছে—তার গানেও আছে।

প্রথম গান শিখেছিলাম একজন মুশকিল-আসান ফকীরের কাছে। পূর্ব-পাকিস্তানে পৌঁছুবার ছ'মাসের মাথায়। বড় একটা সাইক্লোন হয়ে গেল। পূর্ব-পাকিস্তানে ঝড় হয়। জল ঝড় বানের সঙ্গে ওদেশের আসমান-জমীনের কেমন একটা সম্পর্ক আছে। ঝড় এসে সব তছনছ করে দিয়ে যায়। সেবারও দিয়ে গেল। ঘরবাড়ি উড়ল, গাছপালা ভাঙল; দ্বীপকে

পড়ল, মানুষজনও কম মরল না। সেই সঙ্গে উপড়ে পড়ল ইলেকট্রিক তারের পোস্ট, টেলিগ্রাফের টেলিফোনের তার ছিঁড়ল—বন্যায় গ্রামঅঞ্চল ডুবে রইল ক'দিন ধরে। এর জন্যেই আর্মি লোকদেরও ডাক পড়েছিল। আমি আর্মির লোক নই—ওদের ঠিকের কাজ করছিলাম, আমাকেও ওরা পাঠিয়েছিল। একদিন একটা নদীর ঘাটের উপর ইলেকট্রিক পোস্ট পুঁতে লাইন মেরামত করছি, একজন মুশকিল-আসান ফকীর ঘাটের উপর একটা গাছতলায় পাতা পান বিড়ি মুড়ি তেলেভাজার দোকানে এসে, মুশকিল-আসান কর পীর। পীর গাজী। বলে গান আরম্ভ করলে। লোকটার গলা ভারী ভাল। আর গানটাও বড় ভাল লাগল।

> মুশকিল-আসান করেন দয়াল গাজী পীর—
> এ কোন্ সর্বনাশা তুফান আইল—ভাঙল সুখের নীড়—
> ও দয়াল গাজী পীর—
> আসমান জমীন জুড়্যে তুফান গর্জায়—
> কে করল গুনা আল্লা—কার জান যায়—
> ক্যাতেতে পচিল ধান—গাভীর বাঁটে শুকায় ক্ষীর—
> দয়াল গাজী পীর—

ভারী ভাল লেগেছিল—আমি কাজ ফেলে দিয়ে তার কাছে এসে তার সঙ্গে আলাপ ক'রে বলেছিলাম—গানটা শেখাবে আমাকে? আমার রং তখনও এমন কালো হয়নি—তখনও আমি বাংলা ঠিক বাঙালীর মত উচ্চারণ করতে পারি না, কলকাতায় শেখা বাংলা এবং বাংলা বলা কলকাতার জিভ ঠিক আর বজায় ছিল না। পশ্চিম-পাকিস্তানী উর্দু'র টানটোনগুলো এমনই আমার দুরস্ত হয়ে গিয়েছিল যে বাংলা কথা বলতে গেলেই ধরা পড়ত—লোকটা উর্দু-বলা মুল্কের লোক।

ফকীর তাই বোধহয় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং বলেছিল—আপনি আমাগো ভাগের বাংলা বুলির গান শিখব্যান?

বলেছিলাম—হ্যাঁ।

—বাংলা বুলি তো আপনি বেশ কইতি পারেন দেহি।

—হ্যাঁ তা পারি। এখন তুমি গানটা শিখাও।

সেই আমার বাংলা গান শেখার হাতেখড়ি। দিনকয়েক পরেই গানের সুরটা মনে রইল—গানটা ভুলে গেলাম। ওই ক'টা লাইন মনে থেকে গেছে। দ্বিতীয় গান শিখেছিলাম স্টীমারের ডেকে। ওই মিলিটারি হুকুমেই যাচ্ছিলাম খুলনা থেকে বরিশাল; ডেকের উপর একদল ছোকরা—হালআমলের বাঙালী ছেলে—মানে গোঁফদাড়ি কামানো—মিষ্টি-মিষ্টি চেহারা; তারা সব ডেকের উপর আসর পেতে হারমোনিয়ম বাঁশের বাঁশী নিয়ে খুব জমিয়ে গাইছে। আমিও তাদের একপাশে ব'সে গেলাম। ভারী মিঠা লাগল গানখানা। মনে হল—এই নদীরই কোন ঘাটে কোন মাঝা যেন গানখানা গাইছে—সেই গান শিখে এই

ছোকরা গাইছে গানখানা। গানখানা আমার মনে আছে—

আমি কান্দি কান্দি হইলাম অন্ধ, ও সোনা বন্ধু রে—
ওরে তোমার লাগিয়া বন্ধু তোমার লাগিয়া
দিন ফুরাইয়া আইসে রাত্রি—ও রাত্রি ফুরায় জাগিয়া জাগিয়া—
সোনা বন্ধু রে তোমার লাগিয়া—
আমার কান্দার জলে আষাঢ়িয়া নদী ভরি দুকূল ছাপায়—
ম্যাঘে ঢাকা আকাশের পারা মোর মনো দুস্‌দু ক'রে
হায় হায় রে—করে হায় হায়—
পরান বান্ধিতে চাহি বান্ধা নাহি যায় গো—
পড়িছে ভাঙিয়া হায় গো পড়িছে ভাঙিয়া—
সোনা বন্ধু রে তোমার লাগিয়া।

আমি ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছিলাম উর্দু গজল গেয়ে। মির্জা গালিবের গজল গেয়েছিলাম। ওদের গাইয়ে ছেলেটি গালিবের গজলটা লিখে নিয়েছিল—আমি লিখে নিয়েছিলাম সোনা বন্ধুর গানখানা। লিখেছিলাম আরবী হরফে—ওরা দেখে বলেছিল—বাংলাভাষা এমন বলতে পারেন—বেশ বলেন মোটামুটি, কিন্তু লিখতে পড়তে শেখেন না কেন?

ওই যাত্রায় স্টীমার থেকে নেমেই বরিশালে দুখানা বই কিনেছিলাম। বর্ণপরিচয় আর হস্তলিপি শিক্ষা। ডট পেন ফাউণ্টেন পেন ছিল। একসারসাইজ বুক কিনেছিলাম কয়েকখানাই। এবং সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা আটাশ বছর বয়সে অ আ ই ঈ মক্‌স করতে আরম্ভ করেছিলাম।

কিছুদিন পর আমার চাকরি গেল।

চাকরি অবশ্য পাকা চাকরি আমার ছিল না। কাজ ভাল জানতাম বলে কণ্ট্রাক্ট বেসিসে কাজ পেয়েছিলাম। সেটা চলে গেল। কারণটা তুচ্ছ। ওখানে পার্টস কিনে এ্যাসেম্বল্ করে আমি ট্রানসিস্টার রেডিয়ো তৈরী করে দিয়েছিলাম পলটনের লোকদেরই দু'চারজনকে। আমার নিজের ব্যবহারের জন্তে একটা ছোট ট্রানসিস্টার তৈরী করেছিলাম—সেটা স্বচ্ছন্দে পকেটের মধ্যে রাখা যায়। একজন ক্যাপটেন সেটা দেখে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে E. P. R. ব্যারাক থেকে তাড়িয়ে দিলে।

আমি প্রথমটা ভেবেছিলাম চলে যাব এসব দেশ ছেড়ে। মানে East Pakistan West Pakistan India ছেড়ে চলে যাব England South Africa Australia কি যেখানে হোক। কিন্তু গেলাম না। দেশটা বড় আপন আপন মনে হয়েছিল। শান্তশিষ্ট রোগা মাথায় খাটো মানুষগুলি; দেখতে বেশ একটু কালোই; কিন্তু তবু কি সুন্দর। কচিপাতায় ঝলমলে খাটো খাটো গাছের মত। যারা লেখাপড়া শিখছে তারা ইস্পাতের ছুরির মত ধারালো ঝকঝকে শানানো। সাধারণ মানুষেরা আরও আশ্চর্য। মাঝিমাল্লা চাষীভুষি কামার-কুমোর

—এরা ওই গাছের মত। তলার ছায়া মেলে থাকে—ডালে ফুল ধরায়। যদ্ধে ময়দানে ওদের বিক্রম দেখা যায়। ওরা সে কি লড়াই-ই করে। ওদের বেশী ভাল লেগেছিল। ঢাকা রেডিয়োর পল্লীগ্রামের আসর না শুনে আমার দিন যেত না। আমি ওদের মধ্যেই থেকে গেলাম। ওই রেডিয়ো ট্রানসিস্টার তৈরী ক'রে বিক্রী করবার কাজ নিয়ে থেকে গেলাম। পশ্চিম-পাকিস্তানে আমার কেউ ছিল না—এখানেও কেউ ছিল না আমার; পাকিস্তানে ছিলাম ৪৭ থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত পনের বছর। এখানে তখন মাত্র বছর দুই হয়েছিল, তবু এক উর্দু গজল ছাড়া অন্য কিছু হারালো বলে কোন আপসোস আমার হয়নি। আর হিসেবেও আমি ঠকিনি। আমার রেডিয়ো ট্রানসিস্টার ভালই বিক্রী হল। আমার টাকা কিছু ছিল—তাই দিয়ে ঢাকাতে একটা ছোট দোকান খুললাম। রেডিয়ো-ট্রানসিস্টার—তার সঙ্গে গ্রামোফোন আর রেকর্ডের দোকান; তার সঙ্গে মাইক্রোফোন ভাড়ার ব্যবস্থা। মিটিং-এ কালচারাল ফাংশন-এ মাইক ভাড়া দিতাম। দিতাম সস্তায়। কাজী নজরুলের রবীন্দ্রনাথের গান শুনে শুনে ইচ্ছে হল এই গানও শিখব। তার সুবিধেও হয়ে গেল—একটি বাঙালী হিন্দু মেয়েকে ভালবেসে ফেললাম। একটি ফাংশনে মেয়েটি নজরুলের গান গেয়েছিল—আমি মাইক নিয়ে গিছলাম। খুব ভালো কিছু নয়—তবে গান মেয়েটি মোটামুটি ভাল গেয়েছিল—কিন্তু সেজন্যে নয়, অন্য কারণে মেয়েটিকে ভাল লাগল। মনে হল বড় চেনা চেহারা। কচিপাতার মত তার গায়ের রঙ—চোখ দুটি বড় বড়—আর একরাশ চুল। ক'দিন পর আমার দোকানের সামনে দেখলাম সে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। একখানা গজলের রেকর্ড বাজাচ্ছিলাম। তাকে আদর ক'রে ডেকে দোকানে বসিয়ে গান শোনালাম। সে কয়েকখানা বাংলা রেকর্ড শুনতে চাইলে। আমার কাছে ছিল না। বললাম, কাল আসবেন—শোনাবো। এনে রাখব। সেদিন ওকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল ওর চেহারার সঙ্গে আমার মায়ের বাপের বাড়ির আমার মামার বাড়ির মেয়েদের যেন আশ্চর্য মিল। আমার ভাল লাগাটা বেশ গাঢ় হয়ে উঠল।

মাসকয়েক পর আমরা বিয়ে করলাম।

ছায়া—মেয়েটির নাম ছায়া; একটা দাঙ্গার সময় বাপ মরে গিয়ে মিশনারীদের আশ্রয়ে কোনমতে ইস্কুলের পড়া শেষ করে একটা প্রাইমারি ইস্কুলে চাকরি করত, প্রাইভেট পড়াত—গানে বাতিক ছিল, বিনা ফিতে ফাংশনে গাইত। I loved her and she loved me. আমি বাংলা জানতাম—She corrected my mistakes. আমাকে বাংলা গান শেখালে। উর্দু গজলে আমার দখল ছিল—নজরুল ইসলাম সাহেবের গান শুনলেই তুলতে পারতাম। ছায়া আমাকে রবীন্দ্রনাথের গান শিখিয়েছিল। একটা গানের দল করেছিল ছায়া। নাম দিয়েছিল 'ঝঙ্কার'। ফাংশনে গাইতে যেতাম। আমি আমার গলা মেশাতাম তাদের সঙ্গে। কোরাসে আমার ভারী গলার effect খুব ভাল আসে।

অনেক কথা কিন্তু সে থাক।

ছায়া আমাকে বাংলা গান শেখালে—বাংলা শেখালে—বাংলাকে ভালবাসালে।

কলকাতা আমার জন্মস্থান। সেটা গড়ে গেছে ইংরেজরা—কিন্তু বাংলাদেশের কলকাতা ঠিকই আছে। পূর্ব-পাকিস্তানও সেই বাংলাদেশ। এপার আর ওপার।

কথাগুলি ছায়া বলত আমাকে। আমাকে শেখাতো।

সেই Anglo-Indian sentiment যে কেমন করে করলা দিয়ে ঘষেমেজে পরিষ্কার করা ভকতকে পরিচ্ছন্ন একখানি স্লেটে হয়ে গেল তা আমি বলতে পারব না। তবে গেল।

—Wait! অফিসার বললেন—ওয়েট। একটু থামুন আপনি।

—আজ্ঞে?

—একটু থামুন।

—থামব?

—হ্যাঁ।

—বলুন?

—যান—দেখুন—মেয়েটি কি চাচ্ছে।

প্রায় চমকে উঠে লোকটি ঘুরে দাঁড়াল।

ওপাশের ঘরখানা অফিসারের সামনের দিকে; মাঝখানের দরজাটা দিয়ে আধখানারও বেশী খানিকটা দেখা যায়। লোকটির সঙ্গে ছিল একটি আশ্চর্য কালো মেয়ে। মেয়েটি অসুস্থ—জ্বরে প্রায় বেহুঁশ। থানার ওদের আনার পর, ওই ঘরটার আড়াল দেখে, একখানা চাদর গোছের কিছু পেতে তার উপর ওকে শুইয়ে দিয়েছিল লোকটি। মেয়েটি অসুস্থতার মধ্যে বোধ করি এপাশ ওপাশ করতে গিয়ে গড়িয়ে প্রায় দরজার সামনে এসে পড়েছে।

উল্টে এসে সে মেঝের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে—দুপাশে দুখানা হাত পড়ে রয়েছে আধভাঁজ অবস্থায়। মাথার রুখু চুলগুলি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে রয়েছে মুখের চারিপাশে, পরনের কাপড়খানা খুলে গেছে—পরনের সায়া এবং ব্লাউজটা কোনরকমে তাকে আবরিত করে রেখেছে। তাও ব্লাউজটা তার ছেঁড়া এবং ব্লাউজটার ছেঁড়া অংশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেয়েটির স্তন; পূর্ণযুবতী জননীর ঈষৎনমিত একটি নিটোল স্তন। এবং স্তনবৃন্তমুখে সেই মুহূর্তে কয়েক ফোঁটা দুধ আপনা থেকে বেরিয়ে এসে ফোঁটা বেঁধে টলটল করছে। ছেঁড়া ব্লাউজটা চটচট করছে, দুধে ভিজেছে এবং শুকিয়েছে। বুকের অনাবৃত অংশটাতে ঝরেপড়া দুধ এবং ধুলো মিশে জমে রয়েছে।

মেয়েটির বয়স কত তা আন্দাজ করা কঠিন। ছোটখাটো আকার আয়তনের একজাতের মেয়ে আছে; হাল্কা গড়ন—ধারালো গড়নের নাক—পাতলা ঘোর কালো ঠোঁট—ছোট ছোট চোখ—ঘন ভুরু ঘন চুল—হাত-পায়ের তলা পর্যন্ত কালো। চুলের নিচে মাথার চামড়া—সেও কালো।

বাংলাদেশে সে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ দুই বঙ্গেই এমন কালো মানুষ আছে। মেয়েটা বেহুঁশের মত পড়ে রয়েছে, নাহলে কথা বলত যদি তা হলে দেখা যেতো দাঁতগুলি খুব সুগঠিত এবং মাড়ির রংও কালো। লালচে নয়। কিন্তু এরা বিরল। এবং অল্পসংখ্যক

যাই আছে—তারা ছোট ছোট জাত বলে যারা পরিচিত তাদের মধ্যেই আছে। মেয়েটা তাদেরই একজন।

লোকটি ব্যস্ত হয়ে ওঘরে গিয়ে মেয়েটির মাথার গোড়ায় গিয়ে মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে কপালে হাত বুলিয়ে চুলগুলিকে বিন্যস্ত করে দিয়ে ডাকলে—নাজমা! নাজমা! এরে নাজমা!

মেয়েটির কপালের চামড়া এবং ভুরু নড়ে উঠল উত্তরে—বারেকের জন্যে চোখ চাইবারও চেষ্টা করলে।

লোকটি বললে—তেষ্টা পাইছে? পানি খাবি? পানি?

মেয়েটি চোখ মেলে এবার বললে—হুঃ। পানি।

ওদেরই একটা বদনা ছিল ওঘরে মেয়েটির মাথার শিয়রে। সেই বদনাটা টেনে নিয়ে লোকটি ওর মুখের গোড়ায় নলটি ধ'রে বললে—নেঃ, খা। পানি। নাজমা।

আস্তে আস্তে জল ঢেলে দিল মেয়েটির মুখে, বৈশাখের মাটির তৃষ্ণা মেয়েটির বুকে—ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে তার তৃপ্তি হল না। অধীর হয়ে হঠাৎ উঠে বসে ওর হাত থেকে বদনাটা নিজের হাতে নিয়ে বদনার নলটা মুখের কাছে ধরলে। খানিকটা জল তার মুখে গলায় পড়ে গেল। তারপরই ফুরিয়ে গেল জল. বদনাটা ঠক ক'রে নামিয়ে দিয়ে মেয়েটা আবার উপুড় হয়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়ে ডুকরে উঠল—আমারে ক্যান নিয়া আইলা রে—আমারে ক্যান নিয়া আইলা আপনে? আঃ আঃ—আমার চাঁদ মাটির তলায় রইছে—আমার বুকের দুধ ফাইটা ফাইটা বারাইচে—আঃ—আঃ।

—নাজমা! নাজমা! এমন কইরা কাঁদে না নাজমা। ইটা থানা। আমরা ইপার বাংলা হিন্দুস্তানে আইসা গেছি। আমরা ফিরা যামু। আবার ফিরা যামু আমাগো ভাশে। তর চাঁদ আবার আইব তর কোলে—। নাজমা।

মেয়েটি একবার ঈশ্বরকে ডেকে উঠল—তার আল্লাতায়লাকে—এক ধরনের প্রাণফাটানো অনুযোগ আছে, সেটা শিখতে হয় না—শেখানোও যায় না—একেবারে শিখেই মানুষ জন্মায়; প্রাণফাটানো দুঃখ যখন মানুষের বুকে বাজে তখন সে অনুযোগ বেরিয়ে আসে আপনা থেকেই। তার স্বর আলাদা, তার ধর আলাদা—তার সব আলাদা। সেই বুকফাটানো অনুযোগ বেরিয়ে এল মেয়েটির মুখ থেকে। সে ছাদের দিকে মুখ তুলে দুটো হাত মেলে ধরে বলে উঠল—হায় আল্লা—হায় খোদা—তুমি একটা বিচার করলা না আল্লা। হায় আল্লা—।

লোকটি তার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে চুলগুলি সরিয়ে বিন্যস্ত করে দিলে। তারপর তাকে মৃদু আকর্ষণ ক'রে ওই ময়লা চাদর পাতা বিছানার উপর তাকে শুইয়ে দিয়ে বললে—এমন কইরো না নাজমা। এমন কইরা কারে ডাকো? তারে ডাইকা কি অইব? চুপ দাও। শোও। ঘুমাইয়া যাও। ঘুমাইলি পর ভাল অইব।

মেয়েটির দেহে মনে ক্লান্তির আর শেষ ছিল না। লোকটির কথায় উপুড় হয়ে শুয়ে

পড়ুন হাতের উপর মাথা রেখে। লোকটি একটা কাপড়ের পুঁটলি মাথার নিচে বালিশের মত ক'রে গুঁজে দিয়ে বললে—ওটার উপর মাথা রাখ।

—ইনস্‌পেক্টর বললেন—ওটা বের করুন। ওটা কি?

—ভিক্ষের ঝুলি।

—ভিক্ষের ঝুলি? কার?

—হ্যাঁ। ওটা নাজমার।

—নাজমার ভিক্ষের ঝুলি?

—হ্যাঁ। নাজমা ভিক্ষে করত। ভিক্ষেই ছিল ওর পেশা।

ইনস্‌পেক্টর একটু বিস্মিত হয়েই তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোকটি ভিক্ষের ঝুলিটা ওর মাথার তলা থেকে বের ক'রে নিয়ে দেখালে। সেটা সত্যিই আমাদের বাংলাদেশের ভিক্ষের ঝুলি।

লোকটি মেয়েটিকে জল দেবার জন্য এঘরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ইনস্‌পেক্টর টেপরেকর্ডারের মাইক্রোফোন রিসিভারটা হাতে করে এঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিটি কথা তাঁকে ধরতে হবে।

লোকটি বললে—এর মধ্যি সের কয় চাল আছে। একটা ঠোঙায় একপোটাক নুন আছে, খানিকটা গুড় আছে। আর ইটা ওটা—

—বের করুন।

লোকটি বের ক'রে রাখতে লাগল। তিনটে ঠোঙা—একটাতে নুন, একটাতে গুড়, একটাতে মুঠো-দুই চিনি—কয়েকটা আলু—কয়েকটা কাঁচালঙ্কা—একটা ছোট ন্যাকড়ার পুঁটলিতে বাঁধা কিছু মুড়ি কিছু চিড়া। এছাড়া প্লাষ্টিকের তৈরী কয়েকটা খেলনা ছিল। একটা পুতুল একটা বাঁশী একটা ঝুমঝুমি আর একটা-দুটো ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাওয়া খেলনার কতকগুলো টুকরো ছিল তার মধ্যে। ছোট ছেলের গায়ের দুটো রঙীন জামাও ছিল সযত্নে পাটকরা। একখানা শাড়ি একটা সায়া—এবং এই কাপড় সায়ার ভাঁজের মধ্যে একখানা বই।

ইনস্‌পেক্টর বললেন—বই? কি বই ওটা?

মনসুর বললে—একখানা ইংরিজী বই। A Treasury of Modern Asian Stories.

—আপনার?

—হ্যাঁ। পরক্ষণেই বললে—না—আমার ঠিক নয়। এখন আমার। এটা জাফরউল্লার ওখানে পেয়েছিলাম—জাফরউল্লা আমাকে পড়তে দিয়েছিল। সঙ্গে চলে এসেছে—ফেলে দেবার কথাও মনে হয়নি।

—দেখি ওখানা?

বইখানা নিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর মলাট উল্টে একবার দেখে নিয়ে ইউনিফর্মের বেল্টের তলায় পুরে বললেন—Then this girl is not your wife—যার কথা আপনি বলছিলেন?'

লোকটি বললে না। আমার স্ত্রী ছায়া মারা গেছে সে আজ অনেকদিন হল। আড়াই বছর হবে।

—এ কে? দেখে তো আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে ব'লে মনে হয় না?

—না। নাজমা ওর বাপের সঙ্গে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতো। ভিখিরীর মেয়ে। এই ঝোলাটা ওরই। আপনি ধরেছেন ঠিক। ও আমার কেউ নয়।

—আপনার কেউ নয়?

—না। তবে আমি ওকে চিনি অনেকদিন থেকে। ঢাকা শহরের পথে ভিক্ষে করত বাপের সঙ্গে। বাপ ছিল প্রায় অন্ধ; একটা চোখে একটু একটু দেখতে পেতো। জন্ম-গাইয়ে ছিল। গলাটা মোটা থাকলেও বড় ভাল গলা ছিল। দোতারা বাজিয়ে গান করত। মেয়েটি তখন খুব ছোট—বারো-তেরো বছরের মত বয়স তখন, দেখাতো আট-দশ বছরের মেয়ের মত। পরনে একটা সায়া গায়ে একটা ঢিলেঢালা ব্লাউজ পরে বাবার গলার সঙ্গে গলা মেশাতো। গানে আমার নেশার কথা তো বলেছি, সেই নেশার টানেই আলাপ করেছিলাম খানিকটা যেচে। বাপের নাম ছিল রহিম। শক্তসমর্থ বড়সড় চেহারার মানুষ। মিষ্টি দরাজ গলা। মেয়েটাকে ওর মেয়ে বলে মনেই হত না। চেহারাতে কোন মিল ছিল না। পরে শুনেছিলাম—মেয়েটার মা ছিল পূর্ববাংলার বেদের মেয়ে; যারা নৌকোয় নৌকোয় ঘোরে—সাপ ধরে—ওষুধ বিক্রী করে। রহিম যৌবনকালে কেড়ে নিয়েছিল বেদেদের একটা মেয়েকে। মেয়েটি রহিমকে ভালোবেসেছিল। নাজমা তার পেটের মেয়ে।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান।

—বলুন?

—She is in no way related to you then? তা হ'লে হঠাৎ পথে দেখা হয়েছে—এবং আপনি ওকে চিনতেন—ও ঢাকার পথে ভিক্ষে করত, এই তো? আপনি তো ওকে এই রুগ্‌ণ অবস্থায় প্রায় কাঁধে বয়ে নিয়ে এসেছেন—হেঁটেছেন তো অনেকটা!

—হ্যাঁ তাই। But there was a relation—ছিল না বললে ভুল হবে। ঢাকাতে আমার বাড়িতে নিচেরতলায় একটা চালায় ওরা থাকত। আমার একটা affection ছিল। ওর ওই আশ্চর্য কালো রঙ আমার খুব ভাল লাগত বলে আমি বলতাম—তোর মত সুন্দর কালো মেয়ে আমি দেখিনি। ভিখিরীর মেয়ে, বারো-তেরো বছরেই অনেক কিছু বুঝত। আমার কথা শুনে সে লজ্জা পেত, মুচকে মুচকে হাসত, যার সাধারণ ভাবে লজ্জা পাওয়ার থেকেও বেশী কিছু মানে আছে। আমি কিন্তু এর মধ্যে খারাপ মানে খুঁজে বের করতে চাইতাম না। এত সূক্ষ্ম ন্যায়-অন্যায় বিচার করে যারা আমি তো ঠিক তাদের মত মানুষ নই। মোট কথা আমার মনের মধ্যে একটি রমণীয় কোণে ওকে বসাতে দেবার একটি আসন গড়া হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা সেটা বুঝত। এবং সেই কারণেই মুচকে মুচকে হাসত।'

সে একবার খুব বর্ষা,—একটা সাইক্লোন জাতের দুর্যোগ, সেই দুর্যোগে এসে আমার দোকানের বারান্দার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসেছিল—আমি বলেছিলাম—রহিম, নাজমাকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে বস।

রহিম বলেছিল—সাহেব—রুটি কি ভাত কি খাবার কিছু থাকলে নাজমাকে দাও। ওর বহুত ভুখ লেগে থাকবে। কিছু খায়নি।

সেই ওরা ঢুকেছিল। নাজমা নিজে একটা কাজ করত—বাড়ির উঠোনটা বাইরের দরজাটা ভোরবেলা উঠেই ঝাঁট দিত।

অত্যন্ত সহজ ঘটনা। উপরে উঁচুতে জল ঢাললে নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়ার মত ঘটনা। আমার দোস্তদোস্ত যারা তারাও কোন দোষ দেখেনি। তারা বলত—জোটালে ভাল।

শুধু দোস্তরা কেন—আমার সঙ্গে ছায়ার আলাপ হল; আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসলাম and we married together—ছায়া আমার বাসায় এল, আমরা বাসার মধ্যে সংসার গড়ে তুললাম। মেয়েটা ছায়ার বরাত খাটত, কথা শুনত, গল্প শুনত। ছায়াকে গান শোনাতো। ছায়া বোধ হয় ওকে আমার থেকেও বেশী ভালবেসেছিল।

ছায়াকে বিয়ে ক'রে সংসার গড়তে চেয়েছিলাম বললাম; যে বাড়িটায় আমার দোকান ছিল সেই বাড়িটা ছিল ছোট একটা বাড়ি আর পুরনো আমলের বাড়ি, তবে বড় রাস্তার ওপর, সেই বাড়িটা কিনে মেরামত-টেরামত করিয়ে নাম দিয়েছিলাম—The Nest—বাংলাতেও নাম দেওয়া হয়েছিল—'বাসা'। তখন ৬৪ সাল চলছে।

সারা পূর্ববাংলায় বাংলাভাষা বাংলাভাষা বাংলাভাষা ধ্বনিতে আকাশবাতাস ছেয়ে গেছে। তাই বাংলাভাষায় নাম না দিয়ে ছায়ার তৃপ্তি হয়নি। তাই নাম দেওয়া হয়েছিল 'বাসা'।

একজন পাকিস্তানী অফিসার একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—ইংরিজী নাম রয়েছে, বাংলা নাম রয়েছে, উর্দু নাম কই?

অফিসারটির সঙ্গে আমার দোস্তি ছিল। তাঁকে আমি একটা ছোট্ট ট্রানসিস্টার তৈরি করে দিছলাম। নানান্ বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্যও করতেন। তিনি নিজে থেকে একটা উর্দু ট্যাবলেট তৈরী করিয়ে আমায় দিয়ে গিছলেন। নিজেই নাম দিয়েছিলেন 'গরীবখানা'।

তিনি আমাকে সাবধানও করে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন—তুমি বেছে বেছে একটা বাঙালী হিন্দু মেয়েকে কেন বিয়ে করলে? তুমি খৃস্টান মেয়ে বিয়ে করতে পারতে? বাংলাভাষা আর আওয়ামী লীগ করা একটা মেয়ে পছন্দ করলে শেষে?

থাক। যে কথা বলছিলাম তাই বলি।

এই আমাদের নতুন বাড়িতেও ছায়া নাজমাকে আর রহিমকে ডেকে থাকতে দিয়েছিল আমাদের নিচের তলায়।

রহিম স্বভাবে একটু নোংরা ছিল, তামাক খেতো, মাথার লম্বা চুলে জবজবে ক'রে তেল দিত, তামাকের গুলে ঘর নোংরা হত ; তামাকের একটা গন্ধও উঠত—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মাথা রাখলে দেওয়ালে দাগ হত, নাজমা এতখানি নোংরা ছিল না। কিন্তু পুরো একালের মত পরিচ্ছন্ন সে হত না। হলে ওদের গান গেয়ে ভিক্ষের ব্যবসায়ে ক্ষতিই করত ; কিন্তু তাতেও ছায়া অসন্তুষ্ট হয়নি ওদের উপর।

নাজমার বয়স বাড়ল—নাজমা বড় হল। তার মুখের হাসি চোখের চাউনির রকম বদলালো—আমরা ভাবছিলাম—এবার ওদের বলব—ওরা অন্ত কোথাও জায়গা দেখে নিক। নয়তো মেয়েটার বিয়েটিয়ে দিয়ে ওকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে রহিম থাকে তো থাক। হঠাৎ একদিন না বলতেই সেই ব্যবস্থা করলে নাজমা। নাজমা একদিন একটা ছেলের সঙ্গে পালালো। রহিমকে এই অবস্থায় আর চলে যাওয়ার কথা বলতে পারলাম না।

কিছুদিন পর ছায়া নিজেই মারা গেল। পাতানো ঘর সাজানো সংসার ফেলে সে চলে গেল।

চুপ ক'রে গেল মনসুর আলি—কিংবা ডেভিড আর্মস্ট্রং। ঠোঁট দুটো থরথর ক'রে কাঁপতে শুরু করল। চোখের কোলে-কোলে জল ভ'রে উঠল।

রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে আরও একটুক্ষণ সময় নিয়ে সংবরণ করে নিলে নিজেকে মনসুর। তারপর বললে—সেদিন রাত্রে, মানে ছায়াকে কবর দিয়ে এসে বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখন ওই রহিম ছাড়া আমার পাশে কেউ ছিল না। ওই প্রায়-অন্ধ রোগা দুর্বল লোকটি যে আমাকে কি সান্ত্বনা দিয়েছিল সে আর কি ক'রে বলব। সে বলা যায় না।

ওঃ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে মনসুর আলি।

* * * *

মেয়েটি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যে মধ্যে একটা ক'রে কাঁপা-কাঁপা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছিল। মনসুর তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—জানি না মেয়েটা বাঁচবে কিনা। অর যে কি লাঞ্ছনাটা না হইছে! অঃ, চোখে না দেখলে কারুর বিশ্বাস হবার কথা নয়। আমিই বিশ্বাস করতাম না। অঃ, তারির মধ্যেও কালনাগিনীর মত দংশে শোধ নিয়েছে। একটা ছেলে, ছ'মাসের ছেলে, ওই মায়ের মত কুচকুচে কালো—আর কি সে হাসত। খলখল করে হাসত—

ইনস্‌পেক্টর বললেন—চলুন ওঘরে চলুন। মেয়েটি ঘুমুক।

এঘরে এসে ইনস্‌পেক্টর চেয়ারে ব'সে লোকটিকে বললেন—মেয়েটি আপনার কেউ না তা হ'লে?

—হ্যাঁ। ও আমার, বিচার করে দেখতে গেলে—কেউ না। আপনাকে তো বলেছি—ওর বাপের সঙ্গে ও আমার বাড়ির নিচেরতলায় একটা ফালতু জায়গায় থাকত ; একটু-আধটু কাজকর্ম করত ; আর ওর বাবার হাত ধরে পথে পথে ভিক্ষে করত। মেয়েটার গলা ছিল ভারী মিঠি।

—সে-সব বলেছেন আপনি এর আগে।

—Yes sir—I have already said that—.

—আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন।

—Thank you. চেয়ারখানা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চেয়ারে বসে বললে—এখান থেকে ওকে দেখতে পাব। আজ ক'দিন প্রবল জরে ভুগছে। ছোটখাটো রোগা কাঠামোর চেহারা তাই ওকে কাঁধে ঝুলিয়ে আনা সম্ভবপর হয়েছে।

ইনস্‌পেক্টর বললেন—আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করছি। ভাববেন না আপনি। আপনি যতক্ষণ আমাদের হেপাজতে রয়েছেন ততক্ষণ আমরা ব্যবস্থা করব।

—আমাকে কি arrest করেছেন spy বলে? কিন্তু spy আমি নই। ওই শব্দটাকেই আমি ঘৃণা করি। I hate the word, I despise the idea.

—আপনাকে arrest আমরা ঠিক করিনি। তবে সন্দেহ আমাদের রয়েছে: This black beggar girl and you—দুজনে এমন একটা বিসদৃশ pair or match—যাই বলুন। মোটকথা নিঃসন্দেহ না হয়ে আমি আপনাদের ছেড়ে দেব না।

—I can swear by the name of God—ভগবানের নামে শপথ ক'রে বলতে পারি—বাইবেল হাতে নিয়ে I can swear—এ ছাড়া আমি কি ক'রে বিশ্বাস করাব—

—Don't be excited—ওতে তো কাজ হবে না।—আপনি বসুন—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি উত্তর দিন। তাতে কাজ সহজ হবে। এ আপনি বলেই যাচ্ছেন—narrating your story—কিছুটা বিশ্বাস হচ্ছে—সহজ সরল, মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে এটা Arabian nights-এর ঘটনা হ'লে ভাল হত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লোকটি বললে—আরব্য উপন্যাসের ঘটনার মত ঘটনা কোন্‌টা মনে হল আপনার—জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—That you are an Anglo-Indian. আপনার নাম ডেভিড আর্মস্ট্রং—আপনি মনসুর আলি হয়ে গেছেন—

লোকটি বললে—আমার একটা passport আছে—আমার পকেট থেকে ওটাই নিয়ে দেখুন। ওতেই আমার ছবি আছে—আমার নাম আছে। অবশ্য দশ বছর আগের পাসপোর্ট, আমি গিয়েছিলাম 'কায়রো'। তখন আমি পশ্চিম-পাকিস্তানে সব থেকে বড় ইলেকট্রিক কোম্পানীতে কাজ করি; নবাবজাদা জাফরউল্লা খাঁর নাম করেছি, you remember—

ইনস্‌পেক্টর পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে মুখে পুরে প্যাকেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এবং দেশলাই জেলে ওর সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন—Yes I remember him—নবাবজাদা জাফরউল্লা খাঁ। খুব বড় দিল, খেয়ালী মেজাজ—

মুখের ধোঁয়া ছেড়ে লোকটি বললে—ওরা একটা স্বতন্ত্র জাত। শরফানের জাত।

They belong to no religion, they belong to no particular nation. They are a class of Princes Kings Nawabs Sultans Rajas—

ইনস্‌পেক্টর বললেন—ওসব কথা থাক। আপনি passport-এর কথা বলছিলেন।

—হ্যাঁ। Company-র একটা বড় consignment আসছিল electric goods-এর একখানা জাহাজে England থেকে; সুয়েজ ক্যানেলের ঝগড়ায় জাহাজখানা আটকেছিল আরবেরা। অনেক লেখালেখি ক'রে মাল অন্য জাহাজে আনবার ব্যবস্থা হয়েছিল, company sent জাফরউল্লা and me. সেই সময়ের পাসপোর্ট—দেখুন দুটো নামই আছে। সেদিন চেহারা আমার ছিল West Pakistani-এর মত,—ইউরোপীয়ান বললেও I could easily pass.—আজ আমার রঙটা পুড়ে গেছে,—আমার চেয়েও less bright—তবুও চেষ্টা করলেই আমাকে খুঁজে পাবেন।

—তা পাচ্ছি। ইনস্‌পেক্টর পাসপোর্টখানাই দেখছিলেন। ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে ওই কথা ব'লে বললেন—কিন্তু এমন বিচ্ছিরী পোড়া রঙ কি ক'রে হল আপনার? পূর্ববাংলার জলবাতাসে?

সিগারেটে টান দিয়ে সে ঘাড় নাড়লে, কথা বললে না। ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

—তা হ'লে?

—বছর কয়েক আমি ফকীর সন্ন্যাসীর মত কেবল পথে ঘুরেছি। ছায়া মারা গেল। ছায়া আমার কাছে যে কি ছিল তা আপনাকে বোঝাতে পারব না—আপনিও বুঝতে পারবেন না। দু-বছরের মধ্যে এই মেয়ে দুটি আমাকে আশ্চর্য রকমের বাঙালী ক'রে ছেড়ে দিয়েছিল। এই মেয়েটি politics-এর সঙ্গে জড়ানো ছিল।

—You also became a member of the Awami League?

—গোপন করব না। প্রয়োজনও নেই। আওয়ামী লীগ কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ নয়। মৌলানা ভাসানী সাহেবের চীনাপন্থী আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছায়ার যোগ ছিল। ছায়া বেঁচে থাকলে আমি নিশ্চয় ভাসানী সাহেবের দলে যোগ দিতাম। কিন্তু ছায়া মারা গেল। আমি সে প্রচণ্ড আঘাত খেলাম জীবনে। সেই আঘাতে সব, যেন সারা দুনিয়াটাই রঙ-চটা টিনের খেলনার মত হয়ে গেল। রঙ-চটা স্প্রীং-কাটা খেলনার মোটরের মত মূল্যহীন অচল হয়ে গেল। আমি দোকান তুলে দিয়ে বাড়িটা একজনকে ভাড়া দিয়ে সারা পূর্বপাকিস্তান ঘুরে বেড়াতে লাগলাম পায়ে হেঁটে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে সে বললে—জানেন আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বিষয় ছাড়া কখনও ঝগড়া হয়নি। সেটা হল কে আগে মরবে? ও বলত আমি,—আমি বলতাম—নেতার, আমি। ঝগড়ার মীমাংসা হত না—কেউ কারুর-কাছে হার মানতাম না তবে তার থেকেই যে কথা উঠত সেটাতে আমাদের দুজনেই একমত ছিলাম। ছায়াও বলত, আমি ওরই কাছে শিখে বলতাম—'বনবাসী সন্ন্যাসী হইব'।

H. M. V.-র রেকর্ডে শিশির ভাদুড়ীর সীতা নাটক আছে। আমাদের

collection-এ সেটা ছিল। ছায়া রেকর্ডের খুব ভাল কলেকশন করেছিল। সুবিধে হয়েছিল—আমার gramophone, gramophone record-এর দোকান ছিল। সেই সীতা নাটকে ছিল কথাটা 'প্রিয়ার প্রেমের লাগি বনবাসী সন্ন্যাসী হইব'। আমরা দুজনেই মরবার কথা নিয়ে ঝগড়া ক'রে বলতাম—'বনবাসী সন্ন্যাসী হইব'। সেইটে আশ্চর্য ভাবে সত্য হল আমার অদৃষ্টে। ছায়া মারা গেল। একটা আশ্চর্য মিষ্টি এবং সুন্দর সুখস্বপ্নে আমরা যখন বিভোর হয়ে—স্বপ্নটা সত্য হবে বাস্তবে প্রত্যাশায় নানান্ আয়োজন করছি তখনই হঠাৎ সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে ছায়া চলে গেল। হাসপাতালের বারান্দায় সেফ ডেলিভারির খবর আসবে বলে প্রতীক্ষা করছি—ডাক্তার বলেছেন, সব নর্ম্যাল কোন আশঙ্কা নেই। আমি উৎকণ্ঠাবশে সিগারেট খাচ্ছি। সিগারেটের পর সিগারেট—সিগারেটের পর সিগারেট গোটা রাত্রি কেটে গেল। ভোরবেলা খবর পেলাম—ছেলে-মা দুজনেই মৃত। কাউকে বাঁচানো যায়নি।

পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে গেল—আমার সাজানো ঘর-দোর—আমার কাম-কারবার সব হয়ে গেল ফুটো টিনের পাত্রের মত। জীবনের সঞ্চয় সব গলে পড়ে গেল মাটিতে। তোমার প্রেমের লাগি বনবাসী সন্ন্যাসী হইব কথা তখন ঠিক মনে পড়েনি—কিন্তু সত্যিসত্যিই সব পাট তুলে দিয়ে প্রায় সন্ন্যাসী ফকীরই হয়ে গেলাম।

সব বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল,—কিছু ভাল লাগছিল না—আমি এখানকার কারবারটা তুলে দিয়ে প্রথমটা চলে গেলাম লাহোর। লাহোর থেকে ইসলামাবাদ, সেখান থেকে করাচী। কিন্তু ভাল লাগল না, ফের ফিরে এলাম ঢাকা। ঢাকার কারবার তুলে দিছলাম, মালপত্র বেচে দিছলাম জলের দরে—কিন্তু বাড়িটা বেচিনি। বাড়িটা ছিল; ভাড়া দিয়ে গিয়েছিলাম,—নিচেরতলার একটা দিক ভাড়া দিইনি, খালি রেখেছিলাম। ওখানটায় রহিম থাকত একপাশে বারান্দার এক কোণে। ঘরটা ট্রানসিস্টারের, তা থেকেও I earned lot. টাকা ছিল–ষোল বছর বয়স থেকে আমি উপার্জন করেছি, একলা মানুষ; এবং আমি অমিতব্যয়ী ছিলাম না। এবং চাকরির সময় মাইনে আমি ভালই পেতাম। তারপর যে ব্যবসা করেছিলাম—রেডিয়ো-ট্রানসিস্টারের, তা থেকেও I earned a lot. টাকা ছিল—তাছাড়া ইলেকট্রিসিটির যুগে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা টেস্টার পেলেই যে-কোন শহরবাজারে বসে দিনে আট-দশ টাকা রোজগার আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। আমি উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। বাসা ভেঙে যাওয়া পাখি যেমন এ-ডাল ও-ডাল এ-গাছ ও-গাছ করে বেড়ায় তাই করে বেড়াতে লাগলাম।

কতবার ভেবেছি চলে যাই অন্য দেশে। কাজ জানি—যে-কোন দেশের ভাল মেকানিকের সমান কাজ করতে পারি—; আমার আবার ভাবনা কি? কিন্তু পারিনি। এই পুবপাকিস্তানের ভিতরেই ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। শিলেট গিয়ে কতবার ডাউকী নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারের খাসিয়া জয়ন্তী চেরাপুঞ্জী হিলসের কৃষ্ণাভ অঞ্চলগুলির দিকে তাকিয়ে

থেকেছি। ওদিকের পাহাড়ের অপরূপ রূপসী মেয়েদের কথা ভেবেছি—ভেবেছি ওপারে চলে যাই কিন্তু যাইনি। যেতে পারিনি। চিটাগং কক্সবাজারে থেকেছি, বরিশাল অঞ্চলে ঘুরেছি,—ঘোরার নেশাতে পেয়েছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল নৌকোয় ক'রে ঘুরব দেশটা। ঘুরেছিলাম। নৌকোয় ক'রে পদ্মা মেঘনা পার হয়েছি। তুফানের ঝাপটা খেয়েছি; নৌকোর কাঠ আঁকড়ে ধরে বসে থেকেছি। বরিশাল যাবার পথে স্টীমারে বসে নদীর আঁকাবাঁকা চেহারা দেখেছি; জল আর মাটির মাখামাখি দেখেছি। সুন্দরবনে একবার শিকারীদের সঙ্গে গিয়ে বাঘ-বাঘিনী দুইকে দেখেছিলাম—তাদের সে কামড়াকামড়ি ঝাপটাঝাপটি দেখেছিলাম, জোয়ারের ফুলে ওঠা জল আর মাটির ওই মাখামাখি খেলা যেন তাই মনে হয়েছিল। এরই মধ্যে এই দেশটাকে এমন করে ভালবেসে ফেললাম যে এই আমার সব থেকে ভালো দেশ, এর থেকে ভালো দেশ আর নেই। আর এই দেশই আমার দেশ। মনে হত বরিশালের মত উর্বর মাটির অঞ্চলে খানিকটা জমি নেব—একটা বাংলো করব। ইলেকট্রিসিটি পাই ভাল, না পাই একটা জেনারেটার তৈরী ক'রে বসাব। তা থেকে আলো জ্বালাব। ছোট ট্রাকটর কিনে চাষ করব। তার সঙ্গে পোলট্রি করব।

আর শুনতাম গান।

এদেশের আশ্চর্য মিষ্টি ভাটিয়ালী গান। একালের composer আছে একদল, তারা নিজেরা গান লিখে সুর দিয়ে গায়, সে গান নয়। পুরনো কালের গান। খাঁটি নৌকোর মাঝিরা গায়। আর গাঁওগাঁওলার গাইয়েরা দোতারা বাজিয়ে গেয়ে ভিখ মাগে।

এসব গান ছায়া আমাকে গেয়ে শোনাতো। এই গানটা ছিল তার প্রতিদিনকার গান। বিছানায় শুয়ে সে আমার হাত ধরে গুনগুন ক'রে গাইত—

আজি হ'তে তোমায় বন্ধু ছাইড়া নাহি দিব—
নয়ানের কাজল কইরা নয়ানে থুইব।
বসন কইরা অঙ্গে পরব মালা কইরা গলে—
সিন্দূরে মিশাইয়া তোমায় পরিব সিথালে।
দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব—

রোজ শুনতাম। নৌকোর মাঝিরা নৌকো ঘাটে লাগিয়ে গান গায় যারা তাদের ডেকে আনত—আমি শুনতাম। লিখে নিতাম। এ:খানা গান কলেকশনের খাতা করেছিলাম। মৌলানা ভাসানী সাহেব সেখানা নিয়ে বলেছিলেন—এখানা ছাপাবেন তিনি।

ইনসপেক্টর বাধা দিলেন—দাঁড়ান।

—Yes.

—You knew Moulana Bhasani ?

—Yes Sir. I know him—he knows me—

—মৌলানা সাহেবকে কেমন ক'রে জানলেন ?

—বলেছি গোড়াতেই যে, আমার স্ত্রী ছায়া মৌলানা সাহেবের দলের সভ্য যাকে party-member না হ'লেও খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল। ওদের দলের কালচারাল ফাংশানে ওকে না হলেই চলত না।

—আপনি ?

—What do you mean sir ?

—ওদের দলের সঙ্গে আপনি কতটা জড়িত ?

—সম্পর্ক সামান্যই—তবু মৌলানা সাহেবকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। আশ্চর্য মানুষ।

—সামান্য মানে কতটুকু ?

—সামান্য মানে সামান্যই। তিনি আমাকে জানেন, স্নেহ করেন—আমি শ্রদ্ধা করি। দলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সভ্য বা সমর্থক কোনটাই নই।

—তা হ'লে কোন্ দলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ?

—কোন দলের সঙ্গেই না।

—তা হ'লেও কোন্ দলের রাজনীতি আপনার ভাল লাগে ?

একটু ভেবে নিয়ে লোকটি বললে—তাই বা কি ক'রে বলি ? মৌলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবর দুজনের মতকেই আমার ভাল লাগে।

—ভোট কাকে দিয়েছেন এবার election-এ ?

—ভোট আমার দেওয়া হয়নি। নাম ভোটার লিস্টে ছিল না।

ইনস্পেক্টর চুপ করে গেলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। লোকটি বলেই চলল—বলেছি তো ঢাকাতে বাড়িটা আমার আছে—একখানা ঘরও রেখেছি কিন্তু আসলে আমি ঘুরেই বেড়িয়েছি। একবার নৌকোয় নৌকোয় ঘুরেছি, একবার ট্রেনে-বাসে ঘুরেছি, একবার পায়ে হেঁটে ঘুরেছি। সব চেয়ে ভাল লেগেছিল—নৌকোয় নৌকোয় ঘুরতে। নদীনালা খালবিল, নারকেল-সুপুরির গাছের মাথাগুলি, খালের ঘাটে ঘাটে বউ-ঝিদের জটলা—

—আচ্ছা—; কথার মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিয়ে অফিসার বললেন—আচ্ছা একটা কথার জবাব দিন তো।

—বলুন—

—You are not a Purba Pakistani. You are neither a Musalman nor a Hindu. You do not belong to any political party. You voted for none. You are an Anglo-Indian—তা হ'লে আপনি পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে আসছেন কেন ? একটু ভেবে উত্তর দেবেন। Just think. আপনাকে কোন কারণেই ওদের মারবার কথা নয়।

লোকটি স্থিরদৃষ্টিতে অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অফিসারটিকেই যুক্তিযুক্ত প্রশ্নের মত সামনে রেখে তার উত্তর খুঁজতে লাগল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে

ওই ঘরের দিকে তাকালে।

সেই আশ্চর্য কালো মেয়েটি শেকড়ছেঁড়া লতার মত ম্লান হয়ে গিয়ে যেন লুটিয়ে পড়ে আছে।

অফিসার বললেন—For that girl ?

—না—ঢাকা থেকে যখন আমি বের হই ওদেশ থেকে পালাব ব'লে তখন ও ছিল না আমার সঙ্গে।

—ঢাকা থেকে কবে বেরিয়েছেন ?

—২৬শে তারিখ শেষ রাত্রে।

—২৬শে শেষ রাত্রে ?

—২৬শে শেষ রাত্রে। চব্বিশ ঘণ্টা সশস্ত্র সৈনিকদের অটোমেটিক রাইফেল লাইট মেশিনগান চালিয়ে নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করা দেখে—সদর রাস্তার উপর চুলের মুঠোয় ধ'রে বেয়োনেট গায়ে ঠেকিয়ে naked half-naked young এমন কি women aged about forty-fifty—এদের টেনে এনে রেপ করেছে। একটা অন্ধকার ঘরে ভাঙা জিনিসপত্রের মধ্যে বসে থেকে একটা ফাঁক দিয়ে চোখে দেখেছি। তারপর আর পারিনি। আমার চোখের সামনে রহিম, ওই কালো মেয়েটির বাপ,—সে প্রায় অন্ধ, আমার বাড়ির বারান্দাতেই থাকত, সে চোখে তো বিশেষ কিছু দেখেনি, শুধু রাইফেল মেশিনগানের গুলির শব্দ, মর্টারের শব্দ, মানুষের কান্না চীৎকার শুনে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। ২৫শে রাত্রি থেকে ২৬শে শেষরাত্রি পর্যন্ত তিনজন মানুষ আমরা।

অফিসারটি মুখ তুলে তাকালেন--বাধা দিয়ে বললেন—one minute—.

লোকটিও মুখ ফেরালে অফিসারের দিকে।

অফিসার বললেন—তিনজন মানুষ কে কে ?

লোকটি বললে—আমি, মিস্টার সেন আর রহিম—মানে ওই নাজমা মেয়েটির বাপ। আপনাকে নিশ্চয় বলেছি, এগার-বারো বছরের কি চৌদ্দ-পনের বছরের নাজমার হাত ধ'রে রহিম ভিক্ষে করত। গান গাইত। ওর কাছে আমি অনেক গান শিখেছি—ওদের অনেক গান আমার টেপ করা আছে। আমার স্ত্রী ছায়া ওদের আমার থেকেও বেশী ভালবাসত। সেই ওদের বাপ-বেটীকে বাড়ির নিচের তলায় থাকতে দিছল।

—হ্যাঁ। মেয়েটি বললেন পালিয়ে গিছল—

—হ্যাঁ। একটি সাইকেলের চাকাওয়ালা গাড়িতে মনিহারী জিনিস ফিরি ক'রে বেড়ায় এমন একটি ছেলের সঙ্গে। পথে দেখা হত ওদের, বাপ অন্ধ ছিল—সে মেয়ের বিয়ে দিতে ঠিক রাজী ছিল না। So she left her father and went with him ; রহিম কোথায় যাবে, এখানেই থেকে গিছল। আমার বাড়ির উপরতলায় নতুন ভাড়া এসেছিল দিগন্ত কাগজের আপিস। ছোট্ট একটা চৌরাস্তাও বটে। ওখানে হাত পেতে ব'সে থাকত। শেষ দিকটায় আপিং খেতে ধরেছিল। আপিংয়ের ঝোঁকে ঝিমোত, আর রাস্তে গান গাইত

গাইত।

আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি
দয়াল গুরু হে—।
এ ভব দরিয়া পার করতি কেবা আছে আর
চারিদিক দিগন্তে গুরু আন্ধারের আন্ধি।—

ওই একটা গান গাইত বেশী। দিগন্ত-ওয়ালারা ওকে কিছু বাংলাদেশের গান শিখিয়েছিল—তাও গাইত। ২৫শে রাত্রে আমি যখন মিটিং শুনে ফিরে এলাম তখনও সে বাড়ির মধ্যে বসে ওই গানটা গাইছিল। আমি ডাকলাম—সে দরজা খুলে দিলে। এর পর এল মিস্টার সেন।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—মিস্টার সেন কে?

আর্মস্ট্রং তার দিকে তাকালে। অফিসার প্রশ্নটিকে বিশদ করে ধরলেন—কি নাম তাঁর? তিনি আপনার সঙ্গে জুটলেন—মানে—এমন একটা দিনে এতটা রাত্রে?

Mr. Sen বাঙালী, কিন্তু East Pakistani নন—Indian. তবে ওঁদের বাড়ি পার্টিশনের আগে ওদেশেই ছিল। একটা আশ্চর্য টান দেশের উপর।

—পুরো নামটি কি?

—Mr. Sen—Mr. K. Sen, বোধহয় কনক সেন। Mr. Sen একজন Journalist. পাকিস্তান থেকে খবর সংগ্রহ করতে গোপনে মধ্যে মধ্যে আসতেন। আবার সত্যাগ্রহ চলার প্রথম দিকে এসে ঢাকার বাইরে দেশময় ঘুরছিলেন। তারপর President ইয়াহিয়া খাঁ শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে ঢাকা আসতেই ফিরে এসেছিলেন। আমার বাড়িতে কাগজের আপিস ছিল, ওই কাগজের লোকদের সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল। যেসব বাঙালী মুসলমান লেখকেরা East Pakistan-এ বাংলাদেশ নয়া জমানা গড়বার স্বপ্ন দেখতো দিগন্ত কাগজখানা ছিল তাদের। Young men of East Pakistan; তাদের নতুন স্বপ্ন—নতুন বিশ্বাস—নতুন মন। গোঁফ-দাড়ি কামায়—মোল্লা-মৌলানাদের নাগালের বাইরে এরা উর্দু বলে না,—হিন্দু কি কৃশ্চান এ নিয়ে ক্ষেপে ওঠে না। বলতে পারেন এই আওয়ামী লীগওয়ালাদের দল কেউ লেখে কেউ ছবি আঁকে কেউ কলেজে পড়ায় কেউ ইস্কুলে—কলেজে ইস্কুলে পড়া ছেলের দলও আছে এদের মধ্যে। গাইয়ের দল আছে, ড্রামাপার্টি আছে; এরা সব আশ্চর্য মানুষ। ওদের সঙ্গে ওই জন্তেই আমার আলাপ হয়েছিল। ছায়াও ওদের জানতো চিনতো। ওদের হাতে বাড়িটাও ভাড়ার ছেড়ে দিয়েছিলাম এই কারণে। দিগন্ত আপিসে এদের আড্ডা বসত।

Mr. Sen-এর সঙ্গে এদের খুব একটা ভাল understanding ছিল; গভীর intimacy—; Mr. Sen East Pakistan-এ এলেই এখানে আড্ডা দিতে আসতেন। শরীরে শক্তপোক্ত দুঃসাহসী মানুষ; an adventurer বলতে পারেন—dare-devil youngman; এদেশে মানে East Pakistan-এ যখনই কিছু ঘটেছে তখনই ঠিক এসে গেছেন এদেশে। এদেশের ভাষা বলতে পারেন গাঁওগাঁওলার চাষীভুষির মত। হিন্দু-মুসলমান চেহারা দেখে

চেনা যায় না। কোরানের বয়েৎ জানেন। অন্ন কিছুকে করেন না। মরাম গলার হা-হা ক'রে হাসেন। Extreme leftism যারা করে তারা আজকাল এক ধরনের দাড়িগোঁফ রাখে, সেইরকম দাড়িগোঁফ রাখেন। He is a political man, এটা নিশ্চিত—কিন্তু সেটা যে সঠিক কি তা বলতে পারব না। দিগন্তের এরা আওয়ামী লীগের লোক; এদের সঙ্গে গভীর intimacy থাকলেও—এদের সঙ্গে এক ছিলেন না। সেই প্রথমবারই শুনেছিলাম—দিগন্তের editor নুর-উল-হুসেন ওর দলের একটি ছেলেকে বলেছিলেন—তুমি Senএর সঙ্গে খুব বেশী দোস্তি করতে যেয়ো না মেহেদী,—তুমি ছেলেমানুষ। Sen পাকা লোক। Sen আমাদের বন্ধু বটে কিন্তু পার্টির লোক নয়। তা ছাড়া ভিন্নদেশী। এই হলেন মিস্টার সেন—মিস্টার কে মানে কনক সেন। ওঁকে দেখে ভাল লেগেছিল আমার—

অফিসারটি বাধা দিয়ে বললেন—থাক—চিনেছি—কনক সেনকে আমরা চিনি। ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ কত দিনের?

লোকটি বললে—ছায়ার মৃত্যুর পর দিগন্তের জন্তে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে আমি সারা পুববাংলাটা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম—প্রথমবার ট্রেনে-বাসে ঘুরেছিলাম, সেবার ফিরে ঢাকায় এসে মাস-দুই ছিলাম—সেই সময় একদিন টেপরেকর্ডার বাজাচ্ছিলাম। রেকর্ড ক'রে এনেছিলাম গ্রাম থেকে—ভদ্রলোক দিগন্ত আপিস থেকে শুনতে পেয়ে আমার নিচের তলার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে বলেছিলেন—খুব চমৎকার গান তো। একেবারে গ্রামের গন্ধ মাখানো। একটু শুনব। আপত্তি করবেন না তো?

ঘণ্টাখানেক গান শুনে চলে গিছলেন। I liked him. Pleasing manners. আর ছিল একটা magnetic attraction. আমার নিজের তৈরী করা ছোট্ট পকেট transistor দেখে ছেলেমানুষের মত ধরেছিল—এটা আমাকে বিক্রী করুন। ছাড়েননি, ভালো দাম দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন। সেইবারই ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাভাষা নিয়ে যে সব অনুষ্ঠান হয়—সে সময় একবার দেখা হয়েছিল। তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। কথাবার্তা হয়নি। তারপর এবার এই দেখা। ২৫শে মার্চ রাত্রিবেলা—।

আমি একটু জল খাব। A glass of water please.

* * *

২৫শে মার্চ রাত্রিবেলা। কত রাত্রি তখন তা ঠিক খেয়াল ছিল না আমার; আমার হুঁশ ছিল না। এবং ঘড়িও নেই আমার। একজন নৌকোর মাঝিকে ঘড়িটা দিয়ে দিয়েছি। আর কিনিনি। আমার ঠিক দরকারও ছিল না। আমি তখন ঘড়ির চলার তালে ছন্দে যে দিনরাত্রি এবং দুনিয়া চলে তার বাইরে বাস করতে চেষ্টা করছিলাম।

২৫শে বিকেল বেলা থেকেই সারা ঢাকা শহর একেবারে আগুন দেওয়া বোমবাজীর মত পলতেতে জলতে জলতে বোমটার দিকে এগুচ্ছে। শোনা গেছে চট্টগ্রাম নাকি জলছে। এখানে প্রেসিডেন্ট খান সাহেবের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ সাহেবের কথা হচ্ছে। চব্বিশ দিন ধ'রে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে। আশ্চর্য সে আন্দোলন। একটা দুর্দান্ত প্রচণ্ড বন্যাপ্লাবী

অঙ্গ যেন পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে। সারা অঙ্গের কোন একটা স্থানেও কোনও স্পন্দন নেই—চোখ ছুটো মেলে চেয়ে আছে—দেখছে কি দেখছে না তাও বলা যায় না। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে এই পর্যন্ত। বাইবেলে সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা আছে। আমার কাছে এ সত্যাগ্রহ তেমনি একটা miracle মনে হয়েছিল।

এর জন্তেই আটকা পড়ে গেছলাম। নৌকোতে নৌকোতে সারা দেশটা ঘুরে ঢাকায় এসেছিলাম West Pakistan যাব ব'লে। টাকাপয়সা কম হয়ে গিছল—বাড়িভাড়ার টাকা আদায় করে লাহোর ইসলামাবাদ করাচী যাব—আমার সংগ্রহ করা টেপ থেকে একটা সিরিজ রেকর্ড বের করাবার ইচ্ছে ছিল এবং যে কোন সুযোগে ইয়োরোপ গিয়ে এগুলো হাজির করারও idea ছিল। কিন্তু এসেই পড়লাম যে ঢাকায় সে ঢাকা আমি কখনও দেখিনি। ঢাকার সে এক আশ্চর্য চেহারা।

নৌকোর পোস্টারে পোস্টারে ঢাকা শহর যেন নৌকো-ছাপ ছাপানো কাপড়ের তৈরী হাওয়াই শার্ট পরেছে। মেয়েছেলে হয় যদি ঢাকা শহর তা হ'লে ওই নৌকোর ছাপ ছাপানো শাড়ি পরে জুলুসে যাবার জন্ত তৈরী হয়ে বসে আছে। আর দম বন্ধ করে রয়েছে।

পাকিস্তান সরকার অচল হয়ে গেছে। চাকা ঘুরছে না। ব্যবসা বন্ধ, বাণিজ্য বন্ধ; —সব থেকে আশ্চর্য লাগল—হাইকোর্টের জজ প্রেসিডেন্টের হুকুম মানেনি। সারা পাকিস্তানের মানুষের জীবন চলছে কিন্তু সরকার অচল হয়ে গেছে।

অফিসারটি বলেন—দেখুন ওসব আমরা এবং সবাই-ই জানি—আপনার কথা বলুন। আমার প্রশ্ন হল—আপনি হিন্দু নন—আওয়ামী লীগপন্থী মুসলমান নন—you do not belong to any political party—আপনি পালিয়ে এলেন কেন? আপনি Christian—আপনি Anglo-Indian—আপনার উপর Pakistan-এর শত্রুতা থাকার কথা নয়—

—Yes Mr. Officer—পাকিস্তানের আক্রোশ আমার উপর থাকার কথা নয়, বোধহয় ছিলও না। ছায়াকে যখন বিয়ে করি তখন একবার পুলিসের নজর আমার উপর পড়েছিল। কিন্তু ছায়া মারা যাবার পর সেটা তারা উঠিয়ে নিয়েছিল। You are right; and—এবং আমারও কোন political inclination ছিল না। কিন্তু এবার ঢাকায় এসে যা দেখলাম যা শুনলাম তা আশ্চর্য। আমারও যেন নেশা ধরে গেল।

একটু হেসে ডেভিড আর্মস্ট্রং বললে—দেখুন একটা কথা বলিনি, বলার প্রয়োজনও মনে করিনি এবং বলবার মত occasion আসেনি। সেটা হল এই যে, আমি বাউণ্ডুলের মত ঘুরেছি তিনবার East Pakistan-এর মধ্যে—আমি মদ একটু বেশী-বেশী খেতে অভ্যস্ত হয়েছি। আমি Anglo Indian—আপনি জানেন—মদ আমরা বাড়িতেই খেতে শিখি। মদ আমাদের খাদ্য-পানীয়ের শামিল। ঢাকায় এবার এসে এবং ঢাকার নতুন নতুন চেহারা রকমসকম দেখে এমন মেতে যেতাম যে মদ কিনে রাখতে ভুল হত, সভাসমিতিতে গিয়ে বক্তৃতা শুনতাম—মদের নেশা ছেড়ে যেত, উঠে এসে খাবার সময় হত না, খেতাম না। সভা থেকে এসে মদ খেতাম আর মনে মনে বক্তৃতার কথাগুলো আওড়াতাম। কারুর বক্তৃতা বেশী

ভাল হলে সেদিন আবার বেশী করে মদ খেতাম।

News-এর সময় হ'লেই রেডিয়ো খুলে বসতাম—হাতে গেলাস থাকত।

২৫শে মার্চ রাত্রি তখন কত। দশটা কি এগারটা। বিকেলবেলা বেলা তিনটে থেকে মিটিং শুনেছি। পুরানা পল্টনে মিটিং ছিল শ্রমিক ফেডারেশনের—তারপর সরকারী কর্মচারীদের মিটিং। মিটিং-এর পর মিটিং শুনে পথে পথে বেড়িয়েছি—সন্ধ্যেতে ফিরে এসে মদ খেয়েছি আর ভেবেছি দেশ স্বাধীন হচ্ছে। ইয়াহিয়া খাঁ শেখ মুজিবর রহমানের কাছে হার মেনে মিটমাট ক'রে ফিরে যাচ্ছে।

রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে পুবপাকিস্তানীরা ধ্বনি দিচ্ছে—বাংলাদেশ জিন্দাবাদ! বাংলাভাষা জিন্দাবাদ। তাদের হাতে বাংলাদেশের নয়া ঝাণ্ডা। জুলফিকার আলি ভুট্টো ঘাড় হেঁট করে ফিরে যাচ্ছে।

কানে বাজছে শেখ মুজিবর রহমানের সেই আশ্চর্য কণ্ঠ—"ঘরে ঘরে তোমরা দুর্গ গড়ে তোল। যা পাও হাতের কাছে তাই নিয়ে যুদ্ধ কর। আমাদের সংগ্রাম চলছে—চলবে। আমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—আমাদের এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

মদ খেয়ে আমি এই বক্তৃতা সেদিন চীৎকার ক'রে বলছিলাম ঘরের মধ্যে। ২৫শে মার্চ রাত্রি তখন অনেক। Mr. Officer, আমি যে কখন সেদিন বাংলাদেশের একজন মানুষ হয়ে গেছি তা আমি নিজে বুঝতে পারিনি।

শুধু আমি কেন—ওই কানা রহিম—ভিক্ষে ক'রে খায়—ও লোকটার কাছে democratic right-এর কোন দাম ছিল না; East Pakistan, West Pakistan-এর ঝগড়া নিয়ে ওর মাথাব্যথা ছিল না; আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, জামায়েতউলেমা নিয়ে বাছাবাছি করেনি; সেও দেখলাম ঠিক আমার মত ওই সব মানুষদের দলের মানুষ হয়ে গেছে—যারা জয়বাংলা বলে চীৎকার করছে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর জিন্দাবাদ বলে চেঁচাচ্ছে।

Mr. Officer, আমার চোখের সামনে সারা বাংলাদেশের ছবিটা ভাসছিল—আমি তো তিন-তিনবার ঘুরেছি এই দেশটার বুক মাড়িয়ে, সেই দেখা ছবিটা যেন নতুন হয়ে ভেসে উঠল আমার মনে। এরা নিষ্ঠুর রকমের গরীব। পরনে লুঙি—খালি গা খালি পা—গায়ের শ্যামলা রঙ পুড়ে কালো হয়ে গেছে, বুকের পাঁজরা বেরিয়ে আছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে; ছিটেবেড়ার ঘর, টিনের চাল, বছরে বছরে সাইক্লোন এসে উড়িয়ে নিয়ে যায়, চাপা পড়ে ওরা মরে, নদীর বন্যায় গ্রাম ডোবে—মানুষ ডোবে, গরু-বাছুর ভেসে যায়; এদের বাঘে খায়, সাপে কাটে; এরা ধান ফলায়, পাট ফলায়—

—থাক না। অফিসার বললেন—ও কথাগুলো বাদ দিন; তবে I take it যে সেদিন বক্তৃতা শুনে ইমোশনালি লক্ষ লক্ষ লোকের শামিল হয়ে গেছিলেন।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু আপিসে তালাচাবি বন্ধ ক'রে ওরা সকলে চলে গেছে। সবাই ওরা ব্যস্ত ছিল। গোটা ঢাকা শহরটাই তাই। মুজিবর রহমান একরকম যুদ্ধই declare ক'রে দিয়েছেন। লোকে প্রত্যাশা করছে President খান সাহেব কথার দাম রাখবেন,

মুসলমান হয়ে মুসলমানের সঙ্গে বেরাদারির মান রাখবেন। দুনিয়ার কাছে জবাবদিহি করতে হবে তো।—

ইনস্‌পেক্টর বললেন—এসব আমরা জানি। Nobody denies all these facts, আপনাদের কি হল—কি করলেন তাই বলুন।

—গোটা ঢাকা শহর থমথম করছিল। শহরটা নটা বাজতে বাজতে যেন কেমন একটা চেহারা নিলে। দোকানপাট বন্ধ, বাড়িঘর বন্ধ। একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। মনের মধ্যে যত উত্তেজনা তত যেন ভয়ও তার সঙ্গে রয়েছে। ওই বাড়িখানাতে নিচের তলায় উঠোনের এক কোণে সেই গুদোম ঘরটার মধ্যে বসে কিছু করবার নেই বলে শুধু মদই খেলাম।

রাত্রিটাকে অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে কোন দূরান্তর থেকে অনেক মানুষের চীৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছিল।

রহিম মধ্যে মধ্যে তাড়িতাড়ি খায় কালেকশ্বিলে—সে সেদিন আমার কাছে মদ চেয়ে খেয়েছিল—বলেছিল—শরাব খানিকটা দিবেন সাহেব, কলিজার ভিতরটা ক্যামন ঝ্যানো ফং ফং করত্যাছে, জোর পাইত্যাছি না।

আমার ছোট্ট রেডিয়োটা খুলে শুনছিলাম রেডিয়োর খবর। মধ্যে মধ্যে কলকাতার খবর, মধ্যে মধ্যে ঢাকার। তখনও আশা—President-এর কোন ঘোষণার খবর বোধহয় এই বুঝি announced হল। এরই মধ্যে কড়া নড়ল বাইরের দরজার। দিগন্ত আপিসের নিচেরতলা উপরতলা দুতলায় কেউ-একজন ঘুরে কড়া নেড়ে তালাচাবি দেখে নেমে এসে নিচের তলায় উঠানের মুখে যে দরজাটা সেই দরজাটায় ধাক্কা দিলে।

কে রয়েছেন? কেউ আছেন? শুনছেন?

আমরা উত্তর দেব কি দেব না ভাবছি—রহিমের রোঁয়া-ওঠা কুকুরটা চীৎকার করতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় উঠোনের ঘেরা পাঁচিলটার মাথার উপরে উঠে ঝপ ক'রে লাফিয়ে পড়লেন মিস্টার সেন।

আমিও আশ্চর্য হয়ে বললাম—আপনি মিস্টার সেন।

উনি বললেন—হ্যাঁ। দিগন্তের এরা কেউ নেই?

বললাম—না তো,—ওরা সেই বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি।

—শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে মিলিটারি পোস্টিং হয়েছে দেখছি। গভর্নমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে মিলিটারি পাহারা বসে গেছে। ট্রাক ট্রাক ট্রুপ্‌স্ যাচ্ছে। মিলিটারি জীপ ঘুরছে। ব্যাপারটা ঠিক ভাল মনে হচ্ছে না।

—ভাল মনে হচ্ছে না? মানে, কি বলছেন আপনি?

আমার কথা শেষ হয়নি তখনও, একখানি ভারী ট্রাকজাতীয় গাড়ি আশপাশের বাড়িগুলোর দরজা-জানালা নড়িয়ে দিয়ে খুব জোরে চলে গেল।

সেন ছুটে গিয়ে দরজাটার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে

কিন্তু বোধহয় দেখতে পেলে না। ভাবনার মধ্যে চুপ ক'রে দরজার চৌকাঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবছিল।

বাইরে আর একখানা গাড়ি চলে গেল প্রচণ্ড শব্দ ক'রে।

সেন এবার দরজাটা খুললে। মুখ বের ক'রে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলে। আবার গেল একখানা গাড়ি। আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল জীপগাড়ি যাচ্ছে। হুইসিল বাজতে লাগল। এখানে ওখানে সেখানে। যেন একটা ইশারা, একটা নির্দেশ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সেন দরজাতে দাঁড়িয়েই বললে—এ কি হল?

উত্তর এল একটা বোমা ফাটার আওয়াজে। তারই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্-ট্-ট্ শব্দে মেশিনগানের আওয়াজ বেজে উঠল। তার সঙ্গে রাইফেল।

হঠাৎ সেন ছুটে পালিয়ে এল—দরজাটা বন্ধ করবার সময় বোধহয় ছিল না,—দরজাটা খোলা রেখেই পালিয়ে এল। ওদিকে বাইরে এসে থামল একটা ট্রাক।

ফট ফট ফট শব্দে গুলি ছুটে গেল চারিদিকে। সেন আমাকে বললে—পালিয়ে আসুন!

—পিছনের ওই গলিপথ ছাড়া আর পথ কোথায়?

পিছনে খুব সরু একটা গলিরাস্তা। আগে এপথে ঝাড়ুদাররা ময়লা পরিষ্কার করবার জন্য যাতায়াত করত এখন স্যুয়েরেজ হয়েছে—তার পাইপ পাতা হয়েছে। মানুষজন বড় চলে না। সেই পথেই সেন রহিমকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে খিড়কির বহুকাল বন্ধ দরজাটা ভেঙে বেরিয়ে গেল। আমি তার পিছনে।

ওদিকে বাড়ির বাইরের দিগন্ত আপিসের বন্ধ দরজায় লাথির পর লাথি পড়ছে। দরজা ভাঙছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই দরজা ভেঙে পড়ার শব্দ হল। তারপরই ভারী জুতোর শব্দ। বাড়ির ভিতরটা ঘুরে দেখলে। গলিটাতেও টর্চ ফেললে। আমরা লুকিয়েছিলাম গলিটার একটা বাঁকে।

ওরা দিগন্ত আপিসের কাগজে ফার্নিচারে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন দিয়ে চলে গেল।

আমরা বসে রইলাম গলিতে।

চারিদিকে তখন শুধু গুলি গুলি আর গুলি। মেশিনগান রাইফেল চারিদিকে যেমন ইচ্ছে ছুঁড়েই যাচ্ছে, ছুঁড়েই যাচ্ছে এদিকে ওদিকে—কোথায় উপরে একটু আলো দেখা যাচ্ছে কোন জানালায় সেদিকে গুলি ছুটছে।

চীৎকার চীৎকার চীৎকার। মানুষ কাতরাচ্ছে কাঁদছে, আল্লা আল্লা আল্লা।

কোন্ দিকে কেমন ক'রে যে সেই নরকের অন্ধকার দিয়ে গড়া রাত্রিটা পার হয়ে যাচ্ছিল তা বলতে পারি না। বোবা হয়ে গিছলাম—নড়বার শক্তি ছিল না। চিন্তা করবার শক্তি নেই। সেনের দিকে আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি—সেন তাকিয়ে আছেন আমার দিকে—চোখে পলক পড়ে না—চোখের তারায় একটা প্রশ্ন - এক প্রশ্ন—এ কি!

রহিম অজ্ঞান হয়ে গেছে- একটু একটু গোঁ গোঁ শব্দ বের হচ্ছে মুখ দিয়ে। সেন হঠাৎ বললেন—লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে মুখ চেপে ধরবেন। সদর রাস্তা থেকে শোনা গেলে ওরা খুঁজে এসে ঢুকবে।

কুকুরটা একপাশে পড়ে থরথর ক'রে কাঁপছে।

ওদিকে গুলি সমানে চলছে।

হুইসিলের শব্দ উঠছে।

ট্রাক আসছে যাচ্ছে। বিরাম নেই। মানুষ কাঁদছে কাতরাচ্ছে।

—বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও।

—ছেড়ে দাও, ছোড় দো, ছোড় দো।

—দোহাই আল্লাকো কসম খোদাকা—

তারপরই চলে গুলি। টু টু টু টু টু।—লাইট মেশিনগান—স্টেনগান। সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়।

এরপর একবার যেন থামল। মানে গুলি থামল। হেঁটে চলাফেরা আরম্ভ হল। ওদিকে আমার বাড়ির সামনেটা দিগন্ত আপিসটা পুড়ছে। আগুনের আঁচ লাগছে। তবে নিভে আসছে।

সেন নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন—রেডিয়াম দেওয়া আছে কাঁটায়। বললেন - তিনটে পার হয়ে গেছে।

ভয়ে এতক্ষণ পঙ্গুর মত ছিলাম। এখন ভয়টা কাটছিল। এখানে এইভাবে—হে ঈশ্বর—কতক্ষণ থাকা যায়। অসহনীয় মনে হচ্ছিল। লোকগুলো অনবরত চলাফেরা করছে। ভারী বুটের শব্দ উঠছে। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। সেন বারণ করলেন।—না। যাবেন না।

কিন্তু আমি কাওয়ার্ড নই। আমার মধ্যে অসহিষ্ণু সাহসিকতা জেগে উঠেছে। না—বেপরোয়া ভাব নয়। অসহিষ্ণু সাহসিকতা। তখন কাছে জল নেই, মদ নেই, ছিগারেট পর্যন্ত ফুরিয়ে গেছে। রহিমের জ্ঞান ফিরেছে - খুনখুন ক'রে কাঁদছে। সেনের কথা আমি শুনলাম না - এগিয়ে গেলাম হামাগুড়ি দিয়ে, শেষটা শুয়ে শুয়ে। গলির মুখে ছায়াচ্ছন্ন দিকটার গা ঘেঁষে শুয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম রাস্তায় আলো জলছে না, রাত্রি অন্ধকার, তার মধ্যে অনেকগুলো টর্চের আলো ঘুরছে। আমার চোখেও তখন অনেকক্ষণ অন্ধকারে থেকে অন্ধকারের মধ্যেও দেখার একটা ক্ষমতা এসেছে।

দেখলাম—চৌমাথার মোড়টায় অসংখ্য মানুষ মরে পড়ে আছে। খান সাহেবের জওয়ানেরা সেই লাশগুলো টেনে টেনে ট্রাকে তুলছে। পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে আসছে—মৃতদেহ বলে এতটুকু সম্মান নেই; মধ্যে মধ্যে কোন লাশ যদি কিছুতে আটকে যাচ্ছে তা হলে টাননেওয়ালা ঘুরে গিয়ে প্রথমেই মরা লোকটার মুখে লাথি মেরে—তারপর যাতে যা যেখানে আটকেছে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখছিলাম।

ট্রাকটা চলে গেল লাশ-বোঝাই হয়ে। কিছু লাশ তখনও কিন্তু পড়ে রইল।

আমার পায়ের উপর ইশারা জানিয়ে সেন বললেন—পিছিয়ে আসুন। আর না। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। কখন হয়তো নজরে পড়ে যাবেন।

পিছিয়ে এসেছিলাম।

* * *

২৬শে সকাল হল। কাক কোকিল মোরগ পশুপাখি যেমন ডাকবার তেমনি ডাকল।

সেন আমার মনকে সজাগ করবার জন্তে সেদিন কথাটা বলেছিলেন—Mr. Officer, আমি পঙ্গুর মত হয়ে গিছলাম।

আমি coward নই। বলেছি তো একবার, বাঘশিকারীর সঙ্গে বনে মাচার উপর সারারাত্রি একলা বসেছিলাম। বাঘটা আমি মারিনি কিন্তু বাঘটা লাফ মেরেছিল আমারই মাচার সামনে। She was a tigress—জাফরউল্লা খাঁ সাহেব তার বাচ্চাটাকে মেরেছিল একটু আগে; বাঘিনীটা কিছুক্ষণ পর এল বাচ্চা খুঁজতে,—she was furious—

অফিসারটি বললেন—নিজের কথায় আসুন। নিরর্থক বাজে কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

লোকটি বললে—Excuse me please. আমি ভুলে যাচ্ছি; নিজেকে ঠিক control করতে পারছি না। তবে নিরর্থক বাজে কথাও নয় Mr. Officer.—নাহলে আজ মুহূর্তে এইখানে spy বলে সন্দেহভাজন হয়ে কৈফিয়ত দিতাম না আমি, আমি কোন ক্রীশ্চান মিশনে গিয়ে অনায়াসে নিরাপদ আশ্রয় পেতে পারতাম। হয়তো এই ঘটনার পর চলে যেতে পারতাম ইউরোপ বা আমেরিকা বা Australia. তা আমি যাইনি। আমি coward নই—আমি traitor-ও নই। যে বাবা আমাকে নিঃসহায় নিঃসম্বল ফেলে রেখে চলে গেছে তার great grandfather-এর দেশে, তার প্রতি আমার কোন ভালবাসা ছিল না—নাই-ও। কিন্তু my mother—আমার মা ছিল এদেশের মেয়ে।

—আপনি কি মনে আঘাত পেয়েছেন Mr.—

—I am Mr. Armstrong—David Armstrong.

—আঘাত পেয়ে থাকলে আমাকে মাপ করবেন। কিন্তু যদি সেই সঙ্গে বলি যে কিছু কিছু এমন অপ্রিয় কর্তব্য আছে যা পালন করতে গেলে sentiment-কে বাঁচানো যায় না। বলুন তারপর—

—সেন ভদ্রলোকটি আপনাকে সকাল হচ্ছে মনে পড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন ফিরে আসতে।

মিস্টার আর্মস্ট্রং বললে—কাক-কোকিল ডাকছিল—মোরগ ডাকছিল—ছটো-একটা কুকুরও ডাকছিল—কিন্তু সে ঠিক কুকুর যেমন ভাবে ডাকে তেমন ভাবে ডাকা নয়; কুকুরেরা কাঁদে জানেন—তেমনি ভাবে যেন কেঁদে ককিয়ে উঠছিল ভয়ে। তারই মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে একটা ছটো রাইফেলের শব্দ।

সেনের কথায় সম্বিৎ ফিরেছিল আমার। পিছিয়ে গলির মধ্যে এসে যে একটা বাঁকের মোড় ছিল সেইখানে ফিরে এসেছিলাম।

সেন বলেছিলেন—গলিতে নয় আর। বাড়ির ভিতরে চলুন। দেখেশুনে লুকোবার মত জায়গা একটা করে নেব।

*　　*　　*

ওদিকে সামনের দিকে দিগন্ত কাগজটার আপিসে লাগানো আগুন তখন নিভে এসেছে।

কলে জল পড়ছিল, শব্দ উঠছিল।

জল পড়ার শব্দ শুনে মনে হয়েছিল গলা পর্যন্ত তৃষ্ণায় যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে।

কলে হাত পেতে জল খেয়ে নিয়েছিলাম। পিছনে এসেছিল রহিম।—পানি—পানি—

সেন এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ওয়াটার বটল, মদের বোতল নিয়ে। বলেছিলেন—জল ভরে নিয়ে কল বন্ধ ক'রে দেব। জল পড়ার শব্দ শুনলে মনে হবে বাড়িতে লোক আছে।

দরজা বন্ধ করতে দেননি সেন। বলেছিলেন—না—তাহলে সন্দেহ হতে পারে কেউ আছে ভেতরে। থাক খোলাই থাক।

আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম ওই ঘরটার মধ্যে। খুব যত্ন ক'রে আড়াল তৈরী করেছিলাম। রহিমকে নিয়েছিলাম ঘরের মধ্যে। আমাকেই সে জড়িয়ে ধরেছিল। রহিমের কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেও পারিনি—সেটা গিয়ে ঢুকে বসেছিল পাইখানার মধ্যে।

সেনের কাছে খাবার ছিল। আমার ঘরে ছিল খানকয়েক বিস্কুট, খানিকটা চিনি, দুখানা গতকালের বাসী রুটি। তাও ছেঁড়া। খেয়ে পড়েছিল যা তাই। সেনের কাছে ছিল দুখানা পাঁউরুটি, কিছু বিস্কুট। আর ছিল কয়েকটা লজেন্স। সেন লজেন্স খান। সব সময় কাছে রাখেন।

সকাল হয়ে এল, ঘর অন্ধকার, বন্ধ বাইরের জানালাটার কয়েকটা জোড় আর কাটাফুটো দিয়ে আলোর রেখা দেখা দিল।

আস্তে আস্তে গিয়ে একটা ফুটোয় চোখ রাখলাম।

খুব ছোট নয়, মাঝারি একটা চৌমাথার উপর ছিল আমার বাড়িটা। চৌমাথাটায় একটা লম্বা ফালি দেখা যাচ্ছিল।

হে ঈশ্বর।

ধুলোতে আর রক্তে পিচের রাস্তার উপর কালো একটা স্তর পড়েছে—থক্‌থক্ করছে। লাশ পড়ে আছে তখনও। পনের-বিশজনের মৃতদেহ তো বটেই। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। নানা ভঙ্গিতে মরে সেই ভঙ্গিতেই পড়ে আছে। কেউ মুখ থুবড়ে ঘাড় গুঁজে পড়েছে। কারুর মাথাটা পড়েছে ড্রেনের মধ্যে, পা দুটো উপর দিকে উঠে আছে। কাপড়চোপড়গুলো তখনও লাল টকটক্ করছে। তারই উপর পড়েছে সূর্যের আলো।

হঠাৎ আবার হুইসিল বেজে উঠল দূরে, সঙ্গে সঙ্গে চৌমাথা থেকেও বাজল। ওই জানালার ফুটো দিয়ে দেখা যাচ্ছিল না কোথায় দাঁড়িয়ে আছে যারা হুইসিল বাজিয়ে উত্তর দিচ্ছে।

দূরে মিলিটারি ট্রাকের সাড়া জাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার টু টু টু টু। ফট-ফট-ফট-ফট। দুম্-দুম্-দুম্। শব্দ বেজে উঠল। মেশিনগান রাইফেল চলছে—গ্রেনেড ছুঁড়ছে।

সেন বললেন—আবার আরম্ভ হল। সরে আসুন।

মিথ্যে বলেননি সেন। উপরতলার পোড়া দিগন্ত আপিসের দেওয়ালে বুলেট এসে বিঁধছে। ঝর ঝর ক'রে পলেস্তারা খসছে। দুমদাম শব্দে চাঙর খসছে। একটা বুলেট এসে আমরা যে একতলা অংশটায় ছিলাম তারই ছাদের আলসেতে বিঁধল।

রহিম বু-বু শব্দ ক'রে উঠল ভয় পেয়ে।

হাহা হিহি শব্দে কারা হাসছে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে বাজছে মোটরের শব্দ। খান সাহেবের সৈনিকপুরুষেরা হাসছে।

আমি সরে এলাম।

রহিম বললে—সাহেব।

উত্তর দিলাম—চেল্লাস না রহিম। শুনছিস না বন্দুকের শব্দ? কান্না?

অপরাধীর মত রহিম বললে—হায় আল্লা—

আমি বললাম—কি বলছিস রহিম। আস্তে বল্। তোকে আমি বকছি না। রাগ করিনি। বলছি আস্তে বল্। শুনতে পাবে বাইরে থেকে।

—আজ কি আর ফজর অইব না সাহেব?

—সে কি? ফজর তো হয়ে গেছে রহিম।

—হয়ে গিছে তো ইসব থামতেছে না কেন?

—কাক-কোকিল ডাকছে মোরগ ডাকছে শুনতে পাচ্ছিস নে?

—তা হ'লি ওরা অখনও এমন কইরা কি করত্যাছে?

—মানুষ মারছে রহিম—যারে পাচ্ছে তারেই গুলি করছে।

কেঁদে উঠল রহিম। সে কান্না বিচিত্র কান্না। খুনখুন শব্দে চাপা কান্না তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। সেন তার মুখ চাপা দিয়ে বললেন—চুপ!

আবার চলতে লাগল গুলি, গ্রেনেড আর মানুষের চীৎকার।

আ-আ-আ। আ-আ। কথা নাই শুধু চীৎকার রব।

আমার বুকে গাঁথা হয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দু'একটা কথা—বাপ্ রে—হায় আল্লা—হে ভগবান—ওরে মা রে। গেলাম। বাঁচাও। ও।

এমন একটা পৈশাচিক দিন কেউ কখনও কোনকালে দেখেনি—এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

সেন হঠাৎ বললেন—আশপাশের বাড়িগুলো ভেঙে ভেঙে ঢুকে দেখছে। দেখছে নয় গুলি করছে। মারছে। লুঠ করছে। হে ভগবান—

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সেন বলে উঠলেন—হে ভগবান—

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল ?

—বাড়ি থেকে টেনে টেনে মেয়েদের বের করে আনছে। বুকের কাপড় টেনে ছিঁড়ে দিচ্ছে। আঃ—উলঙ্গ ক'রে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে—

আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম—সরুন তো, দেখি কাদের বাড়ির সর্বনাশ করলে।

আমার প্রতিবেশীর মধ্যে তিনটে বাড়ি ছিল হিন্দুর। ওদের মেয়েদেরও মোটামুটি চিনি আমি। ছায়ার সঙ্গে ওদের পরিচয় ছিল। জানালার একটা ছিদ্রতে চোখ লাগিয়ে শিউরে উঠলাম। সে এক নিষ্ঠুর আতঙ্ক—অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্করত্ব; সে একটা নারকীয় পৈশাচিকতা।

মনে হল একদল প্রেত প্রেত-তাণ্ডব শুরু করেছে—নরকের অন্ধকারের উপর দিনের আলো পড়ে নরকে কি ঘটে তাই দেখাচ্ছে।

আঠারো-কুড়ি কি বাইশ-তেইশজন মেয়ে,—উলঙ্গ অর্ধউলঙ্গ হয়ে কুঁকড়ে কোনমতে নিজেদের দেহটাকে নিজের দেহ দিয়ে ঢাকতে চাচ্ছে। কয়েকটা মেয়ে ছিঁড়ে কেড়ে নেওয়া কাপড়টার একটা দিক তখনও দু'হাতে বুকের উপর চেপে ধরে আছে। সব থেকে বীভৎস একটা পিশাচ একটা মেয়েকে রাস্তার উপরই ফেলে তার কাপড়চোপড় ছিঁড়ছে মেয়েটি চেঁচাচ্ছে, পিশাচটা তার মুখে চাপড় মারছে। আর একটা পিশাচ একটা পূর্ণ উলঙ্গ মেয়েকে লাথি মেরে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ক'টি মেয়ে—তারাও সম্পূর্ণ উলঙ্গ—মাথার চুলগুলো বিশৃঙ্খল বিস্রস্ত,—তারা যথাসম্ভব কুঁজো হয়ে নিজেকে ঢেকে হাত জোড় করে ভিক্ষা করছে। একটি মেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করেছে। শুনতে পাচ্ছিলাম তারা মিনতি করছিল—তোমাদের পায়ে ধরি বাঁচাও—ছেড়ে দাও—আল্লার দোহাই—

ওদিক থেকে ছুটে এলো দুটো পিশাচ—তারা এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি আমার মাথার চুল দু'হাতে টেনে ধরে কোন জন্তুর মত একটা বোবা চীৎকার করে উঠতে চেয়েছিলাম।

আমার পিঠে হাত রেখেছিলেন মিস্টার সেন।

আমি তাঁর দিকে তাকাতে সেন বলেছিলেন—সরে আসুন—ভুলে যান আপনি বেঁচে আছেন,—চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকুন।

আমি বলেছিলাম—না, আমি বেরিয়ে গিয়ে সামনে যাকে পাব তাকে মেরে ফেলব। তারপর ওরা আমাকে মেরে ফেলুক।

সেন বলেছিলেন—না।

—কিন্তু আমি যে পাগল হয়ে যাব—

—সে কি আমিই যাব না?

হঠাৎ আমার পালাবার কথা মনে হয়েছিল।—চলুন—তা হ'লে পালিয়ে যাই—

—পালিয়ে?

—হ্যাঁ। এখানে থাকলেও তো মরতে হবে।

দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম—কিন্তু পালাবারও কোন পথ সামনে কল্পনা করতে পারলাম না। একটা ভয় একটা অসহায় দুর্বলতার মধ্যে যেন ডুবে যাচ্ছিলাম।

এরই মধ্যে হঠাৎ বাইরে উঠোনে জুতোর শব্দ উঠল। চার-পাঁচজন মানুষের জুতোর শব্দ।

খটখট শব্দে দাপিয়ে বেড়ালো খানিকক্ষণ। আমরা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে বসে রইলাম। সেন রহিমের মুখ চেপে ধরলেন। রহিম প্রায় অন্ধ। একটা চোখ একেবারে নেই। একটা চোখে অল্প অল্প দেখে; সেই একটা চোখের সে-দৃষ্টি আমি ভুলতে পারব না। সেন ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ এনে বলেছিলেন—চু—প—

স্থির হয়েই পড়েছিল রহিম, নড়েনি।

হঠাৎ আমাদের ঘরটার দরজার কাছে এসে একজন একটা ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠল—আয় বাপ্—উ—কা?

—সাঁপ—

—নেহি—

রহিম রোঁয়া-ওঠা কুকুরটার ওই রোঁয়া-ওঠা রোগ সারাবার জন্য সাপের খোলস একটা কুড়িয়ে এনেছিল কাল বিকেলে। সেটা রাখা ছিল পাঁচিলের উপর ঝুলিয়ে, কখন যে সেটা উঠোনে আমরা যে ঘরে লুকিয়েছিলাম—তার সামনে এসে পড়েছিল কেউই তা জানতাম না। মানে আমরা কেউ খেয়াল করিনি, এদেশে যারা থাকে তারা সাপকে ওদের মত গ্রাহ্য করে না—ভয় করে না। আমরা হয়তো দেখেও দেখিনি। হয়তো পাঁচিলের উপর থেকে আমারই গায়ে ঠেকে খসে পড়েছে—আমি গ্রাহ্য করিনি।

তবে সাপের খোলসটা বেশ বড় রকমের ছিল।

আমরা ঘরের ভিতর থেকেই শুনতে পেলাম—তিন-চারজনে প্রায় সমস্বরে বলে উঠল—আরে বাপ্—

—এ—ত—না বড়া—।

—কাঁহা হ্যায় উ?

—কে জানে?

বলতে বলতেই ঘরের মুখটায় এসে দাঁড়াল এবং বলল—বিলকুল আঁধিয়ারা—

একটা পা চৌকাঠের এপারে পড়ল। কে একজন বললে—নেহি জী—

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ পড়ল ভিতরে। ঘুরল তিন দেওয়ালে। একজন বললে—টুটাফুটা

ছিন্নবিচ্ছিন্ন—

একজন বললে—বরবাদ হো গয়া সব—

আর একজন বললে—ই তো আখবর কা আপিস হ্যায়। উ তো আলা দিয়া হুয়া—উ লোক ভাগ গিয়া হোগা—

—কাঁহা যায়েগা? রাস্তাকে পর খতম হো গয়া হোগা।

—একজন বললে—আরে দূর কোই অওরৎ মিলি নহি—

—চলো—চলো—

আবার একবার চারিদিকে আলো ফেললে। আমরা কতকগুলো ভাঙা লোহার আসবাবের তলায় পড়েছিলাম মৃতের মত।

ওরা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ আমরা কেউই কথা বলিনি। মনে হচ্ছিল বুঝি অনন্তকাল ধরে এইভাবে বোবার মত কালার মত কানার মত পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত পড়ে আছি।

হঠাৎ একসময় আবার গুলির শব্দ, আর তারও থেকে বেশী উঠেছিল মেয়েদের গলার আর্তনাদ।

They were shrieking—it was terrible. কোন কথা নেই, শুধু চীৎকার এর আগেও তারা করছিল, when the brutes were—. I have told what happened. তখন ভেবেছিলাম এই শেষ, এরপর আর নেই।

কিন্তু না। এরপর আরও ছিল। আমরা ধারণা করতে পারিনি। এবার ওরা গুলি ক'রে এবং বেয়নেটিং ক'রে they killed those women.

রহিম জিজ্ঞাসা করেছিল—সাহেব, কি অইত্যাছে সাহেব? সাহেব?

সেন তার মুখে একটা থাপ্পড় মেরে বলে উঠেছিলেন—তোকে আমি মেরে ফেলব রহিম—তুই চুপ কর্।

এরপর সারাটা দিন আমরা নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলাম। মধ্যে মধ্যে ঢুলেছি—তন্দ্রা এসেছে, আবার গুলির শব্দে মর্টার কামানের শব্দে চমকে সে তন্দ্রা ভেঙে গেছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কথা বলতে পারিনি। কথা খুঁজে পাইনি। সারাদিনের মধ্যে খানিকটা রুটি আর চিনি ছাড়া আর কিছু খাইনি। কষ্ট খাবারের জন্যে হয়নি। কষ্ট হয়েছিল drinks-এর জন্যে। একটু মদ হ'লে হয়তো জোর পেতাম, মদের থেকেও বেশী কষ্ট হয়েছিল সিগারেট-বিড়ির জন্যে। রহিমটা আপিং খায়—খানিকটা আপিং ওর ছিল—সেটা ও সবটাই ২৫শে রাত্রি থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেয়ে একটা সেন্সলেস হাফ-অ্যাস্লিপ নির্বোধের মত ঝিমিয়েছিল।

বাইরে সারা শহরে মিলিটারি ভেহিক্‌ল্‌সের চলাফেরার শব্দ। গুলির শব্দ। ট-ট্‌ট্‌ট্‌-ট। লাইট মেশিনগান, হেভি মেশিনগান। অটোমেটিক রাইফেল। মর্টার।

ট্যাঙ্ক চলার শব্দও পেয়েছিলাম। সে একটা নেভাল—আই মীন খোলাটে ঝন-খন-ঝন-খন শব্দ কানে শুনে শরীরটা শিউরে ওঠে, মস্তিষ্ক আর্তনাদ করে উঠতে চায়—প্রাণপণে

নিজের মুখ নিজে চেপে ধরি। বাইরের আর্তনাদের মধ্যে বড় ঈশ্বরের নাম—হায় আল্লা হায় আল্লা, হে ভগবান—তত জন্তর বড উ—আ—হা চীৎকার।

সেন একবার কেঁদেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি কাঁদছেন?

সেন বলেছিলেন—হ্যাঁ। ছেলেটা মেয়েটা আর স্ত্রীকে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে হচ্ছে আর দেখা হবে না। এখান থেকে বেরুতে আর দেবে না এরা।

জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনার কেউ নেই আপনার জন?

বলেছিলাম—না। এখন আমি সম্পূর্ণ একা।

* * *

রাত্রি তখন প্রায় শেষরাত্রি—

হ্যাঁ, ২৬শে মার্চ শেষরাত্রি; সেন তাঁর ঘড়ি দেখে বলেছিলেন দুটো। বেশ কিছুক্ষণ যেন সব থেমে এসেছিল—কাল থেকে দিনরাত্রি মানুষজন সব পাগল হয়ে গিয়েছিল। মাত্র ঘণ্টা-দেড় কি দুই সবে যেন ছেদ পড়েছে। মধ্যে-মাঝে দুটো কি একটা কি পর পর তিন-চারটে শটের আওয়াজ হচ্ছিল।

সেন অন্ধকারের মধ্যেই ঘড়ি দেখে বলেছিলেন—দুটো।

আমি বলেছিলাম—থামল মনে হচ্ছে—

কথা শেষ হতে না হতে পর পর দুটো রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল, আমাদেরই সদর দরজাতেই একটা বুলেট এসে বিঁধল, আর একটা কিছু পড়ার শব্দ হল, তার সঙ্গে একটু-খানি চীৎকার। চীৎকার ঠিক হয়েছিল কিনা তা ঠিক বলতে পারব না। মনে হচ্ছে রহিম আঃ বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। কানা রহিম কখন যে এরই মধ্যে এই কিছুক্ষণ শান্ত নিস্তব্ধ রাত্রির ভরসা পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে কোথাও হোক পালিয়ে যাবার কল্পনায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তা আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু বেরিয়ে সে পড়েছিল—একটা চোখে সে একটু-আধটু দেখতে পেত। পথে সেদিন আলো ছিল—মিলিটারিব লোকেরা নিজেদের গরজেই জ্বালিয়ে রেখেছিল। রাত্রি শান্ত হওয়ার আভাস পেয়ে আর বাইরের আলোর আশ্বাস পেয়ে যেই বেরিয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে, আর দুদিক থেকে দুটো রাইফেল গর্জে উঠেছে।

রহিম পড়ে গেল। রহিমের কুকুরটাও বোধহয় ওর সঙ্গে বেরুতে চেয়েছিল—সেটা আর্তনাদ করে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গুলি। ব্যস, সব নিস্তব্ধ।

না। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানা বুটপরা পা এসে বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গুলি ছুঁড়লে। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ল। দুটো বুলেট আমাদের লুকোনো ঘরের দেওয়ালে বিঁধল। বাড়ির চারিপাশে আবার খুঁজলে। পাইখানা বাথরুম কলের শুকনো চৌবাচ্চা একটা কয়লা-রাখা চোরকুঠরী। তবুও ওই সাপের খোলসটা দেখে আমাদের ঘরটায় ঢুকল না—গাল দিতে দিতে বেরিয়ে চলে গেল।

কিছু নেই বাড়িটায়। না জিনিসপত্র না মানুষ না ঔরৎ।

বললে—ছোকরী ছোকরী। বাংগালীন ছোকরী কালী কালী, লেকেন আচ্ছা আচ্ছা হ্যায়। একঠো নেহি। বিলকুল ভাগ গয়ি।

আমরা বোবা হয়ে বসেছিলাম।

ভাবছিলাম—এর পর?

আমি ভাবছিলাম আমি এখান থেকেই চেঁচিয়ে বলব—ময় বাংগালী নেহি হুঁ, ময় হিন্দু ভি নেহি, মুসলমান ভি নেহি, ময় ক্রীশ্চান হুঁ। পাকিস্তানী ক্রীশ্চান; মুঝে যানে দো।

ঠিক সেই একই সময়ে সেনও ঠিক এক কথাই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন চলে যাবার কথা।

না গিয়ে উপায় নেই—এখানে থাকলে মরতেই হবে।

হঠাৎ সেন উঠে দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি?

সেন বললেন—পালাব। এখানে বাঁচা অসম্ভব।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাবেন?

—ঢাকার বাইরে—শহর থেকে দূরে—যেখানে হোক।

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি করবেন?

কোন চিন্তা-ভাবনা করলাম না, করতে ইচ্ছে হল না; গত কালকের আজকের মত দুটো রক্তাক্ত প্রেততাণ্ডবে বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর দুটো রাত্রি একটা গোটা দিন এই আরশোলা-ইঁদুর-পিঁপড়ে ভর্তি অন্ধকার একটা ঘরে রুদ্ধশ্বাসে কাটানোর পর এসবের থেকে দূরে কোথাও পালাবার কথায় কোন চিন্তা-বিবেচনার কথা আসবে কি ক'রে, কোন্ পথে? আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম – কিন্তু পালাব কোন্ দিকে? কি করে?

সেন বললেন – এর মধ্যেই বেরুতে হবে। না হয় মরব। এত লোক তো মরল—আমরা মরতে এত ভয় করব কেন। রিস্ক নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। এবং এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। মানে ভোর হবার আগে।

* * *

পেরেছিলাম তা।

তিনটের পর একটা সময় এসেছিল, বোধ করি প্রেততাণ্ডব ক'রে ওরাও তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া এ অঞ্চলটাকেও মৃতের অঞ্চল বলে মনে হচ্ছিল। যে বাড়িগুলো লুঠ করবার তা লুঠ হয়ে গেছে; আগুন লাগাতেও বাকি নেই। এসব বাড়ির মেয়েদেরও বোধ করি আর কেউ অবশিষ্ট নেই।

তখনও দু'চারটে লাশ পড়েছিল এখানে ওখানে সুতরাং ক্লান্ত না হয়ে আর কিছু করবার ছিল না। তবে দূরান্তর থেকে মেশিনগানের শব্দ উঠছে। বাতাসে যেন আগুনের আঁচ রয়েছে। এরই মধ্যে রাত্রি তিনটের পর একটা লরি এসে দাঁড়াল। শিউরে উঠেছিলাম। আবার বুঝি আরম্ভ হবে নূতন তাণ্ডব! হে ঈশ্বর!

আতঙ্কিত হয়ে বিস্ফারিত চোখে সেন এগিয়ে গিয়ে জানালার ফুটোতে চোখ রাখলেন। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা ক'রে পিছনে বসে রইলাম। মিনিট-দুয়েক পর গাড়িটা চলে যাওয়ার শব্দ হল। সেন জানালা থেকে সরে এসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম আর ক্রমাগত প্রশ্ন করলাম—মিস্টার সেন? সেন? সেন?

সেন শুধু বললেন—চুপ। চুপ করুন। চুপ—

বাইরের দরজায় উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে ফিরলেন। আমাকে বললেন—চলুন। এই চান্স। যে-কোন মুহূর্তে আবার গাড়ি আসতে পারে। বলে নিজের একটা ঝোলা আর একটা ব্যাগ তুলে নিলেন। আমিও নিলাম আমার চব্বিশ ঘণ্টার ঝোলাটা তুলে। আরও একটা হাতব্যাগ।

সেন বললেন—ভারী জিনিস নেবেন না।

বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে বাইরে রাস্তার উপর। রাস্তার আলো জলছে। রাস্তার উপর এখানে ওখানে ডেড বডি পড়ে আছে। মেয়ে-পুরুষ। মেয়ে কম। গলির মধ্যে দুটো উলঙ্গ নারীদেহ পড়েছিল। গুলি করে মেরেছে। পাশ কাটিয়ে আসতে হল। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমরা গলিপথ ধরে চলছিলাম। মধ্যে মধ্যে রাস্তার এপার থেকে ওপারে গিয়ে আবার গলিতে ঢুকছিলাম। বড় রাস্তার কোথাও মৃতদেহ কোথাও রক্ত—কোথাও রাস্তার ধারের বাড়ি পুড়ছে।

ঠিক ছিল না কোথায় চলেছি। মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে। পুরনো পৃথিবী, শান্ত পৃথিবী, বিশ্বাসের পৃথিবী, নিরাপদ পৃথিবী যাকে জানতাম সে পৃথিবীই যেন হারিয়ে গেছে।

সেন হন হন ক'রে চলেছিলেন। আমিও চলেছিলাম।

মোরগ ডাকল কাক ডাকল কোকিল ডাকল একসময়।

থমকে দাঁড়ালেন সেন। বললেন—কোথায় এসেছি বলুন তো?

পুরনো শহরের কোন একটা অংশ।

খাঁ খাঁ করছে। এদিকটায় আলো নেই। মানে রাস্তাতে ইলেকট্রিক নেই। ভোরবেলাতেও থমথম করছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়তে লাগল মানুষের মুখ। গলি থেকে মানুষেরা মুখ বাড়াচ্ছে। ভয়ার্ত মানুষ। দু'চারজন বাইরে এল —আবার ভিতরে ঢুকল। আবার বেরিয়ে এল। তাদের বগলে পোঁটলা, কাঁধে জিনিসপত্রের মোট। ওরাও পালাচ্ছিল।

জায়গাটা বুড়ীগঙ্গার ঘাটের কাছাকাছি।

ঘাটে ফেরি নৌকোয় চড়ে ওপারে গিয়ে যে যেদিকে পারে পালাবে।

ঘাটের ওপরে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দলে দলে লোক জমে রয়েছে। সারারাত

শব্দে চমকে উঠছে। মেয়েরা কাঁদছে।

সেন আমাকে বললেন—আপনি কোথায় যাবেন?

বললাম—ঠিক তো করিনি। মনেও কিছু নেই। কোন মিশনে যাওয়ার কথাটা মনে ছিল না তা নয় কিন্তু ভাল লাগছিল না। মনে করতেও না।

সেন একটু চুপ করে থেকে বললেন—আপনি বোধহয় ভুল করলেন। আমারও খেয়াল হয়নি।

—কি? বুঝতে পারলাম না সেন কি বলছেন।

সেন বললেন—আপনি আমাদের মত এদের মত চলে যাচ্ছেন কেন? আপনার তো কোন আশঙ্কার কারণ নেই। আপনি হিন্দু নন—আপনি এদেশের মুসলমান নন—

আমি বলেছিলাম—মিস্টার সেন—তার থেকে মরা ভাল। আমার মা বাঙালী, আমি ক্রীশ্চান; জানোয়ারদের বিরোধী নই বলে জানোয়ারদের মিত্র হিসেবে ওদের কাছে প্রাণ বাঁচাতে চাইনে আমি। তার থেকে বরং আমি কোন ক্রীশ্চান মিশনে গিয়ে আশ্রয় নেব। They will save me.

সেন অ্যাপ্রুভ করেছিলেন আমার আইডিয়া। বলেছিলেন—সেটা ভাল হবে। এ আপনি ভাল আইডিয়া করেছেন।

কিন্তু নদী পার হয়ে ওপারে এসে সব গোলমাল হয়ে গেল। এই মেয়েটির সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িয়ে পড়লাম।

ও-ঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে অফিসারটি বললেন—ওর সঙ্গে?

—হ্যাঁ। নাজমার সঙ্গে। রহিমের মেয়ে নাজমা। আশ্চর্য রকমের কালো মেয়ে নাজমা। তাই দু'বছর আড়াইবছর পরেও ওকে দেখে চিনতে কষ্ট হয়নি।

অসংখ্য লোক—বেশির ভাগ গরীব আর মধ্যবিত্ত; এরা দলে দলে ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছে। এদের পাড়ায় হানা দিয়েছে ইয়াহিয়া খাঁয়ের মিলিটারির দল, পাড়া পুড়ে গেছে; হেভি মেশিনগানের গুলিতে আর মর্টারের explosionএ ভেঙে গেছে; যারা সামনে পড়েছে তারা মরেছে গুলিতে, মেয়েদেরও মেরেছে। তবে তাদের দুর্ভোগ অনেক বেশী—চরম লাঞ্ছনার পর বেয়নেট বিঁধে দিয়েছে বুকে কি পেটে। ছেলেগুলোকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বেয়নেটে গেঁথে নিয়ে খেলা করেছে তারা। যারা বেঁচেছে তারা পালাচ্ছে। ঢাকায় আর কিছু নেই। ইউনিভারসিটি কামান-মর্টার দেগে ভেঙে দিয়েছে। প্রফেসরদের কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে হানা দিয়ে টেনে বের করে এনে গুলি ক'রে মেরেছে। গার্লস হোস্টেল থেকে মেয়েদের ট্রাকে তুলে নিয়ে এসে তাদের চরম লাঞ্ছনা ক'রে শেষে গুলি ক'রে মেরেছে। বাঙালী পুলিস বাঙালী ই-পি-আরদের ২৫শে মাঝরাত্রে ব্যারাকে হানা দিয়ে নির্বিচারে গুলি ক'রে মেরেছে। আওয়ামী লীগ লীডারদের বাড়ির উপর ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেবে গুজব রটেছে। আওয়ামী লীগের লোকেরাও তৈরী হচ্ছে। তারা লড়াই দেবে—।

শুনছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সেনও দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। ঢাকা থেকে বেরিয়ে এসে

তিনি মত বদলেছেন—তিনি এ লড়াই দেখবেন। ওই বাড়িটার মধ্যে থেকে আমরা বুঝতে পারিনি যে প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। বুঝতে পারিনি এখনও পৃথিবীতে নিশ্বাস নেবার বাতাস আছে। মানুষের মৃতদেহ—রক্তে আর ধুলোতে কর্দমাক্ত পথ ছাড়া আর কিছু দেখবার আছে। নদীর এপারে এসে বুঝলাম—আছে। তাই শুনছিলাম।

সেন এরই মধ্যে ঠিক করেছিলেন তিনি যাবেন চট্টগ্রাম কুমিল্লা হয়ে শিলেট ময়মনসিংহের দিকে।

আমি ভাবছিলাম—যাই না ওর সঙ্গে।

হঠাৎ কেউ 'বড় ভাইসাহেব' ব'লে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আমার সামনে—একেবারে কোলের কাছে।

কে? চমকে উঠলাম। সামনে দেখলাম আশ্চর্য কালো মেয়ে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে; নরুণে চেরা লম্বা দুটি চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে দরদরধারায়; মাথার রুখু করকরে চুলগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে আছে; কোলে একটা ঘুমন্ত শিশু। আমার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। দেখতে দেখতে মনে হয়ে গেল একটি কৌতুকময়ী চঞ্চলা আশ্চর্য কালো মেয়েকে।

রহিমের মেয়ে—নাজমা।

ছায়া রহিমকে ডাকতো— রহিমচাচা।

রহিম ছায়াকে বলতো মা। নাজমাকে নাজমাই ডাকত ছায়া। নাজমা ছায়াকে ডাকতো 'দিদি' বলে, আমাকে বলতো 'বড় ভাইসাহেব'।

আপনাআপনি আমার মুখ থেকে নামটা তার বেরিয়ে এল—তার মধ্যে ছিল অনেক বিস্ময়। সবিস্ময়ে বললাম—নাজমা!

হা-হা ক'রে নাজমা কেঁদে উঠল।

* * *

নাজমার স্বামী গুলি খেয়ে মরেছে। একটা বস্তির মধ্যে একখানা ছোট্ট ঘরে ছিল ওদের বাসা। সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরে সেই হিংস্র অন্ধকারের মধ্যেও সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে নদীর ধারে পৌঁচেছিল কোনমতে। তার ছেলেটা বেঁচেছে—সে বেঁচেছে। কাল সারাদিন লুকিয়েছিল নদীর ধারে। রাত্রে পাড়াটা দেখে এসেছে। উঠোনে স্বামীর দেহটা পড়ে আছে; নাজমা বললে -ছাতিডায় গুলি ঢুক্যা পিঠ পানে বাইরিয়া গেছে- রক্তে সব ভাইস্তা গেছে। চাপ বাঁধিছে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বললে—আমি কার কাছে যামু,—কোথা যামু আমি?—বড় ভাইসাহেব আপনি বলে জান।

এই ক'ঘণ্টা আগে রহিম পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছে—কথাটা ওকে বলতে পারলাম না। কোন জবাবও খুঁজে পেলাম না। ওকে নিয়ে কি করব? কিন্তু ও

আমাকে ছাড়লে না।

সেন বললেন—ঈশ্বরটীশ্বর তো মানি না ভাই ডেভিড—তবে ওকে তোমার ঘাড়ে ঈশ্বর চাপিয়ে দিলেন একথা বলতে আমার একটুও সঙ্কোচ হচ্ছে না।

ওই কথাটাই যেন আমিও বলতে চাচ্ছিলাম আমার আমিকে। একজন ক্রীশ্চানের যে ঈশ্বরবিশ্বাস থাকে সে বিশ্বাস ঠিক আমার নেই। চার্চে আমি যাইনি দীর্ঘদিন। এবার ঢাকায় ফিরে এসে একদিন গিয়েছিলাম। তার আগে মাসকয়েক যাইনি। নৌকোতে ঘুরছিলাম তখন।

হঠাৎ লোকটি ইংরেজীতে বলতে আরম্ভ করলে—You see I am not a Saint—I don't believe in things like others. নাজমার ওই করুণা ভিক্ষার মধ্যে আমার অনেক কিছু আবিষ্কার করা উচিত ছিল, কিন্তু তা করিনি—করতে পারিনি। I didn't like it. ওই মুহূর্তে আমি আর এক মানুষ ছিলাম বোধহয়।

তা ছাড়া ঢাকার বাইরে এসে নদীর এপারে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল পুরনো পৃথিবী সব একেবারে মুছে যায়নি। তাই সেনের ওই কথাটা শুনে মনে হল ঠিক এই কথাটা তো আমি আমার আমিকে বলতে চাচ্ছি। সেই মুহূর্তে ঢাকার বাইরে নদীর এপারের ঘাটে দাঁড়িয়ে মনে করতে পারছিলাম না যে গোটা দেশটা জ্বলে উঠবে ক্ষেপে উঠবে।

সেন বললেন—তা হ'লে আমি রওনা দিলাম ভাই। তুমি এক কাজ কর, একেবারে ইন্টিরিয়রে গিয়ে কিছুদিনের জন্তে থেকে যাও। ওকে পার তো কোন একটা খেটে-খাওয়া কাজেকামে লাগিয়ে দিয়ো। ও খাটবে খাবে—তুমিও তোমার কাজ দেখে নিয়ো। তোমার স্ক্রু-ড্রাইভার, টেস্টার-যন্তরগুলো সঙ্গে এনেছ তো?

সেন চলে গেলেন। আমি ভেবেচিন্তে পথ ধরলাম নদীর ধারে ধারে গোয়ালন্দের দিকে।

I had some money—two thousand and five hundred. অর্থের ভাবনা ছিল না। ভাবনা ছিল নাজমা।

এমনই একটা আশ্চর্য কালো মেয়ে এবং তেমনি আশ্চর্য তার ছোটখাটো চেহারা। যেন একটি বালিকা মেয়ে। কিছুক্ষণ ভালো ক'রে দেখলে কিন্তু blood boils in your veins. তার যৌবন যেন উপচে পড়ছে।

আমার মত cat's eye চোখওয়ালা, তামাটে গায়ের রঙওয়ালা, ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা একটা লোকের পিছন পিছন এই আশ্চর্য কালো খাটো মেয়েটিকে দেখে সকলেই একটু একটু আশ্চর্য না হয়ে পারেনি।

না-হলে পথটায় বিশেষ বিঘ্ন হয়নি। তখনও সারা দেশটার বুকের ওপর যে হাওয়া বইছে যে হাওয়ার নিঃশ্বাস নিলে যেমন চনচন করে ওঠে, মাঠে চাষী তখনও হাল বইছে, দেখা হলে জয়বাংলা বলছে; বাজারে জায়গায় চায়ের দোকানে লোকজন বসে মুঠি তুলে শপথ নিচ্ছিল—They will fight to the last; ট্রানসিস্টারে ক্যালকাটা রেডিয়ো স্টেশনের

প্রোগ্রাম বাজছে। ঢাকা রেডিয়ো কেউ শোনে না। কারুর ঘরে বাজলে তার বিপদ আছে।

ঢাকায় ২৫।২৬শে তারিখের বীভৎস নারকীয় তাণ্ডবের কথা বিস্তারিত করে বলছিল রেডিয়োতে।

এরই মধ্যে লোকের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছিল—কোত্থেকে আসছেন?

—ঢাকা। বলতে ভয় পায়নি। লুকোবার প্রয়োজনও মনে হয়নি। এরপর প্রশ্ন করেছে—কোথায় যাবেন?

তাও সত্য বলেছি—পালায়ে যাইত্যাছি, কোথা যামু ক্যামন কইরা কই কয়েন?

—নাম কি আপনার?

এবার মিথ্যে বলেছি—বলেছি মনসুর। আমি ক্রীশ্চান, নাম ডেভিড আর্মস্ট্রং বলতে সাহস করি না।

তারপর জিজ্ঞাসা করেছে—ও কে? এই কালো মেয়েটি? এমন কালো তো দেখা যায় না। ওর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?

আপনাআপনি মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে—আমার স্ত্রী। সেকথা ওকে আমি বলিনি। তবে ও শুনেছে দু-চারবার, কিন্তু কোন ভাবান্তর হয়নি। ওর বাচ্চাটিকে কোলে ক'রে চুপ ক'রে বসে থেকেছে। এক-আধবার বড সংকোচের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়েছে, মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠেছে।

লোকে ঠিক বিশ্বাস করেনি আমার কৈফিয়ৎ। এই ধরনের কালো মেয়ে সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে নয়। আশ্চর্য কালোর এই জাত দেখা যায় ওই বেদেটেদেদের মধ্যে—হিন্দুদের একেবারে নিচু জাতের মধ্যে। লোকে সন্দেহ ক'রে তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে। নাজমার ছেলেটা অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করত। ছেলেটার রঙ ওর মায়ের মত কালো নয়। চোখ তার আমার মত কটাসে না হলেও গায়ের রঙ যেন ফরসা ছিল। নাজমা তার ছেলেটাকে আমার কোলে তুলে দিয়ে আমার কাছে সরে এসে গা ঘেঁষে বসত।

নাজমাকে আমি সময় বুঝে অনেক সময় বলেছি- ভয় করিস না নাজমা। তোর নেকা দিয়া ঘর বসত কইরাইয়া তবে আমার দায় খ্যাষ অব। তরে আমি এমনি ছাইড়া দিয়া চইলা যামু না। তু ভাবস না।

ও বলত—কে আমারে নিকা করবে বড় ভাইসাব?

বলতাম—ক্যান? তুই কালো, তাই কস ই-কথা?

ও বলত—তাও কই। তা ছাড়া আমার এই চাঁদটার কি অইব কও? পরের ছাওয়াল সমেত আমার মতুন কালী মাইয়া কে ঘরে লইবে, ক্যানে লইবে? নিকা করলি — আমার ছাওয়ালডারে সে মাইরা ফ্যালাবে। তা থিকা—আমারে একটা পাট কাম ঠিক কইরা দিয়ো আমি খাইটা খামু। আমার চাঁদডারে আমায় বাঁচাইতেই অইব। ও মরলি আমি বাঁচুম না।

রাজমার রূপ একটা আছে। আশ্চর্য রূপ। মিস্টার অফিসার, আপনার চোখ আছে—আপনি সে রূপ দেখছেন—কিন্তু ওর মনের চেহারাটা আরও সুন্দর। ছেলেটাকে কোলে ক'রে দোলা দিয়ে ঘুমপাড়ানী গান গাইত। সে যে কত মিষ্টি তা বলতে পারি না। ওর মিষ্টি গলার কথা আমার অজানা ছিল না। ওর বাপের হাত ধরে ঢাকার রাস্তায় ভিক্ষে করত সে গান শুনেছি—ওর গলায় গান আমার টেপে রেকর্ড হয়ে আছে। ওকে সাবধান ক'রে বলতাম—নাজমা এমন কইরা গান গাইস না। লোকেরা শুনলি কি জানি তরে ছিনাইয়া নিবে।

সরল বোকা মেয়েটা লজ্জা পেয়ে বলত—ধ্যেৎ।

আমার পক্ষে শক্ত হয়েছিল ওকে বোঝানো যে ওর রূপ আছে।

মিস্টার অফিসার, দিনের পর দিন আমি যত ভাবতাম—এ বোঝা আমি নামাব কি ক'রে ততই যেন ওকে আমি আঁকড়ে ধরেছি নিজেই। ভয় হয়েছে ও না আমাকে ছেড়ে চলে যায় অন্য কারুর সঙ্গে—কিংবা হঠাৎ কোনখানে দশদিন থাকতে থাকতে বলে বসে, তুমি এবার চইলা যাও বড় ভাইসায়েব—আমি এইখেনে রইয়া গ্যালাম গিয়া।

ঘরের প্রতি নাজমার বড় টান।

প্রায়ই গল্প করত ওর জীবনের অল্প ক'দিনের ঘরের। যে জোয়ান ছেলেটিকে ভালবেসে সে তার ভিক্ষাজীবী বাপকে ছেড়ে তার সঙ্গে চলে গিয়ে ঘর বেঁধেছিল ঢাকার আর এক প্রান্তে—সেই পুরুষের বিশেষ করে সেই ঘরের। তাদের আরও অনেক আশা ছিল। অনেক আশা, অনেক প্রত্যাশা। তারা শহরে রোজগার ক'রে নিয়ে গ্রামের দিকে যাবে। সেখানে কিছু জমি কিনবে—বাড়ি তৈরী করবে, হালগরু কিনবে; তার ছাওয়াল বড় হবে—তাকে পাঠশালে দেবে। সে পড়বে—ইস্কুলে পড়বে, কলেজে পড়বে।

এমনি গল্প করত। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম অবাক হয়ে। I will not conceal Mr. officer—আমি গোপন করব না যে এইভাবে এই আশ্চর্য কালো মেয়েটির একটু প্রত্যাশা আশায় উজ্জ্বল মিষ্ট হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি—; আমার বুকের মধ্যে একটা কিছু যেন তোলপাড় করে উঠেছে। আমি চঞ্চল হয়েছি। I could understand that it was desire,—that eternal desire of a man; সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তিরস্কার করেছি।

সেনের কথা মনে পড়েছে। সেন বলেছিল—আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না ডেভিড, কিন্তু এই মুহূর্তে ওই মেয়েটিকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—এর দায় তোমাকে ঘাড়ে নিতে হবে, এটা হল ঈশ্বরের নির্দেশ।

আমারও মনে হয়েছিল, এই কথাটাই যেন আমি আমার আমিকে বলতে চেয়েছিলাম।

পথের পর পথ পিছনে ফেলে সামনে চলছিলাম। কোথায় গিয়ে ওকে নিরাপদ দেখতে পারব। চলছিলাম নারায়ণগঞ্জ ফেলে সামনের দিকে, গোয়ালন্দের দিকে। মধ্যে ক্রীশ্চান মিশন পেয়েছিলাম কয়েকটি। সেখানে গিয়ে আশ্রয় চেয়েছিলাম।

আমার পুরনো পাসপোর্টে আমার ছবির সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে, ওদের আমার সব কথা শুনে তাঁরা বলেছিল—surely, তোমাকে আমরা অবশ্যই আশ্রয় দেব, but—

শাহনাজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—She is not a Christian, She is a Muslim girl—ওকে তো আশ্রয় দিতে পারব না।

আমি বলেছিলাম কি বলছ তুমি ফাদার। এই একটি বিপন্ন মেয়েকে তোমরা আশ্রয় দেবে না?

ফাদার বলেছিলেন—তুমি জান না কি হচ্ছে দেশের মধ্যে। ঢাকায় চিটাগংএ কুমিল্লায় বড় বড় শহরে হাজার হাজার men women children মেশিনগানের গুলিতে—

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিলাম—আমি চোখে দেখেছি ফাদার। দিনের আলোয় ঢাকার রাস্তার উপর mothers sisters daughters were dragged in—and—

ফাদার উপরের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন। অঙ্গে ক্রশ চিহ্ন এঁকে শুচি হয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—ওরা যে মুহূর্তে জানতে পারবে যে ঢাকা থেকে পালানো একটি মুসলিম মেয়েকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি সেই মুহূর্তে ওরা অপবাদ দেবে যে আমরা একটি মুসলিম মেয়েকে ক্রীশ্চান করছি। তারপর—

আমি চুপ করেই থেকেছিলাম। কি বলব এর পর? আশঙ্কা তো ফাদার মিথ্যে করেননি।

ফাদার বললেন—এখন Pak soldiers চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, gates of hell have been thrown open and devils are out—শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের দিকে ধাওয়া করছে। I would advice you to find out a shelter somewhere.—তুমি জান না মুসলিম লীগ people and জামেত-উলেমা people are working as informers. তোমাকে দেখলে তারা ধরিয়ে দেবে and—

* * *

হঠাৎ ধরা পড়লাম। ধরা পড়লাম আমি।

লাহোর অঞ্চলে একটা বড় ইলেকট্রিক কোম্পানীতে চাকরি করতাম। সেই কোম্পানীতে এক নবাবজাদা অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। উর্দু গজলে আমার খুব শখ ছিল; একদিন একটা নিঃসঙ্গ স্টোর আপিসে রাত্রে গজল গাইছিলাম আমি—নবাবজাদা জাফরউল্লা খাঁ হঠাৎ এসে পড়েছিল সেদিন এবং আমার সঙ্গে ডেকে আলাপ ক'রে সারারাত সে এক মহফিল জুড়ে দিয়েছিল। আমীর লোক, দিলদরিয়া আদমী, আমার উপরওয়ালা হয়েও আমার গান শুনে বলেছিল—দেখ নোকরি আমরা কখনও করিনি। নোকর আমরাই রাখতাম। এককালে কেনা নোকর গোলাম বান্দা থাকত আমাদের। কারুর উপর মেজাজ খুস্ হ'লে তাকে খোলসা দিয়ে জায়গীর দিয়ে দিয়েছি, জমিন দিয়েছি। আজ উ রোজ চলা গিয়া। জমিন জায়গীর আর নেই। লেকিন মেজাজ আছে। তোমার উপর খুস্ হয়ে গেছে মেজাজ। তুমি খুব ভাল গজল গেয়েছ। শরাব খেয়েছ আর খেয়ে

ঠিক আছ সেই জন্যে তুমি দোস্ত হ'লে আমার।

এরপর অনেকবার দেখা হয়েছে। নবাবজাদা -হায়েশা হায়েশা হুরাইয়া বেগম বলে এক বাঈএর বাড়ি যেতো—আমি লাহোর গেলেই সে আমাকে নিয়ে যেত হুরাইয়ার বাড়ি।

Of course I was quite a different person then. তখনও জীবনে মা মারা যাওয়ার দুঃখ ছাড়া দুঃখ পাইনি কোন। সে-ও খুব বেশী নয়, কারণ my mother was a nurse by profession -নিজে নার্স ছিল, আমি মানুষ হয়েছিলাম একটি মুসলমান আয়ার কোলে। বাবা রেলের চাকরে, তা ছাড়া সাদা চামড়ার মানুষ—ওদের হার্ট একটু স্বতন্ত্র ধরনের, আমি বলেছি আমার মায়ের মৃত্যুর পরই সে একটি আধবুড়ী খাঁটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করে ইংল্যাণ্ড চলে গিয়েছিল—never thought anything about me; একটা নুড়ি পাথর হাতে নিয়ে লুফতে লুফতে হঠাৎ ফেলে দিয়ে চলে যাবার মত আমায় ফেলে চলে গিছল। তার উপর আমার প্রথম যৌবন। ঝড়ো জীবন—wild life সম্পর্কে আমার আকর্ষণ ছিল।

ইনস্‌পেক্টর বললেন—Please be brief।

—Brief। হাসলে একটু লোকটি।—আচ্ছা। একটা কথা বলে নিই শুধু, সেটা এই যে ছায়া আমার জীবনে এসে আমাকে পাল্টে দিছল। And then this girl—ওই নাজমা।

* * *

নাজমাকে নিয়ে গোয়ালন্দ ছাড়িয়ে কালুখালি রতনদিয়া বলে একটা আধা টাউনে আমি একটা বাসা ক'রে নিঃশ্বাস ফেলতে চেয়েছিলাম। জায়গাটা যেন অপেক্ষাকৃত শান্ত মনে হয়েছিল। বাজারে জায়গা; ক'রে খাবার—কাজ-কাম পাবার যেন সুবিধে ছিল। একদিকে শহর গজিয়েছে, অন্য দিকটা পাড়াগাঁ।

এখানে চারিদিকটা যেন অপেক্ষাকৃত শান্ত।

এপ্রিল মাস পড়ে গেছে তখন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ। সারা দেশটা মার খেয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে, তবুও ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়েনি।

সারা দেশ জুড়ে পশ্চিম-পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রাম জ্বলছে মানুষ মরছে গুলি খেয়ে, সব থেকে বেশী লাঞ্ছনা মেয়েদের, তাদের মেরে ফেলবার আগে দল বেঁধে পশুর মত তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করছে। পথের ধারে নদীর ঘাটে গ্রামের মধ্যে উলঙ্গ নারীদেহ আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে আছে। সারা দেহ রক্তে-ধুলোতে মিশানো কাদায় কর্দমাক্ত হয়ে গেছে; কারুর বুকে গুলির ছিদ্র, কারুর পেটটা ফাঁসিয়ে দিয়েছে। সে দৃশ্য বীভৎস, সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর। নাজমা আমাকে মধ্যে মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠে বলত—বড় ভাইসাহেব, আমার কি অইব?

বেয়নেটে বিঁধে মেরে ফেলা শিশুদেহ পড়ে আছে নারীদেহের পাশে।

একতাল রক্তাক্ত মাংস।

নাজমা তার ছেলেটাকে বুকে চেপে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত।

ওদিকে উত্তেজনা উত্তাপ বৈশাখের দুপুরের গরম বাতাসের মত উঠে যেন বিকেলবেলা থম ধরেছে।

মার্শাল ল চলছে ২৬শে ভোরবেলা থেকে।

২৭শে খবর রটেছিল—মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর টিক্কা খাঁ গুলিতে মারা গেছে। একটি মেয়ে রৌশনারা বুকে মাইন বেঁধে ট্যাঙ্কের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে।

নানান্ গুজব নানান্ খবর। খবর রটেছিল—চিটাগং থেকে মুক্তিফৌজ লিবারেশন আর্মি আসছে ঢাকার দিকে। ২৪নং ফিল্ড কোর্সের মেজর দৌলতপুরে আহত হয়েছে। পাক বম্বার সারা ব্রিজ উড়িয়ে দেবে কি দিয়েছে বলেও গুজব রটেছিল।

ঢাকা রেডিয়ো বন্ধ। রাজশাহী রেডিয়োও বন্ধ। চিটাগং-সিলেট-রংপুর কোন রেডিয়ো চালু নেই তখন।

কলকাতা রেডিয়োর খবরের জন্তে লোকেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। কলকাতা রেডিয়োতে একদিন মুজিবনগরে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তৈরীর খবর শুনলাম।

আমার ট্রানজিস্টারটা ঝোলার মধ্যে পোরাই ছিল। এমন সুন্দর ছোট জিনিসটি বের করতে সাহস হয়নি। লোকেরা এমনিই আমাকে এবং নাজমাকে পাশাপাশি দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তার উপর এই চোখে-ধরা এমন জিনিসটিকে বের করতে সাহস হয়নি।

নিতান্ত নির্জনে সময় সুযোগ পেলে খবর ধরে শুনতাম।

এর পরই জোয়ারের পর ভাটির মত উলটো স্রোত বইল। লোকেরা আশা করেছিল—যে বিপ্লব ঢাকায় সেদিন আরম্ভ হয়েছিল সেই বিপ্লব চারিপাশ থেকে in waves চলে আসবে—এই কিছুদিন আগের সাইক্লোনের মত। এবং West Pakistani troops movement, military operation উড়িয়ে ভাসিয়ে ব্যর্থ করে দেবে। কিন্তু তা হল না। সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যে হাজারে হাজারে Pak soldiers মেশিনগান অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে মিলিটারি ভেহিকল্‌স্ চড়ে শহরগুলোকে ছেয়ে ফেললে। হাজারে হাজারে লোক মরল—mothers daughters and sisters were raped in open day-light, then they were shot and killed, কামান মর্টার চালিয়ে university ভাঙলে—বড় বাড়ি ভাঙলে। বস্তি পোড়ালে। সেখানেও সেই এক ইতিহাস।

লোকেরা পালাতে লাগল। আগরতলা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ—হিন্দুস্থান। আমরা তখনও ঠিক করিনি বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাব কিনা। কালুখালি রজনদিয়ার কাছাকাছি এসে নাজমার ছেলেটা অসুখে পড়ল। নাজমা নিজেও ভয় পেয়ে যেন এলিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্তে কাঁপছিল দুখানা দুর্বল পায়ের উপর দাঁড়িয়ে। ছেলেটার গায়ে বেশ উত্তাপ।

রজনদিয়া কালুখালির বাজারের একপাশে একখানা ঘরে প্রথম সপ্তাহখানেক থাকব

জেনে একটুকরো বাসা নিয়েছিলাম।

তারপর দেখলাম—এখানে ক'রে খাবার মেটে আমার পথ আছে। ব্যাগ থেকে বের ক'রে নিলাম আমার যন্ত্রপাতি। যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম, তাতে দুটো ঘর ছিল, সামনে ছিল একটি বারান্দা; সেই বারান্দার দেওয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে লিখে দিলাম—Mr. D. Armstrong—Electrical Engineer—ইংরিজী বাংলা দুইয়েই লিখলাম। দিনকয়েক পর আরবী হরফেও লিখলাম। তখন চেষ্ট যেন ফিরতে আরম্ভ করেছে।

বলতে দ্বিধা নেই—মনে মনে লজ্জার আর শেষ ছিল না।

তা আমি স্বীকার করেছিলাম। কারণ আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম ওই মেয়েটিকে।

ওকে বলেওছিলাম—নাজমা, তুই যেন আর নিজের নাম নাজমা বলবি নে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি—তোর নাম মায়া। মায়া আর্মস্ট্রং।

ওর খুব আশ্চর্য মনে হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—বলব মায়া—? মায়া —। কি?—আর্মস্ট্রং শব্দটা প্রথমটা বুঝতেই পারেনি বেচারা।

—মায়া আর্মস্ট্রং। মুখস্থ কর। রপ্ত ক'রে নে।

—ছায়া দিদির বোন?

—না। তাও না। ছায়ার কেউ না। তুই শুধু মায়া। ছায়া মরবার পর তোকে আমি বিয়ে করেছি।

অবাক হয়ে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

আমি কারণটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—দেখ, তুই মুসলমান মেয়ে আমি ক্রীশ্চান, আর আমার তুই কেউ নস, এ জানতে পারলে হয়তো গণ্ডগোল বাধবে রে। আবার তো দেখছি গতিক খারাপ হয়ে আসছে। লীগের পাণ্ডারা জামাতেউলেমার দালালেরা তো চারিদিকে বেড়াচ্ছে—কে জানে কোন্ ফ্যাসাদ বাধায়? কখন এসে বলবে—ও মেয়ে আমরা কেড়ে নিয়ে যাব। তবে তুই যদি যেতে চাস—কেউ যদি তোকে নেকা করে—

বার বার শিউরে উঠে নাজমা বলেছিল—না-না-না-না বড় ভাইসাহেব। না। আমার চাল্দেয়ে অরা কুকুর-বিরালের মতুন ছ্যাক ছ্যাক কইরা খেদাইতে চাইবে—খেয়া করবে—হয়তো বা মাইরাই ফ্যালবে।

* * * *

নতুন ঘরে আসতেও নাজমার ভয় ছিল।

কিসের ভয় কাকে ভয় তা বলতে পারি না, নাজমাকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সেও বলতে পারেনি—বোকার মত আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছিল। শেষে বলেছিল—আমি জানি না—কইবারে পারুম না বড় ভাইসায়েব—তবে ক্যামন য্যানো ভয় লাগে—ভয় পায়।

ভয় আমারও লাগত। ভয় লাগত আমার আমাকে।

নাজমার মধ্যে আশ্চর্য একটা কি আছে। ওর আশ্চর্য কালো রং—ওর ওই আশ্চর্য যৌবন। সেন আমাকে বলেছিলেন ঈশ্বরের নির্দেশে এ দায় এসে আমার উপর বর্তেছে।

আমি সারা জীবনে বাইবেল গোটাটা পড়িনি। তবু বাইবেল একখানা আমার কাছে থাকে। নাজমাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চলতে মনে হল বাইবেল পড়ি। আমি পড়তাম। নাজমাকে বলেছিলাম—নাজমা, আল্লাকে ডাকতে ভুলিস নে, নামাজ যেন একবার ক'রে পড়িস। নামাজ নাজমা ঠিক পড়তে জানত না তবে হাঁটু গেড়ে বসে একবার চোখ বুঁজে আল্লা দয়া কর ব'লে ডাকত। বিপদের মধ্যে যখন কূলকিনারা পাওয়া যায় না—তখন এ ছাড়া কোন গতি থাকে না। তবে এর ভরসাও যখন করা যায় না তখন আর কারুর ভরসা বা কিছু ভরসাই থাকে না।

সেই ভরসাকে মাথায় করে একখানা বাড়ির একটা অংশ, একটা কুঠরী, একটুকরো রান্নাঘর, ভিতরে বাইরে দুটো বারান্দা ভাড়া নিলাম। নাজমার নাম হল মায়া। মায়া আর্মস্ট্রং।

একটা গোটা দিন মুখস্থ করলে নাজমা।

মায়া আর্মস্ট্রং, মায়া আর্মস্ট্রং, মায়া আর্মস্ট্রং। আর্মস্ট্রং, আর্মস্ট্রং, আর্মস্ট্রং, আর্মস্ট্রং।

পথ ছেড়ে ঘরভাড়া নিয়ে বাসায় ঢুকতে নাজমার ভয় হয়েছিল। ঘরে ঢুকে কিন্তু সে "আঃ বাঁচলাম" বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দার উপর শুয়ে পড়েছিল। অসুস্থ, আধ-মরা হওয়া ছেলেটাকে টেনে নিয়েছিল কোলের কাছে। প্রায় ঘণ্টা-তিনেক ঘুমিয়ে তারপর উঠেছিল। দিনচারেকের মধ্যেই ছেলেটা সেরে উঠল, কিন্তু মানুষের দেহ মানুষের মন ওই বাড়িখানির উঠানটুকু মেঝেটুকু ঘরখানার চালের ছাউনিকে একেবারে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল যেন।

* * * *

বাড়িওয়ালাটি ছিল বড় ভালো মানুষ। অনেকটা মৌলানা ভাসানী সাহেবের মত দেখতে। মৌলানা ভাসানী যদি বিশ্ববিখ্যাত না হতেন তাহলে বলতাম—মানুষটাও এমনি ধরনের। শেখ আব্বাস করিৎকর্মা লোক—হিম্মৎওয়ালা আদমী। হজ ক'রে এসেছেন, নাম হয়েছে—হাজী আব্বাস।

পশ্চিমবঙ্গের লোক; দেশ ছেড়ে এখানে এসে শক্ত হয়ে চেপে বসে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে চাষ ছিল—জমি-সম্পত্তি ছিল। বেচেকিনে এখানে এসে ধান-চালের ব্যবসা করেছিলেন—তার সঙ্গে ইটখোলা। বাজারের শেষদিকে লম্বা একসারি ঘর তৈরী করিয়েছিলেন—ভাড়া খাটতো। খান বিশেক সাইকেল-রিকশা আছে – সেগুলি ভাড়ায় খাটে। আমাকে ঘরভাড়া দিয়েছিলেন ডেকে।

শহরে ঢুকবার মুখে গাছের তলায় বসেছিলাম আমরা। নাজমার ছেলেটা নতিয়ে পড়েছিল হঠাৎ—জ্বর তখন অনেকটা; বেহুঁশ ছেলে কোলে নিয়ে কাঁদছিল নাজমা। হাজীসাহেব ইটখোলা দেখে রিকশায় ফিরছিলেন। ছেলে কোলে নিয়ে নাজমাকে কাঁদতে

দেখে রিক্শা থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হয়েছে বাচ্চার ?

আমি ভয় পেয়েছিলাম।

নাজমা বলেছিল—আমার চান্দেরে বাচান। কি হয়েছে দেখেন।

হাজীসাহেব দেখেশুনে বলেছিলেন—সর্দির দোষটা খুব জোরালো মালুম হচ্ছে। জরও অনেকটা। কিন্তু তোমাদের বাড়ি কোথায় ? যাবে কোথায় ?

কৈফিয়ৎ যা দিয়েছিলাম তা অসত্য দিইনি। অসত্য বলবার কারণও কিছু ছিল না। সৎ-অসত্যের যেটুকু মামলা সে হল নাজমাকে নিয়ে। নাজমার ধর্ম নিয়ে।

হাজীসাহেব বলেছিলেন—আপনি বলছেন আপনি ক্রীশ্চান, তাই-ই হবেন। কিন্তু এই কালো মেয়েটা ?

পরক্ষণেই বলেছিলেন—থাক, ও যা—ও তাই। তবে আমি একটা কথা ওকে শুধিয়ে নেব।

নাজমাকে বলেছিলেন—ওগো মেয়ে, তোমার ছেলের তো অনেকটা জর। তুমি আমার বাড়ি যাবে ? তুমি তো মুসলমান, ও ক্রীশ্চান, আমি মুসলমান। দেখ যাবে ?

নাজমা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—না।

হাজী হেসে বলেছিলেন—তাহলে একখানা ঘর আমি দিচ্ছি—ভাড়া ক'রে কদিন থাকুন ; ছেলেটি সারুক তারপর যাবেন যেখানে যাবেন।

নাজমার খোকা চান্দের জর [illegible]। আমরা ঘরের মমতায় পড়লাম। হাজীসাহেবও বললেন—সেই ভালো ডেভিড সাহেব। এখনই আর কোথাও যেতে চেষ্টা ক'রো না। সারা পূর্বপাকিস্তানে এরা দোজখের আগুন জেলে দিয়েছে। ঢাকা চট্টগ্রাম কুমিল্লা নওয়াখালি শিলেট মৈমনসিংহ রংপুর রাজশাহী বরিশাল খুলনা যশোর সমস্ত শহরে শহরে পাকিস্তানী ফৌজ পৌঁছে গিয়েছে, বালবাচ্চা বুড়ো জওয়ান ছাওয়াল মেরে একাকার করেছে, মা মাসী বোন বেটীদের ইজ্জৎ ধুলোতে মিশিয়ে দিয়েছে দিনের আলোতে—

আমি বলেছিলাম—ঢাকায় সে-সব আমি নিজের চোখে দেখেছি। নাজমাও দেখেছে ওর নসীব আর খোদাতালার দোয়া সেরাত্রে ও লুকুবার জায়গা পেয়েছিল আর খা[illegible] সোলজাররা জায়গাটা খুঁজে পায়নি। তাই তো পালাচ্ছি।

—কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় ?

নাজমা বলেছিল, আমি বলিনি। বলেছিল—কোন গাঁওয়ে—কোন নদীর চ[illegible] কোন জঙ্গলের ধারে যেখানে দুখের ভাত সুখে-শান্তিতে খেতে পারে মানুষ, রাত্রে ঘুমো[illegible] ঘুমাতে পারে।

হাজী বলেছিলেন—তেমন কোন গাঁও তো আজ কোথাও নেই বেটী। আমার জা[illegible] নেই। হিন্দুস্থানে অনেক মানুষ যাচ্ছে। হাঁ—সেখানে পৌঁছালে এইসব শয়তানের সিপা[illegible] ধরজাদদের নাগালের বাইরে যাওয়া যাবে বটে—সেখানে মানুষেরা নাকি খুব যত্নের সা[illegible] জেকে নিচ্ছে বটে কিন্তু সেখানে যাওয়ারও অনেক মেহনৎ, অনেক তকলিফ, অনেক বি[illegible]

আবার সেখানে পৌঁছেও তো সেই তাঁবুর তলায় ভিজে মাটিতে গাছের তলায় লঙ্গরখানার খানা পেতে খেতে হবে। তার থেকে থাকো এখানে। আমরা বাঁচলে তোমরা বাঁচবে। আমার চার ছেলে, তারা আওয়ামী লীগের লোক। যতক্ষণ আমরা থাকব—ততক্ষণ তোমাদের ভয় নাই।

* * * *

শেখ আব্বাস হাজীসাহেব চিরকালের সেই বিচিত্র মানুষ—যাদের বৈচিত্র্য চিরকাল ধরে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও পুরানো হয় না ময়লা হয় না মলিন হয় না—দাম কমে না।

ইন্‌স্‌পেক্টর হেসে বললেন—Please, bare facts only!

—কেন? কি বেশী বলেছি বলুন?

ডেভিড আর্মস্ট্রং একটু উষ্ণ হয়ে উঠল।

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি বলুন।

—আমি সত্যিই বলছি। মিথ্যা ইমোশন সৃষ্টি করে আপনাদের প্রতারণা করতে চেষ্টা করলে, আপনারা নিশ্চয় ধরতে পারবেন এবং আমাকে শাস্তিও দেবেন। কিন্তু এই সত্যটুকু না বললে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন না।

হাজী শেখ আব্বাস দেশের পার্টিশনের সময় ওদেশে গিয়ে আজও আক্ষেপ করেন। মুরশিদাবাদে বাড়ি ছিল। হিন্দু বন্ধু ছিল অনেক। কিন্তু সে-সব কথা থাক। হয়তো বেশী হয়ে যাবে।

এখানে কৃতী লোক। এখানে এসেও এই ক'বছরের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ হয়েছেন। কতকগুলো ব্যবসা খুলেছেন এবং সব ব্যবসাগুলোর তিনিই হলেন প্রাণপুরুষ। সারা বাজারে হাজীসাহেবের উপকার পায়নি এমন লোক খুব কম। মানুষের অসুখে-বিসুখে বিপদে-আপদে এমন বন্ধু আর মেলে না। তাঁর কাষে-কারবারে ইটখোলায় রিকশার ব্যবসায়ে চাল কেনাবেচায় একশো দেড়শো লোক নিমক খেয়ে খাটে। অন্তভাবে ওঁর কাছ থেকে ক'রে খায় আরও অনেক লোক।

ছয় ছেলে হাজীসাহেব শেখ আব্বাসের।

শেখ আসাদুল্লা, আমানুল্লা, ইরফান, ইরসাদ, ইকবাল আর এবাদৎ। তিন মায়ের ছয় ছেলে।

আসাদুল্লা রাজশাহীতে উকীল।

আমানুল্লা ইস্কুল-মাস্টার।

ইরফান কলেজে পড়ে।

ইরসাদ ইকবাল বাপের সঙ্গে কারবারে খাটে। ওরা কলেজ পর্যন্ত পড়া ছেলে। আর এবাদৎ ইস্কুলে পড়ে। তরুণী কনিষ্ঠা পত্নীর সন্তান। এখানকার বাজারে মানুষের মিছিলের সামনে থেকে ঝাণ্ডা বয়ে বেড়ায়।

আসাদুল্লা এখানে আওয়ামী লীগ থেকে পাকিস্তানী নির্বাচনে জিতেছেন।

হাজীসাহেবের বাড়িতেই আওয়ামী লীগের আস্তানা। বাড়ির সামনেই প্রকাণ্ড উঁচু বাঁশের মাথায় বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ উড়ছে।

রোজ একবার ক'রে খোঁজ নিয়ে যেতেন হাজীসাহেব। সে যখন হোক। তাঁর সঙ্গে আরও ভালবাসা জমল ট্রান্‌সিস্টার নিয়ে। আমার ছোট ট্রান্‌সিস্টারটা দেখে হাজীসাহেবের ছেলেমানুষের মত লোভ হয়েছিল। ওটা আমি নিজে তৈরী করেছি শুনে আমার উপর তাঁর খুশীর আর শেষ ছিল না। তাঁর ছিল একটা দামী ব্যাটারী সেট। ভাল করে অ্যাডজাস্ট করতে পারতেন না। আমি অ্যাডজাস্ট করে লণ্ডন মস্কো শুনিয়ে দিয়েছিলাম।

হাজীসাহেব সেদিন বললেন—ডেভিড সাহেব, খারাপ খবর আছে। খান সিপাইরা ট্রাকভর্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। চাটগাঁ কুমিল্লা শীলেট রাজশাহী রংপুর—সব একেবারে পুড়িয়ে তোপের মুখে গোলা মেরে ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছে। যশোর খুলনা বরিশাল সব এক হাল। ইবার ছোট শহর হাটগঞ্জের পালা।

আমি রেডিয়োর খবর জানতাম। কলকাতা রেডিয়ো দুবেলা তিনবেলা বাংলা ইংরিজী হিন্দী খবরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের খবর দিয়ে যাচ্ছে।

হাজীসাহেব বললেন—ফরিদপুরের খবর আজ আইসাছে এই সকালবেলা। খবর ভারী খারাপ।

আমি ভয় পেয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি বলছেন হাজী সাহেব? সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাকে কিছু কইত্যাছেন নাকি?

হাজী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—না কইয়া আর উপায় নাই ডেভিড সাহেব। হাজী আব্বাসের জিন্দগীতে এমন কথা কখনও কইতে হয় নাই হে ডেভিড। তোমারে ঘরখানা ভাড়া দিবার সময় নিজে থিক্যা ডাইকা আইনা বইলাছিলাম—ডরভর কিছু কইরো না ভাই, তুমি এই ঘরে থাক। তোমার পোলাটার অসুখ শক্ত অসুখ—এ নিয়া পথে বেরাইলে বিপদ হবে। হাজী আব্বাস লোকজনেরে ডাইকা ঠাঁই দিয়া কখুনও কারে কয় নাই আর তোমারে ঠাঁই দিতে পারছি না।

আমি হাজীসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম—তাকিয়েই রইলাম। তিনি যে সঠিক কি বলছেন বুঝতে পারছিলাম না।

হাজীসাহেব এবার বললেন—খবর খারাপ ডেভিড সাহেব, রাজবাড়ী থেক্যা আমাদের লোক আইস্যাছে, খান পল্টন ফরিদপুর থেক্যা রাজবাড়ীর কাছ বরাবর আইসা গেছে। সঙ্গে আছে মিলওয়ালা জাফরউল্লা পাঞ্জাবী খানঘরের বাচ্চা। রাজবাড়ীর শহরে আড্ডা কইরা সব অঞ্চলটাকে দোজখ বানাইয়া দিছে। মুসলিম লীগের দালালগুলান—যারা এতদিন অন্তরে চুপ কইরা ছিল, শামুকের মতন খোলার মধ্যি নিজেরে গুটাইয়া ঢুকাইয়া মরার মত পড্যা ছিল, তারা ইবার শুঁড় বার কইরছে।

তারপরই ঘাড় নেড়ে বলেছেন—না, আবুতাহের শামুক নয়, কেঁচো নয়, বিছে-কাঁকড়াও নয় ডেভিড সাহেব—সে সাপ।

দিনের আলোয় মানুষের সাড়ায় বুড়ো কেউটে খরিসের মত গর্তের মধ্যে এই লোকটা চুপ মেরে গুটিয়ে পড়েছিল। মানুষের হাঁক ডাকে সাড়ায় সে গর্জাতেও সাহস করেনি। এবার রাত্রি নেমে এসেছে। এবার সে বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। এখন ফণা তুলে গর্জাতে শুরু করেছে। রাজবাড়ী কালুখালি পাংশা অঞ্চলে সে এক মস্ত নামের ফর্দ তৈরী করেছে। যারা নাকি আওয়ামী লীগের লোক। সেই ফর্দ অনুযায়ী এই অঞ্চলটার খান সিপাহীরা তাদের ট্রাকে চড়ে জীপে চড়ে নদীতে লঞ্চে চেপে এসে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে নেমে তাদের উৎখাত ক'রে দিয়ে যাবে। সে যা করছে, সে নাকি বড় ভয়ঙ্কর, বড় নিষ্ঠুর।

আমি বললাম—আমি দেখেছি। ঢাকায় প্রথম রাত্রি প্রথম দিন একটা অন্ধকূপে গর্তের মধ্যে ভয়ার্ত জন্তুর মত লুকিয়ে থেকে চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখেছি। গলা থেকে একটা ভয়ার্ত চীৎকারও বের হয়নি। ভয়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

হাজী বললেন—না, তার থিক্যাও গাঁয়ে তাদের জালিমি আরও ভয়ঙ্কর ডেভিড সাহেব।

গাঁয়ের বাড়িঘর তো টিনে-ছাওয়া ঘর; কারুর বা খড়-ছনের চাল। গোলা মেরে ভাঙতে হয় না। মিলিটারি ট্রাক গ্রামে এসে ঢোকে—সাধারণ গরীব মানুষেরা তাদের ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকে। আমাদের মত যারা লড়াই দেবার জন্যে কসম খেয়েছে—আল্লার নাম নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা হয়তো সরে যায়। আড়ালে যায়। আর যারা বেইমান, যারা সাপ, যারা শয়তান তারা পাকিস্তানী ঝাণ্ডা উড়িয়ে বেরিয়ে গিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ আওয়াজ তুলে খান সিপাহীদের সালাম বাজিয়ে নামতে বলে। সিপাহীদের সব প্রথমে দেখিয়ে দেয় তারা বাংলাদেশের তরফের লোকেদের বাড়ি, তারপর আরম্ভ হয় শয়তানী খেল। লুঠ করে যথাসর্বস্ব—ঘরে টেনে বের করে আনে মেয়েছেলে বালবাচ্চা কানাখোঁড়া বুড়োবুড়ী সব।

—তারপর?

—হায় আল্লা—হায় খোদা। কি বলব তোমাকে ডেভিড সাহেব, মা-বাপের সামনে বেটীর উপর, স্বামীর সামনে স্ত্রীর উপর, ছেলের সামনে মায়ের উপর সে অত্যাচার—

—ঢাকাতে এ-ও চোখে দেখেছি হাজীসাহেব।

—দেখেছ? দেখবে বৈকি ডেভিড, শয়তানের শয়তানীর রকম হয়তো অনেক রকম, কিন্তু সেই অনেক রকমই তো সর্বত্র ঘটবে—সেই অনেক রকমই যে তার জুলুম, জালিমিরই একরকম। যাবার সময় ঘরগুলো আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। রেখে যাচ্ছে এক-একটা সিপাহীরা থানা। আমাদের এ চাকলাটার থানা বসেছে রাজবাড়ীতে। রাজবাড়ীর লাগোয়া জাফর রাইস মিলে হবে তার আসল হেড-কোয়ার্টার। শয়তান জাফর খাঁ ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ফরিদপুর। শুনেছি সে ফিরে এসেছে সিপাহীদের সঙ্গে। জাফর খাঁয়ের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া পুরনো ঝগড়া। সে এবার আমাদের উপর শোধ নেবে, ছাড়বে না।

হাজীসাহেব সবশেষে বললেন—তোমাকে আমি ডেকে আশ্রয় দিয়েছি। তোমাকেই

সব থেকে আগে বলতে এসেছি ডেভিড সাহেব—তুমি তাই ভেবে ঠিক করে নাও কি করবে।

আমি ভাবছিলাম—কি করব ?

হাজীই বললেন—পালাতে চাও তো এখনও সময় আছে, তোমরা চলে যাও।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় পালাব ?

—কোথায় পালাবে ? দেখ, তুমি ক্রীশ্চান—তুমি আধা সাদা মানুষ। তোমার তো কোন ভয়ের কথা নয়। তুমি নিজের পরিচয় দিলেই তোমাকে ছেড়ে দেবে। বড় জোর ধরে রাখবে কি ঢাকা-টাকা কোথাও পাঠিয়ে দেবে। মারতে তোমাকে পারে না এমন বলছি না। দুনিয়াতে মানুষ যখন জানোয়ার হয়ে হাতিয়ারের দাঁত-নখ নিয়ে খুনখারাপী খেলায় মাতে তখন কোন কানুনের ধার সে ধারে না। তবু তোমার একটা খুঁটি আছে ধরে দাঁড়াবার। তবে ওই কালো মেয়েটাকে তোমার সঙ্গে দেখলে—তোমারও বাঁচোয়া থাকবে না, ওরও না। তুমি ক্রীশ্চান ও মুসলমান—এইটাই হবে বড় গুনাহ্। প্রমাণও নেবে না তোমার সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ—তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে—তারপর—

সমস্ত দীনদুনিয়া যেন চোখের সামনে মুছে যেতে লাগল। মনে হল অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সব। আমার নিজের জন্যে ঠিক নয়। এই নাজমার জন্যে। নাজমা আমাকে এমন করে জড়িয়ে ধরেছে এই কয়েকটা দিনের মধ্যে যে ওকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবলে সারা দেহমন একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করে। সারা বুকটা উদ্বেগে আশঙ্কায় দুঃখে টনটন করে ওঠে।

আমরা ঘরের মধ্যে বসে কথা বলছিলাম। বাইরে দাওয়ার উপর হাজীসাহেবের চারজন লোক বসে আছে। একটা সাইকেল-রিকশা খাড়া আছে, একজন সাইকেল-চড়া ছেলে অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি এদিকে। আবার ভিতর দিকে দাওয়ার উপর বসে নাজমা ভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—তার সে কান্নাও শুনতে পাচ্ছি।

হাজীসাহেব বললেন—একটা পথ আছে ডেভিড সাহেব—

বললাম—বলুন—

উনি বললেন—আমরা আমাদের মেয়েছেলেদের সরিয়ে দেব এখান থেকে। কেবল পুরুষেরা থাকব—আমরা লড়াই দেব। মরতে আমাদের অনেককে হবে। মরব। তুমি চাও তো তুমি আমাদের সঙ্গে থেকে লড়াই কর। নাজমাকে আমাদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পার—ও তাদের সঙ্গে থাকবে।

আমি বলেছিলাম—আমি একবার ওকে জিজ্ঞাসা করি।

হাজী বলেছিলেন—শোন, আমাদের এই যে শেখ বংশ, এদের গোড়াকার কথাটা বলি শোন। নাজমাকে বলো। আমাদের বাড়ি বহুকাল ধরে মুর্শিদাবাদের উত্তরে—লালগোলা ভগবানগোলার ওদিকে। তখনও আমরা শেখ নই। আমরা—যতদূর জানি ডেভিড, আমরা তখন কায়স্থ ছিলাম জাতে। মস্তবড় গৃহস্থ। তখন মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সুবাদার। আমার সাত-আট পুরুষ আগে—আমার পূর্বপুরুষেরা তখন দুই

ভাই। বড় ভাই নবাব দরবারে মোক্তারি করত। দেশের জমিদার রাজাদের কাজ করত মোক্তার উকিলেরা, এ হল তাই। নবাব দরবারের উজীরনাজির পেশকার থেকে কানুনগো-আমীন-গোমস্তাদের সঙ্গে আলাপ রাখত। তাদের টাকাকড়ি দিয়ে কাজ উদ্ধার করে নিত। নিজেরা জমিদারদের কাছে কাজ হিসেবে ঠিকে করে কাজ নিত। সেই টাকার কিছু দিত নবাবী আমলাফয়লাদের—কিছু দিত জমিদারদের কর্মচারীদের—আর বাকিটা থাকত তার নিজের। রোজগার তার ভালই ছিল, দেশেও খাতির ছিল; কোঁটা তিলক কাটত, মালাজপ করত। আর শুনি—কোন্ লোকের কোন্ ভাল জমিটি নিতে হবে ফাঁকি দিয়ে—সেই কথা ভাবত মালা জপতে জপতে।

ছোট ভাই ছিল আলাদা রকমের মানুষ। বাবরি চুল ছিল—লম্বা-চওড়া পুরুষ পুরুষ ছিল—ধর্মেকর্মে মতি ছিল না, লেখাপড়াও ভাল শেখেনি, শখ ছিল লাঠি তলোয়ার খেলায়—কুস্তিতে সাঁতারে। সব থেকে বেশী শখ ছিল সাঁতারে আর নৌকো ছিপ নিয়ে বাইচ খেলায়। নিজের নৌকো ছিল ছিপ ছিল। আর শখ ছিল চাষের বলদে—ঘোড়ায়—আর দুধালো ভঁইষায়।

মেলামেশাতেও রুচি ছিল আলাদা।

মেলামেশা ছিল এক নৌকোওয়ালা সর্দারের সঙ্গে। কাছেই ছিল নৌকোওয়ালা মাল্লাদের একখানা গাঁও। এরা রাজমহল থেকে ভগবানগোলা লালগোলা মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত নৌকো বাইত। ভাড়া খাটত। এরা খুব দুর্ধর্ষ। নৌকো বাইচ নিয়ে এদের সর্দারের সঙ্গে আলাপ ছিল খুব জমাট। এরা চাষীও ছিল খুব ভালো। তবে ধর্মে ছিল এরা মুসলমান। ছোট ভাই এদের সর্দারের সঙ্গে ঢোলক কাঁসী বাজিয়ে গানের আসর বসাতো নৌকোয় আর গাঙের বুকে ঘুরত। লোকে মন্দ বলত কিন্তু যে শোনে না শুনবে না তাকে শোনায় কে? বড় ভাইয়ের সঙ্গে ভাত আলাদা—ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী—তার কথা বলবারই বা এখতিয়ার কি? বড় ভাই ভয়ও করত ছোটকে। তার উপর সোনার সঙ্গে সোহাগার পানের মত তার পরিবারটিও ছিল ওই আশ্চর্য মেজাজের। ছেলেপুলের মা। ধর্ম-অধর্ম মানত না। স্বামীর কথাই ছিল কোরান-হদিস।

এই সর্দার নৌকোওলা হঠাৎ মারা গেল। গাঙের দহেই ডুব দিয়েছিল কি একটা পড়ে-যাওয়া জিনিস তুলতে, উঠবার সময় বড় একটা মাছের চুঁ লেগেছিল বুকে। তাইতেই মারা যায়। মরবার সময় একবার জ্ঞান হয়েছিল—সেই সময় বলেছিল—আমার শেরিনা বেটিকে তুমি দেখো।

শেরিনা সর্দারের একমাত্র বেটি। মা-মরা মেয়ে। আরও দুটো বিবি তার ছিল—কিন্তু তাদের পোলাপান কেউ ছিল না। এই শেরিনাকে নিয়ে দুই বিবি চেষ্টা করছিল আপনাপন বাপের গোষ্ঠীর কারুর সঙ্গে বিয়ে দিতে। তারা যাই হোক, সর্দার তাদের 'পছন্দ' করত না। তারে নিয়ে যখন দুই বিবি আর গাঁয়ের লোক ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে—তখন এই কায়স্থবাবু একদিন এসে শেরিনাকে নিয়ে চলে গেল নিজের বাড়ি। একটা দাঙ্গা হয়ে

গিয়েছিল—পাঞ্জায় লাশ ফেলে দিয়েছিল আমার পূর্বপুরুষ। এদিকে সর্দারের গ্রামে রটল—শেরিনাকে লুঠ করে নিয়ে গেছে রক্ষিতা করে রাখবে। ওদিকে তার নিজের গ্রামে লোকেরা, কথাটা লুফে নিয়ে বললে—তোমার জাত গেল।

কথাটা লুফে ধরে নিয়েছিল সেই মোক্তারসাহেব—ফোঁটা-তিলকধারী বড় দাদা।

ছোট কর্তা বললে—কুছ পরোয়া নেহি বাবা। যো হি আল্লা ও হি ভগবান। যো সত্যনারায়ণ ও হি সত্যপীর। ধরম মানুষের এক—দিলকো সাচ্চা রাখনা। রাম রহিম না জুদা করো ভাই দিলকো সাচ্চা রাখো জী। সর্দার ছিল দোস্ত, ওর বেটি আমারও বেটির মত। আমার দিল ঝুটা নেহি। সাচ্চা আদমী আমি। ওকে রক্ষিতা রাখব আমি? আরো বাবা রাম কহো—লা-ইলাহি-ইল্লালা। দুনিয়ার বেইমানদের তুমি সাজা দিয়ো।

বলে সে চলে এসেছিল গ্রাম থেকে। ভগবানগোলায় ছিল ওর একটা চাষবাড়ি। সেইখানে বাস করছিল—মুসলমানও হয়ে গিয়েছিল।

সর্দারের মেয়ের সাদী দিয়েছিল—খুব ভাল পাত্রে খুব ভাল ঘরে।

ডেভিড সাহেব—এই যে মাল্লা সর্দারের বেটি—যার ভার নিয়ে আমার পূর্বপুরুষ জাত দিয়েছিল এই মাল্লা সর্দারকে, নিজের জাত দিয়েছে তবু তাকে ফেলে দেয়নি।

* * *

হাজীসাহেবের এই কাহিনী আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

হাজীসাহেব বললেন—নাজমা বেটিকে তুমি আমার বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে দিতে পার। আব্বাস হাজী যে বংশের ছেলে—সে বংশে জাত আর বাত এক কথা।

বলেই হাজীসাহেব উঠলেন। বেরিয়ে চলে গেলেন।

আমি নাজমাকে বললাম—নাজমা, হাজীসাহেব ভাল কথা বলেছেন—তুমি ওঁদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে যাও।

নাজমা আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে হা-হা করে কেঁদে উঠল। বললে—না-না-না বড় ভাই, তাইলে আমি মরে যাব মরে যাব। তার ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার সে কান্নার আর যেন শেষ ছিল না। বাইরে চারিদিকে শোরগোল উঠেছে। বাইসিক্লে চড়ে লোকজন প্রচণ্ডবেগে ছুটেছে। বাইসিক্লের ঘণ্টার মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যস্ততা এবং আতঙ্ক যেন ফুটে উঠছে।

নাজমার সামনে আমি নির্বাক হয়ে বসে ভাবছিলাম—কি হবে? কি করব?

কতক্ষণ পর তা ঠিক জানি না। তবে অনেকক্ষণ পর। হঠাৎ আবার হাজী সাহেবের গলা শুনলাম।—ডেভিড। ডেভিড।

বেরিয়ে এলাম।—কি বলছেন?

—কি বলব? কি ঠিক করলে? এদিকে দু'পহর গড়িয়ে গেছে। ভাবছি রাত্রির কথা। রাত্রিতে যদি শয়তানের সিপাহীরা আসে তা হলে মহা বিপদ হবে। ঘুমিয়ে থাকবে

মানুষ, বাঁচবার জন্যে উঠে দাঁড়াবার সময় পাবে না, কিছু কিছু লোক সন্ধ্যের আগেই বেরিয়ে যাবে গ্রাম থেকে বাজার থেকে। আমাদের মেয়েদের পাঠাব রাত একপ্রহর হলেই। নাজমা যাবে? বল?

—আমি বললাম—নাজমা যাবে না হাজীসাহেব। ও কেবলই বলছে—ও মরে যাবে—ও মরে যাবে। আমাকে ছেড়ে ও যাবে না।

—কিন্তু করবে কি?

—ভাবছি—

—ভাববার সময় খুব নেই ডেভিড। আজ রাত্রি কিংবা কাল বেলা একপ্রহর পর্যন্ত এখানে এসে পড়বে খান সিপাহীরা, সে খবর আমি পেয়েছি—তাতে কোন ভুল নেই। আর আমার উপর তাদের কঠিন আক্রোশ। লীগওয়ালা আবু তাহের—সে আমার জ্ঞাতি, জ্ঞাতির চেয়ে বড় দুশমন কেউ হতে পারে না ডেভিড।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন আবার—আবু তাহের আসবে, তার সঙ্গে আসবে সেই পাঞ্জাবী মিলওয়ালা জাফর। সে যে কি ভীষণ না দেখলে কেউ বোঝাতে পারবে না না মুখের কথায়।

একটু থেমে থেকে আবার বললেন—আমাদের মেয়েদের দলের সঙ্গে তোমাকে যেতে দিতে কেউ মত করবে না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আছে ডেভিড।

বলেই বললেন—ভাল মনে পড়েছে। তুমি নাজমাকে নিয়ে বিপদে পড়বে। গ্রাম অঞ্চলে তোমার ওই চোখ ওই গায়ের রং দেখে পাঞ্জাবী মনে করবে। খান সিপাহীরা এই কালো মেয়েকে দেখে ওকে হয়তো—

—ওকে বাঁচানো মুশকিল হবে ডেভিড। এদেশের মেয়েদের উপর এদের যত লালসা তত ঘেন্না। তুমি শুনেছ রেডিয়োতে—চট্টগ্রামে একজন খান সিপাহীদের কর্নেল সাহেব কি বলেছে? একজন ইউরোপীয়ানকে বলেছে—এদেশটার এই বিপ্লব দমনের নামে পুরুষগুলোকে মেরে ফেলা হবে—তখনই হবে সুখের জিন্দগী। এদেশের বেওয়া ছোকরীদের আমরা বাঁদী করে রাখব। আমাদের উপপত্নী হবে এরা।—একটু জল আন তো ডেভিড। একটু জল।

মুখে চোখে মাথায় জল দিলেন হাজীসাহেব। তারপর বললেন—শোন ডেভিড, আজই মৌলভী সাহেবকে ডেকে নাজমার সঙ্গে তোমার সাদী একটা দিয়ে দিতে চাই। না-হলে তুমি নাজমাকে বাঁচাতে পারবে না। বেটি বললে কেড়ে নেবে—বোন বললেও নেবে, হয়তো মা বললেও নেবে। এক তোমার স্ত্রী বলে তুমি ওকে বুকে জাপ্টে ধরে রাখতে পারবে।

* * * *

হাজীসাহেব আশ্চর্য মানুষ। সেইদিনই মৌলবী ডাকিয়ে আমায় কলমা পড়িয়ে নাজমার সঙ্গে আমার বিয়ের কাজ সেরে দিতে চেয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, তোমাকে আমাদের দলের সঙ্গে পাঠাতে পারছি না—এটাতে আমার দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু কি

করব ?

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।"

তখন রাত্রি হয়েছে ; গ্রাম থেকে সরে যাওয়ার পালা শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের চারিপাশে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আওয়ামী লীগের ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা গেঞ্জি, কোমরে গামছা বাঁধা—হাতে বল্লম বা শড়কী বা লাঠি। কারুর কোমরে দা-ও গোঁজা।

শুনলাম এ পাহারা চলে গেছে মাঠের মধ্য দিয়ে বড় রাস্তার ধার পর্যন্ত ; এদিকে নদীর ঘাট পর্যন্ত। খান সিপাহীদের কোন সন্ধান পেলেই—বাঁশীর ইশারা ছুটে আসবে বাতাসে বাতাসে গ্রাম পর্যন্ত। গ্রামের মধ্যে যারা সন্দেহভাজন তাদের বাড়ির চারিদিকে পাহারা পড়ছে। তারা যেন বের হাতে না পারে। নিরাপদ যেদিকটা - সেদিক দিয়ে গরুর গাড়ি চলছে দু-চারখানা—অধিকাংশই চলেছে পায়ে হেঁটে। কোমরে মাথায় বোঁচকা পুঁটলি নিয়ে চলছে মেয়েরা—পুরুষেরা কাঁধে বাঁক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কতকগুলো সাইকেলরিকশা যাচ্ছে আর আসছে খানিকটা দূর অবধি রাস্তায় লোকজনদের নিয়ে—মাঠের পায়েহাঁটা পথের মুখে নামিয়ে দিয়ে আসছে।

হাজীসাহেব বসে আছেন নিজের দাওয়াতে। সামনে লম্বা বাঁশটার মাথায় তখনও আওয়ামী লীগের বাংলাদেশের ঝাণ্ডা উড়ছে। হাজীসাহেবের পাশে বসে আছে মেজ ছেলে আমানুল্লা। এই সন্ধ্যেতে এসে পৌঁচেছে রাজশাহী থেকে। রাজশাহী কলেজ-ইস্কুল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রায়। যা ঢাকায় ঘটেছে—তাই ঘটেছে এখানেও। কলেজে পড়ত হাজীসাহেবের ছেলে ইরফান—সে নেই। গুলি খেয়ে মারা গিয়েছে। বড় ছেলে আসানুল্লা—উকীল এবং আওয়ামী লীগের সভ্য হিসেবে এবার নির্বাচনে জিতেছে তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে—কিন্তু বেঁচে আছে কি নেই তার কোন স্থিরতা নেই। মেজ ছেলে আমানুল্লা ইস্কুলমাস্টারী করত, সে কোনরকমে পালিয়ে এসেছে। নৌকোয়—পায়ে হেঁটে—খানিকটা বাসে—কোনরকমে এই সন্ধ্যেতে এসে পৌঁচেছে।

সে বলছিল—হাজীসাহেব শুনছিলেন।

—রাজশাহীর ই পি আর-এর সিপাইরা নিজের বন্দুক নিয়ে পালিয়ে বাংলাদেশের খাতায় নাম লিখিয়েছে। একজন বড় পুলিস অফিসারকে গুলি করে মেরেছে পাক সিপাইরা।

হাজীসাহেব বললেন—ইরফান গুলি খেয়ে মরল—মরণের সময় কেউ তোরা কাছে ছিলি ?

আমানুল্লা কথা বলতে পারলে না।

হাজী বললেন—না। দুখ আমার নেই। আমি মুসলমান—খোদার নাম নিয়া সব দিব বলে—বাঙালী আমি, বাংলাদেশের জন্তে লড়াইয়ে নেমেছি—সব দিব বলেছি। দুখ আমার নেই। আটপুরুষ আগে আমরা হিন্দু ছিলাম—ভাইদের ভগ্‌দের দুশমনিতে জাত হারাইয়াছিলাম। পুতিজ করেছিল। আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম, এসেছিলাম

ভগবানগোলায়। পলাশীতে যে লড়াইয়ে নবাব সিরাজুদ্দৌলার হার হল—সে লড়াইয়ে সিপাহসালার মীরজাফর বেইমানি করে লড়াই বন্ধ করে কোম্পানিকে জিতিয়ে দিলে—নবাবী সিপাহীরা গুলি খেয়ে মরল গোলা খেয়ে মরল। তাতে মোহনলাল মীরমদন মরেছিল—তার সঙ্গে আমাদের বংশের শেখ মনজুর হোসেন সাহেব জান দিয়েছিলেন; তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর বিশবছর বয়সের নওজোয়ান ছেলে মমতাজ হোসেন। সেও মরেছিল। ছেলে যখন মরে—তখন পাশে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাপ তলোয়ার হাতে লড়ছে এক ফিরিঙ্গীর সঙ্গে। ছেলে তাকে ডেকে বলেছিল—বাপজান—আমি যাচ্ছি।

বাপ বলেছিল—বেহেস্তে যাবে। ভয় করো না।

বলতে বলতে একটা গুলি এসে বিঁধেছিল তার বুকে।

আমি ভাবছিলাম আমি এবার উঠব। উঠব এবং রওনা হব, রওনা হব কোন নিরুদ্দেশ উদ্দেশে। বনে-জঙ্গলে কিংবা কোনো নদীর চরে, ময়মনসিং জেলার ওদিকে গেলে পাহাড় আছে, বরিশাল-খুলনার দিকে গেলে সুন্দরবন আছে। সেইখানে কোন নির্জনে এই নাজমা মেয়েটাকে একটা কুটীর গড়ে দিয়ে বলব—তোর চান্দাকে নিয়ে তুই এখানেই থাক নাজমা; আল্লা তোকে তোর ছাওয়ালকে দয়া করুন। তুই যখন বলবি বড়ভাই তুমি এবার যাও, তখন আমি চলে যাব।

ডেভিড আর্মস্ট্রং ভারতীয় পুলিস অফিসারটির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে নিলে। তারপর বললে—

সে-রাত্রির অন্ধকার সে এক আশ্চর্য অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে! সে-অন্ধকার যেন সাধারণ রাত্রির অন্ধকার নয়, সে অন্ধকার সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে নেমেছে আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে কেটে যাবে—শেষ হবে। মনে হচ্ছিল এ অন্ধকার যেন কোনদিন পোয়াবে না।

আধাগ্রাম আধাশহরটা সেই অন্ধকারে ভয়ে যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল— আতঙ্কে যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে—লাঠি শড়কী রামদাও কয়েকটা—তা বোধহয় পনেরটা হবে, বন্দুক নিয়ে একদল অল্পবয়সী জওয়ান ঘোরাফেরা করছে—পাহারা দিচ্ছে। বাকী লোকেরা ভয়-পাওয়া লোক। তারা গায়ে ঘেঁষে এ ওর কাপড় কি হাত ধরে চলেছে নিঃশব্দে। রাত্রিটা ছিল অন্ধকার, আকাশে ছিল মেঘ। আলো জ্বালা ছিল বারণ। ওই অন্ধকারের মধ্যে দল বেঁধে মানুষজনদের নিঃশব্দ চলার সেই কালো কালো চলন্ত ছবিগুলি কেমন যেন মনকে ভয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

মসজিদের সামনে চাতালে হাজীসাহেব বসেছিলেন। তাঁরই কাছে আমি বসেছিলাম। নাজমাও ছিল তার ছেলেকে নিয়ে। হাজীসাহেব চেয়েছিলেন আমার সঙ্গে নাজমার একটা বিয়ে গোছের কিছু ঘটিয়ে দিতে। নাজমা শুনে আমার দিকে বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছিল। বুকে চেপে ধরেছিল তার বাচ্চাটাকে—চাঁদকে। আমি লজ্জিত হয়েছিলাম। ঠিক এইটে যেন সে বরদাস্ত করতে পারছিল না। হাজীসাহেবকে বলেছিলাম—হাজীসাহেব; আপনি আমার কাছে হজরত-তুল্য লোক। আপনি আমাকে ওই হুকুম

করবেন না। নাজমা আমার কাছে নাজমা। বহেন বলেন বহেন, বেটি বলেন বেটি, মা বলেন মা—যা বলেন তাই। ওকে ওর ছেলেকে কোন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আমি খালাস হব।

হাজী বলেছিলেন—আমি তোমার বাপের বয়সী কি তার থেকেও বড় ডেভিড। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি। তোমার ভালো হোক বেটা। তবে তোমার নসীব আর খোদার মর্জি।

নাজমা সেই তখন থেকেই এসে বসে আছে আমারই ঠিক পিছনে আমার জামার খুঁট ধরে। চাঁদ তার কোলে ঘুমুচ্ছে। সে ঢুলছে।

হাজীসাহেব এরই মধ্যে বলছিলেন—কোন্ কালের গল্প। কলেজে পড়া ছেলে ইরফান গুলি খেয়ে মারা গেছে, বড় ছেলে রাজশাহীর উকীল আসাদুল্লা—সে ধরা পড়েছে। পাকিস্তানী খান সিপাহীর দল তাকে অ্যারেস্ট করেছে, তাকে ধরিয়ে দিয়েছে জমায়েৎ-ইসলামের কে এক আখতার হোসেন। কথা শুনেই হাজী বললেন—আমি মুসলমান—খোদার নাম নিয়া সব দিব বলে লড়াইয়ে নেমেছি। দুখ আমি করব না।

বলতে বলতে মনে পড়েছিল তাঁর বংশের পুরনো কথা। এমন মনে পড়ে। অতীত গৌরব তো ভোলা যায় না। মনে পড়েছিল—সেই দুশো চব্বিশ বছর আগের পলাশীর যুদ্ধে তাঁর পূর্বপুরুষ মনজুর হোসেন আর তাঁর ছেলে মমতাজ হোসেনের প্রাণ দেওয়ার কথা। লড়েছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার তরফে। দ্বিতীয় ছেলে আমানুল্লা সে বাপের কাছে বসেছিল, অনেকটা কেমন যেন পাথর-হয়ে-যাওয়া ঠিক নয়, পাথর হয়ে যাচ্ছে এমন মানুষের মত। মানুষটা কাঠ হয়ে বসেছিল—শুধু ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল বলেই একেবারে পাথর হয়ে গেছে বলছি না।

আমানুল্লা বাপকে বাধা দিয়ে বললে—বাবা!

হাজীসাহেব বললেন—কি?

আমানুল্লা বললে—ওসব কথা থাক্ বাবা।

—কেন রে? শুনে মনে জোর পাস না? কর্তাদের কথা?

আমানুল্লা বলে উঠল—রাজশাহীর জামাতে ইসলামের পাণ্ডাও তো শুনি আমাদের চাচাটাচা কি হন। আখতার হোসেন সাহেব।

—চাচা হয় আমানুল্লা—, আখতার আমার ভাই—আখতারের দাদো আর আমার দাদো এক বাপের ছাওয়াল—মা ভিন্ন। আমার দাদোর মা এদেশের বেটি। আর আখতারের দাদোর মা হল আগ্রা শহরের এক পড়ন্ত খান সাহেবের বেটি। ফরক তো খুব বেশী নয়; আমার দাদো আর আখতারের দাদো একসঙ্গে এক উঠানে খেলা করত। তফাত আখতারের সঙ্গে আমার দু'পুরুষের।

—সেই আখতার হোসেন সাহেবই দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছে। রাজশাহী প্রথমেই এসেছিল আমাদের কাবেজে। তখন আমাদের একদল, আমরা বলেছিলাম—লীগ আর

ঘাঘাতে ইসলামের দুশমনদের খতম করে দাও। ওদের রেখো না। কেউ শুনলে না আমাদের কথা। সবাই ভাবলে—ইয়াহিয়া টিক্কা খাঁ ক'দিনের মধ্যে ভেঙে মিটমাট করবে। এখন! এখানে আপনারা তাহের মিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাহের মিয়া আপনাদের বাঁচতে দেবে না।

হাজী বললেন—ইরফান গুলি খেয়েছে। আসাদুল্লাকে গ্রেপ্তার করে প্রাণে রেখেছে, না—বল আমিন ঠিক ক'রে বল। আমার মনে লাগে কথাটা তুই বলতে পারছিস না।

চীৎকার করে উঠল আমানুল্লা—হাঁ—হাঁ—হাঁ—তুমি যারে ভাই কও। বল আমাদের চাচা হয়—সেই তারে মারাইছে। চোখে দেখেছে যে লোক সেই আমারে বলে গেছে।

—আসান নাই?

—না। নাই। বন্দুকের গুলি মেরে শেষ হয় নাই, বেয়নেট দিয়া খুঁচ্যা খুঁচ্যা মারছে। বড়দাদা নাই।

—চুপ দে আমিন। অরে তদের মা অখনই শুনবে। শুনলি পর সি কাঁদলে—কালুখালির ঘাটমাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে রে। চুপ দে বাপ। চুপ দে।

Mr. Officer—জীবনে এত বড় দুঃখ আর এমন জগৎ-জোড়া থমথমে অন্ধকার আমি দেখিনি। এর আগেও বটে এর পরেও বটে একলা রাত্রি জেগে বসে থেকেছি। আমার স্ত্রী ছায়ার মৃত্যুর পর দু'বছর প্রায় সে উদাসী বিবাগী হয়ে ঘুরেছি। পায়ে হেঁটে নৌকোয় তখন কত রাত্রি একলা জেগে বসে কাটিয়েছি, এরপরও এই ক'দিনের মধ্যে নাজমাকে নিয়ে গাছতলায় পথের ধারে কোন গ্রামের মসজিদের চাতালে—কোন ভাঙা পোড়াবাড়িতে কোন ইস্কুলঘরের দাওয়ায় কাটিয়েছি রাত্রি। নাজমা ঘুমিয়েছে আমি জেগে থেকেছি। আকাশে মেঘ উঠেছে, বিদ্যুৎ চমকেছে, বাতাস দিয়েছে, আমি বসে কাটিয়েছি। কিন্তু মনে বুকে এত দুঃখ কখনও অনুভব করিনি—রাত্রিকে এত দীর্ঘ কোনদিন মনে হয়নি।

হাজীসাহেব আমাকে বলেছিলেন—ভোরবেলা তোমাকে আমি পথ ধরিয়ে দেব। তুমি ঘুমিয়ে নাও।

কিন্তু ঘুম আমার আসেনি। দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে থেকে তখন অন্ধকারের মধ্যেও চোখে বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখছিলাম ওই বৃদ্ধকে। বৃদ্ধ প্রায় আপনমনেই কথা বলে যাচ্ছিলেন। বলছিলেন অবশ্য আমানুল্লাকে। কিছুক্ষণ পর পর ইরসাদ ইকবালও এসে বসেছিল। আর ছিলাম আমি আর নাজমা। নাজমা ঘুমোচ্ছিল।

হাজী বলছিলেন—আখতার ধরিয়ে দিয়েছে আসানকে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গুলি করিয়েছে বলছিস—তা বোধহয় ওর তাই করারই কথা রে। সেই দাদোদের আমল থেকে এই আক্রোশ। আমাদের দাদোর বাবার নাম মহম্মদ ওসমান সাহেব। আমার দাদোর মাকে সাদী করেছিলেন—তিনি ছিলেন এই দেশের মেয়ে, মস্ত বড় জোতদার ছিলেন

যেন অনেক কয়েক মিনিট দীর্ঘ মনে হল। তবুও তাকে প্রশ্ন কেউ করলেন না—তারপর ?

জজসাহেবও স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—তাঁর হাতে পেনসিল ছিল একটা, অকস্মাৎ সেটা হাত থেকে খসে টেবিলের উপর এবং টেবিল থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সেই শব্দে সজাগ হয়ে উঠল ছেলেটি। বললে—হুজুর, একদিন মায়ের বাক্স খুললাম। মায়ের জিনিসপত্র ছিল না কিন্তু ট্রাঙ্ক ছিল তিনটে। যত বাজে ভাঙা ফুটো জিনিস ভর্তি থাকত। একটা বাক্সের দরকার ছিল। বোমা তৈরি করেছিলাম—সেগুলো নিয়ে যাবার জন্যে বড় বাক্সেরই দরকার ছিল। খড ন্যাকড়া নিচে দিয়ে আরও খড ন্যাকডা দিয়ে প্যাক করে তার ওপর থানকতক কাপড বই দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায নিযে যাবে। বড একটা হাঙ্গামা আছে। দলে দলে হাঙ্গামা হুজুর। বাজারে বাক্স কেনার হাঙ্গামা ছিল। তাই বাড়ির বাক্স একটা খালি করে নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম। আমার মা সে-দিন—।

—সন্ধ্যের পর। মা বাড়ি ছিল না। একটা বাক্স খালি করে ফেললাম। হুজুর, তার মধ্যে পুরনো ছেঁড়া একটা গরম কোট ছিল। কতকগুলো কাগজ ছিল। একটা সিগারেটের কেস ছিল। পুরনো রুমাল ছিল। হুজুব, সব শেষে ছিল—একখানা ফটো। অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

হুজুর, আলোতে ছবিখানা দেখলাম, দেখে আমি চমকে উঠলাম। এ কে ? এ কে ? চেয়ারে বসে ? আর পাশে দাঁড়িযে ?

চিনতে পারলাম হুজুর।

মাকে চিনলাম আগে। বিয়ের কনে আমার মা। মাথায় মুকুট গায়ে গযনা পরনে দামী শাড়ি। তারপর চিনতে বাকী রইল না চেযারে যে বসে তাকে। সে আমার বাবা প্রণব কুমার চক্রবর্তী। দেখলাম হুজুব—অবিকল আমি।

আমার সব ভুল হয়ে গেল। আমি ভুলে গেলাম আমাকে ট্রাঙ্ক নিয়ে যেতে হবে। আমি ভুলে গেলাম। ছবিটা নিয়েই বসে রইলাম আলোব সামনে। কালীপড়া একটা লণ্ঠন। তারই আলোতে অবাক হয়ে দেখলাম। আমি শুনেছিলাম—দিদিমা মাঝে মাঝে বলত—আমি বাবার মত দেখতে। মা আমাকে দেখে হয় মুখ ফিরিয়ে নিত নয় বিরক্ত হত—তার চিহ্ন ফুটত তার মুখে। আমি এ ছবি কখনও দেখি নি। বাবা যখন মারা যায় তখন আমি এক বছরেরও নই। সেদিন এই ছবি দেখে আমার যে কি হল তা বলতে পারব না। মনে হল আমি যেন রাজা হয়ে গিয়েছি। মনে হল ছবিখানা নিয়ে সারা হাওড়ার পথে পথে দেখিয়ে আসি—চীৎকার করে বলে আসি—দেখ আমার বাবার ছবি দেখ।

দলের লোক ডাকতে এল—তাকে ট্রাঙ্কটা দিয়ে দিলাম—আমি গেলাম না। বললাম—যাব না আজ। আমাকে ডাকিস নে। খুনোখুনি হয়ে যাবে। পালা। সে চলে গেল। আমি ক্যাপার মত ঘরে ঘুরতে লাগলাম। ঠিক এই সময় এল আমার মা।

মাকে আমি রাক্ষুসী বলতাম। বলতাম তার ওপর রাগের জন্যে—যেভাবে সে মারত তার

জন্যে। পরে আর একটা চেহারার জন্যেও বলতাম। সে যে সাজ করে ওই একটা লোকের সঙ্গে বেরিয়ে যেত সপ্তাহে একদিন করে রাত্রে তার জন্যে। সে ঘরে তালা দিয়ে বাইরে যেত। আমার তো ঠিক ছিল না কিছু। আমি ঢুকতাম পাঁচিল টপকে। তারপর ঘরের চাবি খুলে নিতাম—সে চাবি আমার কাছে থাকত। ঘরের তালা খুলে মা ওই সাজে ঢুকতেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, কোথায় গিয়েছিলি?

মা চমকে উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

আমার রাগ চড়ে চড়ে উঠেছিল—বললাম—বল, আজ তোকে বলতে হবে। কেন তুই যাবি এমনভাবে? তোর লজ্জা নেই তোর হায়া নেই?

মা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—সরে যা—সরে যা নীলু—আমার মাথায় খুন চড়িয়ে দিস নি।

আমি সরি নি। পথ দিই নি ঘরে ঢুকতে।

মা বলেছিল—নীলু! সর আমি চান করব।

—হুজুর, বাইরে থেকে এসে মা চান করত। সে সেই বোধ হয় গোড়া থেকেই। আমি আজন্ম দেখে আসছি।

আমি বললাম—না। আগে তোকে বলতে হবে কেন তুই আমার বাবার মুখে আমার বংশের মুখে এমন করে কালী মাথিয়ে দিবি? আমার বাবা মরে গিয়েছে সে কি তার—

মা আমার কথায় বাধা দিয়ে বলেছিল—তোর বাবাকে আমি ঘেন্না করি তোদের বংশকে আমি ঘেন্না করি। আর তুই? তোকে পেটে ধরে আমার লজ্জার শেষ নেই। অখণ্ড তোর পরমায়ু—তুই হয়ে হয়েই মরিস নি।

আমি ঠাস করে এবার মায়ের মুখের উপর চড় কষিয়ে দিয়েছিলাম; শুধু চড মারাই নয় হুজুর; ছেলেবেলা থেকে মায়ের উপর অহরহ রাগ করে থেকে থেকে মেজাজ আমার রাবণের চিতার মত জ্বলে—আমার বাবাকে আমার বংশকে গাল দেওয়া আমার সহ্য হয় নি। শুধু চড়ই মারি নি খারাপ কথা বলে গালও দিয়েছিলাম।

মা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। হুজুর, মায়ের সঙ্গে সমানে মারপিট করেছি—মা মারলে আমিও মেরেছি—হাতে কামড়ে দিয়েছি, ঢেলা ছুঁড়েও মেরেছি কিন্তু এমনভাবে কখনও গালে চড় মারি নি।

কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে আমার মুখের দিকে সাপের মত তাকিয়েছিল মা। আমি মনে করেছিলাম মা ভয় পেয়েছে—মা এবার বলবে—আর করব না। আমি ভাবছিলাম ওকে গলা টিপে মেরে ফেললে কি হয়!

অনায়াসে তখন আমি খুন করতে পারতাম। আমিই মায়ের হাত ধরে তাকে ঘরে টেনে এনে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম—তারপর বলেছিলাম, বল কেন তোর পাপে আমার চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে? বল?

মা বলেছিল—আমি যেদিন মরব সেদিন তোকে ডেকে সব বলে যাব। আর তুই যদি

মরিস তবে—

আমি তখন মরীয়া। আমার হাতের কাছেই পড়েছিল একখানা কানাভাঙা রেকাবি সেই-খানা তুলে নিয়ে মায়ের কপালে মারলাম—ভাবলাম না কি হবে! রেকাবির ধারটা কপালে খপ্ করে বসে গেল। বললাম—সীতা সাবিত্রী আমার—হারামজাদী—কুত্তার বেটী কুত্তি—

কথা আমার শেষ হল না—শেষ করতে পারলাম না আমি—মায়ের কপাল থেকে গলগল করে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে মুখখানাকে ভয়ংকর করে তুললে। আমি বোবা হয়ে গেলাম। চেয়ে রইলাম মুখের দিকে।

মা বাঁ হাত দিয়ে সেই রক্ত নেড়ে আঙুলে মেখে চোখের সামনে ধরে দেখে আস্তে আস্তে বললে—রামের মত স্বামী পেলে আমিও সীতা হতে পারতাম নীলু। তোর বাপ রাম ছিল না রে! রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল—রাম সমুদ্র বন্ধন করে রাবণকে বধ করে তারপর সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছিল। তোর বাবা রাম ছিল না—আমাকে কুত্তার বেটী বললি—আমার বাবা কুত্তার চেয়েও অধম জীব ছিল। অর্থের জন্যে বড়লোক লম্পটের পা চেটেছে—তাদের কাছে স্ত্রী কন্যা বিক্রি করেছে। আমাকে যখন বিক্রি করলে আমার হাতে নগদ দু'হাজার টাকার নোটের গোছা ধরিয়ে দিয়ে বাবা নির্লজ্জের মত পাষণ্ডের মত সেই টাকা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে পকেটে পুরে বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজাটা মল্লিক বন্ধ করে দিয়ে—।

হুজুর, মা আমার হাউহাউ করে কেঁদে উঠল একবার। বললে—ওরে নীলু, আমাকে সেকালে দাসী বাঁদী যেমন বিক্রি হত তেমনি করে বিক্রি করলে প্রথমে বাপ। আমি তখন ষোল বছরের মেয়ে—আমি কি করব? অসহায় অবলার মত পড়ে রইলাম—লোকটা আমাকে রাক্ষসের মত গোগ্রাসে গিললে—।

তোর বাবাকে তখন আমি দু'হাত বাড়িয়ে ডেকেছিলাম—তুমি স্বামী—তুমি আমাকে বাঁচাও বাঁচাও। বলেছিলাম—ভীম যেমন দ্রৌপদীকে কীচকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল তেমনি করে বাঁচাও। শুধু বাঁচানো নয় তুমি শোধ নাও। তুমি ওকে খুন কর। করে যদি ফাঁসি যেতে হয় যাবে—তুমি ভেবো না—আমি বিষ খেয়ে মরব। কিন্তু তোর বাবা কাপুরুষের অধম কাপুরুষ—আমাকে উদ্ধার করতে এসে ছুরি তুলে কাঁপতে লাগল থরথর করে, ওই রাবণ তার হাত ধরলে, ছুরিটা পড়ে গেল। তোর বাপ তার পায়ে গড়িয়ে পড়ে বললে—আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে ছেড়ে দিন। ওই আমাকে বলেছিল—। তোর বাপ আমার দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

আমি মাটির পুতুলের মত অবশ হয়ে গিয়েছিলাম—চোখেও বোধ হয় পাতা পড়ে নি—মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু শুনেই গিয়েছিলাম—মায়ের কাছে লিখিয়ে নিয়েছিল—আমাকে আপনি কিনিলেন—তার দাম দিলেন আমার বাবাকে আমার স্বামীকে। আমি চিরদিন কেনা হইয়া রহিলাম। বাবা লিখে দিয়েছিল—আমার স্ত্রী রত্নমালাকে স্বেচ্ছায় আপনাকে বিক্রয় করিলাম এবং দুই হাজার টাকা বুঝিয়া পাইলাম। তারপর বাবা নিজে নাকি নিয়ে যেত

মাকে সঙ্গে করে।

কপাল থেকে রক্ত ঝরে ঝরে মুখ ভিজিয়ে বুক ভিজিয়ে দিয়েছিল—মধ্যে মধ্যে থানা থানা হয়ে জমেও উঠেছিল—সেদিকে তারও খেয়াল ছিল না আমারও ছিল না। সব বলা শেষ করে মা বলেছিল—ওরে নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না সেই বাপের মেয়ে বলে। সেই স্বামীর স্ত্রী বলে। তোকে ক্ষমা করতে পারি নি ওই কাপুরুষ বাপের ছেলে বলে। তুই পেটে না এলে আমি হয়তো মরতাম মরতে পারতাম। তোকে কোন দিন স্নেহ করি নি কিন্তু তোর জন্যেই মরতে পারি নি।

বলতে বলতে মা ঢলে পড়ে গিছল। রক্তক্ষয়ে দুর্বল হচ্ছিল সে খেয়াল ছিল না। তারও ছিল না। আমারও ছিল না। যখন পড়ে গেল তখন মা বললে—নীলু, তুই লোকজন ডাক রে —তাদের সামনে বলব আমি নিজে রাগ করে কানাভাঙা রেকাবিখানা নিজের মাথায় বসিয়ে দিয়েছি।

হুজুর, আমি সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর শোধ আমি নেব। আমার মা। হুজুর, লোকে আমাকে মস্তান বলে—যার মায়ের উপর এমন অত্যাচার হয়—যার চারিদিকে কোন আনন্দ নেই আশা নেই সে মস্তান না হয়ে কি করবে? উপায় কি তার? মায়ের কাছে সব কথা শুনে অবধি আমি ঘুরেছি—পাগলের মত ঘুরেছি। তারপর ছোরা নিয়ে তৈরী হয়ে সেদিন দাঁড়ালাম ওই গলির মোড়ে।

বলতে ভুলেছি হুজুর, মাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল। মা লোকেদের কাছে বলেছিল নিজের কপালে সে নিজেই ভাঙা রেকাবি বসিয়েছে—হাসপাতালে বলেছিল এমন কাটা নিজের হাতে হয় না। লোকজনে বলেছিল—তাহলে ওর ছেলেই মেরেছে। তাও লেখা আছে পুলিসের খাতায়। তারপর মা বাঁচল—হাসপাতালে সাতদিন থেকে ফিরে এল। এসে বললে —নীলু, তুই চলে যা। আমি তোকে টাকা দিচ্ছি, এই বাড়ি বিক্রি করে টাকা দিচ্ছি তুই চলে যা কোথাও।

আমি মাকে কিছু না বলে চলেই গেলাম। চলে গেলাম না, লুকোলাম কাছেপিঠেই। বুকে আগুন জ্বলত অহরহ। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া হল। তাদের আমি ছাড়লাম, তারা আমাকে ছাড়লে। ছোরাখানা নিয়ে তক্কে তক্কে থাকতাম। জানতাম মা সপ্তাহে একদিন যায়। ঠিক করেছিলাম প্রথম দিনেই রাক্ষসকে আমি বধ করব। আর এক দিন এক বারও সে আমার মায়ের গায়ে হাত দেবে তার থেকে আমার মৃত্যু ভাল। কিন্তু তা পারি নি হুজুর। সে আমার আপসোস। এত আপসোস আমার বাবা দাদামশায়ের কাজের জন্যেও হয় নি। প্রথম দিন গাড়ি এল কিন্তু সে এল না।

দ্বিতীয় দিন গলির মুখে অন্ধকারে দাঁড়ালাম।

একটা লোক নেমে ভিতরে গিয়ে মাকে ডেকে আনলে।

রাক্ষসটা নামলে। এগিয়ে এসে বললে—এস।

আমি লাফিয়ে পড়লাম। পেটে ছুরি চালালাম। তারপর বুকে বাঁদিকে ডানদিকে।

লোকটা পড়ে গেল। যে লোকটা মাকে ডাকতে গিছল সে ভয়ে ছুটে পালাল। গাড়ির ভিতর থেকে ড্রাইভারটা চীৎকার করে উঠল। মা বলে উঠল—নীলু!

বললাম—হ্যাঁ। এই তোকে খালাস করে দিলাম। এরপরও যদি এই পাপ তুই করিস তবে তুই যা বলেছিস সব মিথ্যে আর তার জন্যে তোর কুষ্ঠ হবে জেনে রাখিস। যদি না হয় তবে ফাঁসি যাব আমি—আমি মরা ঈশ্বরকে নরককুণ্ডের পাঁকে পুঁতে দেব চিরদিনের মত।

আমাকে ফাঁসির হুকুম দিন।

আমি খুন করেছি। আমার মাকে যে টাকার জোরে জন্তু-জানোয়ারের মত কিনেছিল তাকে খুন করে আমার মাকে আমি খালাস করেছি।

ঠিক এই মুহূর্তে একটা গুরুভার কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে সারা আদালত ঘরটা চকিত হয়ে উঠল। কি পড়ল? আসামীও চুপ করলে এবং সেই দিকে তাকালে যেদিক থেকে শব্দটা

উঠেছিল সামনের দিক থেকেই।

একটি অতি বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

মা।

তার মা চেয়ারে বসেছিল—সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। কোর্ট অ্যাডজোর্নড হল সেদিনের মত।

ছয়

"মানুষের প্রতি কি মানুষের অন্যায় করবার অধিকার আছে? প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। এ অধিকার নাই। তবু অন্যায় ঘটে। মানুষ মানুষের উপর সজ্ঞানেই অন্যায় করে। তাহার প্রতিবিধানের জন্য দেশে আইন আছে কানুন আছে শাসন আছে শৃঙ্খলা আছে তবু অন্যায় হয়। এবং বহু ক্ষেত্রে সে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। আইন অসহায়ভাবে দুর্বল হয়ে মাথা নত করে। মানুষের ন্যায়বোধ নীতিবোধ সমস্ত কিছুকে মানুষেরই প্রবৃত্তি সরীসৃপের মত বিষাক্ত দংশনে বিনষ্ট করে। আইন শৃঙ্খলার লোহার বাসরঘর নির্মাণ করে মানুষ ন্যায়নীতির লখীন্দরকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সূচীপ্রমাণ ছিদ্রপথে কালনাগিনী প্রবেশ করে লখীন্দরের প্রাণ হরণ করছে যুগ যুগ ধরে। মানুষ অসহায়ভাবে মেনে নেয় এবং এই সরীসৃপ প্রবৃত্তিকে মাথা নত করে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে। বর্তমান ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আসামী নীলু চক্রবর্তীর জীবন নিষ্ঠুর অভিশাপে অভিশপ্ত জীবনের একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

জন্মের বোধ করি প্রথম মুহূর্ত থেকে সে তার মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত, সম্ভবতঃ ঠিক বলা হল না—মাতৃরোষের দ্বারা তিলে তিলে সে দগ্ধ। সমাজে সে চরমতম অপমানে অপমানিত, লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত। এক কামার্ত নরপিশাচের কুটিলতম অত্যাচারে অত্যাচারিত।

পাবলিক প্রসিকিউটর বলেছেন সাক্ষীদের দ্বারা তিনি প্রমাণিত করেছেন যে আসামী কুখ্যাত একজন মস্তান। স্থানীয় লোকেরা তার নামকরণ করেছে টাইগার। অর্থাৎ হিংস্র শ্বাপদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং হিংস্র শ্বাপদ।

হয়তো তাই।

এ সম্পর্কে আসামীপক্ষের অ্যাডভোকেট বলেছেন—হয়তো তাই। যার মায়ের অপমান হয় ধনী ব্যভিচারীর কলুষিত থাবার নীচে, যে বালকের জীবনে কোন সম্মান নেই সমাদর নেই সে যদি সত্যই প্রাণবন্ত হয় তবে বাঘের মত হিংস্র হয়ে নিষ্ঠুরভাবে বর্তমানের সব কিছুকে ভেঙে-চুরে চূর্ণ করে না দিয়ে তার পথ কোথায়? যাকে কেউ স্বীকার করে না তাকে আপন শক্তিতে স্বীকার করাতে হয়, সকল অত্যাচারকে রোধ করতে হয়।

মানুষের কাছে সকল অত্যাচারের চরম অত্যাচারে—মায়ের অপমান।

আসামীপক্ষের অ্যাডভোকেট বলেছেন—সারা দেশের অবস্থা এবং দেশের তরুণদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলতে ইচ্ছে করে যে এই বালক এবং তার মা তার প্রতীক।

এ কথা স্বীকার করতে আমারও ইচ্ছা হয়। এবং বলতে আমি বাধ্য যে এই বালকের মায়ের উপর যে কুটিল এবং কল্পনাতীতরূপে কুৎসিত অত্যাচার হয়েছে, আইনসংগতভাবে তার প্রতিকার হয়তো পেতে পারত কিন্তু এর শোধ নেবার অধিকার তার ছিল না। এ কথাও সত্য যে, বিচিত্র মানুষের সমাজের অতীত-কালের প্রভাবে ওই মিথ্যা দলিলে সই করিয়ে নিয়ে এই নারীর উপর যে অত্যাচার হয়েছে এবং যে অত্যাচারের মুখে অসহায়ভাবে তার পিতা ও তার স্বামী তাকে সমর্পণ করেছে তাতে তার এই পুত্রটি এইভাবে নিজের জীবনপণে ফাঁসিকেই স্থির পরিণাম জেনেই অত্যাচারীকে হত্যা করেছে; সে দুর্দান্ত, প্রাণবন্ত—তার পক্ষে বোধ হয় এই ছিল স্বাভাবিক। দেশের আইন এতে সম্মতি না দিলেও এই প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিতে উদ্যত হত্যাকারী পুত্রটিকে মানুষ শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়েই মনোলোকে অভিষিক্ত করবে।

আমি মহামান্য হাইকোর্টের কাছে এই বালকের সকল অপরাধের মার্জনার জন্য সুপারিশ করছি।"

দায়রা বিচারের রায়খানা পড়ছিলেন সুধাংশুবাবু। সুধাংশুবাবুর সেই বসবার ঘরে। সেই রাত্রিবেলা। সামনে দাঁড়িয়েছিল সেই চাঁপা—সেই রত্নমালা।

প্রেতিনী নয়, মমতায় বেদনায় জল-টলমল দুই চোখ নিয়ে সুধাংশুবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—মা। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

সকল গ্লানি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত মা।

সুধাংশুবাবু প্রসন্ন এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকালেন।

আশ্রয়টুকুর মধ্যে বসে একখানা ক'রে রুটিও আমরা খেয়েছিলাম।

নাজমা দেখতে ছোট, কয়াগড়নের কালো মেয়ে—কিন্তু তার বুকে কি অফুরন্ত সুখ। আর ওর ছেলেটা, চাঁদ ওর নাম—ছেলেটাও শান্ত। ছেলেটা এর মধ্যেও হাসছিল। বেরিয়েছিলাম সেখান থেকে সন্ধ্যার মুখে। সঙ্গে একটা-টর্চ ছিল—তার ব্যাটারি ক্ষয় হয়ে এসেছিল। সেইটেকে ভরসা করেই বেরিয়েছিলাম। ওদিকে তখন আগুন ধোঁয়া কোলাহল কমে এসেছে। মনে হল—যে সিপাহীর দল এসেছিল এখানকার বিদ্রোহ-বিপ্লব দমন করতে, তারা কাজ সেরে চলে গেছে।

ভরসা ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। নাজমাকে বললাম—নাজমা ভয় পাসনে যেন। ভয় পেলে আর কূলকিনারা মিলবে না।

নাজমা বললে—না বড়ভাই, ডর আমার নাই। চল তুমি।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম—ধরাই যদি পড়ি নাজমা?

নাজমা বলেছিল - সে আমার নসীব—আর কি কমু?

* * * *

কার নসীবের নির্দেশ তা জানি না। ধরা পড়ে গেলাম আধঘণ্টার মধ্যে। খানিকটা মাঠে মাঠে পায়-চলা পথে চলে মনে হল দিগদিগন্ত হারিয়ে গেছে। অন্ধকার রাত্রি—দূরে দূরে গ্রামে আলো দেখা যাচ্ছে—কিন্তু সেদিকে চলতে সাহস নেই। চলছিলাম নিঃশব্দে। খুঁজছিলাম একটা অন্ততঃ গাছতলা। এক সময় মনে হল গাছতলা যেন পেলাম। ওই দূরে একটা গাছতলা। গাছতলাটার দিকে আসতেই হঠাৎ টর্চের আলো মুখের উপর পড়ল। কেউ যেন টর্চের আলো ফেললে মুখের উপর। জিজ্ঞাস করলে—কে? কে তোমরা?

আমি কিছু বলবার আগেই সে বললে - তুমি কে? তুমি তো এদেশের লোক নও। এই চেহারা এই চোখ এই চুল এই রং।

লোকটার দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। আলো তার মুখের উপর না পড়লেও মুখখানা দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম এ দেশেরই লোক। মনে হল রাজাকার-টাজাকার দলের কেউ হবে। কিংবা মুসলীম লীগ। মাথার টুপিতে চাঁদতারা বসানো ছিল।

পরিচয় আমি গোপন করলাম না। বললাম—আমি একজন পাকিস্তানী ক্রীশ্চান—আমার বাবা ইংরেজ ছিলেন—মা ছিলেন দেশী ক্রীশ্চান।

আমার পাসপোর্টটাও দেখালাম।

তারা কিন্তু নিষ্ঠুর হাসি হাসছিল। তার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু বুঝতে দেরি হল না—আমাদের সব কিছু সন্ধান ক'রে সব কেড়ে নিয়ে রুমালে বেঁধে কোমরে গুঁজলে—তারপর দাঁত মেলে বিচিত্র কামার্ত হাসি হেসে দু'হাত বাড়ালে নাজমার বুকের কাপড়ের দিকে।

ক্ষীণকায়া নাজমাকে তো চোখেই দেখছেন—ওর যৌবন সমৃদ্ধ যৌবন। হ্যাঁ।

এ কয়দিন তার দিকে তাকিয়ে—বার বার ওই যৌবনের দিকে তাকিয়েছি আবার ভেবেছি। কেন? এমন উদ্ধত যৌবন—

ও যখন ওর ছেলেটাকে কোলে করত—তখন এর উত্তর পেতাম। উদ্ধত যৌবন নয় নাজমার—সমৃদ্ধ যৌবন। তার সব সমৃদ্ধি ওই ছেলেটার জন্যে।

আমি চীৎকার করে উঠলাম—না।

নাজমাও চীৎকার ক'রে উঠল। ভাষাহীন একটা চীৎকার। ঠিক এই মুহূর্তে তীব্র আলো জলে উঠল। মোটরের শব্দ উঠল।

আমরা অন্ধকারে বুঝতে পারিনি—গাছতলাটা একটা গাড়ি চলাচলের সরকারী রাস্তার ধারের একটা গাছতলা। আলোটা জলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের আওয়াজ হল। পর পর তিনটে-চারটে। বাতাসে শিস কেটে গুলি বেরিয়ে গেল আমাদের কিছুটা দূর দিয়ে।

এরা চীৎকার করে উঠল—পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

গুলি বন্ধ হল। গাড়িটা গোঙাতে গোঙাতে এসে দাঁড়াল। একটা মিলিটারি জীপ—তার সঙ্গে আরও একখানা জীপ। গাড়ি থামল—আলো নিভল না। সে আলো পরিপূর্ণভাবে আমাদের উপর এসে পড়েছিল। নাজমা আমাকে জাপটে ধ'রে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি আমার ঈশ্বরকে ডাকলাম—ক্রায়েস্টকে ডাকলাম, আল্লাহতায়লাকে ডাকলাম—পয়গম্বর রসুলকে ডাকলাম—হিন্দুর ঈশ্বরকেও ডাকলাম। নাজমাকে বাঁচাও। জীবনের মধ্যে একটি ভিখিরীর মেয়ে, কালো মেয়ে—একটি মজুর আদমীর স্ত্রী—আমাকে বড়ভাই বলে—আমাকে সজ্জন জেনে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে আত্মরক্ষার জন্য। আমি দুর্বল—আমি অসহায়—তোমরা বাঁচাও তাকে। তোমরা বাঁচাও।

এরই মধ্যে একটা খুব ভারী গলার আওয়াজে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কেয়া নাম তুমহারা? তারপরই বললে—Hallo—are you not David Armstrong? Motor mechanic David? গজল গানে-বালা ডেভিড নেহি হো তু?

আমি অবাক্ হয়ে গিছলাম। ভয় আমার খুব হয়েছিল—মনে পড়েছিল ঢাকার ২৫শের রাত্রিকালের কথা। তবুও বিস্ময়ের শেষ ছিল না। মিলিটারি জীপ থেকে নেমে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরে আমার সঙ্গে আমার নাম ধরে ডেকে কথা বললে কে?

আমি কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কে? আপনি—আপনি—

উত্তর পেলাম—পছানৃতে নেহি? I am Zaffar Mahammad Jaffarulla Khan of Lahore? Look at my face—

তারপর একসঙ্গে একরাশি প্রশ্ন।

তুমি এখানে কোথা থেকে এলে? এখানে তুমি কি করছ?—তুমি এখানে কি কর? এমনধারা চেহারা হয়েছে কেন? আরে তুমি কি এই ছোটা আদমীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ নাকি?

আরে—এ কে? এটা—? এই ছোকরী? এই কালো মেয়েটা? আ—হা। এ

তো বহুত আচ্ছা—খুবসুরতী হ্যায়।—আরে ডেভিড, কাঁহাসে এইসা চীজ তুমনে জুটায়া হো?

কামার্তের লালসা তার কথাগুলো থেকে যেন ঝরে ঝরে পড়ছিল। আমাকে নাজমা সজোরে জড়িয়ে ধরলে।

* * * *

জাফরউল্লা খাঁ—সেই জাফরউল্লা খাঁ। যে জাফরউল্লা খাঁ পাকিস্তান ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের একজন অফিসার ছিল। যে আমার গজলগান শুনে দোস্তি করেছিল। যে আমাকে নিয়ে এই পূর্ব পাকিস্তানে আসতে চেয়েছিল। আমি ওর সঙ্গে আসিনি—ভালো লাগেনি।

সেদিন সেই মুহূর্তে আমি লজ্জিত বোধ করেছিলাম।

জাফর খাঁ বলেছিল—ভাগ্যিস আমার চোখে পড়েছিলে তুমি। না হলে তোমাকে হয়তো এরা গুলি ক'রে মেরে দিয়ে তবে কথা বলত। কালো কালো এই বাঙালীগুলোর মধ্যে ইংরেজী শিখে যারা কায়দে আজমের পাকিস্তানকে বরবাদ করে দিতে চায় তাদের কুত্তার মত গুলি ক'রে মারতে কসম খেয়ে লড়াইয়ে নেমেছি আমরা। Thank your star David —নিঃসন্দেহে তুমি ভাগ্যবান।

গাড়িগুলো হাজিসাহেবের গ্রামে ঢুকছিল। এসে থামল মসজিদের সামনে। ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে গুলি খেয়ে মরা বেয়নেটের খোঁচায় মরা মানুষ। এই গাঁয়ের মানুষ। মেয়ে-পুরুষ, বাপ-ছেলে, বুড়ো-বুড়ী।

জাফর খাঁ নেমেই বললে—সেই শয়তানকে—কুত্তাকে হারামীকে মিলেছে? হাজী শেখ আব্বাসকে? নেই মিলা?

—নেই মিলা।

কুৎসিত গালাগালি দিলে জাফর খাঁ।

পাকিস্তানের দুশমন—ইসলামের হুকুমৎ না-মানা লোক শয়তান হাজী শেখ আব্বাস। এখানে ধানচালের কারবার নিয়ে জাফর খাঁ মিলওয়ালার সঙ্গে দুশমনি করে হাজী আব্বাস। এখানে আওয়ামী লীগের ঝাণ্ডা উঁচা করে এই হাজী শেখ আব্বাস। তাকে পাওয়া যায়নি?

—খোঁজা হয়েছে ভাল ক'রে? খোঁজ ভাল ক'রে। মুর্দা হোক আর জিন্দা হোক—বের কর তাকে। ভাল ক'রে খুঁজে দেখ। টর্চলাইট ফেলে দেখ। সার্চলাইট জেলে—আলো ফেলে খোঁজ।

—দেখ ভাল করে আওয়ামী লীগের কোন লোকের বাড়ি খাড়া আছে কি না; পোড়ার হাত থেকে বেঁচেছে কিনা। দেখ। দেখ—

দুটো মড়া টানতে টানতে নিয়ে এল একজন স্থানীয় লোক--ইয়ে দেখিয়ে—ইয়ে হ্যায় হাজীকে মবলে বেটা আমীন—আমানুল্লা শেখ—আর ইয়ে হ্যায় এক লেড়কা—ইরসাদ—

ভাল ক'রে দেখলে জাফর খাঁ। তারপর দুটো লাথি মেরে সরিয়ে দেবার ভঙ্গি ক'রে বললে—বুঢ্‌চা কো মিলনা চাহি।

—ওদের বাড়ির ঔরৎরা কোথায়?

—তাদের আগেই সরিয়ে দিয়েছে—

—আঃ।

* * * *

আমি পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। অবশ, পঙ্গুর মত বসেছিলাম জাফর খাঁর সামনে। জাফর খাঁ একটা গোটা মুর্গী রোস্ট নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষুধায় এবং উল্লাসের উৎসাহে খাচ্ছিল। তার সঙ্গে হুইস্কি।

হাজীসাহেবের গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরে একেবারে নদীর কিনারায় জাফরউল্লা খাঁয়ের রাইস মিল, তার সঙ্গে আরও ব্যবসার সারিবন্দী আপিস। পাশেই সুন্দর বাংলো। বাংলোর মাথায় পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ উড়ছিল, সামনে বারান্দায় জাফরউল্লা খাঁ খাচ্ছিল। আমিও বসেছিলাম। না, আমিও খাচ্ছিলাম। আমার সামনেও খাবার ছিল। কিন্তু আমি দেখছিলাম জাফর খাঁকে।

জাফর খাঁ মোটা হয়েছে। রঙ কিছু ময়লা হয়েছে কিন্তু মেদবৃদ্ধি হয়েছে। চিবুকের নিচে মাংসের একটা থলি যেন ঝুলে পড়েছে। মদে মুখটা থমথম করছে। হা-হা ক'রে হাসছে। মধ্যে মধ্যে আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষছে। আক্রোশ হাজী আব্বাসের উপর।

জাফর খাঁ পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল, দৌলৎ আর দৌলতখানা গড়বার জমিনের সন্ধানে।

—পূরব তরফ কি দক্ষিণ তরফ চলে যেয়ো।

জাফর খাঁ বলছিল আমাকেই। বলছিল—আমার বাপ দাদা এঁরা বলতেন - এক জায়গায় জায়গীর টুকরো টুকরো করো না। চলে যেয়ো ছড়িয়ে পড়ো। আমার পূর্বপুরুষ সামাদ খাঁ এসেছিলেন নাদির শাহের সঙ্গে। শাহ নাদির সারা বালুচিস্তান সারা পশ্চিম পাঞ্জাব হিন্দুস্তানের বাদশার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জায়গীদার বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সামাদ খাঁর জায়গীর বাড়িয়ে গিয়েছিল তার ছেলে। শাহ আবদালী দিল্লীর বাদশাকে হারিয়ে নিজের সীমানা যখন বাড়িয়ে নিলে তখন সামাদ খানের ছেলের জায়গীরেরও সীমানা বাড়ল। তারপর যত ছেলে বেড়েছে তারা চলে এসেছে পূরব তরফ। কালা ছোটা আদমীদের এই মুল্কে আমরা ইসলাম এনে এদের জাত দিয়েছি মান দিয়েছি। এদের বাড়িঘর বানাতে শিখিয়েছি। ডেভিড, তোমরা এসে আমাদের বাদশাহী সুলতানীর সুখের ঘর ভেঙেছিলে। আল্লার মেহেরবাণী ইংরেজ চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আপসোস কি জান, তোমরা বেধরমী কাম কি করেছ জান? আমাদের বাদশাহী আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে যাওনি। এই উত্তর-পশ্চিমে খানিকটা আর এই পুব দিকে খানিকটা দিয়ে বাকিটা দিয়েছে ওদের—ওই হিন্দুদের।

* * * *

জাফরউল্লা মুরগীর রোস্টটা পুরো খেয়ে নিয়ে কানায় কানায় পরিপূর্ণ মদের গ্লাসটি তুলে নিল এবং নিঃশেষে গ্লাসটা শেষ ক'রে সিগারেট ধরিয়ে বললে—তুমি তো খাচ্ছ না ডেভিড?

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। গলার ভিতরটা আমার যেন বন্ধ হয়ে আসছিল একটা ভয়ে; জাফরউল্লার মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম ঢাকার ২৫শে রাত্রির সেই তাণ্ডব নৃত্যের একজন মিলিটারি অফিসারকে। কি বলব তাই ভাবছিলাম মনে মনে।

জাফরউল্লা খাঁ এখানে একজন বিশিষ্ট ব্যবসাদার মিলওয়ালা। পাঞ্জাব থেকে যে সব ব্যবসাদারেরা এসে পূর্ব পাকিস্তানে সমস্ত ব্যবসায়কে নিজেদের করায়ত্ত করেছেন জাফর খাঁ তাঁদেরই একজন। ধানচালের ব্যবসায়ে তিনি তৃতীয় কি চতুর্থ প্রধানজন। এ অঞ্চলে মুসলীম লীগ জামাতে ইসলামের যাঁরা সমর্থক আছেন, প্রধান আছেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক তিনি। এখানে যে পাকিস্তানী সিপাহীরা এসেছিল এবং আগুন জালিয়ে সব ছারখার ক'রে দিয়ে সাধারণ হতভাগ্য মানুষদের নির্বিচারে খুন ক'রে অঞ্চলটার উপর পাকিস্তানী ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল তার সমস্ত ছকটা তিনি তৈরী করেছিলেন লীগ সমর্থক আবু তাহের এবং আর ক'জনের পরামর্শ নিয়ে। প্রথম অভ্যুত্থানের সময়ই তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে ঢাকা চলে গিছলেন। ঢাকাতে তাঁর বাড়ি আছে। এতদিন পর পাকিস্তানী সিপাহীদের নিয়ে তিনি ফিরেছেন পাকিস্তানী জেহাদ নিয়ে। এখানকার যে দখল বেদখল ক'রে দিয়েছিল এখানকার হাজীসাহেবরা, সেই দখল উদ্ধার করলেন আজ। পাকিস্তানী ফৌজের অল্প কয়েকজনকে রেখে বাকিরা চলে গেছে। এখন জাফর সাহেব নিজের মিলের বাংলোর মধ্যে বিজয়ীর মন নিয়ে উল্লাসে হা-হা ক'রে হাসছেন। এখন কি ক'রে বলব—মিস্টার খান এ আমার ভাল লাগছে না।

আমি জানি যে মুহূর্তে বলব সেই মুহূর্তে তাঁর টেবিলের পাশে যে চেয়ারটা রয়েছে তার উপর চামড়ার বেল্টসমেত যে রিভলভারটা রয়েছে সেটা তাঁর হাতে উঠবে। এবং পরমুহূর্তেই সেটা গর্জে উঠবে, আমার বুকে বিঁধবে বুলেটটা। আর্মিতে ব্যবহার হয় এ রিভলবারগুলি—৪৫ বোরের।

জাফর খাঁ নিজে হাতে মদের গ্লাস তুলে এগিয়ে দিয়ে বললেন—খাও। আজ এ আমার একটা রাজ্য জয় মিস্টার ডেভিড। সত্যি সত্যি একটা রাজ্য জয় করেছি। ছোটা আদমী ওই শেখ আব্বাস—ও বলে হজ ক'রে এসেছে—ইনসাল্লা। পয়গম্বর রসুল নিশ্চয়ই খুব খুশী হননি। ওই আব্বাসকে আজ খতম করেছি। ওর বাড়ি ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছি; ওর ছেলেরা বোধহয় সবগুলো মরেছে। ওদের ঔরৎদের পাইনি। পাব। জরুর পাব। এখন এ ইলাকা হল আমার নিজের জায়গীর, নিজের রাজ্য। তোমার বহুৎ নসীবের জোর ডেভিড যে তুমি আমার চোখে পড়েছ। না হলে ওরা তোমাদের খতম ক'রে দিত।

এবার আমি বললাম—আপনাকে বহুত বহুত সালামত আর অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার খান তার জন্য। এবার আর একটা প্রার্থনা করব।

—কি বল?

—আমাদের এইবার ছেড়ে দেন—আমরা কোথাও নিরাপদে গিয়ে—

—নিরাপদ! হা-হা ক'রে অট্টহাস্য ক'রে উঠল জাফরউল্লা খাঁ। নিরাপদ কোথায়

ডেভিড ? গোটা পুরব পাকিস্তানের মাটি রক্তে ভিজে যাবে। যারা এখান থেকে আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়—যারা আমাদের তাড়াতে চায় তাদের একজনকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব না। একটুকু একটা বাচ্চাকেও না। আমার কাছে থাক ডেভিড। Enjoy the rest of the days of your life. আমি তোমাকে একটা ভাল চাকরি দেব। And তার সঙ্গে একটি হারেম। A very good harem. অবশ্যই এ দেশের মেয়েদের দিয়ে। They are very good—very very good girls. উপভোগ করবার মত এমন আর হয় না। These black girls—

আর এক গ্লাস পূর্ণ ক'রে মদ ঢেলে নিয়ে জাফর খাঁ বললে—তোমাকে একটা গল্প বলি। আমার পূর্বপুরুষ এদেশে এসেছিলেন নাদির শাহের সঙ্গে। যাবার সময় আমার পূর্বপুরুষ নবাব হয়ে বসলেন সিন্ধুনদের ধারে। সেখানে তাঁর হারেমে ছিল একশোও বাঁদী। গোলাম বাঁদীর হাট থেকে ব্যবসাদারেরা তাঁর কাছে বেছে বেছে বাঁদী নিয়ে আসত। তাঁর ভাল লাগত গুজরাটওয়ালী গোয়ালিন। লেকেন তার রঙ ফরসা হলে তিনি পছন্দ করতেন না। আমার বংশের আর এক আমীরের জন্তে আফ্রিকায় লোক যেত বাঁদী আনতে। তাঁর ভাল লাগত হাবসী লেড়কী।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। আমি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের ছেলে। ষোল-সতের বছরে বাপ আমাকে পাকিস্তানে ফেলে দিয়ে চলে গেছে ইংল্যাণ্ড। আমি অনেক দেখেছি Mr. Officer. Naked life আমি দেখেছি। কিন্তু জাফর খাঁর মত ভালগার মানুষ আমি দেখিনি—এত কুৎসিত এত ভয়ঙ্কর আর কাউকে আমি দেখিনি। দাঁত মেলে হাসছিল, মধ্যে মধ্যে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছিল আর কথা বলছিল।

—I like Bengali girls—black Bengali girls. আমি এখানে আজ ক'বছরই হল এসেছি। এখানে আমার এক আশ্চর্য হারেম আছে। কালো গরীব মেয়েদের নিয়ে আমার সে হারেম। এদের হারেমে রাখি কেন জান ? যখন ওদের দিকে তাকাই তখন মনে হয় আমি ওদের যুদ্ধ ক'রে জয় ক'রে এনেছি।

আমি তোমাকে এমনি একটা হারেম ক'রে দেব। যদি black girls না চাও তুমি ফর্সা রঙের মেয়ে পাবে। অনেক পাবে। Lakhs of educated young men মরবে ডেভিড—তাদের girls থাকবে। তাদের আমরা পাব।

আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। বোবা হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই থেকেছিলাম শুধু। মনের মধ্যে চিন্তার আকারেও কিছু ছিল না।

বলেই যাচ্ছিল জাফর খাঁ। বলছিল—I don't like them—these educated modern Bengali girls; তুমিও চাও না জানি। তোমার choice খুব ভাল, I have liked your girl—

এতক্ষণে একটা electric current যেন আমাকে সারা অস্তিত্বকে নাড়া দিয়ে নিষ্ঠুর চাবুক মারার মত আঘাত দিয়েছিল। আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম—Mr. Khan—

জাফর বলেছিল—কি ?

আমি বলেছিলাম—না।

—কি না ?

—ওর গায়ে তুমি হাত দিয়ো না জাফর খাঁ। না। না।

হা-হা-হা শব্দে হেসে জাফর খাঁ ভেঙে পড়েছিল।

* * * *

Mr. Officer—রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে নরক যেন চোখের সম্মুখে বিমূর্ত হয়ে উঠেছিল।

জাফরউল্লা খাঁর বাড়ির এদিকে ওদিকে জোরালো আলো জলছিল। নিরাপত্তার জন্যেই আলো জালিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছিল অনাথা অসহায়া কয়েকটা মেয়েকে নিয়ে ধানবিছানো বাঁধানো উঠানটার উপর কতকগুলো পিশাচের অকল্পিত পৈশাচিকতা।

আর আমি ছিলাম বারান্দায় একটা থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সামনে টেবিলের উপর রাখা ছিল সেই ৪৫ বোরের রিভলবারটা। আর সামনে ঘরের মধ্যে মেঝের উপর পড়েছিল উলঙ্গ অনাবৃত একটি মেয়ে। নাজমা। হতচেতন। চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে, হাত দুটো অসাড় হবে পড়ে আছে।

কিছুটা দূরে চাঁদ পড়ে আছে—নিথর, নিস্পন্দ। আমারই চোখের সামনে ছেলেটার গলায় পা দিয়ে ওকে হত্যা করেছে জাফর খাঁ। তারপর আমারই চোখের সামনে নাজমাকে বিবস্ত্র ক'রে কুটিল উল্লাসে ওকে ধর্ষণ করেছে।

নাজমা কয়েকবার মানুষকে ডেকে ঈশ্বরকে ডেকে আর চীৎকার করেনি। চীৎকার করেনি নয়, চীৎকার করতে পারেনি। ও অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জাফর খাঁ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা মদের গ্লাস। কি ভয়ঙ্কর যে তাকে দেখাচ্ছিল তা আমি স্মরণই করতে পারি। বলতে পারি না। বর্ণনা ক'রে বোঝাতে পারি না।

আমার চোখের সামনেই সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল নাজমার উপর।

ঠিক এই সময়েই—বোধহয় মিনিটখানেকের মধ্যেই রাইফেলের গুলির আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আলো নিভে গেল।

চীৎকার ক'রে উঠল একদল মানুষ। আকাশ বিদীর্ণ-করা চীৎকার। কি ক্রোধ সে চীৎকারের মধ্যে, কি প্রচণ্ড উল্লাস সে চীৎকারের মধ্যে সে বলতে পারব না। চমকে উঠেছিলাম। চমকে উঠেছিলাম ওদের ধ্বনি শুনে। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

ধ্বনি শুনে একটা জন্তুর মত চীৎকার ক'রে উঠেছিল জাফর খাঁ।

গাঢ় অন্ধকারে তখন সব ঢেকে গেছে। জাফর খাঁর চীৎকার চিনেছিলাম ওর বর্বর গলার আওয়াজ শুনে। অন্ধকারের মধ্যে উলঙ্গ দানবটা খুঁজছিল সেই রিভলবারটা। আমি খুঁটিতে বাঁধা হয়েই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নাজমা সেই পড়েই ছিল।

এরই মধ্যে ছায়ামূর্তির মত মানুষেরা এল।

পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মুসলমান নওজোওয়ান। খালি পা, পরনে লুঙ্গি—কারও খালি গা, কারও গায়ে গেঞ্জি, কারও একটা খাকিরঙের হাফহাতা কামিজ। তাদের সর্বাগ্রে রয়েছে এবাদৎ। ষোল বছরের ছেলে। হাতে রাইফেল। দিনের বেলা এরা পালিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যে থেকে আবার একত্রিত হয়ে দল বেঁধে রাত্রির অন্ধকারে এগিয়ে এসেছে। এসেছে শোধ নিতে।

এখন আক্রোশে ডেকে এনেছেন এদের হাজীসাহেব নিজে।

হাজীসাহেব গুলি করে মারলেন জাফর খাঁকে।

জাফর খাঁ একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র পশুর মত চীৎকার করলে মরবার সময়। পর পর চারটে গুলির পরও সে চীৎকার করেছিল।

* * * *

Mr. Officer, হাজীসাহেব লোক সঙ্গে দিয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে দিয়েছেন আমাদের। আমার আসবার কোন ইচ্ছা ছিল না, কারণ ছিল না। আমি এসেছি কেবল ওই নাজমার জন্যে।

নাজমা বাঁচতে চায়। তার চাঁদ মরেছে। সে এখনও আশা করে, বড়ভাই তুমি আমার ঘর গড়্যা দিবা, আমার নিকা দিয়া দিবা। আমার চাঁদ আবার ফিরে আসবে। পাগল হয়ে গেছে নাজমা।

হাজীসাহেব আমাকে বলেছেন—ডেভিড সাহেব, তুমি নাজমারে নিয়া যাও উপার বাংলায়। ইপার বাংলায় যখন বাংলাদেশের ঝাণ্ডা উড়বে তখন তারে নিয়া তুমি এস এখানে।

আমি অনেক কষ্টে নাজমাকে বয়ে এনেছি এখানে।

আমি স্পাই নই। স্পাই শব্দটাকে আমি ঘৃণা করি। আমি নাজমাকে নিয়ে এসেছি। ও একটি আশ্চর্য কালো মেয়ে—ওকে আমি ভালবাসি। ওকে আমি আবার ওদেশে ফিরে নিয়ে যাব।

সুতপার তপস্যা

(এপার বাংলা)

কি ? সুব্রত নেই ? সুব্রতর কাপড়জামা, একটা ছোট হাতব্যাগ পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে একসঙ্গে পাঁচটি মৃতদেহ ; মুখ-চোখ কুপিয়ে বিকৃত করা ; গলিত শব ; একটা আলগা মাটি-চাপা-দেহ গর্তের মধ্যে যেমন-তেমন করে চাপা দেওয়া হয়েছিল।

আসানসোলের কাছে একটা কলিয়ারিতে ইউনিয়ন নিয়ে ঝগড়া শেষ পর্যন্ত দাঙ্গায় পরিণত হয়েছিল—মানুষ মরেছে কতজন, তার সঠিক হিসেব কেউ বলতে পারে না, পুলিসও না ; পাঁচটি পাওয়া গেছে, কতজন কত পরিত্যক্ত পিটের গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, কতজনের দেহ ট্রাকে তুলে কিছুদূরে জঙ্গল বা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে—তাই বা কে বলবে।

সুতপা যেন পাথর হয়ে গেল।

এক হাতে চায়ের কাপটা সে ধরে ছিল, সেই কাপটা সে ধরেই রইল—চোখ দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে নিষ্পলক হয়ে গেল। নীরব, তবে নিস্পন্দ নয়—নিঃশ্বাস পড়ছিল। তার সে চেহারা দেখে মানুষের অন্তরাত্মা কেমন যেন আনচান করে ওঠে। যে দেখে সে ভয় পেয়ে যায়।

সুতপার বড়বউদি ঘরের দরজা খুলেই তাকে এইভাবে দেখে আতঙ্কিত হয়ে ডেকে উঠল—ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি।

সুতপা বিহ্বলের মত শুধু সাড়াই একটা দিলে—এঁ্যা। হাত থেকে কাপটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। তারপর যেন টলতে লাগল।

সুতপার বড়বউদি ঘরের ভিতরে শ্বশুর দাশগুপ্ত সাহেবকে ডাকলে—বাবা। ঠাকুরঝি—

দাশগুপ্ত সাহেব প্রবীণ মানুষ, বয়স ষাটের কোঠায়, পেশায় আইন ব্যবসায়ী—ব্যারিস্টার মানুষ। প্র্যাকটিস অবশ্য বিশেষ একটা কিছু নয় ; আবার নেহাত কিছু নয় তাও নয়। তবে পণ্ডিত বলে খ্যাতি তাঁর ভারত-জোড়া। নূতন কালে রাজনীতি শাস্ত্রের যত আধুনিকতম তত্ত্ব—সে সম্পর্কে তাঁর মতামতের মূল্য অনেক। কেরালা থেকে দিল্লী এবং দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁরা তাঁকে সমীহ করেন—প্রতিটি মন্তব্যকে খুঁটিয়ে বিচার ক'রে দেখেন। তিনি কোন দলভুক্ত নন এবং সকল দলকেই তিনি বক্রোক্তি করে বিদ্ধ ক'রে থাকেন।

দাশগুপ্ত ঘরের মধ্যে বসে একজন পুলিস অফিসারের কাছে সমস্ত বিবরণ শুনছিলেন। ভদ্রলোক এসেছেন আসানসোল থেকে ; যেসব পুলিস অফিসাররা নিজেরা কেস ইনভেস্টিগেট করেছেন, ইনি তাঁদের একজন। ইনস্‌পেক্টর সুধীর বোস। একখানা চিঠি নিয়ে এসেছেন

তিনি। চিঠিখানা তাঁরা সুব্রতর যে ব্যাগটা পাওয়া গেছে, তারই মধ্যে পেয়েছেন। চিঠিখানা ফুলস্কেপ কাগজে লেখা চিঠি; দীর্ঘ চিঠি। চিঠিখানা সুব্রত লিখেছে বা লিখছিল সুতপাকে। বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠার চিঠি। বার বার ছেদ টেনে শেষ করতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি, আবার লিখেছে। চিঠিখানা শেষ করেছিল লেখক কয়েকবারই এবং ঠিকানার জায়গায় সুতপার নাম-ঠিকানাও লিখেছিল। কিন্তু তারপরও আবার পুনশ্চ দিয়ে আবারও লিখেছে। তাতেও শেষ হয়নি মনে হয়েছিল বলে আবারও লিখেছিল—এতেও তৃপ্তি হয়নি বলে চতুর্থবার দু-তিন লাইন লিখেছিল।

সেই চিঠির ঠিকানা ধরেই ইনস্‌পেক্টর এখানে এসেছেন।

দাশগুপ্ত সাহেব প্রথম সংবাদটা শুনে, ডেকেছিলেন বড় পুত্রবধূকে। এত বড় মানুষটা—এত পাণ্ডিত্য, এত স্থিরতা—সব যেন একমুহূর্তে একটা আচমকা দমকা বাতাসে আলো নিভিয়ে দেওয়ার মত এক বিপুল বিহ্বলতার অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে গিয়েছিল।

অসহায় বালকের মত দাশগুপ্ত সাহেব বলেছিলেন—বউমা, এ আমি কি করব বল তো? কি ক'রে আমি সুতপার কাছে মুখ দেখাব বল তো?

বউমা বলেছিল—এর আর আপনি কি করবেন বাবা?

—মা, আমি যে ভুলতে পারছি না—আমার জন্মদিনের জন্যে—

বাধা দিয়েছিল পুত্রবধূ।—না বাবা। আপনার জন্মদিনে আপনি সুতপাকে আসতে বারণ করেছিলেন। আপনার সে-পত্র আমি দেখেছি। সে না এলেই পারত।

দাশগুপ্ত বললেন, সেই তো বলছি মা, আমি ষাট বছরের বেশী বয়সের বৃদ্ধ—আমার জন্মদিনের জন্যে—ছি—ছি—ছি।

ইনস্‌পেক্টর সুধীর বোস চুপ ক'রে বসেই ছিলেন। তিনি এবার কথা বলবার সুযোগ করে নিয়ে বললেন—মিসেস মুখার্জীকে—I mean সুতপা দেবীকে একবার ডাকুন। এই যে চিঠিখানা—এখানা তো আমি এখন আপনাদের দিয়ে যেতে পারব না, এখানা এখন আমাদের ফাইলে থাকবে। উনি একবার পড়ে নেবেন বলেই চিঠিখানা আমি নিয়ে এসেছি।

দাশগুপ্ত বললেন—বড় নিষ্ঠুর চিঠি, সুব্রত নির্মম হয়ে পত্রখানা লিখেছে। এতটুকু মমতা হয়নি।

দুটো কনুই টেবিলের উপর রেখে দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধরেছিলেন দাশগুপ্ত সাহেব। তারপর বলেছিলেন—বউমা!

—সুতপাকে ডাকতে বলছেন?

—হ্যাঁ মা। এ সংবাদ তো দিতেই হবে তাকে।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বড় বউ বললে—এ বিয়ে দিতে আমরা সে সময় বার বার বারণ করেছিলাম বাবা।

দাশগুপ্ত সাহেব বললেন—সুতপা আমাকে বলেছিল—বাবা, সুব্রতকে আমি ভালবাসি। তার জন্যে আমি সব সইতে পারব। সব সইব। তুমি যদি না বল বাবা,

তা হলে আমি বিয়ে করব না। নয়তো তোমার পরে—আমি তার ঘরে চলে যাব। সে বলেছে, আমার জন্তে সে অপেক্ষা করবে। তা ছাড়া—

—থাক্ সে-সব কথা মা—ভুল ভুলই। মানুষ ভুল করবেই।

বড় বউ বাইরে যাবার জন্তে পা বাড়িয়ে বললে—হ্যাঁ, বিয়েটা আমাদের উপর, মানে ভাই-ভাজদের উপর, তাদের বাপেদের গুষ্টির উপর রাগ ক'রে করে ব'সেছিল—সে আমাদের অজানা নয়। আপনিও তাতে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

বড় বউ কথা শেষ করতে-করতেই দরজাটা ঠেললে, যাতে কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে বেরিয়ে যেতে পারে। কারণ শ্বশুরকে যে খোঁচাটা সে দিয়েছে, তার উত্তরটা যাতে তাকে না শুনতে হয়।

দাশগুপ্ত সাহেব মধ্যে মধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বিশেষ ক'রে এই ধরনের খোঁচা খেলে। থাক সে কথা। বড় বউ অমিতা দরজা খুলেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দরজার ওপাশেই কাপ হাতে দাঁড়িয়েছিল স্বতপা। মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে, দৃষ্টি বিস্ফারিত নিস্পলক, মানুষটার চেতনা আছে কি নেই বোঝা যায় না।

সে চেহারা দেখে তার অন্তরাত্মা আনচান করে উঠল। সে আতঙ্কিত হয়ে ডাকলে—ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি।

এবার অমিতা ডাকলে শ্বশুরকে—বাবা। ঠাকুরঝি—

চমকে উঠলেন দাশগুপ্ত—কে? স্বতপা?

—হ্যাঁ। বোধহয়—

– কি? কি বোধহয়?

অমিতা স্বতপাকে জড়িয়ে ধরলে। স্বতপা একটা বিহ্বল সাড়া দিলে—এঁ্যা।

দাশগুপ্ত সাহেব বুদ্ধির ব্যাপারে মস্তিষ্কের ব্যাপারে আজও ক্ষুরের ধারের মত শাণিত বুদ্ধির অধিকারী, কিন্তু দেহ তেমন সমর্থ নেই, তবু তিনি এগিয়ে এলেন—স্বতপার পিঠে হাত দিয়ে তাকে ডেকে বললেন—স্বতপা। মা।

স্বতপা সামলেছে তখন, বললে—বাবা।

কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং কাঁপছে কাঁপানো তারের সুরের মত।

দাশগুপ্ত বালকের মত দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন।

স্বতপা ইনস্পেক্টর বোসের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—চিঠিখানা দেখি।

* * *

চিঠিখানার প্রথম ছত্রেই, নিষ্ঠুরতম কথা কুটিলতম লক্ষ্যভেদে তীক্ষ্ণতম আঘাত। 'স্বতপা, ডাইভোর্স সমাজে চালিত হয়েছে, আইনের জোরে বলবৎ হয়েছে—তবুও ডাইভোর্সের এখনও একটা যন্ত্রণা আছে, লোকলজ্জার একটা জ্বালা আছে আমাদের দেশে। সে যন্ত্রণা এবং জ্বালা থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেবার জন্তে পথ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পথ পেয়ে গেছি।

সেই সংবাদটা জানাচ্ছি তোমাকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। একটা মারাত্মক হানাহানি খুনোখুনির মধ্যে এসে পড়েছি। ইচ্ছে করেই এসেছি। এখানে এই কলিয়ারির ইউনিয়নটা এ অঞ্চলের মধ্যে সব থেকে important Labour Union. তার দখল নিয়ে লড়াই হবে। এবং—, থাক্ সে-সব কথা। সে-সব কথার আগে একটা কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমাদের বিয়েটা একটা মারাত্মক ভুল, এই কথা তোমার দাদারা বউদিদিরা একবাক্যে বলেন। তোমার বাবা বলেন কিনা ঠিক জানি না। তবে মনে মনেও যদি কথাটা কচলান, তাতেও দোষ দেব না। আমার মা তো তার অখুশীর কথা গোপন করতেন না। কিন্তু ভুলটা কার? আর ভুলটাই বা কি?

ভুলটা তোমারও বটে, আমারও বটে, আমাদের অভিভাবকদেরও বটে; তবে বিবাহ করেছি আমরা—ভুল আমাদেরই।

তবে এ ভুল চিরকাল, মানে সেই আদিকাল থেকে করে আসছে মানুষ। রাজার ছেলে ঘুঁটেকুড়ুনীকে বিয়ে করেছে, রাজকন্তে রাখাল ছেলেকে ভালবেসেছে—সব বাধা-বিঘ্ন বুক দিয়ে ঠেলে বেড়ি ভেঙে প্রাসাদের উপর থেকে লাফিয়ে পরিখার জলে পড়ে ওই রাখাল ছেলের পাশে দাঁড়িয়েছে।

রাজার ছেলে রাজার মেয়ের বেলাতেও ভালবাসার পথ মসৃণ ছিল না। সংযুক্তা-পৃথীরাজের বিয়ের ব্যাপারটা ভেবে দেখ; চৌহান রাজবংশই শুধু ধ্বংস হয়নি, গোটা ভারতবর্ষ মুসলমানদের পায়ের তলায় এসে গেল। এখানে সংযুক্তার রূপের জন্য যুদ্ধ হয়নি, সংযুক্তার পিতৃপক্ষ ওই তার কন্যা পৃথীরাজকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল বলে—মুসলমানদের ডেকে এনেছিল। সুভদ্রা-হরণ রুক্মিণী-হরণ এসব পুরাণের কথা।

সামাজিক যুগে, বড়লোকের ছেলে গরীব লোকের মেয়ে, বড়লোকের মেয়ে গরীব লোকের ছেলের বিয়ে অজস্র হয়েছে এবং তার ট্রাজেডিও মানুষের মুখে মুখে রয়েছে। গল্প-উপন্যাসে রয়েছে।

তবে তোমার বাবা তো বড়লোক, মানে ধনী লোক নন! ব্যারিস্টার হলেও আয়টায় তো খুব বেশী নয়।

ভুল আমার ওখানেই হল।

দেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে খাড়া করা হল। সামন্তরাজারা গেল, জমিদারদের জমিদারী গেল, কদর বাড়ল গুণী লোকদের। বামুন বৈদ্য কায়স্থ গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক সদগোপ মাহিষ্য নবশাখ এসব বেড়াগুলোও শুকনো শাক আড়ার পুরনো বেড়ার মত ঝড়ে-বৃষ্টিতে ধাক্কায় খসে পড়ল, ভেঙে শুয়ে পড়ল।

তোমার মনে আছে বিয়ের আগে তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম—তাতে লিখেছিলাম তুমি আমাকে ভালবাস, আমি তোমাকে ভালবাসি। এর মধ্যে—এই স্বাধীন ভারতবর্ষে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ যে ভারতবর্ষের আদর্শ—সেখানে বামুন-বদ্যি প্রশ্নটা কি প্রশ্ন

নাকি? আমার যাকে মানতে হবে, আমি তাঁকে মানাবো।

কিন্তু ভুলটার সামনে দাঁড়িয়ে ভুলটা করে ফেললাম।

ভুলে গিছলাম তোমার দাদারা আলাদা পার্টির-লোক। আমি অন্য পার্টির ছেলে। তোমার দাদারা বউদিদিরা যে পার্টির মেম্বার, সে পার্টির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য মারাত্মক।

অবশ্য তখনও তুমি পার্টির মেম্বার ছিলে না—স্টুডেন্টস ফ্রন্টে ওদের সমর্থক ছিলে। এবং তোমার বাবা পার্টির মেম্বার ছিলেন না। তুমি আমাকে আকর্ষণ করেছিলে, কিন্তু তাঁর উদারতা এবং স্নেহ আমাকে উৎসাহিত করেছিল। এত উদার তিনি! বোধ করি সেই কারণেই তিনি এ বিয়েতে অমত করতে পারেন নি। তুমি—তুমিই আমাকে বলেছ—বাবার কাছে বলেছিলে—বাবা আমি যে ওকে ভালবাসি! নাই বা হল ও দাদাদের পার্টির লোক।

আর একটা কথা বলব—বলতে হবে, না বললে আমি অকৃতজ্ঞ হব—তোমার বাবা আমাকে সত্যই ভালবাসতেন।'

* * *

না। কোথাও এতটুকু সত্য গোপন করেনি, একবিন্দু মিথ্যাও জুড়ে দেয় নি। কিছু আড়াল দিতে চায়নি।

ব্যারিস্টার বি-বি-ডি,—বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত ব্যারিস্টার হিসেবে বড় নন—তাঁর আয়টায় প্রথম শ্রেণীর কেন, দ্বিতীয় শ্রেণীরও অনেকজনের পরে। তবে রাজনীতি শাস্ত্রের তত্বজ্ঞ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ভারত-জোড়া তো বটেই, আংশিক ভাবে বিশ্বব্যাপ্ত বলা যায়। সোসালিজম থেকে কম্যুনিজম পর্যন্ত সকল ইজমের আধুনিকতম আকারপ্রকার ভাবভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর মতামত রাশিয়া চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের অনেক আগে থেকেই এদেশের পলিটিক্যাল পার্টিগুলি তাঁর মতামতের জন্ম উদ্‌গ্রীব থাকত, তাঁর কাছে মতামতের জন্ম আসত; স্বাধীনতার পর তাঁর ওজন বেড়েছে, এখন বামপন্থী বিদেশী রাষ্ট্রের যেসব আগন্তুকবৃন্দ ডেলিগেশন দলভুক্ত হয়ে আসেন—তাঁরা বি-বি-ডি'র সঙ্গে দেখা ক'রে যান। তিনি নিজে কোন দলভুক্ত নন—সকল দলকেই কিছু কিছু সাহায্য তাদের প্রয়োজনের সময় করেও থাকেন। সেখানে ফেরান না তিনি কাউকেই; তবে একটি রাজনৈতিক দলকে সাহায্য কিছু বেশী করেন—কারণ তাঁর দুই ছেলে এবং পুত্রবধূরা ওই পার্টির সভ্য। সভ্য-সংখ্যা কম, কিন্তু তারা প্রতিটিজনই মডার্ন বিশিষ্ট ইন্টেলেকচুয়াল।

কন্যা সুতপা—তাঁর সব থেকে প্রিয় সন্তান—মা-মরা মেয়ে—সে-ও এই পার্টির ছাত্রফ্রন্টে স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত পাণ্ডাগিরি করেছে। হঠাৎ সে পাল্টে গেল। হঠাৎ তার দৃষ্টি রাজনৈতিক দিগন্ত থেকে পিছলে এসে বা সরে এসে আবদ্ধ হল সুব্রতর উপর।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

সুব্রত তাই লেখে। লোকেরা অবশ্যই মুখার্জী বলে। সুব্রত সংশোধন করে দেবার চেষ্টা অনেক করেছে—কিন্তু পারেনি। যে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করত—আপনি সুব্রত মুখার্জী? সে বলত—না। মুখোপাধ্যায়।

সুতপাই জিজ্ঞাসা করেছিল এবং ওই উত্তর পেয়ে বলেছিল—মুখার্জীতে দোষটা কি ?

সুব্রত বলেছিল—বামুন কায়েত বদ্যিদের আদ্ধেক জাত মেরে দিয়ে গেছে ইংরেজ পদবীতে বিলিতী ঢং ঢুকিয়ে। বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় ব্যানার্জী মুখার্জী চ্যাটার্জী করে, বসুকে বোস বাসু ভোস করে, গুপ্তকে গুপ্টা করে, রায়কে রে করে। স্বাধীনতার পর ওগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

সুতপা বলেছিল—মানে জাতটা ফিরিয়ে আনতে চান। আপনি তো খুব চীপ স্টান্ট-হান্টার দেখছি।

—জাত আমি ফিরিয়ে আনতে চাই, কিন্তু স্টান্ট-হান্টার আমি নই।

—জাত মানেন আপনি ?

—মানি না। ন্যাশানালিটিতে আমি ইণ্ডিয়ান, জাতিতে আমি ভারতীয় এটা ভুলব কি ক'রে ? হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান—এ জাত আমিও ঠিক মানি না, এ জাতের থাক উঠিয়ে দেবার আন্দোলন করলে আমাকে ভলেন্টিয়ার পাবেন—কিন্তু ভারতীয় জাতিত্ব ওঠাতে গেলে যে স্বাধীনতাকে আবারও জলে ডোবাতে হবে। ন্যাশানাল থেকে ইণ্টারন্যাশানাল হওয়া আমার ধাতে ঠিক সয় না।

সুতপা তার মুখের দিকে একরকম অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল।

সুব্রতর তখনও কথা শেষ হয়নি, সে বলেই চলেছিল—ওই ভারতীয় জাতিত্ব অনুযায়ী আমি মুখোপাধ্যায়, মুখুজ্যেও বটে। কিন্তু মুখার্জী নই।

সুতপা এবার বলেছিল—আপনি হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান জাত ঠিক মানেন না বললেন। মানেন না ? ঠিক মানেন না কেন বললেন ?

সুব্রত বলেছিল—আমার মা আছেন। তিনি মানেন তো। তাই বলছি—ঠিক মানি না। তবে পৈতে আমি রাখিনে এবং ঠাকুর দেবতা সংস্কার এসব মানিনে—তা আমার মা জানেন।

সুতপা বলেছিল—আপনার মায়ের খুব প্রশংসা করেছিল আমার বাবা। আপনার থেকেও বেশী।

—মিস্টার দাশগুপ্ত ? আপনি তো সুজিত দাশগুপ্তের বোন ? ব্যারিস্টার বি. বি. দাশগুপ্তের মেয়ে ?

—হ্যাঁ। আপনি, আপনার মা আমার বাবার খুব যত্ন করেছিলেন। বাবা বলছিলেন—বাংলাদেশের এইটি আমি ঠিক জানতাম না। আমার অজানা ছিল। হয়তো না জেনে এ দেশ সম্পর্কে যা লিখেছি তাতে মনে হচ্ছে আমার রিমার্কসের মধ্যে আমি ভুল করেছি। বেশ কিছু ভুল করেছি।

সুব্রত বলেছিল—আমরা অবশ্য এমন কিছু করেছি বলে মনে করিনে। ওঁর উপযুক্ত যত্ন আমরা করি এমন সাধ্যও আমাদের ছিল না। কিন্তু উনি আমাদের সেই অকিঞ্চিৎকর যত্ন যে পরিতোষের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে আমরা আশ্চর্য হয়ে গিছলাম। কিন্তু

আমাকে খুঁজছিলেন কেন? আমাদের কথা বলতে দেখে কলেজের ছেলেরা বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

সুতপা জানিয়েছিল—বাবা আপনাকে দেখা করতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন—আমি ভেবেছিলাম সে নিজেই আসবে। যাই হোক, তুই তাকে বলিস আমি দেখা করতে বলেছি—এলে আমি খুব খুশী হব।

বি. বি. দাশগুপ্ত একরাত্রি এবং একদিনের একবেলা—সুব্রতদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এবং খুবই খুশী হয়ে এসেছিলেন।

বর্ধমানের কাটোয়া সাবডিভিশানে গঙ্গার ধারে সর্বানন্দপুর একখানি প্রাচীন গ্রাম। বিখ্যাত বৈদ্যবাসভূমি শ্রীখণ্ডের কাছেই। বড় গ্রাম নয়, ছোট গ্রাম। এই গ্রামেরই ওরা অধিবাসী ছিলেন একদা। মানে দাশগুপ্তরা। মুখুজ্যেরাও এই গ্রামের বাসিন্দে। এখান থেকে বিজয় দাশগুপ্ত মশায়ের পিতামহ ডাক্তারী পাস করে রেলের ডাক্তারী চাকরি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলেন কলকাতায়। দেশে ফেরেননি। দেশে তখন ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণ চলছে। বিজয়বাবুর বাবাই প্রথম কুলবিদ্যা চিকিৎসা-বিদ্যা ছেড়ে আইন-ব্যবসায় গ্রহণ করেন। বিজয়বাবুর বাবা এখানে সম্পত্তি করেননি, তবে এখানকার বাড়িখানি মেরামত করিয়েছিলেন এবং বাড়িতে যে পুজা ছিল, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। জীবনের একটা সময়—সেটা তাঁর খুব চলতির সময়—সে-সময় বছর বছর পুজো উপলক্ষে গ্রামে আসতেন। সে সময় বিজয়বাবু ক'বছর এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স আট-নয়। তের-চৌদ্দ বছর পর্যন্ত এসেছিলেন। তারপরই বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর আর বিজয়বাবু দেশে আসেননি।

যাক সে-সব কথা। সে-সব অনেক ইতিহাস। বিজয়বাবু খ্যাতিলাভ করেছেন, নিজের জীবনকে নিজের উপলব্ধ সত্যপথে ও মতে চালিত করেছেন। পুজো উঠিয়ে দিয়েছেন, এখানকার জমি-জেরাত জ্ঞাতিদের দান করে দিয়েছেন। সে অনেক অনেক কথা।

বহুকাল পরে হঠাৎ ১৯৬১ সালে বর্ধমানে আইনজীবী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে এসে বর্ধমান-কাটোয়া লাইনের ট্যারা-বেঁকা নড়বড়ে ঝরঝরে ছোট লাইনের গতি দেখে দেশের কথা মনে পড়ে গেল।

বুড়ো বয়সে বোধ করি মানুষের মায়া বাড়ে।

ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর একবার সর্বানন্দপুর গিয়ে বাপ-পিতামহের জন্মস্থান পুরুষ-পুরুষান্তরের বাস ভিটেখানি দেখে আসেন।

কনফারেন্স-শেষে তাঁর চাকরকে সঙ্গে নিয়ে টিকিট কেটে চেপে বসেছিলেন ছোট লাইনের গাড়িতে।

অসুবিধে ছিল অনেক এবং সে-সবের অনেক কথাই তাঁর মনেও এসেছিল। কিন্তু সে-সবকেই প্রায় তিনি, কড়া গৃহস্বামী যেমন ক'রে জোর ক'রে ঢুকে পড়া অবাঞ্ছিত জনকে ঘাড় ধরে বের করে দেয় বাড়ি থেকে, তেমনি ক'রেই জোর ক'রেই হটিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু গ্রামে পৌঁছে মনে হল ভুল করেছেন। যে ভাবনা-চিন্তাগুলোকে অবাঞ্ছিতজনের মত দূর করে দিয়েছিলেন, তারা সদর দরজা থেকে হটে গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে একেবারে বাড়ির ভেতর ঢুকে চেপে বসে আছে। বিজয়বাবুর পৈতৃক বাড়িতে একজন দারোয়ান থাকত—আর জমি-জেরাত দেখাশুনো করত তাঁর জ্ঞাতিরা—তাদের খবর তিনি পাঠিয়েছিলেন। দারোয়ানটি ঘরদোর পরিষ্কার করিয়েও রেখেছিল, বালতিতে জলও তুলিয়ে রেখেছিল, তার বেশী কিছু তার অনুমান বা কল্পনার মধ্যে আসেনি। প্রথমেই বিজয়বাবুর অসুবিধে হয়েছিল চা নিয়ে। তাঁর জ্ঞাতিটির বাড়ি থেকে যে চা এসেছিল সে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল জিভ থেকেই ফেলে দেন; কিন্তু জ্ঞাতিটির সামনে তা পারেননি। মনকে প্রাণপণে শক্ত করে গলাধঃকরণ করেছিলেন এবং একটা বমির ভাবকে চেপে ধরেছিলেন। এমনই ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছিল সুব্রত। কলেজে পড়ে। তখনও আই-এ, বি-এ, এম-এর কাল, বি-এ পড়ছিল সুব্রত। সর্বানন্দপুরের সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে। সুরেশ মুখোপাধ্যায় প্রথম যৌবনে একটা কনস্পিরেসি কেসে জড়িয়ে পড়ে বছর দশেকের জন্যে আন্দামানে গিয়েছিল; ফিরে এসে পৈতৃক পঁচিশ-ত্রিশ বিঘে জমি নিয়ে চাষ অবলম্বন করেছিল। তার সঙ্গে করত কংগ্রেস কর্ম। বিয়াল্লিশ সালেও জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে বেশী দিন বাঁচেনি। তারই ছেলে এই সুব্রত। গান্ধীজীর নির্দেশে বিনোবাজী যেদিন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে পদযাত্রা শুরু করেন, সেইদিন সুব্রতর জন্ম। তাই তার বাবা সেইদিন, প্রায় বলতে গেলে জন্ম-মুহূর্তে নাম রেখেছিল সুব্রত।

সুব্রতর মা প্রভাময়ী শহরের মেয়ে এবং প্রথম যৌবনে স্বামী যখন কনসপিরেসি কেসের আসামী হয়ে জেলে যান, তখন তিনিও দেশের কাজে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তবে তাঁর কাজ ছিল সমাজসেবা, চরকা আর গান্ধীজীর বাণীপ্রচার। সুব্রত তাঁর হাতে মানুষ। ভাল ছেলে বলে নাম ছিল সুব্রতর। সুব্রতকে তার মা প্রভাময়ীই পাঠিয়েছিলেন খোঁজ করতে। এখানে তাঁর অসুবিধে কি হচ্ছে দেখতে।

প্রায়-ভর্তি চায়ের কাপটাকে নামিয়ে রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন বিজয়বাবু। কেউ বিশেষ লক্ষ্য করলে না। শুধু বিজয়বাবুর খাস খানসামা শিবু বেয়ারা চঞ্চল হয়ে উঠল। এবং বিজয়বাবুর কাছে এসে মৃদুস্বরে কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বিজয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন—না। সমস্তটা অনুমানে বুঝলে সুব্রত। এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই একটি ট্রের উপর একটি ভর্তি টি-পট একখানা প্লেটে ঘরের তৈরী ক্ষীর-নারকেলের কয়েকটি মিষ্টি, আর খানকয়েক ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুট সাজিয়ে উপরে একখানি ধবধবে ঢাকনা ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসে নামিয়ে দিল বিজয়বাবুর সামনে একখানা চেয়ারের উপর।

বিজয়বাবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এ কি? এ কেন?

একটু হেসে সুব্রত বলেছিল—আমার মা পাঠিয়ে দিলেন তৈরি করে। চা নয়—কফি।

—কফি? বিস্মিত হয়েছিলেন বিজয়বাবু।

—হ্যাঁ।

উপস্থিত যারা ছিল তাদেরই একজন বললে—ওর মা প্রভাময়ী দেবী আমাদের সারা গ্রামের মা-ঠাকরুণ।

—অ। তা উনি কফি খান নাকি?

সুব্রত বলেছিল—না। মা চা-ও খান না। তবে গ্রামে তো মাঝে-মধ্যে প্রায়ই ইনি-উনি আসেন—আজ এটা কাল ওটা—তাই চা-কফিটফি রাখতে হয়।

—কিন্তু আমার তো আর দরকার নেই—

—একটু মুখে দিন। মা সমাদর ক'রে পাঠিয়েছেন আপনাকে—

হেসে বিজয়বাবু বলেছিলেন—মিষ্টিগুলো কি কেনা না বাড়ির তৈরী—ক্ষীর-নারকেলের তৈরী ক্ষীরপুলি মনে হচ্ছে—

—মায়ের নিজের হাতের তৈরী।

—তা হ'লে একটা খাব। অনেকদিন ক্ষীরপুলি খাইনি।

একটা নয় চারটে ক্ষীরপুলির সাড়ে তিনটে খেয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে বলছিলেন—বাঃ। তারপর কফিটা শেষ করে—আবার আধকাপ টি-পট থেকে ঢেলে নিয়েছিলেন।

এরপর দ্বিতীয় দফা—সন্ধ্যেবেলা আলো নিয়ে।

আলো একটা ছিল। আলো-অন্ধকার একটা হ্যারিকেন। সেইটের দিকে ভুরু কুঁচকে তিনি তাকিয়ে আছেন—হাতের বইখানার পাতা বাতাসে ওল্টাচ্ছে—এমন সময় একটা হ্যাজাক লণ্ঠন হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সুব্রত এসে হাজির হয়েছিল। হ্যাজাক লণ্ঠনটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে লালচে চিমনী হ্যারিকেনটা সরিয়ে দিয়েছিল।

বিজয়বাবু পরম স্নেহভরে কথঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন—You are an angel from Heaven, my boy. তুমি দীর্ঘজীবী হও—ভগবানের আশীর্বাদ তোমার উপর ঝরে পড়ুক।

সুব্রত তাঁকে প্রণাম করেছিল। তিনি বলেছিলেন—তুমি আমাকে প্রণাম করছ কি হে? তোমরা যে ব্রাহ্মণ, আমরা বৈদ্য—

সুব্রত বলেছিল—আপনি এ যুগে সত্যিকারের একজন ঋষি, আপনাকে প্রণাম করব না?

এর উত্তরে হয়তো বিজয়বাবু তর্ক এবং যুক্তি দিয়ে অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগবিস্তার করতে পারতেন—ইদানীং এটা তাঁর একটা স্বভাবের মধ্যে না হোক অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—আজ কিন্তু তিনি চুপ করে গিয়েছিলেন—কতটা অভিভূত হয়ে গিছলেন এবং মিষ্ট লেগেছিল ছেলেটির এই প্রণামটি।

এরপর পরদিন ভোরবেলা সুব্রত আবার ট্রেতে সাজিয়ে বিস্কুট-চা এনে হাজির করেছিল—তখনও বিজয়বাবু বিছানায়। শীতকাল, দরজা বন্ধ—সুব্রত টেবিলের উপর ট্রে নামিয়ে ভাবছিল—এমন সময়ে বাইরে এসেছিলেন বিজয়বাবু। ট্রের উপরের পেয়ালা পিরিচ টি-পটের টুংটাং শব্দ তাঁর কানে গিয়েছে। শিবু বেয়ারাকে সুব্রত বলছিল—তুমি যে

বললে সাহেব খুব ভোরে ওঠেন। পাঁচটায়—

শিবু বললে—হাঁ তো। সে তো উঠেন। কিন্তু কাল রাত্রে সারারাত সাহেব ঘুমালেন না।

—দু'তিনটে ধেড়ে ইঁদুর বড় জালিয়েছে হে—বলে বেরিয়ে এসেছিলেন বিজয়বাবু।—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম শেষরাতে। কিন্তু এই ভোরে তুমি চা নিয়ে এসেছ। তোমাদের ঋণ শোধ হবার নয়। তা হোক—ঋণী হয়েই থাকব। বস, চা খাওয়া যাক। ঢালো।

চা ঢালতে ঢালতে সুব্রত বলেছিল—আমি চা খাইনে।

—কি মুশকিল। আমার জন্যে খাও অন্তত। আমার যে ভারী সঙ্কোচ লাগছে সুব্রত। দেখ তো, তোমরা চা খাও না অথচ এই ভোরবেলা উনোন ধরিয়ে আমার জন্যে চা করেছ। খাও—এক কাপ চা খাও—for my sake!

এরপর দুপুরবেলা তাঁকে সুব্রতদের বাড়িতে খেতে হয়েছিল। প্রভাময়ী দেবী নিজে এসে তাঁকে নেমন্তন্ন ক'রে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—খেয়ে যাবেন। নাহলে সারাদিন ভারী কষ্ট পাবেন। এখানে আটটায় চড়ে বর্ধমান—সেখান থেকে হাওড়া যেতে সেই বিকেল-বেলা হবে। তার থেকে সাড়ে দশটায় খেয়ে যাবেন—আমি রান্না চড়িয়ে দিয়ে এসেছি—ওরই মধ্যে মাছের ঝোল ভাত ক'রে দেব আমি।

প্রত্যাখ্যান করেননি বিজয়বাবু। তবে বলেছিলেন—আপনার হাতে যখন খাব তখন কিন্তু নিরামিষ খাব। আমার মা অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন—নিরামিষ খেতাম ছেলেবেলা তাঁর পাতে। বেশ একটু সুক্তোর ঝোল খাব। মাষকলাই বাটা ফেটিয়ে তারই পোরের ভাজা।

প্রভাময়ী হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন—তাই হবে। তবে তার সঙ্গে মাছের ঝোল করে দেব। মাছ রাঁধার কথা বলছেন—তা সে তো আমি রাঁধি। সুব্রত তো মাছ খায়।

* * *

সুতপা পড়ছিল সুব্রত লিখেছে—

'তোমার বাবা সত্যিই ঋষিতুল্য মানুষ। তুমি আমাকে জানালে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে বলেছিলেন—আমি ভেবেছিলাম তুমি কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। স্টেশনে তো আমি তোমাকে বলেছিলাম আসবার জন্যে। কিন্তু এলে না কেন?

আমি চুপ করে ছিলাম—সত্যি উত্তরটা মুখে আটকেছিল।

উনি বলেছিলেন—বড়লোক কম্প্লেক্স? কিন্তু আমি তো বড়লোক নই। আর বড়লোক তো নেই এযুগে। দু-দশটা আছে জীর্ণ বৃদ্ধ অথর্ব অতিকায় জন্তুর মত পড়ে, তারা যাবার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তা হলে? বিলেতফেরত বলে—জাতটাত—! না, তাও তো না—তুমি আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছ। তবে? তারপর বলেছিলেন—তুমি

স্কটিশে পড়—আমার মেয়েও স্কটিশে আই-এ পড়ে। আমি তাকে বলব, সে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।'

সুব্রতকে বিজয়বাবু কলকাতায় এসে তাঁর বাড়ি আসতে বলেছিলেন। কিন্তু সুব্রত আসেনি। বিজয়বাবু কিন্তু তার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। শুধু সৌজন্যের খাতিরেই বলেননি ; তিনি ওকে জানতেও চেয়েছিলেন।

ছেলেদের বলেননি। দুই ছেলেই রাজনীতিতে একেবারে পাঁকাল মাছের মত পাঁকের ভেতরের জীব হয়ে পড়েছে।

বড়ছেলে ব্যারিস্টার এবং পলিটিকাল ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টারি-রাজনীতির আসরে ঘোরেন—ছোটছেলে বিলেতে থেকে ফোক আর্ট ফোক সংএ বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এসেছে। নিজে স্বাধীনভাবে কাজও করে—আবার পার্টির কালচারাল ফ্রণ্টেও কাজ করে। এখন তার সঙ্গে লক্ষ্য—সিনেমার মিউজিক ডিরেক্টরিতে। ছোটবউ পার্টির মেয়ে, গাইতে পারে, আর্টিস্ট হিসাবে নাম ছিল, পার্টির প্রচার-নাট্য করে বেড়াত। এ বাড়ির ছোটছেলের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে আর একজনের সঙ্গে বিয়েও হয়েছিল, কিন্তু বিজয়বাবুর ছোটছেলের সঙ্গে আলাপ হবার পর, সে বিয়ে ডাইভোর্স হয়ে বাতিল হয়ে গেছে। বড়বউ গিন্নীবান্নী মানুষ এবং স্বামীর টানে তিনিও পার্টি করেন।

তিনি অর্থাৎ বিজয়বাবু তাতে আপত্তির কিছু দেখেন না, তবে এক্ষেত্রে মুশকিল হয়েছে এই যে, এই খদ্দর-পরা ছেলেটি মোটামুটি তাঁর ছেলেমেয়েদের পার্টির লোক নয়। ছেলে-বউয়েরা অন্য পার্টির লোককে তো বরদাস্ত করতে পারবে না। এটা কেমন ওদের স্বভাব—হয় তুমি আমার সঙ্গে আছ, আমার মিত্র, নয়তো তুমি শুধু পরই নও, তুমি শত্রু। মাঝখানে কিছু নেই। কেবল মেয়ে সুতপা তখনও পর্যন্ত পার্টি-সাপোর্টার—পার্টি-মেম্বার তখনও হয়নি ; নিজে বিজয়বাবু বাধা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—আরো কিছুদিন যাক না রে। মনটা আর একটু শক্ত হোক।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—দেখ, পার্টি-মেম্বার হলেই তো আমাকে ভুলে যাবি।

দু-তিনটে ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য একথা তিনি বলেছিলেন। সে-সব ঘটনাগুলো তার অবিদিত ছিল না।

দুটো ছোটবউদিকে নিয়ে। একটা বড়দাকে নিয়ে।

এর মধ্যে একটার কথা এ বাড়ির সকলের মনেই যেন দুরারোগ্য ক্ষতের মত জীবনের সঙ্গী হয়ে আছে। ছোটবউ মাধুরীর সেদিন একটা নাটকের ফাইনাল রিহার্সাল। বিজয়বাবু বিকেলবেলা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বুকে অস্বস্তি, তার সঙ্গে ব্যথা। এ্যানজাইনা আছে ওঁর। ওষুধপত্রও সঙ্গে থাকে তাঁর। সেদিন বাড়িতে কেউ নেই তখন। সুতপা বড়ভাই বড়বউদির সঙ্গে বড়বউদির বাপের বাড়ি গেছে হালিশহর ; ছোটভাই সুজিত, ওই যে-

নাটকের রিহার্সালে যাবার জন্ত তখন ছোটবউ তৈরি হচ্ছিল—সেই নাটকের ব্যবস্থার জন্ত তখন স্টেজে চলে গেছে। এই সময় ঘটল ব্যাপারটা।

বিজয়বাবু সেদিন অসুখ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শিবু খানসামাকে বলেছিলেন—ছোটবউমাকে গিয়ে বল—আমার মনে হচ্ছে অসুখটা এবার সম্ভবত শক্ত। ডাক্তার যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ যেন উনি না যান। বাড়িতে কেউ নেই—

ছোটবউ কথা শোনেনি। তার ড্রেস রিহার্সালে খানিকটা দেরি করতেও সে পারেনি—চলে গিছল। বলেছিল—ওরে বাপ্‌রে! আর আমার এক মিনিট দেরি করবার উপায় নেই।

শিবু বলেছিল—আজ্ঞে না। সাহেব বলছেন—ছোটবউমা যেন না যান।

—না যান! না যান কি? দেখছ না আমি বেরিয়েছি! বাবু কি যত বয়স হচ্ছে তত ছেলেমানুষ হচ্ছেন! আমি বরং ডাক্তারবাবুকে বলে দিচ্ছি ফোনে—তিনি যেন একজন নার্স সঙ্গে নিয়ে আসেন!

বড়ছেলে অজিতের সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটেছিল—সেটা অন্ত ধরনের। বিজয়বাবুর কাছে একটি পলিটিক্যাল পার্টির নেতা আসা-যাওয়া করছিলেন কিছুদিন ধরে এবং চাঁদা হিসেবে টাকাকড়িও নিয়ে যাচ্ছিলেন। বড়ছেলের পলিটিক্যাল পার্টির বিরোধী পার্টি। শুধু ভোটের ক্ষেত্রেই বিরোধটা সীমাবদ্ধ নয়, আদর্শের ক্ষেত্রে সে বিরোধ সম্ভবতঃ অধিকতর তীব্র। এই নেতাটি একদিন বিজয়বাবুর বাড়িতে এসে তাঁর দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। ফেরার পথে গেটের মুখে দেখা হয়েছিল অজিতের সঙ্গে। অজিত বাইরে থেকে বাড়ি ফিরছিল। পরস্পরের পরিচিত ব্যক্তি। অজিত দাশগুপ্ত তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিল। যে ব্যঙ্গটা করেছিল সেটা শুধু মর্মান্তিকই নয়, তারও চেয়ে অধিকতর লজ্জাজনক।

কথাটা বিজয়বাবুর কানে উঠেছিল। কানে উঠেছিল ঠিক না; তিনি খোঁজখবর করে জেনেছিলেন। এই বৃদ্ধ মাননীয় ব্যক্তিটি কয়েকদিন না আসার জন্ত খোঁজ করেছিলেন। ওদিকে দুই ছেলেই তখন এই চাঁদা দেওয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছে। বিচক্ষণ লোকেরা মন্দ বলছে। বিচক্ষণ লোক অবশ্য তারাই, যাদের বিচক্ষণ বলে গণ্য করে তাদের পার্টি। তারা অজিত-সুজিতকে ঠাট্টাও করে। সে ঠাট্টা, তাদের চামড়া শক্ত হলেও, জ্বালাকর রসায়ন মাখানো লোহার ফলাযুক্ত তীরের মত বিদ্ধ করত। সুতরাং তারা পুত্রের অধিকারকে বড় ক'রে যতখানি জোরালো করা যায় জোরালো ক'রে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল—এভাবে আপনি চাঁদা দিতে পাবেন না। ওই লোকটাকে ভিক্ষে দিতে চান দিতে পারেন; একজন ভিক্ষুককে ভিক্ষা হিসেবে—

বিজয়বাবু মধ্যপথেই বলেছিলেন—না।

বড়ছেলে চমকে উঠেছিল—কি না?

বিজয়বাবু বলেছিলেন—তোমাকে কথা বলতে নিষেধ করছি। এ সব কোন কথাই বলবার অধিকার তোমাদের নেই। আমি বাপ, তোমরা ছেলে—তবুও নেই। তুমি অজিত,

সেদিন ওঁকে কতকগুলি অপ্রিয় কথা তোমার অধিকারের বাইরে অবাঞ্ছিত উপহাসের ভঙ্গীতে বলেছ—সেও আমি শুনেছি। আশা করি অতঃপর আর এরকম ঘটনা ঘটবে না।

এর ফলে সংসারটাই তিনটুকরো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড়ছেলে বড়বউ, ছোটছেলে ছোটবউ এবং বিজয়বাবু ও মেয়ে সুতপা। পুরনো ঠাকুরদার তৈরি বাড়িখানাকে অদলবদল ক'রে নিয়ে তিনটে আলাদা দরজাও ক'রে নিয়েছিলেন।

এই সব কারণেই বিজয়বাবু মেয়েকে বলেছিলেন—পার্টি-মেম্বার হলেই তো আমাকে ভুলে যাবি। আর পার্টি-মেম্বার হয়েই বা করবি কি?

সুতপা বাপের কথা মেনেছিল। পার্টি-মেম্বার হতে চেষ্টা করেনি। চায় নি। ছোটবউদি মাধুরী বার বার বলা সত্ত্বেও চেষ্টা করেনি। বড়বউদি অমিতা মেমসাহেব মেজাজের লোক এবং বড়লোকের কন্যা। স্বামীর প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আগ্রহের আর শেষ নেই। তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর স্বামীর পলিটিক্যাল পার্টির সমর্থক। বউদিদিরাও। অমিতা পার্টি-মেম্বার ছিলেন না—এখন হয়েছেন; স্বামীর তাগিদে হয়েছেন। তিনি সুতপাকে পার্টি-মেম্বার হতে বারণও করেননি, হতেও বলেননি। বরং বাবার কথাই শুনতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—বাবা যা বলেন তাই তুমি কর সুতপা। ছেলেরা পার্টি করতে গিয়ে ওঁকে মধ্যে মধ্যে দুঃখ দেয়, তুমি ওঁর একটি মেয়ে—তুমি আর ওদের সঙ্গে যোগ দিও না।

সুতপা পার্টি-মেম্বার হয়নি, কিন্তু ওদেরই ভাবনায় ভাবান্বিত ছিল। এবং এদেরই সঙ্গে ছিল ওর সকল প্রীতির বন্ধন।

* * *

নিজের গ্রাম সর্বানন্দপুর থেকে ফিরে এসে বিজয়বাবু সেই কারণেই সুতপাকে বললেন—হ্যাঁরে, তোদের কলেজে বি-এ ক্লাসের সুব্রত মুখার্জী বলে কোন ছেলেকে চিনিস? ইকনমিকসের ছাত্র। বেশ ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে। আর খদ্দর পরে। তোদের অপোজিট ক্যাম্পের ছেলে। তবে কংগ্রেস নয়।

এক ডাকেই চিনেছিল সুতপা। সুব্রত মুখার্জীর নাম সে শুনেছে—দু'চারবার দেখেছেও। তবে আলাপ নেই। কিন্তু কেন? জিজ্ঞাসা করেছিল—তাকে কি করে চিনলে তুমি বাবা?

বিজয়বাবু বলেছিলেন—ভারি ভালো ছেলে রে, ভারি ভাল ছেলে। সর্বানন্দপুরে গিয়ে যেসব অসুবিধেয় পড়েছিলাম—ওঃ! কবিরা গ্রামের ছবি আঁকেন—কিন্তু আসল গ্রাম যা—, ওরে বাপরে! চায়ে চুমুক দিয়ে না পারি গিলতে না পারি ফেলতে—সে আমার মারাত্মক অবস্থা। অথচ চায়ের জন্যে প্রবল তৃষ্ণা। এই সময় ছেলেটি এল, গরম কফি-ভর্তি টি-পট দুধ চিনি কাপ নিয়ে।

সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করেছিলেন বিজয়বাবু সুতপার কাছে। সব বলে বলেছিলেন—ছেলেটির মা যেমন, ছেলেটিও তেমনি। ওকে আমি বলেছিলাম—বড়দিনের বন্ধের পর এখানে এসে যেন আমাদের সঙ্গে দেখা করে। আমার মেয়ে সুতপা—সে আই-এ ক্লাসে

পড়ে ফটিশে। তাকে আমি বলব—সে তোমাকে নিয়ে আসবে। ও অবশ্য কথা দেয়নি—তবে I expected him. এলে আমি খুব খুশী হই। তুই তার খোঁজ ক'রে বলবি—আমি তাকে ডেকেছি। সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবি।

* * *

'সুতপা, আমি তোমাকে চিনতাম। কিন্তু বিখ্যাত বি বি ডি-র কন্যা বলে চিনতাম না। তোমার মডার্নিজমের মধ্যে এমন একটা বিশেষ কিছু ছিল—যার জন্তে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে হত প্রত্যেকটি ছেলেকে।

ছেলেদের থেকে মেয়েরা বোধ করি বেশী দেখত তোমাকে।

তোমরা জোরদার পার্টির ছাত্রফণ্টের সভ্য সব। তোমাদের চলার সঙ্গে উর্ধ্বগগনে মাদল বাজত, পায়ের তলায় ধরণীতল উতলা হত, তোমাদের দাপাদাপি—এসব আমাদের ভাল লাগত না। বিশেষ করে আমার নিজের। তবুও তোমার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল। শুধু আমার কেন—সব ছেলেরাই তোমাকে দেখত। সেটাই ওই মডার্নিজমের মধ্যে বিশেষ কিছু। একটি শালীনতা—একটি—কি বলব—রাজহংসীর মত ভাব! বুঝেছ? প্রথম দিন তোমাকে দেখে—আমায় ডেকে কথা বলছ বলে একটু আবোল-তাবোল বকেছিলাম। ওই যে মুখার্জী-মুখোপাধ্যায় সংবাদ; ওইটে। বোধহয় নিজেকে একটু স্মার্ট, নিজের একটুখানি পৌরুষ দেখাবার হাস্যকর চেষ্টা করেছিলাম আপনার অজ্ঞাতসারে।

থাক্।

তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি গেলাম।

তোমার বাবা খুব খুশী হলেন—আমিও হলাম। এমন একটি মানুষ—জ্ঞানের একটা সমুদ্র। বিশেষ ক'রে রাজনীতি-বিজ্ঞানের মধ্যেও কোথায় একটি আশ্চর্য জ্ঞাতুমীপ্সা আছে, জিজ্ঞাসা আছে তাঁর—যার সন্ধান পেয়ে অভিভূত হয়ে যেতাম। ওটা আমার মধ্যেও ছিল কিনা। ছিল বলেই তো তোমার দাদাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারিনি। ওই পার্টির স্রোতে গা ভাসাতে পারলে তো সকল সংশয় সকল সমস্যা মিটে যেত। এমন বিয়োগান্ত পরিণতিতে এসে পৌঁছতে হত না।

ওই দেখ অকারণ বেশী বকছি। অকারণ হয়, তোমার আর আমার কথা—সে যে যে-কাহিনীর শেষ নেই—সেই কাহিনী।

তোমাকে আমি জয় করলাম।

তোমার রাজনৈতিক মতামত তোমার দাদাদের বউদিদিদের সঙ্গে এক—সে না হও তুমি পার্টি-মেম্বার। এটা আমি তো জানতাম। আর আমি তোমার দাদাদের পার্টির সব থেকে বড় শত্রু যে পার্টি সেই পার্টির মেম্বার না হলেও—ওই পার্টির মতই ছিল আমার জীবনসত্য এবং ওই পার্টির গতির ধারাই ছিল আমার চলার ছন্দগতি। এদিক দিয়ে তুমি উত্তর মেরু, আমি দক্ষিণ মেরু, তোমার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই—দিন আর রাত্রির

মত আমরা পরস্পরের বিপরীত—তোমার সঙ্গে আমার মিলন হয় না—হতে পারে না—এ কল্পনা অবাস্তব—অসম্ভব—এর ফল বিষময়—বিষময় হতে বাধ্য, তবুও তোমাকে জয় করবার জন্ত ব্যাকুল হলাম আমি। ওটা জীবধর্ম। জীবন জীবনের সঙ্গে মেলে, কিন্তু নারী-পুরুষের দেহ ধরে মিলতে হয়।

তোমার বাবা একদিন বলেছিলেন—এক থেকে দুই হয়েই তো সব হল না। বিরহ-মিলন মান-অভিমান চাই, দেহে দেহে এক হওয়া চাই। তাই পুরুষকে দেখলেই নারীদেহে নারীবুকে দোলা লাগে—নারীকে দেখলে পুরুষ চমকে জেগে ওঠে।

আমি তেমনি ক'রে জেগেছিলাম এবং মনে মনে জয় করবার সঙ্কল্প করেছিলাম তোমার মনকে; আর হাত বাড়িয়েছিলাম—'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামন'—: তোমার হাতখানি ধরবার জন্ম। কিন্তু হাত বাড়িয়ে কোন নারীর হাত টেনে নিয়ে নিজের মুঠোতে চেপে ধরা—করায়ত্ত করা তো সহজ নয়। তুমি বিখ্যাত বি বি ডি-র কন্যা, ব্যারিস্টার অজিত দাশগুপ্ত এম্ এম এল এ-র বোন, একটা এত বড় পলিটিক্যাল পার্টির স্টুডেন্ট ফ্রন্টের একজন উৎসাহী অতি-আধুনিকা সমর্থনকারী; তার হাত চেপে ধরে 'তুমি আমার' বলা তো সহজ নয়। এ এক পুরাকালে পারতেন কৃষ্ণ-অর্জুনের মত বীরেরা—আর একালে পারে যারা মস্তান তারা। সুতরাং তোমার দিকে আমার হাত বার বার প্রসারিত হতে চাইলেও প্রসারিত হতে দিইনি। মন মনের পথে এগিয়েছিল—তোমার মনকে জয় করতে চেষ্টা করেছিলাম। একটা সস্তা পথ ছিল ইউনিয়নের পথ, কিন্তু তুমি যে ছাত্রফ্রণ্টে কাজ কর—তার বিরোধী ফ্রন্ট আমার ফ্রন্ট। আমি ছিলাম আমার ছাত্রফ্রণ্টের লীডার। কিন্তু আমার ফ্রণ্টটা ছিল দুর্বল। ফ্রন্ট দুর্বল হলেও আমি দুর্বল ছিলাম না। আমি বক্তৃতা করতে উঠলে হাততালি পড়ত। তুমি শুনতে খুব মন দিয়ে—কারণ তোমার সঙ্গে আলাপের পর যখন থেকেই আমাদের মধ্যে চুম্বক-লোহার খেলা শুরু হয়েছে—তখন থেকেই আমি ছাত্রসভায় বলতে উঠে সর্বাগ্রে তোমাকে খুঁজতাম এবং তোমাকে প্রথম সারিতেই পেতাম।

কলেজে তোমার সঙ্গে কথা কওয়া সহজ ছিল—তুমিও সে সম্পর্কে সজাগ ছিলে, আমিও ছিলাম।

আর একটা পথ তোমার বাবা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা হল—আমার পরীক্ষা জীবনে কৃতকার্যতার পথ। বলেছিলেন—সর্বাগ্রে তুমি ভাল ক'রে পড়াশুনাটা শেষ কর। তুমি ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে, কিন্তু ম্যাট্রিক আই-এতে খুব ভাল রেজাল্ট কেন হয়নি তা ঠিক ধরতে পারিনে। মনে হয়, পড়াশুনো তুমি মন দিয়ে করান। পলিটিক্স করেছ বেশী। এ অত্যন্ত সস্তা পথ সুব্রত।

ওঁর কথার মধ্যে তোমাকে জয় করার পথের যেন নির্দেশ পেয়েছিলাম। বি-এ পরীক্ষায় ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলাম। খবর বের হলে—আমি ইউভিভারসিটি থেকে ছুটে গেলাম তোমাদের বাড়ি তোমার বাবাকে প্রণাম করতে—তোমার সামনে উজ্জ্বল মুখে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে। তোমার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি প্রদীপের মত জলবে—আমি জানতাম। আমার

রং কালো হলেও তুমি আমার সবল সুস্থ দেহলাবণ্যে মুগ্ধ ছিলে আমার অজানা ছিল না। মনে মনে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসখানার সেই একটা লাইন তুমি মধ্যে মধ্যে আওড়াতে: "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে।" ওটা তুমি লেখকের প্রশংসা করতে না, নায়িকারও না, আমি জানি—তুমি আমার প্রশংসা করতে। ভেবেছিলাম তোমাকে বলব কথাটা সেদিন। 'তোমায় ভালবাসি' কথাটা বলব;—তার ভূমিকা রচনার জন্ত বলব। কিন্তু আমি গেলাম তোমাদের বাড়ি—তুমি তখন বেরিয়ে এসেছ ইউনিভারসিটি আমার খবরের জন্তে। তোমার বাবাকে প্রণাম করলাম, তিনি বললেন—Congratulations! কিন্তু এখানে শেষ করলে হবে না। সামনে এম-এ। ভেবেছিলাম বলে ফেলি তোমার কথাটা। কিন্তু তোমার মত জানিনি বলে বলতে পারিনি। দেখা হয়েছিল পথে। আমি ফিরছিলাম তোমাদের বাড়ি থেকে। তুমি ইউনিভারসিটিতে আমায় না পেয়ে ঠিক ধরেছিলে আমি তোমাদের বাড়ি এসেছি এবং যথাসম্ভব দ্রুত বাড়ি ফিরছিলে। আসছিলে ট্যাক্সিতে। আমাকে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—গাড়ি থামিয়ে আমাকে ডেকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিলে।

ট্যাক্সিতেই আমি তোমাকে বলেছিলাম—তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।

তুমি বলেছিলে—কি কথা?

কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ না ক'রে সটান বলেছিলাম—ভালবাসি।

বোধ করি এইভাবে না বললে বলতে পারতাম না।

তুমি বলেছিলে—আমারও কিন্তু কথা আছে। সেইটেই আগে—

বলেছিলাম—বল। বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠেছিল।

তুমি বলেছিলে—ভালবাসি। আমি আগে।

আমি বলেছিলাম—আমি আগে।

* * * *

এরপর দু'বছরের পূর্বরাগ—সে তো তোমারও মনে আছে, আমারও মনে আছে। কফি হাউস—ইউনিভারসিটি ক্যান্টিন—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—স্ট্র্যাণ্ড—চৌরঙ্গীর পশ্চিম দিকের ফুটপাত ধরে হাঁটা, এসব থাক্।

ওসব ছাড়িয়ে মনে পড়ছে বাধার কথা, বিয়ের কথা। তোমার দাদা—তোমার বউদি—তোমার ছোড়দা—ছোটবউদি—তোমাদের পার্টিফ্রন্ট—বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, তোমার আমার মেলা হয় না।

তোমার বড়দা আমাকে ডেকে বলেছিলেন—দেখ হে, তুমি যেন একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছ। সুতপার সঙ্গে মেলামেশায় তুমি মাত্রা টাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তোমাকে একটু সাবধান করে দিচ্ছি।

তোমার ছোটবউদি বলেছিল—সুব্রতবাবু, আপনি বেশ ভাল বক্তৃতা করেন। আমাদের ড্রামা-পার্টিতে আসুন না। আমরা আপনাকে অর্জুনের পার্ট দেব—মানাবেও খুব

ভাল ; আমি সুভদ্রা-হরণ নাটক লিখেছি ; সুভদ্রার রোলে আপনি যদি বলেন তো সুতপাকে নামাতে পারি।

তারপর বলেছিল তোমার ছোটবউদি—সোজাসুজি বলা যাকে বলে তাই—পারবেন ? যদি না পারেন—তা হলে সরে দাঁড়ান। বুঝেছেন ?

তোমার বাবাও আমাকে ডেকে বলেছিলেন—দেখ, তোমাকে আমি সত্যই স্নেহ করি, কোনরকম অপ্রিয় কথা বলতে অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করি। অনেকদিন আগেই এটা বলা আমার উচিত ছিল। সেটা হল সুতপাকে নিয়ে। তোমরা দুজনে দুজনের দিকে একটু বেশি এগিয়ে গেছ। এতে অবশ্য বাধা থাকা উচিত নয়। তুমি ব্রাহ্মণ আমরা বৈদ্য এ বলেও থাকা উচিত নয়—সেটা নেই সেও আমি অনুমান করতে পারি। তোমার মাকে আমি দেখে এসেছি। তোমাকে দেখছি। কিন্তু একালে আর একটা জাতই বল আর থাকই বল—সেটা তৈরি হয়ে গেছে। সেকালে রায়বাহাদুর শ্বশুরের কংগ্রেসী জামাই হলে ব্যাপারটা ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করত। কংগ্রেসী বাপের সুন্দরী মেয়ে রায়বাহাদুরদের বাড়ি এসে কষ্ট পেয়েছে, বাপের সঙ্গে দেখা করতে পায়নি—এমন সব ঘটনা ঘটে গেছে। বড়লোক গরীবলোকের কুটুম্বিতের ট্র্যাজেডির মতই। কিন্তু এখন সেগুলো আরও নানান্ চেহারা নিয়েছে। পার্টির ব্যাপার। দেখ, আমি কোন পার্টির লোক নই ; তবু কিছুটা পরোক্ষ সমর্থন অজিত-সুজিতদের পার্টির উপর আছে এ মানতেই হবে। সুতপাকে আমিই পার্টি-মেম্বার হতে দিইনি ; নাহলে ও ওই পার্টিরই মেম্বার হয়ে যেত এবং হয়তো বা সেক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে তার কোন হৃদ্যতাই হত না। জানি না সুতপা ঠিক কতটা বদলেছে, কিন্তু সবটা বদলেছে কিনা সেইটেই কথা। এবং সেটা—মানে সবটা বদলানো—বোধহয় অসম্ভব। সুতরাং—

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন তোমার বাবা। তারপর বলেছিলেন—দোষ সম্ভবতঃ আমারই। আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

আরও অনেকক্ষণ পর বলেছিলেন—তুমি এদের পার্টিতে আসতে পার না বলে শুনেছি।—তা হলে আমার মনে হয়—তোমাদের দুজনের তোমাদের আলাদা আলাদা পথে চলে যাওয়াই ভাল।

* * * *

কথাগুলো খুব বিচক্ষণতার কথা। কিন্তু তুমিও শোননি—আমিও শুনিনি।

আজ গোপন করব না। আপত্তি মা-ও কম করেননি। অনেক অনেক অনেক আপত্তি। মাকে সেদিন নতুন ক'রে নতুন চেহারায় দেখলাম। আমার মা—আমাদের বাড়িতে মুসলমান কৃশ্চান হরিজন নেতারা যাঁরা এসেছেন—তাঁদের এঁটো কাপ দিব্যি হাতে করে তুলে নিয়েছেন। আমি সকলের সঙ্গে বসে খেয়েছি—আপত্তি করেননি। গরীব-দুঃখী—সে আচণ্ডাল পর্যন্ত—অসুখে পড়লে তাদের শিয়রে গিয়ে বসেছেন। সেই মা আমার তোমাকে বিয়ে করবার কথা বলতে বলেছিলেন—সে কি রে!

এতে আমিও কম আশ্চর্য হইনি। এ কি ? মা এ-সুরে কথা বলেন কেন ? এত

বিস্ময়ের এতে কি আছে?

অনেক তর্ক, অনেক তর্কের গণ্ডীর বাইরে যাকে সোজা কথায় বলে ঝগড়া-বিবাদ—তাই। শেষ পর্যন্ত মা না খেয়ে পড়ে রইলেন—আমিও রইলাম। বেলা তখন তিনপ্রহর—তিনটে বেজে গেছে; ঠাকুরের ভোগ হয়নি তখনও; পূজুরী পূজা ক'রে চলে গেছে। মা তখন উঠে বললেন—আমার ঠাকুরের কি হবে?

বলেছিলাম—কেন? যেমন আছে তেমনি থাকবেন ঠাকুর।

বলেছিলেন—তোর বউ? থাকতে দেবে ঠাকুরকে?

আমি তোমার কথা ভেবেছিলাম সুতপা। ভেবেচিন্তেই বলেছিলাম—বেশ তো মা, ঠাকুরের পুজোর ব্যবস্থার জন্তে আমি সব সম্পত্তিটাই লিখে দিচ্ছি।

মা বলেছিলেন—তা দিলি। ঠাকুরের পুজো হল—কিন্তু আমার বংশের কে করবে? যাদের মেয়ে তারা যে মতে বিশ্বাস করে, তাতে তো ঠাকুর-দেবতা নেই, ঈশ্বর নেই।

আমি বলেছিলাম—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা, তোমার পর ঠাকুরের পুজো আমি করব। আমি যেদিন না থাকব—সেদিন পূজুরী করবে।

আমি তোমাকে এসব কথা একটি একটি ক'রে খুলে বলেছিলাম। আমার বিশ্বাস, তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। কারণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কথা শুনেছিলে। আমি তোমাকে সব কথা বলে বলেছিলাম—তোমার রাজনৈতিক মত তোমার জীবন-বিশ্বাস, মানে আস্তিক্যবাদ নাস্তিক্যবাদ যাই হোক, আমার নিজের সে-সব যাই হোক, যত পৃথক হোক—সে তোমার তোমার, আমার আমার। আমরা জীবনে মিলতে চলেছি—ভালোবাসাকে সম্বল করে—ভালবাসাতে বিশ্বাস রেখে—তা নিয়ে কখনও আমরা সংশয় প্রকাশ করব না।

যদি পরস্পরকে সহ্য করতে না পারি—তাহলে আমরা পৃথক হয়ে যাব।

তুমি সেদিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তোমার দীর্ঘক্ষণের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলেছিলে—থাক্ সুব্রত; এ বোধহয় না হওয়াই ভাল। আমি চললাম। উঠে চলে গিছলে তুমি।

পরের দিন তুমিই এসেছিলে আগে। এসে বলেছিলে—তোমার সব শর্তই ঠিক আছে সুব্রত; শেষটা, অর্থাৎ পরস্পরকে সহ্য করতে না পারলে পৃথক হয়ে যাব—এ কথাটা বাদ।

বলেছিলাম—মানে আছে? বাদের কোন মানে হয়?

—আইনের কথা বলছ?

—হ্যাঁ।

তুমি বলেছিলে—মানে আছে, মানে হয়।

—কি হয়?

—তোমার যদি দরকার হয় ডাইভোর্স চেয়ো আদালতে, আমি কোন জবাব দেব না, আপত্তি তুলব না। আমি কখনও ডাইভোর্স চাইব না।

আমি বলেছিলাম—শুনতে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু এটা সেন্টিমেন্ট।

এরপর আমরা বিয়ে ক'রে তোমার বাবার কাছে গিয়েছিলাম। তোমার বাবা বিস্মিত হননি। বিচক্ষণ মানুষ—আশ্চর্য মানুষ—বলেছিলেন—এইটেই আমি প্রত্যাশা করছিলাম। বিয়ে করে দুজনে এসে আমার সামনে দাঁড়াবে। কিন্তু এরপর আমি একটা সেরিমনি করতে চাই।

মনে আছে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এ মানায়নি রে তপু! একদম মানায়নি! মাথায় মৌর নেই সিঁথি নেই কনেচন্দন নেই লাল বেনারসী নেই—এই ডগডগে একসিঁথি সিন্দূর নেই—। না—না—না। সেরিমনি চাই। তা না হলে বিয়ে কি ক'রে হল।

তোমার বাবা রোশনচৌকি বাজনা বসিয়ে—ছাদনাতলা তৈরী করিয়ে—পুরুত এনে কন্যাদান করেছিলেন—রীতিমত দান-সামগ্রী সাজিয়ে দিয়েছিলেন। দশজনকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে তবে শেষ করেছিলেন।

তোমার দাদারা দুজনেই বাইরে চলে গেছলেন। মাধুরী বউদি ঘরে খিল দিয়ে অসুখের ভান ক'রে শুয়ে ছিলেন—কেবল বড়বউদি ছিলেন সারাক্ষণ। আমাদের যাবার সময় বড়বউদিই সব করেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন—সুব্রত, ভাই একটা কথা বলি।

বলেছিলেন—সুতপাকে ভালবেসে যখন বিয়েই করলে, তখন পুরোপুরি আমাদেরই হয়ে যাও না। আমরা বড় অস্বস্তি বোধ করছি।

সুতপা, তুমিই বলেছিলে—না বউদি, ওসব কথা থাক্।

সর্বানন্দপুরে এসে তুমি খুব খুশী হয়েছিলে।

মা-ও প্রথম দিন প্রসন্ন হাসিমুখে আমাদের ঘরে তুলবার জন্ম এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সে হাসিমুখ আমারও মনে পড়ে, তোমারও হয়তো মনে পড়ে।

প্রথম দিনই কিন্তু যেখানে সংঘাত বাধার সেইখানেই সংঘাত বাধল।

মা নিয়ে গেলেন আমাদের শালগ্রাম শিলার আসন যে ঘরে সেই ঘরের বারান্দায়, বললেন—প্রণাম করো।

তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলে। আমি ভেবেছিলাম—তুমি প্রশ্ন করছ আমাকে। প্রশ্ন করছ—প্রণাম করতে হবে শালগ্রাম শিলাকে—নুড়িকে? কিন্তু একথা তো ছিল না।

আমার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। তুমিই বলেছিলে। সেটা অবশ্য রাত্রে শোবার ঘরে, তোমার বাবার দেওয়া সোফা-সেটে বসে। কিন্তু সেই সঙ্কটমুহূর্তে তুমি মাটিতে হাত ঠেকিয়ে কপালে ঠেকিয়ে মায়ের কথা মেনে নিয়েছিলে।

আমার বুক থেকে পাষাণের ভার নেমে গিছল।

কিন্তু সঙ্কট যেটা, সেটা যেখানকার সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকেছিল।

* * * *

একটি পুরুষ আর একটি নারী। সুতপা, এরা রাত্রে যে মিলনে মিলিত হয়—সেটি মেলে দুটি দেহের সেতুবন্ধের উপর দাঁড়িয়ে। দিনের মিলন মনে মনে। মত বিরোধ তখনই প্রমাদ ঘটায়। মানুষ ছাড়া প্রাণীজগতে দেহ-মিলনের পরেই একরকম পালা শেষ। মানুষ ঘর বাঁধে দিনরাত্রি একসঙ্গে বাস করবে বলে।

আমাদের মতের বিরোধ সেইখানেই সুযোগ পেলে মাথা তুলে দাঁড়াবার। আমরা ঠিক করেছিলাম—আমার মত আমার, তোমার মত তোমার। তৎসত্বেও আমি তোমার, তুমি আমার।

ভুল বোধহয় হল সেখানেই।

আমি যখন তোমার হব—তখন আমার মতটাই বা তোমার হবে না কেন্? আর তুমি যখন আমার হবে তখন তোমার মতটাই বা আমার হবে না কেন?

এটা তো আছে চিরকাল।

কত মহাকাব্য নাটক উপন্যাসই না তৈরী হয়েছে এ নিয়ে।

সূত্রপাত হল তোমাদের বাড়িতে তোমার ছোড়দার খোকার অন্নপ্রাশনে যে পার্টি হয়েছিল সেই পার্টিতে। কুটুম্ববাড়ির প্রথম কাজ; মা একখানি রূপোর রেকাবীতে একমুঠো সুগন্ধি চাল, একটি রূপোর বাটি-ঝিনুক পাঠিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আরও দিয়েছিলেন একটি ব্রোঞ্জের নাড়ুগোপাল মূর্তি। ওটা আমাদের বাড়ির প্রথা ছিল। তিন পুরুষের প্রথা। অন্নপ্রাশনে নাড়ুগোপাল দেওয়া হত।

ওই নিয়েই পার্টিতে নানান্ কথা উঠল। তোমার দাদাদের বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় হল—তাঁরা তোমাকেই বললেন—তোমার বরকে নিয়ে এস আমাদের বাড়ি। কথা বলব। তোমার মত মেয়েকে জয় করেছেন উনি—নিশ্চয়ই একজন হিরো। কিন্তু আমরা তো expect করব তুমি ওঁকে নিয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসবে—

তোমার ছোটবউদি ওই গোপাল-মূর্তি দেখিয়ে কি বলেছিল মনে আছে? বলেছিল—ওঁকে জয় করা সহজ হবে না। উনি আমাদেরকে জয় করবার জন্তে কোমর বেঁধেছেন। এই দেখুন আমার খোকার জন্তে নাড়ুগোপাল দিয়েছেন—ছেলে আমার আপাল নেপাল ভূপাল টুপাল মানে নাড়ুগোপালের রাখাল সখা কেউ একজন হবে।

উত্তরে আমিই বোধ করি আমার কথার হাতিয়ারকে বেশ ক'রে শানিয়ে নিয়ে কথার কোপ মেরেছিলেন। বলেছিলাম—ছোটবউদিদিদের বোধহয় ব্যাসদেবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল—একেবারে ভাগবতকে নতুন ক'রে তৈরী করে দিলেন। সুবল শ্রীদাম দাম বসুদামকে একেবারে আপাল নেপাল ভূপাল ক'রে ছেড়ে দিলেন।

তুমি আমার হাতে ধরে চাপ দিয়েছিলে।

আমি রাগটাকে সংযত করতে ঠিক পারিনি—চেপে গিছলাম; এরপর মাথা ধরেছে বলে বসেছিলাম একধারে।

আমাদের বাড়িতে আমার মা তোমাকে ভালবাসতে চেষ্টা করলেন প্রাণপণে—কিন্তু

আশ্চর্য, পারলেন না। দোষ কার—সে নিয়ে প্রশ্ন বড় নেই, সেটা আমার মায়ের; কিন্তু তোমার কতখানি আমার কতখানি—তা বলতে আজও পারছিনে।

মা সংসারের সব থেকে ভাল খাদ্যটুকু বাড়ির ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তোমাকে খেতে দিতেন, আমাকে দিতেন না।

তুমি এই প্রসাদটুকু খেতে চাইতে না। ওই তুলসীর পাতা—ওই হাতে নাড়াছোঁয়া খাদ্য—তা ছাড়া আমি যতটা বুঝেছি এই প্রসাদ নামক বস্তুর প্রতি তোমার একটা বিতৃষ্ণা ছিল। চরণোদক আমাদের বাড়িতে আমরা ছেলেবেলা থেকে খাই। তুমি প্রথম দিনই বলেছিলে—আমার মাথায় দিন। আমার এক মামাতো দাদা তীর্থে গিয়ে চরণোদক খেয়ে ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রিতে পড়েন—তাতেই মারাও যান। ও খেতে আমার কেমন ভয় করে। মা আমার শহরের মেয়ে—তাঁর কালের প্রগতিশীল মেয়ে; ইনফেকশন বোঝেন। কলেরায় আমাদের অঞ্চলে এককালে কাজ করতেন, আমরা তাঁর অধীনে কাজ করতাম; আমাদের ইনফেকশন বোঝাতেন। বলতেন—সাবধান হতে পারলে এসব বিষকে ঝাঁটা মেরে দূর করা যায়। তিনি তোমার এই ইনফেকশনের ভয়ের কথাটা তুচ্ছ করতে পারতেন না, কিন্তু ক্রুদ্ধ হতেন খুব। বলতেন—সুব্রতর বয়স হল চব্বিশ বছর, চব্বিশ বছরই ওর মুখে চরণোদক দিচ্ছি—সে কিন্তু কোন ক্ষতি করেনি, বিষ হয়ে ওঠেনি কোন দিন।

মধ্যে মধ্যে বলতেন—আসল কথা ভগবানকে বিশ্বাস। তাঁকে মানা। যারা ভগবান মানে না, নাস্তিক—তাদের চারিপাশে রক্ষা করবার তো কেউ নেই—তারা মৃত্যুকেই দেখে আর মৃত্যুভয়েই তারা অধীর।

বিরোধ বাড়তে লাগল।

বিচিত্র পথে বাড়ল—পথরোধ করবার শক্তি আমাদের কারুরই হল না।

আধুনিক সাজসজ্জা মা পছন্দ করতেন না—তুমি সেইটেই যেন জোর ক'রে শুরু করলে।

তোমার বাবাকে প্রণাম করছি। তিনি না থাকলে অনেক আগেই আমরা পরস্পরের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতাম। তাঁরই ব্যবস্থায় তাঁর বাড়িতেই সপ্তাহের পাঁচটা দিন থাকতাম, শনিবার আসতাম সর্বানন্দপুর। রবি সোম দুদিন থেকে মঙ্গলবার ভোরে কলকাতা আসতাম। শনিবার দিন মা হ্যারিকেন তুলে ধরে তোমার মুখের ওপর আলো ফেলে গভীর আক্ষেপের একটি ছোট্ট 'হুঃ' শব্দ উচ্চারণ ক'রে কয়েকটা কঠিন কণ্ঠের—'ছি ছি ছি ছি' শব্দের ধিক্কার দিতে দিতে চলে যেতেন।

আমরা জানতাম এর অর্থ। তুমিও জানতে—আমিও জানতাম। আমরা দুজনে দুজনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিতাম।

নিজেদের ঘরে এসে বলতাম—কেন এমন ভাবে ওই ধরনের সাজ ক'রে এখানে আস বল তো? কেন?

প্রথম কিছুদিন চুপ করে থাকতে।

তারপর মুখের উপরই বলতে—রুচি আমার নিজের। আর আমি তো ভালগার সাজসজ্জা করিনি। আজকাল আবার চুলে তেল মাখে কে?

আমার মা আমাদের কথা শুনবার জন্ত তাঁর ঘরের জানালা খুলে অন্ধকারের মধ্যে কান পেতে বসে থাকতেন।

তোমার বাবা তাঁর দেশের পৈতৃক বাড়িখানা সংস্কার করিয়ে তোমাকে দান করেছিলেন। সেই বাড়িতে আমরা থাকতাম। তোমার বাবা তেতলায় একখানা ঘর তুলে দিছলেন, ঠাকুরের জন্ত। মোজেকের মেঝে, সুন্দর বেদী। মা সে-ঘরে ঠাকুরকে আসতে দেননি।

আমাকে বলেছিলেন—বেশ মিষ্টি ক'রে বলেছিলেন—দেখ, তোরা ও-বাড়িতে থাকবি—নির্ঝঞ্ঝাটে থাকবি—যা ইচ্ছে খাবি, ঠাকুর ও-বাড়িতে যাবেন না। এ বাড়ির ঠাকুর, মাটির ঘরে খড়ের চালে আজ পাঁচপুরুষ আছেন। উনি এমনি থাকবেন।

তুমি পরের দিন থেকে সকালে কফির সঙ্গে মুর্গীর ডিম টোস্টের ব্যবস্থা করেছিলে। ভোরবেলা উঠে কোমর বেঁধে কাজে লাগতে। কাজ মানে কফি টোস্ট পোচ তৈরি করা।

* * *

ঘরের মধ্যে যখন আমরা পরস্পর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি—তখনই, আমাদের দুর্ভাগ্য, বাইরে ঘনিয়ে উঠল প্রচণ্ড দুর্যোগ।

বিচিত্রভাবে আমি একটা সত্যকে এর মধ্যে অনুভব করেছিলাম।

বাইরের দুর্যোগ ঘরের দুর্যোগকে কখনও কমায়, কখনও বাড়ায়।

দুর্যোগ বলতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলছিনে। প্রাকৃতিক নয়—রাজনৈতিক।

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ বাধল।

গোটা ভারতবর্ষে যেন আশ্চর্য আবেগের কম্পন বয়ে গেল। একটা যেন জাদুর খেলা ঘটে গেল।

অসংখ্য রাজনৈতিক দলে বিভক্ত, নানান্ প্রশ্নে—ভাষার প্রশ্নে ধর্মের প্রশ্নে প্রাদেশিক সীমান্তের প্রশ্নে জর্জরিত দেশটা যেন একমুহূর্তে সকল বিবাদ পাশে ঠেলে সকল প্রশ্নে ধামা চাপা দিয়ে এক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

পার্লামেন্টে একটা আইন পাস হয়ে গেল বিশেষ ক্ষমতাবলে। এদেশের অধিবাসী যারা তাদের পক্ষে ভারতের বর্তমান সীমান্ত-রেখায় সংশয় প্রকাশ করা দেশদ্রোহিতার অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।

সংশয় প্রকাশ করার অর্থটার মধ্যে কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল না। ছিল চীন অথবা ভারতবর্ষকে সমর্থনের প্রশ্ন।

আইনের বলে কাগজে কাগজে এই ধরনের ভারতকে অসমর্থন করার মত আলোচনা বন্ধ হল। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে মন্তব্য প্রকাশও বন্ধ হল। কিন্তু মুখের আলোচনা বন্ধ হল না, দৈব-দুর্বিপাকে আমাদের জীবনে এ দুর্যোগের এই প্রভাব আমাদের ঘরের দুর্যোগের

উপর এসে পড়ল।

কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে একদিন তোমার বাবার কাছে এসেছিলেন জনকয়েক তোমার দাদার পার্টির লোক। আইনের পরামর্শ নিতে এসেছিলেন। তার জের এসে আছড়ে পড়েছিল চায়ের টেবিল পর্যন্ত। সেখানে, চায়ের সঙ্গে আলোচনাটা আইনের সীমানা ডিঙিয়ে চলে এসেছিল স্বাভাবিক ভাবেই।

তুমি প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করনি। কিন্তু অত্যন্ত উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলে—চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নের ঐতিহাসিক সত্যটা কি? সেটা সত্যসন্ধানীর জিজ্ঞাসা বা ঔৎসুক্য নয়—একথা বললে তুমি যেন রাগ করো না স্বতপা। তুমি যে পার্টিকে একদিন বিশ্বাস করতে—যার সঙ্গে তোমার দাদাদের সম্পর্ক রয়েছে—বাবারও কিছুটা রয়েছে—সেই পার্টির হয়ে কথা বলবার খানিকটা জোর খুঁজছিলে। তুমি তো আমার বুকের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পাচ্ছিলে। তুমি তো জানতে আমার বুকের মধ্যে এদের বিরুদ্ধ মনোভাব কালবৈশাখী মেঘের মত পুঞ্জীভূত হয়ে আছে! হ্যাঁ স্বতপা, কালবৈশাখী মেঘের মত বজ্রবিদ্যুৎ ভরা ছিল আমার সেদিনের আবেগ।

আমি তারই বেগে তারই ঠেলায় আচমকা উঠে চলে গিছলাম চায়ের আসর থেকে। অনেকটা ছিটকে চলে আসার মত যেন দেখতে হয়েছিল।

রাত্রে তুমি বলেছিলে—ওইভাবে চলে আসা তোমার খুব অশালীন হয়েছে।

আমি বলেছিলাম—হ্যাঁ, এই কথাটাই আজ তোমার কাছে শুনব এইটেই আমি অনুমান করেছিলাম। আমার ভুল হয়নি।

সর্বানন্দপুরে এসে দেখলাম, তার ঢেউ সেখানেও এসেছে। দেখলাম কংগ্রেস আপিসে পতাকা উঠেছে। নতুন পতাকা এবং ফ্ল্যাগ-স্টাফটা প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু।

আমাদের সঙ্গে—মানে মা এবং আমার সঙ্গে—কোন সম্পর্ক ছিল না কংগ্রেসের। তবে চীনের সঙ্গে বিরোধে আমাদের পার্টি কংগ্রেস এবং ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। আমার খুব ভাল লাগল।

যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন আমার মা আমাদের বাড়িতেই ওখানকার ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা হচ্ছিল একটা বড় মিটিং করবার। দেশকে সজাগ করতে হবে।

তুমি আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ও-বাড়ি চলে গিয়েছিলে।

সেদিন সমস্ত রাত্রি তুমি বিচিত্র বিষণ্ণতার মধ্যে নিজেকে অসুস্থ অনুভব করেছিলে। আমি মায়ের ওখান থেকে যখন এ-বাড়ি এলাম, তখন তুমি শুয়েছ। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কণ্ঠস্বরে আমার ব্যঙ্গের সুর ছিল—জিজ্ঞাসা করেছিলাম—শুলে যে। কি হল?

বলেছিল—শরীর আমার বড্ড খারাপ করছে।

ব্যঙ্গভরেই বলেছিলাম—জর এল নাকি?

তুমি বলেছিলে—Please, Please!

জরটা সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত। পরদিন রবিবারেই তুমি কলকাতা আসবার জন্যে প্রায় জেদ ধরেছিলে।

মা সেদিন কিন্তু সত্যসত্যই তোমার জন্যে চিন্তিত হয়ে তোমার শিয়রে বসেছিলেন। আমার চিন্তার শেষ ছিল না। তুমি কিন্তু কোনটাকেই সহজভাবে নাওনি। রবিবার জরের জন্য আসা হয়নি—সোমবার জর কমতেই কলকাতা এসেছিলাম তোমায় নিয়ে। রবিবার দিন একটা মিটিং ছিল গ্রামে, তুমি বলেছিলে ঐ কারণে তোমায় নিয়ে কলকাতা আসবার সময় হয়নি আমার। আমি মিটিংয়ে গিছলাম একথা ঠিক, কিন্তু যা তুমি ধারণা করেছিলে—হয়তো বা আজও যে ধারণাকে সত্য মনে ক'রে রেখেছ—তা সত্য নয়—সত্য নয়—সত্য নয়। মা সভানেত্রীত্ব করেছিলেন—কিন্তু তিনিও বার বার বলেছিলেন - আমার বড্ড খারাপ লাগছে। তবে এটা ঠিক যে সেদিন কংগ্রেসের ওরা মাকে বলেছিলেন—আবার আপনি আমাদের মধ্যে আসুন। মা বলেছিলেন—না। আমি আর পলিটিক্সের মধ্যে নেই।

মায়ের কাছে একটা কথা শিখেছিলাম সেদিন। বলেছিলেন—দেশ আমার মা, ভগবান পিতা, বিশ্বপিতা। এবার তাঁর সেবার সময় হয়েছে।

ভাল লেগেছিল খুব। কিন্তু ওঁরা বলেছিলেন—তাহলে সুব্রতকে দিন। ও এবার হাল ধরুক। এবার ভাল করে শক্ত ক'রে হাল না ধরলে বিপদ হবে।

মা বলেছিলেন—ও তো একটা পার্টিতে যোগ দিয়েছে। ওকে বলুন আপনারা।

ওঁরা আমাকে বলেছিলেন, আমি দৃঢ়স্বরে বলেছিলাম—না। তবে মনে মনে আমাদের পার্টির হয়ে আমাদের ওখানে কাজ করবার সংকল্প করেছিলাম।

সোমবার কলকাতায় এসে তুমি পাঁচ-সাতদিন বিছানায় শুয়ে ছিলে। জর ঠিক ছিল না। কিন্তু অসুস্থ তুমি ছিলে। অসুখ ছিল কিনা ঠিক জানি না—তবে তুমি অসুস্থ ছিলে তাতে সন্দেহ নেই। আমি জানি তোমার মনের সংকট এবং সংঘর্ষের কথা। কারণ সেটা তো আমারও ছিল।

তুমি কি এ সময়ের মধ্যে ডাইভোর্সের কথা ভেবেছিলে? আমি জানি না। তবে আমি এটা ভাবতাম—ভাবতাম—তোমরা আলট্রা-মডার্ন—তোমরা এদেশের সমাজ-সংস্কারকে মানো না—তুমি হয়তো কোন্ দিন ডাইভোর্স চাইবে।

বিচার ক'রে দেখতে গেলে সেইটেই পথ। কিন্তু আমার হৃদয় যে মানত না। কি করব?

পরের দু-সপ্তাহ তুমি সর্বানন্দপুর যাওনি। আমিও যেতে অনুরোধ করি নি। আমি গেলাম। এর মধ্যে গ্রামে যুদ্ধে সাহায্য-সংগ্রহের জন্য মিটিং হল, মা দুখানা গয়না দিলেন। তাঁর গয়না থেকে দুখানা গয়না। দুগাছা চুড়ি আর সিঁথি-টিকলি। সিঁথি-টিকলিটা তোমার নামে দিয়েছিলেন।

কাগজে বেরিয়েছিল। তুমি প্রতিবাদ করেছিলে—আমার নামে উনি কেন দেবেন? উনি নিজের নামে দিলেই পারতেন।

বহু ভাগ্য স্বতপা যে, সেদিনও তোমার দেহ তোমার রূপ—তোমার গায়ের গন্ধ তোমার চোখের দৃষ্টি—এবং তোমার কাছেও আমার এই কালো ওথেলোর মত দেহের রুক্ষতা এবং সবলতার আকর্ষণ হারিয়ে যায়নি। গভীর রাত্রে মিটমাট হয়েছিল—আমার জানুর উপর মাথা রেখে তোমার কোমল হাত দুখানি দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বলেছিলে—চুপ। চুপ। মিটে গেল। আর না।

তোমার শ্যাম্পু-করা চুল আমার মুখে বুলিয়ে বুলিয়ে প্রমত্ত হয়ে খেলা করেছিলাম। মনে আছে তোমার?

* * *

পণ্ডিতজী মারা গেলেন। লোকে বলে পার্লামেন্টের স্পেশাল সেশনে চীন-ভারত সংঘর্ষ সঙ্কট সম্বন্ধে তাঁর যে একটি স্টেটমেণ্ট দেবার কথা ছিল—সেই স্টেটমেণ্ট নিয়ে চিন্তা করতে করতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি সহ্য করতে পারেননি।

সারা ভারতবর্ষ হায় হায় করে উঠেছিল। আমি তো কল্পনা করেছি কতদিন যে, ভারতবর্ষ, এই মাটির ভারতবর্ষের আত্মা কেঁদেছিল।

যার যা হল তা হল, কিন্তু আমার যা হল তা বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। আমার মা খবরটা শুনে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। রেডিয়োতে খবরটা শোনবামাত্র তাঁর নাকি মুখখানা সাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই সাদা ফ্যাকাশে মুখে—বাক্যহারা নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুক চেপে ধরেছিলেন এবং একটি আর্তনাদ ক'রে ঢলে পড়ে গিয়েছিলেন।

আমি বাড়ি ছিলাম না—পাড়ায় গিয়েছিলাম।

খবর পেয়ে বাড়ি ফিরলাম। তুমি কলকাতায় ছিলে। ভাগ্যে তাই ছিলে, না হলে হয়তো দুঃখ সেদিন আমরা সকলেই পেতাম। মা—আমি—তুমি—তিনজনেই। কারণ কলকাতায় এসে যখন তোমাকে সব বিবরণ বলেছিলাম—তখন তুমি কি বলেছিলে মনে আছে? কথাটা বলেছিল ব-হু ব-হু জন।

—বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

তুমি বলেছিলে—ওই কথাটা বোল না। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুসংবাদ শুনে বুকে ব্যথা ধরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন—ওটা বোল না। লোকে ঠাট্টা করবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষে এইভাবে বুকে ব্যথা ধরে কতজন অজ্ঞান হয়ে গেছে তা আমি জানি না—তবে বেশ কিছু লোক যে গেছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তারা সকলেই কংগ্রেসের লোক তা আমি বলব না, তবে কংগ্রেসের লোকই বেশী এবং তারা পণ্ডিতজীর স্নেহভাজন কংগ্রেসী। যারা ঠাট্টা করেছিল—তারা যে বিরোধী মানুষ এবং তাদের অধিকাংশই যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোক—তাতেও আমার সন্দেহ নেই।

আমি তোমাকে বলেছিলাম—লোকে যা বলে বলুক, তুমি সেটা বোল না।

তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলে কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বলেছিলে—

কিন্তু লোকের মুখ চাপা দেবে কি ক'রে বল ?

আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলাম—মুখ চাপা দেবার দরকার নেই। পরে যে যা বলে বলুক, আমি শুধু তোমাকে বলছি—তুমি ওটা বোল না।

তোমাকে আমি সঙ্গে না নিয়েই চলে এসেছিলাম।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে—আমাকে যেতে হবে না বলছ ? আমি যাব না ? মায়ের অসুখ—। আমি তো দাদা-বউদির কাছে কারণটা চেপে যেতে পারি। কি দরকার বলবার যে নেহেরুজীর মৃত্যু-সংবাদ শুনেই বুকে ব্যথা ধরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম —না। এখন তো সুস্থ হয়ে গেছেন আবার। তা ছাড়া মায়ের ভক্তের তো অভাব নেই গ্রামে। তারা সব খুব উৎসাহ ক'রে শুশ্রূ-সেবা করেছে। এবং তোমার নিজের শরীরটার কথাও ভাব। তোমার এখন না যাওয়াই ভাল।

তুমি বলেছিলে—হ্যাঁ। না যাওয়াই ভাল। মা যদি বলেন—বউমা তুমি ঠাকুরের কাজকর্ম কর, কি বলেন ভোগ রাঁধ—তা অবিশ্যি বলবেন না—আমার হাতে জল খান—আমার রান্না তরকারী খান—কিন্তু ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে বলবেন না। তবে কি জানি, বললে বিপদে পড়ব। বিশ্বাস অবিশ্বাস ছেড়ে দিচ্ছি, ওই ছুঁচিবাইয়ের মত—এটা নাড়া পড়ল ওটার ছোঁয়া লাগল—এ আমি কোনমতেই পারব না।

তোমাকে বলিনি সুতপা—কথাটা চেপে রেখেছি আজও। মা-ও ঠিক তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন—ভালই করেছিস সুব্রত, বউমাকে আনিসনি। আমি অসুখে পড়ে থাকতাম—বাধ্য হয়ে বউকেই দিতে হত সংসারের সব কিছু ভার। কিন্তু বউমার কোন আচার নেই, কোন ভক্তি নেই,—ভার দিয়ে আমার স্বস্তি হত না সুব্রত। তা ছাড়া—

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তুই হয়তো দুঃখিত হবি সুব্রত—এই এত বড় ঘটনাটা—বউমা এটাকে আমাদের মত ক'রে দেখত না।

* * *

এরপর ঘটনাগুলো মনে করতে গিয়ে নিজেই যেন বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। সারা দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো আষাঢ় থেকে আশ্বিনের ঝড়-জল-মেঘের মত ঝাপটা মেরে মেরে একের পর এক আসতে লাগল। অনাবৃষ্টির আষাঢ় থেকে আশ্বিন নয়—অতিবৃষ্টি বৎসরের আষাঢ়-আশ্বিনের ঝড়-জল-মেঘ। ছোট থেকে বড়—সব থেকে বড় সাইক্লোনের মত।

স্বাভাবিক ভাবেই এটা হয়েছিল।

জওহরলাল নেহেরু চলে গেছেন—বাংলাদেশে তার দু'বছর আগে চলে গেছেন ডাঃ রায়। কেন্দ্রে এসেছেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী, সৎ লোক, শান্ত লোক—কিন্তু মৃদু মানুষ। জলে উঠে জালিয়ে দিতে জানেন না। বাংলাদেশে বিধান রায়ের বিরাট ব্যক্তিত্বের শূন্য স্থান সেন পূর্ণ করতে পারেননি। তার উপর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের আসরে রাজ্যহীন রাজা-

রাজপুত্র, জমিদারীহীন জমিদার-জমিদারনন্দনদের সমাবেশের মাঝখানে বসে কংগ্রেস-সভাপতি হাস্যে পরিহাসে আস্ফালনে—সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনয়ে—দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা-কর্মের আয়োজনের মধ্যেও লুকানো অহঙ্কারে ও মমতাহীনতায়—সাধারণ মানুষের যে বিরূপতা এবং বিদ্বেষ অর্জন করেছিলেন, সে ঘটনা ঐতিহাসিক এবং তার ফলে যে বিস্ফোরণ আসন্ন তাও ঐতিহাসিক এবং তা সব দলই বুঝেছিল।

সামনে নির্বাচনও এগিয়ে আসছিল।

বিশ্ব-রাজনীতির উত্তপ্ত বাতাস এসেও আমাদের দেশের উত্তপ্ত বাতাস খানিকটা ভারী করে তুলেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের ঘরের হাওয়া তাতে বেশি ভারী হয়েছিল—এ তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি।

ভিয়েৎনাম নিয়ে এদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষ সজাগ ছিল না, ক্যাস্ট্রো সম্পর্কেও সচেতনতা তাদের ছিল না। আমার পার্টি যেটা—তার পিছনে সমর্থন খুব ব্যাপক ছিল না এটা আমি অস্বীকার করব না। তোমার দাদাদের কয়েকটি দল তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। তরুণদের সমর্থনে শক্তি তাদের প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। তারা মিছিল নিয়ে কলকাতার পথ-ঘাট-আকাশ-বাতাসে আলোড়ন তুলছে।

পার্লামেণ্ট থেকে বাজারের রাজপথ পর্যন্ত।

ভিয়েৎনাম নিয়ে তোমার আমার অশান্তি নিশ্চয় তুমি ভোলনি। ভোলা উচিত নয়। বল তো সুতপা, আমি কি ভিয়েৎনামের শত্রু, না তাদের বিরোধী ছিলাম?

ছিলাম না—এটা তুমি খুব ভাল ক'রে জান। আমিও ছিলাম না—আমার পার্টিও না। তবে যারা খুব বেশী উচ্চ-চীৎকারে সমর্থন করছিল—তাদের সঙ্গে গলা মেলাইনি কেন এটা প্রশ্ন করলে সেদিনও যেটা বলিনি তোমাকে, আজ সেটা বলি। যারা চেঁচাচ্ছিল তাদের চীৎকারে ভিয়েৎনামের শক্তিবৃদ্ধি যতটা হয়েছিল—তার থেকে তাদের নিজেদের শক্তি অনেক বেশী বাড়ছিল বলে তাদের পিছনে পিছনে দুর্বল একটি দল নিয়ে যাইনি। আমার আপত্তি ছিল—তুমি ভিয়েৎনামের পক্ষ সমর্থনের জন্যে নতুন করে মিছিলে যোগ দিতে শুরু করলে।

আমার আপত্তিকে তুমি তুচ্ছ করতে শুরু করলে। বললে—প্রতি মানুষের কর্তব্য এটা। তোমারও আমার সঙ্গে বের হওয়া উচিত। এই তো, দাদা-বড়বউদি, ছোড়দা-ছোটবউদি সকলেই যান। আরও অসংখ্য লোক যায়।

তবু আমি যাইনি। যেতে পারিনি। মন বলেছিল—ওদের সঙ্গে যাব না। না। সে হয় না।

ছোটবউদি আমাকে ডাকতে শুরু করলেন জামাইবাবু বলে।

তার অর্থ—আমি পোষ্য ঘর-জামাইবাবুতে পরিণত হয়েছি। এবং সেই কারণেই মিছিলে বের হইনে। জামাইয়ের অপমান হবে যে। তোমার সঙ্গে তোমার বাবার কাছে থেকে পড়ছিলাম। এম-এ পরীক্ষা এক বছর দিইনি—ফলে তিন বছর থাকা হয়েছে। হ্যাঁ, বেশ আরামে ছিলাম এতে নিশ্চয় সন্দেহ নেই। সকালে উঠেই চা-টোস্ট-মিষ্টি—আগে চা

খেতাম না, তোমাদের বাড়িতে এসে চা খেতে ধরেছি তখন—তারপর দশটায় র‍্যাশনের বাজারেও খুব মিহি চালের ভাত, তার সঙ্গে বেশ খানিকটা গাওয়া ঘি—ভাজা-ভুজি-মাছ-দই-মিষ্টির ব্যবস্থা; তোমার বাবার সংসারে উপাদেয় ব্যবস্থা ছিল। আমি ডিম মাছ মানে আমিষ খেতাম না বলে বেশী ঘি খেতাম—দই-মিষ্টিও বেশী খেতে হত। এবং আমি খেতে পারি। খাইয়ে লোক। বি-এ যখন পড়ি তখন হোস্টেলের ঠাকুরকে জব্দ করবার জন্তে বত্রিশ-চৌত্রিশখানা রুটি খেয়েছি। বিয়ের বরযাত্রী গিয়ে পঞ্চাশটা পান্তুয়া একখোলা দই খেয়েছি।

ছোটবউদি বলতেন—আপনার বউ-ভাগ্যি ভাল, বিয়ে করে কায়েমী স্বার্থে জামাই হয়ে গেড়ে বসেছেন।

বাইরে বন্ধুরা ব্যঙ্গ করত। বলত—বউ করছে ভিয়েৎনাম—তুমি করছ রাজারাম। আছ বেশ।

তোমার বন্ধুরাও করত এবং অনেক ধারালো জিভে করত—তা আমি জানি। ছোটবউদির থেকে ধারালোতর জিহ্বা নিশ্চয় আছে।

এই কারণেই এম-এ পরীক্ষা দিয়েই বললাম—এবার আমি বাড়ি গিয়ে থাকব।

তোমার বাবা বললেন—যাও। আমি সব অনুমান করতে পারি। এখানে থাকা তোমার উচিত হয়নি। তোমার দোষ নেই, দোষ আমার। মেয়ের জন্তেই চেয়েছিলাম এটা। তবে যাবে যখন—তখন স্বতপা তোমার সঙ্গে যাবে এবং পারমানেণ্টলি ওখানে থাকবে। আমি স্বতপাকে বলব। ল'টা তুমি শেষ কর। তোমাদের একটা টাকা আমি দিয়েছি উইলে। সেটা এখনই দিতে পারি। কিন্তু তুমি প্র্যাক্‌টিসে বসবে—তখন এইটে হবে তোমার মূলধন। বাসা ভাড়া করতে হবে—অন্ত খরচ আছে—

সেদিন উনি বলেছিলেন—কথার মধ্যখানে বলেছিলেন—মেয়েটাকে স্বখী দেখতে চাই আমি। ওর মা মরে যাবার পর আমি ওকে নিজে হাতে মানুষ করেছি। আমার আদর্শে ওকে গড়তে চেয়েছি। কিন্তু—

আমি বলেছিলাম—অপরাধ আমার। স্বতপাকে আমি না বুঝে আকর্ষণ করেছিলাম। অথচ আমার তো ওকে স্বখী করবার মত শক্তি নেই। এ ভুল কি সংশোধন করা যায় না?

তোমার বাবা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—ভুল হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। মানুষের বিবাহ শুধু দেহে দেহে নয়—তার সঙ্গে মনে মনেও। এবং বিবাহের সার্থকতা তার বংশরক্ষায়, তার কোনমতে প্রাণধারণেই শেষ নয়—প্রেমে তাদের পৌঁছতে হয়। এ ভুল সংশোধনের কথা বলছ—বিবাহ তোমরা করেছ রেজেস্ট্রি করে—একালের বিধানকেই বড় করেছ। সেদিক থেকে ভুল-সংশোধনের যে পথ, তারই ইঙ্গিত বোধ হয় দিচ্ছ তুমি?

আমি বলেছিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ হওয়া উচিত তাই। কিন্তু, নাই বয়, এ কথা তুমি আর

কাউকে বোল না। বললে ওইটেই একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি বলেছিলাম—কিন্তু আর কোন্ পথই বা আছে বলুন?

তিনি বলেছিলেন—আছে। ভালবাসার পথ। ভালবাসাকে বড় করে তোল সুব্রত, তোমার হাত ধরে আমি মিনতি করছি। এ কথা তুমি ভেবো না।

তোমাকেও তিনি একথা বলেছিলেন।

আমি জানি। তুমি আমাকে বলনি—কিন্তু তবু আমি জানি।

তুমি কিছুদিনের জন্য অন্যরকম হয়ে গেলে। আমি তোমায় ফিরে পেয়েছিলাম—কিছুদিনের জন্যে। বাবা তোমায় এই কথাগুলিই বলেছিলেন, দুপুরবেলা বলেছিলেন- তখন থেকে সারা সন্ধ্যে তুমি কেঁদেছিলে—আমি না ফেবা পর্যন্ত।

আমি মাস-কয়েকের জন্যে দেশে যাব বলে দুপুর থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত এখানে ওখানে ঘুরেছিলাম।

তোমায় কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কাঁদছ কেন? তুমি আরও কেঁদেছিলে। মনে আছে—সারারাত্রি পরস্পরের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম?

মনে আছে—আবার ভালবাসার জন্যে সংকল্প নিয়েছিলাম? তুমি হঠাৎ আমার আলিঙ্গন ছাড়িয়ে সিঁদুরের কৌটো এনে ধরে বলেছিল আমায়—সিঁথিতে পরিয়ে দাও তো।

মনে আছে?

দেশে তখন যুদ্ধের শিবির বসে গেছে।

কলকাতাতেও যা, এখানেও তাই। তিন-তিনটে পলিটিক্যাল পার্টির সাইনবোর্ড টাঙানো আপিস হয়েছে। কংগ্রেসের আপিস একটা ছিল। নতুন বসেছে আমাদের পার্টির আপিস—আর তোমার ছোড়দার পার্টির আপিস।

আমার মা এবার তোমার সিঁথিতে সিঁদুরের স্পষ্টতা দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। বলেছিলেন—বাঃ, কত সুন্দর লাগছে বল তো।

বাড়িতে তখন আমার এক বিধবা দিদি এসেছেন। মায়ের হার্টে সামান্য স্থায়ী ক্ষতি হয়েছে। ডাক্তারের নিষেধ হয়েছে কাজকর্ম করতে, মা নিজেও যেন পারেন না ঠিক। সুতরাং ওই বিধবা কন্যাটি মায়ের সেবা এবং ঠাকুরের সেবা করেন। মা তাঁকে বলেছেন—তোকে আমি কিছু দিয়ে যাব শিবানী, তুই আমার ঠাকুরের সেবা কর—আর আমায় একটু-আধটু দেখ। রাত্রে ঘরে শুয়ে মরে পড়ে না থাকি! ছেলের বউ তো—

কথাটা নাকি শেষ করেননি মা। কিন্তু তা না করলেও ওর বাকীটা যে কি তা বোধ করি বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবে না কারুর। এবং দু'রকম কেউ বুঝবেন না।

সেদিন তোমার সিঁথিতে সিন্দুর দেখে সারা চিত্তটাই ওঁর বোধ করি দোলা খেয়ে দুলে উঠেছিল।

তোমার মুখখানি তুলে ধরে দেখেছিলেন।

তোমাকে মৃদুস্বরে যে কথাটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তাতে তুমি লজ্জিত হয়েছিলে।

পনেরো-বিশ দিন আমাদের খুব সুন্দর কেটেছিল।

এর মধ্যেই লোক-যাতায়াত শুরু হয়েছিল—কিন্তু আমরা আমল দিইনি।

তোমার ছোড়দার পার্টির ছেলেরা তোমার কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিল—তুমি দিয়েছিলে, তারা চলে গিছল এই পর্যন্ত।

হঠাৎ গ্রামের প্রান্তে হাড়িপাড়ায় কলেরা লাগল।

কাটোয়ায় অম্বুবাচীতে গঙ্গাস্নানে গিয়ে আম-কাঁঠাল খেয়ে কলেরা ধরিয়ে মর-মর অবস্থায় একজন সমর্থ জোয়ান বাড়ি এসে মরল—সেটা কেউ জানতে পারেনি; কিন্তু এরপর তিন-তিনজনের একসঙ্গে কলেরা হওয়ার সংবাদে গ্রামখানা চঞ্চল হল।

কলেরা আমাদের গ্রামে অনেকদিন—বোধ হয় দশ বছর হয়নি। লোকেরা এল মায়ের কাছে।

আমার বাবা দেশের কাজ করতেন যখন, তখন কংগ্রেস কমিটি করে তার প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন—তার সঙ্গে আর একটা সমিতি স্থাপন করেছিলেন—সমাজ-সেবক সমিতি। কলেরা তখন এ অঞ্চলে লেগেই থাকত। কাছেই কাটোয়া উদ্ধারণপুরে গঙ্গার ঘাট। পর্বে-পার্বণে বছরে পাঁচ-সাতটা মেলা বসে, সেই মেলায় হয় কলেরার উৎপত্তি। এবং সেটাই যেত চারিপাশে। তারই জন্য স্থাপন করেছিলেন সমাজ-সেবক সমিতি। কলেরা ছাড়া ছিল ম্যালেরিয়া। আরও কাজ ছিল—নাইট-স্কুল ছিল। আগুন নিবারণী বাহিনী ছিল।

এককালে এ অঞ্চলে এই সমিতির খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা ছিল অনেক। বাবার পর এ সোসাইটি চালিয়েছিলেন আমার মা। আমার বাল্যকালে এসব কাজ ভলেণ্টিয়ার হয়ে আমিও করেছি। কিন্তু স্বাধীনতার পর কলেরা আর ম্যালেরিয়া এ দুটো ব্যাধি বিচিত্রভাবে দেশ-ছাড়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সমিতির কাজকর্মের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তা ছাড়া স্বাধীনতার পর কংগ্রেস নাইট-স্কুল, আগুন-নিবারণী বাহিনী চালাবার মত কাজকর্ম পাশে ঠেলে সরিয়ে সভাসমিতি ইলেকশনের কাজ নিয়েই উঠে পড়ে লেগেছিল বলে সমিতিগুলি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়েছিল। মা ধরে রেখেছিলেন বলেই ছিল—না হলে হয়তো মরে পচে ধুলো-মাটির সঙ্গে মিশে যেত।

মা আমার কংগ্রেস ছেড়েছিলেন এরই জন্য।

আমিও ছেড়েছিলাম মায়ের সঙ্গে। অবশ্য আমার আরও কারণ ছিল। যাক সে-সব কারণের কথা। ওসবের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ঘুচিয়ে দেব বলে বদ্ধপরিকর ছিলাম আমি। কিন্তু কলেরার তাড়া খেয়ে দরিদ্র মানুষগুলো সেদিন যখন ছুটে এসে আমাদের উঠোনে দাঁড়িয়ে 'ঠাকরুণ, মা ঠাকরুণ। বাঁচাও মা—এ বিপদ থেকে তুমি বাঁচাও' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল, তখন তো তুমি আমি আমাদের—মানে তোমাদের পাকা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তখন তো 'কি হল কি হল' বলে আমরা দুজনেই ছুটে এসেছিলাম বাড়িতে। মায়ের শরীর ভাল ছিল না। মা তবুও খাট থেকে নেমে দেওয়াল ধরে বাইরে এসেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন—ওরে, আমার তো যাবার শক্তি নেই, তো তুই যা। কাজ তো

এককালে করেছিস। ভয় তো করবে না। যা—দেখেশুনে ওদের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আয়।

তুমি আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলে। বলেছিলে—আমি যাব।

মা হেসে বলেছিলেন—যাবে বইকি মা। যাওয়া তো উচিত। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমিও যেতাম ওদের মধ্যে। তাঁর কাছেই শিখেছিলাম এই সব সেবার কাজ। কিন্তু তুমি যাবে—তোমার ভয় করবে না তো? তোমার কি অ্যান্টি-কলেরা ভ্যাকসিন নেওয়া আছে?

ভ্যাকসিন তোমার নেওয়া ছিল না। ভয়ও তুমি পেয়েছিলে। তবু আমি চেয়েছিলাম তুমি আমার সঙ্গে যাও। হয়তো আমার এই গৌরবের কাজ তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম। পুরুষ দেখাতে চায়।

তুমি দেখেছিলে—খুশী হয়েছিলে।

তারপর আরও কত খুশী হয়েছিলে- যখন কাজ বাড়ল। তখন কলেরাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; টেলিগ্রাম গেল হেলথ ডিপার্টমেণ্টে—মিনিস্টারের কাছে। তারা এল দলে দলে জীপে চেপে। তাদের অভ্যর্থনার সব ভার মা দিলেন তোমার উপর। আমি আমার চ্যালাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম—এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া, এ-গাঁ থেকে সে-গাঁ। একদিন তুমি আমার সঙ্গে ঘুরেছিলে। সে কি মুগ্ধ-বিস্ময় তোমার মুখে, তোমার চোখে।

আমাকে জাপটে ধরে তুমি বলেছিলে—তুমি অত্যন্ত শঠ—তুমি প্রবঞ্চক।

চমকে উঠে বলেছিলাম—কেন?

তুমি বলেছিলে—তুমি শঠ—তোমার এই রূপ আমাকে দেখাওনি আজও।

আশ্চর্য! এই সমাজ-সেবক সমিতিরই কোন এক ফাটল দিয়ে আমাদের জীবনে ঢুকল সেই সাপটা—যে সাপটা লোহার বাসরঘরে লখীন্দরকে কামড়েছিল; না, সে সাপটা নয়। এ সাপটা রাজনীতির সেই সর্বনাশা সাপটা—যেটা আজ মানুষের সমাজের মাথায় ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের সমস্ত মানুষকেই সে কামড়াবে, বিষে জর্জরিত করে দেবে।

মনে পড়ছে? কলেরা থেমে গেল। গোটা গ্রামঅঞ্চলে সমাজ-সেবক সমিতির প্রশংসা হল। প্রচুর প্রশংসা। মা পুজনীয়াই ছিলেন। পরম পুজনীয়া হয়ে উঠলেন। আমার তোমার প্রশংসারও শেষ ছিল না।

আমার পার্টির গৌরব বাড়ল। তারা বেশী বেশী মিটিং করতে লাগল। তোমাকে আমাকে অভিনন্দন দিল তারা। লোকে বলতে লাগল—তুমি এবার ইলেকশনে দাঁড়াও।

ওদিকে কংগ্রেস এবং তোমার ছোড়দার পার্টির লোকেরা অভিযোগ তুললে—আমরা সেবা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

যে ডাক্তার এখানে কলেরা-ডিউটিতে এসেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে দরখাস্ত গেল উপরে যে, ডাক্তার বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানের সেবা-কার্যেই সহযোগিতা করেছেন, সাহায্য করেছেন

এবং অন্ত অন্ত প্রতিষ্ঠান যারা সাহায্য চেয়েছে, তাদের কোন সাহায্য দেননি। এ ছাড়াও গ্রামময় দেওয়ালে লেখা হল, মুখে মুখে আলোচনা হতে লাগল—এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন হবে না কেন?

সুব্রতর বাবা স্থাপন করেছিলেন—তাঁর মৃত্যুর পর থেকে প্রভাময়ী দেবী প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের খাস তালুক ক'রে রেখেছেন।

এর নির্বাচন হোক।

মা আমার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

—না। না। না। না। বুকের রক্ত দিয়ে একে বাঁচিয়ে রেখেছি। আমার স্বামীর কীর্তির স্মৃতি। আজ পঁয়ত্রিশ বছরে—কত ছেলে এল, কত ছেলে গেল—কেউ আজ মাস্টার কেউ দোকানদার কেউ চাষী কেউ কংগ্রেসী কেউ কিছু সম্পর্ক রাখেনি। আমি বুক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি—এর আবার ইলেকশন কিসের?

এটা আমার গায়েও লেগেছিল। আমিও তো ছেলেবেলা থেকে মায়ের নির্দেশমত সমিতির কাজ করে এসেছি।

সমিতির কাজ ঠিক নয়, মা আমাকে শেখাতেন তাঁর পছন্দমত কাজ। পাড়ায় ইঁদুর-বেড়াল মরে রাস্তার ধারে ধারে পড়ে থাকলে বলতেন, সুবু যাও, ব্রতপালন কর। মরা বেড়ালটাকে পায়ে দড়ি বেঁধে গ্রামের বাইরে ফেলে দিয়ে এস।

কোন অন্ধ কি খঞ্জকে রাস্তায় দেখলে—তাকে কিছুটা সাহায্য করার উপদেশ তাঁর দেওয়া ছিল।

আমাদের বাড়ির খিড়কির পুকুরটার পূবপাড়ে যে বসতিটা এখন দেখ, ওটার মধ্যে ঘরতিনেক বাউড়ির বাস আজও আছে। শম্ভুর বউ তার ছেলে জিতেনকে চেন। জিতেনের টি-বি হয়েছে—তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে সেবা-সমিতি থেকে—আজও মা বাড়ি থেকে তাদের সাহায্য করেন। তুমিও তাকে টাকা দিয়েছ। আজও গ্রামে থাকলে পুকুরের এপাড়ে আমাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে হেঁকে জিজ্ঞেস করি—ওরে শম্ভুর বউ, জিতেন কেমন আছে? মতিলালের বউকেও চেন; তার বেটা, বেটার বউকে চেন। বেটার বউটাকে যেদিন ডোমনা চিতিতে কামড়াল—সেদিন রাত্রে ছুটে এসে পড়ল আমাদের বাড়ি। আমিই তার হাতে বাঁধন দিয়ে, গাড়িতে ক'রে পাশের গ্রামের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অ্যান্টি-ভেনম ইনজেকশন দিইয়েছিলাম। তুমি চোখে দেখেছ এসব এবং এসব একালের কথা।

সেকালে ওদের কারুর জর-জালা কি অসুখ-বিসুখ করলে আমি সকালবেলা উঠে ওদের খবর করতে যেতাম। বাড়িতে মা রোগীর খাদ্য সাগু-বার্লি তৈরি ক'রে রাখতেন—ওরা নিয়ে যেত। সেটা বিকেলবেলা। সকালবেলার খাদ্যটা আমাকে নিয়ে যেতে হত।

বারো-তেরো বছর বয়সে আমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে এসে জুটে সমাজসেবক সমিতির সেবক হয়েছিল। আমাদের ওই বাউড়ীদের পাড়ায় একবার আগুন লেগেছিল যখন তখনই পত্তন হয়েছিল আগুন-নিবারণী বাহিনীর।

তখন আমরা সেবক ছিলাম আটজন। মা ঘর থেকে পাঁচটি টাকা দিয়ে সাতটি বালতি কিনে পত্তন করে দিয়েছিলেন। তাঁর দেখাদেখি গোটা গ্রাম থেকে চাঁদা উঠেছিল পনেরো টাকা। সেবক আটজন থেকে ক'দিনের মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাইশজন। বালতি কেনা হয়েছিল আরও তেরোটি।

এসব তুমি দেখনি। এসব তুমি জান না। তাই তোমার ভাল লাগেনি আমাদের কথা এবং আমাদের অ্যাটিচুড। তুমি আমাকে দিব্যি বলে উঠলে—এটা কিন্তু অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে।

আমি তোমাকে কটু কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম—হ্যাঁ, আইন তুমি ভাল বোঝ বটে। তোমাদের ঘর ব্যারিস্টারের ঘর। ব্যারিস্টারের মেয়ে, ব্যারিস্টারের বোন। আইন তোমার নখাগ্রে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়টা ঠিক এত সহজ নয়। নাই বা তুললে ন্যায়-অন্যায়ের কথা।

মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয়ে গেল। তুমি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—তুমি আমার বাবা তুললে?

যে আঘাতটা আমি তোমাকে করেছিলাম সেটা শতগুণ হয়ে ফিরে এসে আমাকে আঘাত করলে। আমি স্তম্ভিত হয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। কিন্তু তোমার কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে পারলাম না।

স্বীকার করলে হয়তো—

না। পরিণাম এই-ই হত। হতে বাধ্য। কারণ সমগ্র পৃথিবীর সকল দেশে সকল সমাজের সকল ঘরেই বোধ করি এই সংঘর্ষ চলছে।

সুতপা, দোষ তোমারও নেই, দোষ আমারও নেই। একালের পৃথিবীর বাতাসে ভালবাসা নেই—একালের অন্নে নেই, একালের জলে নেই; বোধ করি আকাশে সূর্যের আলোতেও নেই। একালের বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে একালের অন্নে বেঁচে থেকে বোধহয় কেউ আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না।

হিসেবটা যেন উল্টে গেছে। আগের কালে ভালবাসার হিসেবের ছকটা ছিল বিচিত্র। জমার দিকটায় লেখা হত কতটা দিলাম তার কথা। আর আজকাল জমার দিকে লেখা হয় নিজের পাওনার কথা। একালে সব হিসেব পাওনার হিসেব—আমি কতটা পেয়েছি, আরও কতটা পাইনি, পাওনা আছে - তার হিসেব। কতটা কে পাবে, কতটা কাকে দিলাম—তার কথা নয়।

থাক্‌। ওই কথাটা কিন্তু মায়ের কানে গিয়েছিল এবং মা আমাকে ডেকে খুব একটা কটু কথা বলেছিলেন। তোমাকে বলেছিলেন—সর্বনাশা অগ্নিশিখা। আমায় বলেছিলেন পাখা-পোড়া পতঙ্গ।

তুমি যদি তাই পারতে সুতপা।

তুমি যদি আমাকে পাবার তপস্যা করতে। আদর্শের চেয়েও যদি আমাকে বেশী ভালবাসতে।

যাক্।

না, যাবে না। তোমাকে আমি অত্যন্ত ভাল বেসেছিলাম।

না, তাতেও যেন সংশয় জাগছে। তা না হলে সেবা-সমিতির থেকে তুমি বড় হলে না কেন?

* * *

সেবা-সমিতির নির্বাচন তোমার কথার পর ইচ্ছে করেই করলাম। আমি করিয়েছিলাম। মা হার্টের রোগী হয়েও সমিতির আপিসে এসেছিলেন। বিচিত্র সংসার, বিচিত্র কাল, নির্বাচনে তোমার দাদাদের পার্টি এবং কংগ্রেস—দু'পক্ষই হাত মিলিয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে।

সারা গ্রামে চাঞ্চল্যের কথা তোমার মনে আছে।

চঞ্চল বোধ করি আমিই হয়েছিলাম সব থেকে বেশী। তুমি গম্ভীর হয়ে বসেই ছিলে। তোমার কাছে বারকয়েকই এসেছিল তোমার দাদার পার্টির ছেলেরা। তারা তোমার দাদার পার্টির ছেলে হলে হবে কি, তারা তো আমার গ্রামের ছেলে। তাদের আমি 'সুব্রতদা'। আমাকে ভাল তারা তখনও বাসত। তারা তোমাকে একটা মিটমাট ক'রে দিতে বলেছিল। তুমি বলেও ছিলে। কিন্তু আমার পার্টির ছেলেরা মিটমাট করতে দেয়নি।

নির্বাচন হয়ে গেল। আমরা জিতলাম এবং সে জয় এমন-তেমন নয়। পনেরো জনের মধ্যে বারো জন। মা হলেন প্রেসিডেন্ট, আমি সেক্রেটারী। আমি তোমায় বলেছিলাম—দেখলে তো! মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়।

তুমি হেসেছিলে।

এরপরই এসেছিল গ্রামপঞ্চায়েৎ এবং অঞ্চলপঞ্চায়েৎ নির্বাচন। আমার পার্টি কোমর বেঁধে নামল। তোমার দাদার পার্টির লোকেরা কৃষি-শ্রমিক-সমিতি নামে সমিতি খুললে।

আমাকে তুমি বলেছিলে—তুমি অন্ততঃ এই ব্যাপারটায় এসে এদের সঙ্গে দাঁড়াও। ওরা তোমাকে চায়। আমাকে অনেক ক'রে বলে গেছে—সুতপাদি আপনি বুঝিয়ে বলুন ওঁকে।

আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল, খপ করে বলেছিলাম—সম্বন্ধটা পর্যন্ত দেখছি উল্টে দিয়েছে এরা—তুমি দিদি হয়ে গেছ বউদি থেকে।

তুমি হেসে বলেছিলে—সীতাংশু যে দাশগুপ্ত-বাড়ির ছেলে। এ বাড়িটাই যে দাশগুপ্তদের বাড়ি।

এত বড় আঘাত আমি ওই কথাটায় পেয়েছিলাম সুতপা যে, আমার মনে হয়েছিল আমি নিজের মাথায় একটা লোহার ডাণ্ডা মেরে নিজেকে রক্তাক্ত করে ফেলি। তোমার মনে আছে, বারান্দার দেওয়ালের গায়ে পুরনো আমলের দেওয়াল-গিরি টাঙাবার একটা ব্র্যাকেট ছিল, সেটাকে অকারণে চেপে ধরে টেনে ভেঙে ফেলেছিলাম।

তুমি লক্ষ্য করনি। সম্ভবতঃ তুমি তোমার আদর্শের প্রেরণায় সেই মুহূর্তে আর আমার প্রিয়তমা ছিলে না।

তুমি আমাকে বলেছিলে—রোগ হলে মানুষের সেবা কর। পুণ্য নিশ্চয় হয়। কিন্তু সুস্থ মানুষেরা বুক দিয়ে খেটে চাষ করে যে সারা বছরের তিনমাস উপোস করে তিনমাস একবেলা খায়, তিনমাস হয়তো দুবেলা খায় কি খায় না—তাদের কথা একবার ভাববে না? তাদের পাশে দাঁড়াবে না? অন্ততঃ সরকারী আইনে এদের যে ভাগ পাওয়ার কথা তাও তো এরা পায় না। তুমি আমার থেকে অনেক বেশী জান। এদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নিবিড়। এই তো, তোমাদের বাড়িতেই বোধহয় পায় না।

কথাগুলো যা বলেছিলে তা তুমি এই-ই বলেছিলে, কিন্তু বাগ্‌বিন্যাস বোধহয় এমনটি নয়। বড় শুকনো শুকনো ছিল। হয়তো বা জ্বালা ধরানোর মতও কিছু ছিল।

আমি নীরবেই নীচে নেমে আসছিলাম, হঠাৎ কি মতি হল ফিরলাম; সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসে বলেছিলাম—শোন, দাশগুপ্তদের এ বাড়িতে আমি আর আসব না।

কথাগুলি মা শুনেছিলেন।

বলে দিয়েছিল শিবানীদি। কিন্তু স্থূল কথাটাই সে ধরতে পেরেছিল—জমিব ভাগ-সংক্রান্ত কথা যেগুলি সেইগুলি। বাড়ি নিয়ে কথাটা সে ধরতে পারেনি। ওর দোষ কি, তুমিও জানতে না।

মা আমাকে ডেকে বললেন—ওই ভাগ জোতদারদের নিয়ে হাঙ্গামার মধ্যে তুই নামছিস নাকি?

রাগ আমার মায়ের কথাতেও হয়েছিল।

আমি বলেছিলাম—ঠিক কিছু করিনি।

মা বলেছিলেন—বউমা নামবেন বলে নাকি গাছকোমর বাঁধছেন?

আমি বলেছিলাম—যদি নামে?

—তা হলে বলো আমার সঙ্গেই আগে বোঝাপড়া হবে। আমাদের জমিই কৃষাণী ভাগে বিলি আছে। চাষী পায় একভাগ, আমরা পাই দু'ভাগ। শুধু তাই নয় সুব্রত—তোর বউকে খোঁজ নিয়ে দেখতে বল্ যারা সমিতি খুলছে তাদের মধ্যে যাদের জমি আছে তাদেরও সব ওই একভাগ।

সে-সব কথা আমার মাথায় তখন ঢুকছিল না সুতপা, আমার মাথায় ঘুরছিল তোমার ওই কথা—ওই যে—'সীতাংশু যে দাশগুপ্ত-বাড়ির ছেলে, এ বাড়িটা,—এ ভিটে যে দাশগুপ্তদের ভিটে'।

সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গিছল। তোমার ছোটবৌদি আমাকে জামাইবাবু বললে যত জ্বালা ধরত গায়ে, তার থেকে বেশী জ্বালা ধরেছিল।

আমি ফিরে এসেছিলাম তোমার কাছে।

তোমাকে আঘাত দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে ফিরে এসেছিলাম।

ফিরে এসে দেখি তুমি বারান্দার মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ।

ছুটে ডাক্তার ডাকলাম।

ডাক্তার দেখলেন। চেতনা পেয়ে তুমি উঠে বসেই বললে—আমি কলকাতায় যাব। আজই তুমি ব্যবস্থা করে দাও। Please.

আমি মনে মনে উত্তর আওড়ালাম—বরাবরের জন্য সুতপা। তুমিও বাঁচ, আমিও বাঁচি।

ডাক্তারের সামনে বলতে পারলাম না। ডাক্তার বললেন—হ্যাঁ। আপনি কলকাতায়ই যান। সুব্রতবাবু, এখানে তো যত্ন করবার লোক নেই, আপনার মা তো হার্টের রোগী। বাড়িতে তো ঐ ঝি-টা। অবশ্য ও কলকাতার ঝি। কিন্তু উনি—

ডাক্তার হেসে বলেছিলেন—উনি মা হতে চলেছেন।

আমি চমকে উঠে মুখ তুলে তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম।

তুমি চোখ বন্ধ করেছিলে। কেন তা জানি নে। লজ্জাতে চোখ আপনিই এমন ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে আসে; নারী পুরুষের চোখে চোখ রাখতে পারে না। ঠোঁটের কোণে যে এতটুকু একটু হাসি থাকে, তাকে খুঁজে বের করতে হয়। চোখ বন্ধ হলেও হাসি আমি দেখতে পাইনি সেদিন।

লিখতে লিখতে থেমে গিয়েছিলাম সুতপা।

মনে প্রশ্ন জেগেছিল, প্রশ্ন জেগেছিল—আমি কি হাসির টুকরোটুকু খুঁজে ছিলাম? বিচার করে মনে হচ্ছে—খুঁজিনি।

অবশ্য এটাও ঠিক যে খুঁজলেও পেতাম না। কারণ আমি যেমন হাসি খুঁজিনি, তুমিও তেমনিই ঠিক হাসোনি।

আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলাম।

আসবার সময় কোন কথাই আমি বলিনি। অথচ এমন ক্ষেত্রে বলা উচিত ছিল যে কথাটা—সেটা বোধহয় জিভের ডগায় এসে বসেছিল। ডাইভোর্স তোমারও চাওয়া উচিত ছিল। আমারও চাওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল দুজনের একসঙ্গে আদালতে গিয়ে ডাইভোর্স পিটিশন দাখিল করে আসা।

পারলাম না। আমিও না—তুমিও না।

বিবাহের বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে পিছিয়ে এলাম—দেখলাম, বাঁধনটার উপর কখন আর একটা বাঁধন পড়ে গেছে, দিয়েছি আমরাই দুজনে—দেবার সময় তুমি ধরেছিলে একদিকে—আমি একদিকে।

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন—এ তুই কি করছিস সুব্রত? তোর থেকে কি ক্রিয়া-কাণ্ড সব লোপ পাবে রে?—এরপর শ্রাদ্ধও করবি নে—তর্পণও করবি নে?

মনটা বড় অশান্ত পীড়িতই ছিল, বললাম—কি করব মা উঠে গেলে। শ্রাদ্ধ-তর্পণ বলছ—কোন্ শ্রাদ্ধ করিনি? এখন তো নিজের শ্রাদ্ধই করছি অহরহ। আর শ্রাদ্ধ-তর্পণ—১৯৬৫ সালে—কেউ করে নাকি? করলেও কি নিয়মরক্ষের জন্তেই করে না? ওসব আর কি কেউ সত্য বলে বিশ্বাস করে?

মাকে আমার জান।

মা কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের কাছে ঈশ্বর শাস্ত্র ধর্ম যতখানি মিথ্যে, মায়ের কাছে ততখানি সত্যি।

ও নিয়ে ঝগড়া ক'রে লাভ নেই। মানুষের বিচারের অস্তিও যতখানি মিথ্যে, নাস্তিও ততখানি মিথ্যে।

থাক্। কি লাভ তত্ত্ব নিয়ে তর্ক করে! যা হয়েছিল, তাই বলি। তুমি বোধহয় ভুলেই গেছ। ভোলারই কথা। আমাদের বাড়িতে নাড়ুগোপালের মূর্তি আছে: বাড়ির বধূ-কন্যারা অন্তর্বত্নী হলে ওই মূর্তিটির সেবা তারাই করে। সেবা। মন্ত্র-টন্ত্র নেই। গোপালটিকে কুলুঙ্গীতে রেখে তার সামনে চারবেলা ভোগ দেওয়া, ফুল-চন্দন দেওয়া—এই। এর ওপরে যে যতখানি পারে খেলতে। মা তোমাকে যাবার আগে সেটি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—আমাদের বংশের এই নিয়ম। আমাব দিদিশাশুড়ীর সন্তান হয়নি, বড় দুঃখ ছিল মনে। তাঁর বাপেরই এই ভিটে। আমার দাদাশ্বশুর ছিলেন পেশাদার কুলীন। পঁচিশ-ত্রিশটা বিয়ে ছিল। তবু এখানে বেশীর ভাগ থাকতেন, যত্নের জন্তে। আমাব দিদিশাশুড়ী স্বামীর সেবাতে নিজেকে ঢেলেও দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্তান হয় নি। একবার নবদ্বীপ গিয়ে দাদাশ্বশুর গোপালটি কিনে দিয়ে বলেছিলেন—এর সেবা কর। আমার দিদিশাশুড়ী গোপালকে কুলুঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা ক'রে সেবা ক'রে সন্তান কোলে পেয়েছিলেন। তিনিই এই নিয়ম ক'রে গেছেন যে, বউ মেয়ে যে-ই পোয়াতি হবে, সে গোপাল-সেবা করবে সন্তানের অন্নপ্রাশন পর্যন্ত।

মা তোমাকে বলেছিলেন—এটি তুমি নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। আমার বংশের নির্দেশ হল, তুমি এঁর সেবা করবে যেমন আমরা করেছি। নাও, ধর।

তুমি নিয়েছিলে। আমার মা সিংহাসন, ভেলভেটের টুকরো, রূপোর রেকাবী—পুতুল খেলার সব সরঞ্জাম সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তুমি আসবার সময় সেটিকে ফেলে গিছলে।

আমি বাড়ি ফিরলেই মা অভিযোগই শুধু করেননি, কপালে কয়েকটা চাপড়ও মেরেছিলেন।

তুমি একখানা চিঠি লিখেছিলে দিনচারেক পর। লিখেছিলে আমাকে না, মাকে। লিখেছিলে—গোপাল-মূর্তিটি আমি ফেলে এসেছি। আপনি নিয়ে গিয়ে যেমন আপনার কাছে ছিল তেমনি করে রাখবেন। 'সুব্রত' লিখে, কেটে তার জায়গায় 'আপনার ছেলে' যখন আসবে তখন তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন—লিখেছিলে।

মা বোধহয় তার উত্তর দেননি।

হঠাৎ দেশে দপ্ ক'রে আগুন জলে ওঠার মত আন্দোলন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। চালের দর ক'বছর ধরেই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে বেড়ে আসছিল।

ধান-চালের ব্যবসাদারেরা যে-চক্র তৈরী করলে—সে-চক্র পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকার ভাঙতে পারলে না বা ভাঙলে না। জোতদারদের সঙ্গে, ধান-চালের মহাজন কলওয়ালাদের সঙ্গে, ওদের আঁতাত যেটা সেটা প্রমাণ কেউ করেনি, কিন্তু না করলেও এটা প্রমাণিত সত্য থেকেও বড় সত্য—বেশী সত্য।

তুমি রইলে কলকাতায়। আমি জানি তুমি মিছিলে বের হওনি—কিন্তু সভা-সমিতিতে গিয়েছ। এখানে এরই মধ্যে পঞ্চায়েৎ ইলেকশনে আমরা জিতলাম। কংগ্রেস হারল, তোমার দাদাদের পার্টি হারল।

আমরা বিজয়োৎসব করলাম। বেশ বড় মিটিং হয়েছিল, মা পর্যন্ত এসেছিলেন সভায়, তিনি পতাকা তুলেছিলেন।

তুমি খবর জান, সীতাংশু তোমাকে জানিয়েছিল। খোঁচা দিয়ে একখানা লেটার-পেপারে একটামাত্র কথা—'অভিনন্দন'—নিচে 'সুতপা' লিখে চিঠি লিখেছিলে আমাকে।

তোমার বাবা আমাকে লিখেছিলেন—শুনলাম তুমি পঞ্চায়েৎ ইলেকশন করে জিতেছ। যা করবে কর—পার্টি করো না। এইটেই আমার একমাত্র অনুরোধ। আমি খুব চিন্তিত হয়েছি তোমাদের জন্য।

তোমার চিঠির ব্যঙ্গ আমার অন্তরে এমন জালা ধরিয়ে দিয়েছিল যে, তোমার বাবার পত্রেরও উত্তর আমি দিইনি।

শুধু তাই নয়, এম-এ'র খবর বের হল—খবরটা অনুজ্জ্বল নয়। সেকেণ্ড ক্লাস পেলেও, সেকেণ্ড ক্লাসে সেকেণ্ড হইনি—নামটা প্রথমেই ছিল। তোমার বাবার টেলিগ্রাম এল। তুমি একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলে; যেতেও লিখলে—কিন্তু যেতে যেন উৎসাহ পেলাম না।

তোমার উপর অভিমান? অভিমান বলব না। রাগ—হ্যাঁ রাগ, বিদ্বেষ যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। সে রাগ কত প্রচণ্ড—সে এই খবর থেকেই বুঝবে। আমাদের পার্টির কনফারেন্স হচ্ছিল পাটনায়। আমি বেঙ্গল গ্রুপের একজন—প্রধান। আমি যাব। কলকাতায় এসে নামলাম বেলা দশটায়। ইচ্ছে করেই দশটায় নেমেছিলাম; তার একদিন বা দু'দিন আগে আসতে বাধা ছিল না, কিন্তু আসিনি, কলকাতায় থাকতে হলে তোমাদের ওখানেই থাকতে হবে বলে আসিনি। দশটায় নেমে তোমাদের বাড়ি গিছলাম সাড়ে বারোটায়, আবার সন্ধ্যাবেলা উঠেছিলাম ট্রেনে। ফেরার সময় বর্ধমান থেকে নেমেই চলে গিছলাম সর্বানন্দপুর।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল দুপুরবেলা। কিন্তু তিনটের সময় তুমি বেরিয়ে চলে গিছলে তোমার ছোটবউদির সঙ্গে।

এ নিয়ে কোন কথা তুমিও বলনি, তবে অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলাম—একটা

পারাবার আমাদের দুজনের মধ্যে এবং সেটা নিরন্তর আয়তনে বেড়েই চলেছে।

যে কথা ক'টা হয়েছিল—তা নিশ্চয় তোমার মনে আছে? তুমি বলেছিলে—এম-এ তো হল—এবার শেষ কর। বাবা বলছেন—সুব্রতর জন্তে এবার ভাবনা হচ্ছে আমার। পার্টি-পার্টি করে শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট না করে। অ্যাসেম্বলী ইলেকশনে দাঁড়াবে নাকি? মনে আছে? বলেছিলাম—পার্টি বললে দাঁড়াতে হবে বইকি।

তুমি বলেছিলে—তোমাদের এ কনফারেন্সে তো তারই আয়োজন?

—হ্যাঁ।

কনফারেন্সে তারই আয়োজনই বটে।

সারা দেশ জুড়ে তারই আয়োজন প্রবল উদ্যমে শুরু হয়েছে। সামনের দুর্গাপুজোর বারোয়ারীর মধ্যে তারই আয়োজন। এখানে ওখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে তারই আয়োজন।

রাজনৈতিক মিছিল আর সভার তো শেষ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে ইস্কুলে ছাত্র-আন্দোলন চলছে।

খাদ্য-আন্দোলন হচ্ছে তীব্র থেকে তীব্রতর। পনেরো-ষোল টাকা মণ থেকে পঞ্চাশ টাকা চালের মণ যখন হল তখন আগুন জ্বলল—তারপর চার টাকা সের ১৬০ টাকা মণ হল চালের। আগুন আর নিভল না। কলকাতা শহরে সপ্তাহে সপ্তাহে ট্রাম-বাস বন্ধ হচ্ছে, ব্যারিকেড দেওয়া হচ্ছে; ট্রামে-বাসে আগুন লাগছে। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে পথের দুধার। বিপ্লব বিপ্লব বিপ্লব। এরই মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে বাধল ভারতবর্ষের সংঘর্ষ। পাকিস্তান আক্রমণ করলে ভারত সীমান্ত, কিন্তু হঠতে হল। ভারতবর্ষের সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতরে প্রবেশ করলে।

সারা দেশে কংগ্রেস স্ফীত হয়ে উঠল।

জানুয়ারী মাসে তাসকেন্দে রাশিয়ার আহ্বানে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের জিত পালাটা আপসে মিটিয়ে নিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী মারা গেলেন।

ইন্দিরাজী প্রধানমন্ত্রী হলেন।

সারা ভারতবর্ষে—দিনের পর দিন প্রতিটি দিন—মানুষ অনুভব করতে লাগল—সময় হয়েছে; কংগ্রেসের যাবার সময় হয়েছে; জীর্ণ হয়েছে কংগ্রেস; অন্যায়ে ভরে গেছে কংগ্রেস; ভারতবর্ষের সাধারণ দরিদ্র মানুষকে বঞ্চনা করেছে এরা। এর প্রতিকার করবার জন্য আহ্বান এসেছে—কালের আহ্বান। যেমন আহ্বান এসেছিল পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের পর কুরুক্ষেত্রের পূর্ব সময়টিতে। সেই এক কথা 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়—সম্ভবামি যুগে যুগে।'

আজ মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে কেন—স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছি—এর সবটা মিথ্যা, সবটা প্রবঞ্চনা।

আবার মনে হচ্ছে—না। তা নয়। সত্য আছে বইকি—এরই মধ্যে। সব পার্টিই এক-একটি আদর্শের সত্যকে সামনে রেখে এগিয়ে আসছিল এই সঙ্কট-মুহূর্তে। মানুষের সেবা করবে—দেশের সেবা করবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ছে সুতপা। 'আমার জীবনে জীবন লভিয়া জাগ রে সকল দেশ।' এ আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে আশ্চর্য সত্য।

তারই সঙ্গে বিচিত্র বৈষম্যে—ঠিক এরই সঙ্গে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারা দেশের উপর, মানুষের উপর কর্তৃত্বের অধিকার, নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা, অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান। এই মুহূর্তে চোখের উপর ভেসে উঠছে—ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণের সেই বক্তৃতা দেওয়া মুখচ্ছবিখানি।

তারও পিছনে যখন তাকাই, তখন চোখে পড়ে দল। অন্ধ জনতার দল। যখন দলের দিকে তাকাই—তখন মনে হয়—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলার মধ্যে 'ইতি গজ' শব্দ দুটি উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্বর মৃদুকরার যে মিথ্যাচারের জন্য যুধিষ্ঠির নরক-দর্শন করেছিলেন, সেই মিথ্যাচারের পাপ জমা হয়ে আছে ওখানে। ওই পাপের জন্য সব পুণ্যব্রত ব্যর্থ হবে, সব সত্য মিথ্যা হবে। মনে হয় ওই অরণ্যের অন্ধকারে গাছের আড়ালে রাবণ দাঁড়িয়ে আছে।

তোমার আমার জীবনের কথাও মনে হয়েছিল সুতপা। কিন্তু তখন আর ভাববার অবকাশ ছিল না। সেখানেও ওই মতবাদের বিবাদ কলির মত আমাদের সব বন্ধন কেটে ফেলবার জন্য ওই অরণ্য থেকেই ছুরি এগিয়ে দিয়েছিল।

* * *

নল-দময়ন্তীর কথা সুতপা। তুমি জান নিশ্চয়। নল আর দময়ন্তী কলির চক্রান্তে সব হারিয়ে বনের মধ্যে যখন একখানা কাপড়ের দুই প্রান্ত দুজনে পরে পরস্পরকে যখন পরস্পরের কাছে বেঁধে রেখেছে, সেই সময় একদিন গাছের ছায়ায় দময়ন্তী ঘুমিয়ে আছেন, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন—বেঁধে তো রেখেছি স্বামীকে, স্বামী মুখের দিকে তাকিয়ে, গভীর মমতার সঙ্গে মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন—আমার জন্যই দময়ন্তীর এই দুর্ভোগ। কলির যত আক্রোশ আমার উপর, দময়ন্তীর উপর তো নয়।

কে যেন বলেছিল—মনের কানে কানে—সুতরাং তুমি ওর সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন কর। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থেকে একখানা শাণিত ছুরিকা কেউ এগিয়ে দিয়েছিল।

আমাদেরও হল তাই।

খোকা হল।

খোকার নাম তোমার বাবা রাখলেন—আনন্দ। আনন্দময়।

আমার মায়ের আর খুশীর শেষ রইল না। কি সুন্দর নাম। আনন্দময়। খোকার ডাকনাম হয়ে গেল ছুটো।

তোমরা—তুমি, তোমার ছোড়দা—নাম রাখলে গর্কী।

আমি নাম রাখব ভেবেছিলাম—শিবা। অর্থাৎ শিবাজী।

ইলেকশনের মুখ তখন। আমার যাবার তো খুব সময় ছিল না। কলকাতার পার্টি আপিসে গেলেও তোমাদের বাড়ি যাই নে। ওদিকে তোমার ছোড়দা, তোমার ছোটবউদি, তাঁদের গানের দল নিয়ে ওখানকার ওদের দলের ক্যাণ্ডিডেটের প্রপাগাণ্ডা ক'রে এল।

আমিও একবার ডাকলাম না ওদের, ওরাও একবার এল না আমাদের বাড়ি। এ সত্ত্বেও হয়তো মারাত্মক কিছু হত না, যা তোমার আমার জীবনটাকে এমনভাবে, দুদিকের দুই দূরান্তর কোন ঘাটে কি মাঠে ফেলে দেয়। কিন্তু আমি হারলাম। জিতল সীতাংশু, তোমার দাদাদের পার্টির ক্যাণ্ডিডেট এবং তোমার দাদাদের জ্ঞাতিও সে।

যখন খবরটা পাকা হয়ে গেল—অর্থাৎ সদরে ভোট-গণনা শেষ হয়ে যে-মুহূর্তে ডিক্লেয়ার্ড হল—সীতাংশ দাশগুপ্ত নির্বাচিত, সুব্রত হেরেছেন, দু'শো ভোটের ব্যবধানে—সেই মুহূর্তে ফট্ ক'রে আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল তোমার মুখ, আব কানের কাছে তুমি যেন বললে —সীতাংশু যে দাশগুপ্ত। বাড়িটা যে দাশগুপ্তদেরই ছিল।

সীতাংশুরা আমাদের বাড়িটার—

না, আমাদের বাড়ি বলব না। তোমাদের বাড়ি বলাই ভাল। আজ এই মুহূর্তে তোমাকে আমার প্রিয়তমা ভাবতে গিয়েও তা ভাবতে পারছিনে। তার থেকে তুমি আমার বিরোধীদের আত্মীয় অন্তরঙ্গ ভেবে দুঃখ-বেদনা অনুভব করে আনন্দ পাচ্ছি।

সীতাংশুরা তাদের বিজয়-মিছিলটা বের করেছিল তোমার বাড়ির সামনে থেকে। ইলেকশনের সময় তোমার দাদা যখন এসেছিলেন, তখন তুমি চিঠি লিখেছিলে—দাদা যাচ্ছেন—তোমার বিরুদ্ধেই বক্তৃতা করতে, তবুও ওঁর থাকবার ব্যবস্থা তুমি আমাদের বাড়িতেই করো। বাইরের ঘরখানায় থাকতে দিয়ো। ঘরখানার চাবি সীতাংশুর কাছেই ছিল। ফেরত দেয়নি। মধ্যে মধ্যে বাইরের লোক এলে ওরা এখানেই এনে বসাত। ঘরখানার চাবি তোমার দাদাই সীতাংশুকে দিয়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন—তুমি তো বাড়িখানা প্রায় বন্ধই রেখেছ। তোমার নিজের আপিস তো অন্যত্র। এই ঘরখানা সীতাংশু ব্যবহার করলে আপত্তি করবে না নিশ্চয় ?

আমি আপত্তি করিনি। মনে মনে অনুমান করেছিলাম, এ কথাটা আমাকে বলতে তুমিই তোমার দাদাকে বলেছ।

থাক্।

সেদিন বিজয়-মিছিল ওরা ওখান থেকেই বের করেছিল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার বাড়ির দোরে। বোমার পর বোমা ফাটাচ্ছিল—আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি অবশ্য লজ্জাবোধও করিনি—হেরে যাওয়ার মধ্যে যে একটা দুঃখ থাকে—তাও ছিল না। কারণ সীতাংশু আমাকে ঠিক হারায় নি। আমাকে হারিয়েছিল কংগ্রেসের ক্যাণ্ডিডেট প্রমথ ঘোষাল। এককালের জমিদার ওরা। সেই ইংরেজ আমল থেকে ওদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বিরোধিতা করেছেন আমার বাবা, তারপর আমার মা—এঁরাই তখন কংগ্রেস ছিলেন।

সেন-ঘোষদের আমলে এরা এসে ঢুকল কংগ্রেসে এবং প্রমথ যখন বুঝল সে কোনক্রমেই জিতবে না—তখন আমার কাছে হারতে চাইল না, সীতাংশুকে জিতিয়ে তার কাছে আমাকে হারিয়ে নিজে হেরে গিয়েও খুশী হল। তার নিজের কতকগুলো নিশ্চিত ভোট সে সীতাংশুকে দিতে বলেছিল। সেই কারণেই আমার লজ্জা হয়নি সেদিন। রাগ হয়েছিল। প্রচণ্ড রাগ—নিষ্ঠুর ক্রোধ। প্রমথর উপর নয়। সীতাংশুর উপরও নয়। হয়েছিল তোমার উপর, তোমার দাদার উপর।

মা আমার বক্তৃতা-করা মেয়ে। হার্টের রোগী। কখন বুক চেপে ধরতে হবে বলে সাবধানে থাকেন, বেশী কথা বলেন না, চীৎকার করে তো নয়ই। মা আমার আস্তে আস্তে বাছা বাছা কতকগুলি কথা আমাকে বলেছিলেন। সব তোমার প্রসঙ্গ নিয়ে।

আমি কলকাতায় এসেছিলাম অনেকটা বিভ্রান্তের মতো। মতির কোন স্থিরতা ছিল না। প্রথম সংকল্প ছিল, তোমাকে এসে বলব—আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। যদি বল তো আমার সন্তানকে আমায় দাও, আমি নিয়ে যাব—মাকে দেব আমার, তিনি পারেন তো বাঁচাবেন। না বাঁচে তো জানব অদৃষ্টে ও সৌভাগ্যবান। যে দুর্ভাগ্যের মধ্যে ওর মা-বাপ দুজনেই ওকে ছুঁড়ে ফেলবে, তার সত্য স্বরূপটার সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই ও মুক্তি পাবে।

হাওড়ায় নেমে অজয় মুখার্জির কলকাতা-প্রবেশের সেই আশ্চর্য মিছিল দেখে সব ভুলে গিয়েছিলাম। অজয়বাবুর সেদিনের জীপের উপর দাঁড়ানো মূর্তি দেখে মনে হয়েছিল এ মানুষটি হয়তো পারবে। দু-দু জায়গায় অজয়বাবু জিতেছেন। আরামবাগ—তমলুক। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেন হেরে গেছেন। আরামবাগে—সেনের সমর্থনে কে যেন বলেছিল—অজয়বাবুকে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

পার্টি-আপিসে গিয়ে সেখানেই বসেছিলাম--রাত্রি দশটা পর্যন্ত। পার্টি-আপিস তখন বেশ জমাট এবং উত্তপ্ত। কংগ্রেসের মেজরিটি হয়নি। সমস্ত ছোট পার্টিরা এক হয়ে যুক্ত-ফ্রন্ট তৈরী হবে।

পার্টির আপিসেই কে যেন বললে—নিচে রাস্তায় গাড়িতে তোমার শ্বশুর দাঁড়িয়ে আছেন। তোমায় ডাকছেন।

বুকের ভিতরটায় আগুন জলে উঠেছিল। তবু নিচে নেমে এলাম। মানুষটিকে শ্রদ্ধা করি তো। তিনি হাত ধরে বললেন—এস। তুমি এসেছ আমি জানি। এদের এখানেই বলা ছিল আমার। আমি প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু দেরি দেখে বুঝলাম, তুমি—, এস।

পথে বললেন—এমনি একটা কিছু হবে আমি জানতাম।

একটু পর আবার বললেন—তোমরা দুজনে পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেছ। যখন প্রথম শুনলাম কানাঘুষো বউমাদের মধ্যে যে তোমাদের মধ্যে ইন্টিমেসি একটা চেহারা নিচ্ছে, তখন সুতপাকে আমি বলেছিলাম—এ বোধহয় ঠিক হবে না সুতপা। তবে তোমার

উপর একটা ভুল ধারণা ছিল, ভেবেছিলাম তুমি যাই হও তুমি ব্রাহ্মণ-বাড়ির ছেলে এবং বিধবা মা রয়েছেন—তুমি বৈদ্যের মেয়ে এবং বিলেত-ফেরত বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবে না। যখন তোমরা বিয়ে করে আমার কাছে এলে, তখন বোধহয় আমি তোমাদের বলেছিলাম, আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি সুব্রত। সুতপা তুমি দুজনের কাছেই সে দুঃখ পেলাম আমি—তোমরা ভালবেসে বিয়ে ক'রেও ভালবাসাকেই সব থেকে ওপরে তুলতে পারলে না।

একটু পর বললেন—সুতপা কিন্তু খুব দুঃখ পেয়েছে। বড়বউমা বলছিলেন—খবরটা শুনে ও কেঁদেছিল।

তারপর বলেছিলেন—তুমি তো একটাও কথা বলছ না সুব্রত।

এবার কথা বলতে হয়েছিল আমাকে। বলেছিলাম—কি বলব বলুন?

আমার কি বলা উচিত বা আমার কাছে উনি কি শুনবার প্রত্যাশা করেছিলেন তা তোমার বাবার মত ব্যারিস্টারও বলতে পারেননি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তুমি পলিটিক্স ছেড়ে দাও সুব্রত। আমার অনুরোধ—আমার উপদেশ—যাই বল।

আমি তৎক্ষণাৎ বলেছিলাম—আমাকে ক্ষমা করবেন, তা আমি পারব না।

কেন বলেছিলাম তা বলতে পারব না।

উনি বলেছিলেন—তা হলে দেশকে সামনে রেখে কর। পার্টিকে মাথার উপর বসিয়ো না।

তুমি আমার সামনে কেঁদেছিলে।

চোখের জল অনেক কঠিন নিষ্ঠুরতাকে গলিয়ে নরম ক'রে দেয়। অনেক অন্যায়-ন্যায়ের হিসেবনিকেশ ধুয়ে-মুছে জীবনের খাতার পাতা আবার সাদা ক'রে দেয়। নতুন হিসেব পত্তন করবার আশ্চর্য সুযোগ সেদিন যেন এসেছিল।

সেদিনের দুটো কথা আমার মনে আছে। তুমি বলেছিলে—খোকাকে—শিপ্রা, তুই কথা কইবিনে। যাবিনে ওর কোলে। তোকে দেখতে এসেছিল সেই কবে। তারপর আর আসেনি।

আমি আশ্চর্য হয়ে গিছলাম। বলেছিলাম—ওর নাম তো তুমি গর্কী রেখেছ।

তুমি বলেছিলে—তুমি তো শিপ্রা রেখেছ। বাবা বললেন—তুমি সুতপা ওকে শিপ্রা বলবে। ওর মামা-মামীরা গর্কী বলবে।

আর একটা কথা অক্ষয় হয়ে আছে মনে। তুমি বলেছিলে—তুমি হারবে এ আমি ভাবিনি।

বলেছিলাম—কেন?

তুমি বলেছিলে—তোমার হারবার কথা নয়। মানুষের যে-সেবা তুমি কর, ক'রে

আসছ, তাতে তোমার হারার মানে মানুষ অকৃতজ্ঞ, অথবা নির্বোধ।

সারারাত্রি সেদিন দুজনে কল্পনা করেছিলাম—আগামী ইলেকশনে আবার দাঁড়াব। স্থির করে ফেলেছিলাম পলিটিক্সকেই জীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করব। সর্বানন্দপুরের এলাকাই হবে আমার কর্মভূমি। তবে পার্টি নয়। দেশকে সামনে রেখে স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে দাঁড়াব।

পরদিন সকালে উঠে মনে হয়েছিল আমরা বুঝি নবজীবনে জেগে উঠলাম।

তোমার বাবা বলেছিলেন—দেরি কোর না। তোমরা দুজনেই ফিরে যাও ওখানে। দুজনে মিলে কাজ আরম্ভ কর। United front হচ্ছে বটে, কিন্তু এ থাকবে না। কংগ্রেস একে ভাঙবেই।

ঠিক এই সময়েই এসেছিলেন বামপন্থী নেতারা তোমার বাবার কাছে। উল্লাসের আর শেষ ছিল না তাঁদের।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

কতজন নিয়ে মন্ত্রিসভা তৈরী হবে, কোন্ দল ক'টা মন্ত্রিত্ব পাবেন, তাই নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন ওঁরা।

তুমি জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছিলে।

তোমার ছোটবউদি এসেছিলেন ছুটে—এই স্বতপা ভাই, তুমি এ সময় কোথায় যাবে। বাঃ—আমি এখন গানের দলে লোক পাব কোথায়? চারিদিকে তো মিটিং হবে এখন—।

আমাকে দেখতেই পেলেন না তিনি।

তুমি বলেছিলে—তোমার লোক তুমি অনেক পাবে। আমাকে যেতেই হবে।

* * *

আমরা ফিরে এসে নতুন করে ঘর পাতলাম।

দুজনে মিলে একটা কর্মসূচী তৈরী করলাম। রাজা-প্রজা নেই—উঠে গেছে, ধনী-দরিদ্রও থাকবে না। হিন্দু মুসলমান কৃশ্চান বিরোধ থাকবে না। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ শূদ্র ভেদ থাকবে না। অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার থাকবে না। দেশে রোগ থাকবে না, অজ্ঞানতা থাকবে না। মা আমার প্রাণ দিয়ে সায় ঠিক দেন নি, তবু তিনি বিবেচনা ক'রে এটাকে গ্রহণ করেছিলেন। খুশী হয়েছিলেন মা। আমরা যখন এসে নেমেছিলাম—খবর না দিয়ে এসে পড়েছিলাম—মা তোমাকে দেখে গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। সে গম্ভীর মুখ দেখে সে-সময় পর্যন্তও আমি ভয় পেতাম। কিন্তু খোকাকে কোলে টেনে নিয়ে জুড়িয়ে গিয়েছিলেন মুহূর্তে। এর উপর সমস্ত বিবরণ শুনে মা খুশী হয়েছিলেন। তাঁর গম্ভীর মুখ হাসিতে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল।

তোমার কর্মক্ষেত্রের একটা খসড়া ছকে দিয়েছিলেন। মা সংগঠন করতে জানতেন। বয়স্কা মেয়েদের ইস্কুল করে দিয়েছিলেন। মেয়েদের মধ্যে কাজ করবার জন্তে গ্রামের মেয়েদের নিয়ে তোমার একটা দলও ক'রে দিয়েছিলেন। বড় আনন্দে ছিলাম কয়েকটা

দিন। মা খোকাকে নিয়ে খেলায় মাতলেন। আমাদের দুজনকে ওখানে কাজ করবার ভার দিয়ে এগিয়ে দিলেন সকলের মধ্যে। বেশ ছিলাম। পার্টি থেকে তুমিও বাইরে ছিলে, আমিও ছিলাম।

ওদিকে ইউনাইটেড ফ্রন্ট তৈরী হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয়বাবু, সহকারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু। এ ছাড়া সব অকংগ্রেসী দল থেকে একজন না একজন। আমার পার্টি মন্ত্রীত্ব পায়নি। ডেপুটি মিনিস্টারিত্ব পেয়েছিল। সভ্যও মাত্র দুজন। উল্লাসে উৎসাহে দেশের একটা অংশ যেন ফেটে পড়ল। সে যে কি হৈ-হৈ, কি উৎকট উত্তেজনা, তা আর কি বলব। তোমার তো মনে আছে। আমাদের ওখানে মিটিং হয়েছিল—আমরা ইউ. এফ-কে স্বাগতঃ জানিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এক দুর্যোগ আসন্ন হয়ে উঠল।

ধর্মঘট আরম্ভ হল—তার সঙ্গে ঘেরাও। কল-কারখানা বন্ধ হতে শুরু করল। গ্রামে গ্রামে মিছিল, সে কি মিছিল। খালি গা, খালি পা—কোমরে কারুর ধুতি, কারুর হাফ-প্যাণ্ট—কাঁধে গামছা, কালো রং— হাতে লাঠি-ঝাণ্ডা—গলায় বিকট চীৎকার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কলে গিয়ে ধান আটকাল, রাস্তায় লরী-বোঝাই খাদ্য আটকাল, স্টেশনে স্টেশনে পলিটিকাল স্লোগান দিয়ে এরা যাত্রীদের মাল নিয়েও টানাটানি আরম্ভ করলে। মা আমার সইতে পারেননি। গোটা ভদ্রপাড়ায় একটা সন্ত্রাস যেন থম থম করছিল। সমস্ত কিছুর বিধাতা তখন সীতাংশু। কংগ্রেসের ঘোষাল তখন দেশ ছেড়ে চলে গেছে কলকাতা। আমাদের বাড়ির সামনে মিছিল এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেঁচায়।

কোথা দিয়ে কি যে বেরিয়ে আসে—সেই পরীক্ষিৎকে ব্রাহ্মণের দেওয়া ফলের মধ্য থেকে কীটের আকারের বিষধর তক্ষক—অথবা কি থেকে যে কি হয় তা বলতে মানুষ পারে না—তবে যা হয় বা যা বেরিয়ে আসে—তা আজ না হোক, কাল হোক বা পরশু হোক, বেরিয়ে আসতই। তোমার এবং আমাদের মধ্যে যে বিরোধ যে পার্থক্য, তা আবার মাথা-চাড়া দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে সেদিন।

সীতাংশুরা একটা বিরাট মিছিল বের করেছিল। গ্রামের গ্রামদেবতা কালীতলায় সেদিন জ্যৈষ্ঠমাসে ফলহারিণী কালীপুজো। গ্রামের জগা চৌকিদার হাড়িকাঠ পুঁতবার সময় কাশতে কাশতে সর্দি তুলে থু ক'রে ফেলেছিল মাটিতে, কিন্তু মাটিতে পড়বার সময় খানিকটা পড়েছিল হাড়িকাঠে, খানিকটা পড়েছিল মাটিতে। সেই কারণে হরু চাটুজ্যের ছেলে মণি তার মাথায় মেরেছিল একটা চড়। কিছু জরিমানাও করেছিল তার। একটা টাকা আদায় ক'রে এক ব্রাহ্মণকে দিয়েছিল, সে পুকুরঘাট থেকে জল এনে হাড়িকাঠটি ধুয়ে দিয়েছিল। মিছিল বের হল সেই কারণে, মিছিলের পুরোভাগে সীতাংশু। দাবী—মণি চাটুজ্যেকে ওই চৌকিদারের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এক টাকার বদলে পাঁচ টাকা দিতে হবে।

টাকা শেষ পর্যন্ত কমে দু টাকা হয়েছিল। কিন্তু যে লাঞ্ছনাটা মণির হয়েছিল, সেটা

অত্যন্ত করুণ। ওই কালো ধুলিধুসর দেহ নগ্নগাত্র নগ্নপদ মানুষগুলি—যারা কখনও কোন উঁচু কথা কয় না—তারা মণি চাটুজ্যের কান মলে দিলে এবং মাথায় চড় মারলে।

মা বারান্দা থেকে দেখে চীৎকার করে উঠেছিলেন। তাঁর হার্টের ব্যারামটা সেদিন নতুন করে চাগাল। আমি মণিকে আমার নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে শেষ পর্যন্ত বের ক'রে আনলাম। চড়-চাপড় আমিও খেলাম। কিন্তু আমার দল ছিল। হয়তো তার উপর, তুমি আমার স্ত্রী—তাই আরও কিছু ঘটেনি, পিছু হটেছিল দলটা। কিন্তু আমাদের জীবনে মেরামত-করা মেঝের তলায় যে সাপটা লুকিয়েছিল, সেটা বেরিয়ে পড়ল। আমি ফিরে আসতেই তুমি তিরস্কার করলে –তুমি কেন গেলে এর মধ্যে? তোমায় যদি ওরা মারত?

আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম—বল কি তুমি? মণিকে তা হলে কি রাখত ওরা?

—না রাখত—যেতো মণি।

—যেতো মণি? বলছ কি?

—শুনতে ভাল লাগছে না, কিন্তু মনে রেখো এটা বিপ্লবের সময়। ঐরকম হবেই। তুমিও চেয়েছ একদিন বিপ্লব।

আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম—না-না-না। এই ধরনের অনাচার অত্যাচার বিপ্লব নয়—এ আমি চাইনি।

পরদিন সকালে তুমি হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালে—হাতে স্বামীজীর সেন্টিনারী ভল্যুমের একটা ভল্যুম। তোমার হাতে বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলীর একখানা দেখে খুশী হয়েছিলাম। বলেছিলাম—কি কাণ্ড! বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী হাতে!

—তোমাকে একটু শোনাতে এসেছি। মানে বুঝতে চাই।

—কি, পড়?

তুমি পড়েছিলে—'তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি।...ভূত ভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধুলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না?'

তুমি পড়ে গেলে, আর আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তোমার মুখের দিকে। তোমার পড়া শব্দগুলির সঙ্গে বুকের ভিতর যেন কে একটা ভারী লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করছিল। তুমি পড়ছিলে—'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে থেকে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে। ভুজাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে হাট থেকে বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'

তুমি পড়েই যাচ্ছিলে।

তুমি যে মানেটা বুঝতে চাচ্ছিলে তা ততক্ষণে আমার বোধগম্য হয়েছিল। বুঝতে আমার বাকী ছিল না।

আমি বলেছিলাম—ওর কোন্ মানেটা বুঝতে পারছ না তুমি ?

তুমি বলেছিলে—কাল যে ঘটনা ঘটল তা দেখে এমন করে ভয় পেলে কেন ?

বলেছিলাম—ভয় তো পাইনি। ভয় যদি পাব, তবে মণিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আগলালাম কেন ? তবে হ্যাঁ, সীতাংশুর খাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে রণতাণ্ডবে ধেই ধেই ক'রে নাচিনি। আর জগা চৌকিদারের ওই ভাবে বেপরোয়া হাড়িকাঠে থুতু ফেলাটাকে একেবারেই যেন কিছু নয় বলে মনে করছ কেন ? জগা চৌকিদার যে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় কাজ করতে এসেছিল—এটা তো শুনেছ—তাকে তো টলতে আমি চোখে দেখেছি। গন্ধও এসেছে আমার নাকে। মণিকেই তো শুধু বাঁচাতে যাইনি—দুপুরবেলা জগাকে যখন শাসন করছিল মণি—তখনও আমিই গিয়ে ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই কারণেই মাত্র পাঁচ টাকা জরিমানা মকুব হয়ে দু টাকা হয়েছিল। টাকাটা নগদও দেয় নি জগা। জগা কালীপুজোর বলির যে দুটো ঠ্যাং পায়—সেই দুটো দু টাকা মূল্যে জগা নিজেই জরিমানা স্বরূপ দিয়েছিল।

তুমি ফট করে বলে উঠেছিলে—পুজো পুজো করে আর কতকাল তোমরা এই ধরনের মাতামাতি করবে ? জগা মদ খায়—ওদের নিচুজাত ছোটলোক বলে চেপে রেখেছি—ও চৌকিদারের কাজ করে, মদ ওরা হয়তো মণিদের হুকুমেই চোলাই করেছে এবং সেই মদ খেয়েছে। হাড়িকাঠ জগাই পুঁতেছে। ওর ওই মদ-খাওয়া হাতেই পুঁতেছে। গঙ্গা নেয়ে বামুনের ছেলে মণি তো পুঁততে আসেনি। তাতে একটু থুতু ফেলতে গিয়ে ছিটকে একটু কাঠটায় লেগেছে—কি হয়েছিল মহাভারত অশুদ্ধ তাতে ? ওই মাটির ঠাকুর পুজোয় তুমিও বিশ্বাস কর না—আমিও করি না—মণিও করে না। আমি হলপ ক'রে বলতে পারি—

কখন যে মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরজায় মুখে—তুমিও দেখনি, আমিও দেখিনি। খোকা তাঁর কোলে ছিল, সে কেঁদে উঠে আমাদের জানিয়ে দিল তাঁর অস্তিত্ব। আমি চমকে উঠে, উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

তুমিও চমকে উঠেছিলে।

মা খোকাকে তোমার কোলে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—'ঘি দিয়ে ভাজো নিমের পাত —নিম না ছাড়ে আপন জাত।' আমার কপাল।

তুমি বোধহয় মর্মান্তিক ভাবে বিদ্ধ হয়েছিল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠেছিলে—কি বললেন আপনি ?

মা বলেছিলেন—যা বলেছি তা তো শুনেছ।

তুমি বলেছিলে—কেন এ কথা বললেন ?

মা বলেছিলেন—স্বামীজীর বাণী পড়ে শোনাচ্ছিলে। স্বামীজী বলেছিলেন—ভারতবাসী আমার ভাই—ভারতবাসী আমার প্রাণ—ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর—

তোমাকে আজ আমি সহস্র ধন্যবাদ দিই। তবে সেদিন তোমার সে তেজস্বিতা আমার অত্যন্ত কটু ঠেকেছিল—নিদারুণ ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়েছিল, তুমি মুহূর্তে তোমার স্বরূপের সকল আবরণ টেনে ফেলে দিয়ে বলেছিলে—আমি ঈশ্বর মানি না, দেব-দেবী

দূরের কথা।

মা বলেছিলেন—সুব্রত তো ঈশ্বর মানে বলেই আমি জানি।

আমাকে উত্তর দিতে হয়নি—তুমিই বলেছিলে, হ্যাঁ ও মানে। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়নি এবং হবার কথাও নয়—

মা বলেছিলেন—হলে?

তুমি বিভ্রান্তের মত উত্তর দিয়েছিলে—হলে।

মা বলেছিলেন—হ্যাঁ, আজ তো এই হল। বল তোমাদের উত্তর?

তুমি নিরুত্তর হয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিছলে। আমিও হতভম্বের মত দাঁড়িয়েছিলাম।

ঈশ্বর মেনেও যে ফল—ঈশ্বর না মেনেও ফল সেই একই রকম। ঈশ্বর যারা মানে তারাও মরবার সময় 'হে ঈশ্বর বাঁচাও' বলে ডাকে, কিংবা বলে 'হে ঈশ্বর পায়ে ঠাঁই দাও'; আর যারা না মানে, তারা ডাক্তারকে বলে 'ডাক্তার আমাকে বাঁচাও', নইলে ডাক্তারকেই বলে 'আমাকে পীসফুলি মরতে দাও ডাক্তার'।

এই পর্যন্ত।

কিন্তু এই নিয়ে দ্বন্দ্ব যে আজও মেটেনি। কোনকালে হয়তো মিটবে না। তবে 'হে ঈশ্বর পায়ে স্থান দাও' বলে মরার মধ্যে অসীমসমুদ্রে একটা ভাঙা ভেলা পাওয়া যায়। তা নিয়ে তোমার কোন আকর্ষণ তো ছিল না, আমারও যে খুব একটা ছিল, তা ছিল না। সেই কারণেই বোধ করি কোনরকম জোড়াতালি দিয়ে আমাদের জীবন চলেছিল; এবার কিন্তু সে দ্বন্দ্বটা এমনই কঠিনভাবে উগ্র হয়ে উঠল যে, মনে হল আমাদের মিলিত জীবন—যেটা একটা ঘাসে-লতায় গাছের পাতায়-ফুলে সমৃদ্ধ একটি পাহাড়ের মত মাথা তুলে উঠেছিল—সেটা হঠাৎ একটা আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে।

আমার ঈশ্বর আছে এবং তোমার ঈশ্বর নেই—এই নিয়ে যে ঝগড়াটা হল, তার মধ্যে সব থেকে বড় ফাঁকি হল এই যে, আমিও কোন দিন ঈশ্বর খুঁজলাম না, তুমিও কোন দিন ঈশ্বর নেই এ সম্পর্কে কোন গভীর গাঢ় চিন্তা করলে না। সাধারণ জীবন হলে এমনটা ঠিক হত না। ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটি করে সারাজীবনটা কাটিয়ে শেষজীবনে আজকাল যেমন রিটায়ার করা চাকুরেরা বাত নিয়ে পড়ে থাকেন আর তাঁর স্ত্রী পুজোর আসন পাতেন তেমনি ভাবে আমাদেরও কাটত। কিন্তু এর পিছনে তোমার রাজনৈতিক সচেতনতা, আর আমার মধ্যে আমার রাজনৈতিক সচেতনতা দাঁড়িয়েছিল যেন সজাগ প্রহরীর মত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের বিষাদ হয়েছিল রণক্ষেত্রে রথের উপর বসে—আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে—তাদের হত্যা করতে হবে। এত বড় বীরের হৃদয়ে মমতা কেঁদে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন—এ যুদ্ধ করতে আমি পারব না।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।

গীতায় আবৃত্তি করেছিলেন কৃষ্ণ। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

আমাদের জীবনেও তাই হল।

১৯৬৭ সালে মন্ত্রীত্বের জন্য কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন নতুন করে পাতা হল বাংলাদেশে। ধর্মক্ষেত্রে নয় কারণ ধর্মের স্থানই ছিল না এর মধ্যে। ছিল চুক্তি। তার দুটো দিক—একটা আপন পার্টির মন্ত্রীত্ব, পার্টির লোকের সুযোগ, পার্টির প্রভাব-বিস্তার—অন্যদিকে এরপর দেশের লোকের কল্যাণ যতটা সম্ভব।

তুমি বললে—আমাদের ভুল হয়েছিল, সংশোধন করতে চাই—

আমি বললাম—বল কি চাও? ডাইভোর্স?

—আমি কলকাতা চলে যেতে চাই।

—তারপর?

—তারপর যা হয় হবে। আমার যা ভাল লাগে করব। তোমার যা ভাল লাগে কর।

আমি বলেছিলাম—যেতে পার তুমি, কিন্তু শিব্বাকে তুমি পাবে না। ওকে নিয়ে যেতে দেব না।

তুমি চমকে উঠে বলেছিলে—কি বললে? গর্কীকে কেড়ে নেবে?

—নেব। শিব্বা আমার সন্তান।

তুমি আস্ফালন করেছিলে—সীতাংশুর দলবলের সাহায্য নিয়ে তুমি জোর করে খোকাকে নিয়ে চলে যাবে। আমিও বলেছিলাম—বেশ কথা। তাই তুমি চেষ্টা করে দেখ।

সামনে তোমার বাবার জন্মদিন।

তোমার বাবার জন্মদিন তোমাদের পরিবারের একটি বাৎসরিক উৎসব। আমরা প্রতি বৎসর গিয়েছি। এবার আমি স্থির করেছিলাম—আমি তো যাবই না, তোমাকেও যেতে দেব না। জোর করে বন্ধ করব।

আমি জানতাম এতেই তুমি সব থেকে বেশী দুঃখ পাবে।

তুমি যদি সীতাংশুর সাহায্যে জোর করে যেতে চাও—তুমিই যাবে শুধু, অর্থাৎ আমি না—খোকাও না।

আমি অজুহাতও পেয়েছিলাম—মায়ের অসুখ বেড়েছিল। ডাক্তার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের সতর্ক থাকতেও বলেছিলেন। মা বুঝতে পেরেছিলেন দুটোই। তাঁর নিজের অবস্থার কথাও বুঝেছিলেন—আমাদের দুজনের মধ্যের ঝগড়ার কথাও তাঁর অজানা ছিল না।

তিনি আমাদের দুজনের হাত ধরে বলেছিলেন—না। এ তোমরা কোরো না। আরও বলেছিলেন—তোমরা যেমন প্রতিবার যাও বেয়াইয়ের জন্মদিনে—তেমনি যাবে। আমি একটা দুটো দিন দিব্যি থাকব। শিবানী আছে, ডাক্তার আছে, গ্রামের লোকেরা আছে।

ঠিকও সবই ছিল। মেনে আমি নিয়েছিলাম মায়ের কথা, কিন্তু তুমি ঠিক মেনে নাওনি। কিছু মনে করো না সুতপা, তুমি মেনে ঠিক নাওনি। তোমার নিশ্বাস, তোমার আরক্তমুখ, তোমার চোখের দৃষ্টি, বার বার বলেছিল তুমি মানোনি। পরের দিন সকালে তোমার বাবার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা কলকাতা যাব; রাত্রে তুমি বলেছিলে—তুমি আমার কাছ থেকে খোকাকে কেড়ে নেবে বলেছ—একথা আমি কোন দিন ভুলব না। আমি বলেছিলাম—তার আগে তুমি নিজে চলে যাবার যে কথাটা বলেছিলে সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

তুমি বলেছিলে—তা ভুলে যাইনি। আজও চাই চলে যেতে।

আমি বলেছিলাম—তা চাইলেই আমি খোকাকে কেড়ে নেব।

তুমি বলেছিলে—তুমি আবার বিবাহ কর, আমি বাধা দেব না।

আমি বলেছিলাম—কথাটা ঘুরিয়ে আমিও বলছি এবং তাতে তোমার বাধা হবে না সুতপা। এবং একটা কথা তোমাকে বলি—দ্বিতীয়বার বিবাহের যে অধিকার আসুক, আমি সে অধিকার নেব না। সুতরাং আমার খোকাকে আমাকে পেতেই হবে।

ঠিক এই মুহূর্তটিতে—তোমার মনে নিশ্চয় রয়েছে—সেই রাত্রির প্রায় শেষ প্রহরে দূরে কোথাও উঠেছিল আর্ত কলরব। বহু মানুষের ভয়ার্ত কণ্ঠ।

—আগুন—আগুন—আগুন।

আগুন।

বেরিয়ে এসেছিলাম বারান্দায়। বারান্দা থেকে ছাদে। ছাদে উঠে দেখেছিলাম দূরে পশ্চিম আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। অনুমানে মনে হল মুসলমানদের গ্রাম মোমিনপুরে আগুন লেগেছে।

আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। গ্রামে গ্রামে সাড়া উঠেছে। আকাশে খড়পোড়া আগুন উড়ে যাচ্ছে। আমি তোমার মুখের দিকে তাকালাম। তুমি আমার মুখের দিকে তাকালে। নিচে থেকে সেবা-সমিতির ছেলেরা ডাকছিল—সুব্রতদা—সুব্রতদা।

সীতাংশুরাও উঠেছিল। তারাও অপেক্ষা করছিল। কারণ বাটটা বালতি—তার সঙ্গে বাঁধন কাটবার কাস্তে হাঁসুয়া এসব সেবা-সমিতিরই আছে। আমি সেবা-সমিতির স্টোরের চাবি নিয়ে ছুটে নেমে গেলাম।

* * * *

ফিরে এলাম পরের দিন—বেলা তখন বারোটা।

তখন তুমি কলকাতা চলে গেছ। মা হার্টফেল করেছেন, তাঁর শব কাপড়-ঢাকা পড়ে রয়েছে। গ্রামের লোকেরা অপেক্ষা করছেন আমার জন্তে। আমি তাঁর মুখাগ্নি করব।

আমি তখন শ্রান্ত ক্লান্ত আহত। শরীরের অনেকগুলো স্থানে ক্ষত হয়েছে, অনেকগুলো স্থানে পুড়ে ফোস্কা হয়েছে। কালিতে কালো হয়ে গেছে সর্বাঙ্গ। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনে অজ্ঞান হয়ে গিছলাম।

মোমিনপুরে দুশোর মত ঘর পুড়েছে। কয়েকটা গরু ছাগল পোড়া চাল চাপা পড়েছে। আগুনের সে বর্ণনা আর করব না। কি হবে?

তবে মানুষের কান্না এবং দুঃখ-দুর্দশার শেষ ছিল না।

আশপাশের কয়েকখানা গ্রামের লোকই জড়ো হয়েছিলেন। সীতাংশু এখানকার এম. এল. এ., সে সকাল হতে হতে ছুটল কাটোয়া। এস. ডি. ও-র কাছে গেল সে, ওখান থেকে টেলিগ্রাম করবে বর্ধমানে ডি এম-কে, কলকাতায় চীফ মিনিস্টারকে। আমি ওদের সেই দিনের অন্নের ব্যবস্থা করছিলাম। খড় তালপাতা কেটে পোড়া ঘরগুলিকে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষা আসন্ন।

দুশোখানা ঘর পুড়েছে—খান-পঞ্চাশ ঘরের চালের খড় টেনে আমরাই ফেলে দিয়েছি। এই আড়াইশোখানা ঘরের পাঁচ-ছশো লোকের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার সে তো সহজ নয়।

এরই মধ্যে খবর এল মা মারা গেছেন। হার্টফেল করেছেন তিনি।

শুনলাম, সকালবেলা হতেই তুমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলে। বাবার জন্মদিন—কলকাতায় যাবার জন্ত সব গোছগাছ হয়ে আছে; আমারও সঙ্গে যাবার কথা—কিন্তু আমি চলে গেছি আগুন নেভাতে।

মা বলেছিলেন—বেশ তো, যখন ফিরবে সুব্রত তখনই রওনা হবে। সন্ধ্যে পর্যন্ত তো ট্রেন অনেক। কাটোয়ায় গিয়ে ভোর-রাত্রে ট্রেন ধরলেও কাল সকালেই পৌছবে।

এই সময়েই ফিরেছিল সীতাংশু। সে খবর দিয়েছিল ফিরতে সুব্রতর দেবি হবে। তার কাজ তো। আর এবার কাজ সত্যিই অনেক বেশী।

তুমি খবর শুনে সীতাংশুকেই বলেছিলে, কাটোয়ায় সঙ্গে গিয়ে ট্রেন ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে।

মায়ের কাছে গিয়ে বলেছিলে—আমি সীতাংশুর সঙ্গে চলে যাচ্ছি।

মা স্বাভাবিক ভাবেই বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—সে কি! সুব্রত যে যাবে—সে ফিরুক।

তুমি বলেছিলে—এবং খুব নাকি সহজ করে আস্তে আস্তে বলেছিলে—তাকে যেতে বারণ করবেন।

মা বলেছিলেন—বারণ করব?

তুমি বলেছিলে—হ্যাঁ। বলবেন আমি বারণ করেছি। আমাকেও যেন আর আনতে না যায় সে। আমি আর আসব না ফিরে।

চীৎকার করে উঠেছিলেন মা—বউমা!

তুমি পিছন ফিরে বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়েছিলে—খোকা কার তার মীমাংসা যদি

একান্তই করতে হয়, তা হলে তা হবে কোর্টে।

মা আবার বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

শিবানীদি ছুটে তোমাকে বারণ করতে যেতে চেয়েছিল—বউ, মায়ের অসুখ বোধহয় বাড়ল—কিন্তু মা তাকে যেতে দেননি। হাত-ইশারায় বারণ করে বলেছিলেন—না। তারপর কোনরকমে বলেছিলেন—ডাক্তার ডাক। ডাক্তারকে—

ওদিকে সীতাংশুর ইলেকশনের জীপখানা তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ঘন্টা-দেড়েক পর মা মারা গিয়েছিলেন। ডাক্তারও গ্রামে ছিল না। আসতে আসতেই মা মারা গিছলেন।

মায়ের শ্রাদ্ধ করলাম।

না, তোমাকে খবর দিইনি। ইচ্ছে করেই দিইনি। তুমি আঘাত পাবে এই মনে ক'রেই দিইনি।

আমার মাতৃশ্রাদ্ধে তোমাকে অংশগ্রহণ করতে ডাকলাম না—তুমি এতে তোমার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে,—আমি তোমাকে বঞ্চিত করলাম—এ ভাবনা ভেবে একটা কঠিন ধরনের আনন্দ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি নিজেই এসে দাঁড়াবে। কিন্তু তুমি এলে না।

খবর তুমি পেয়েছিলে। পাবার কথা তো বটেই। সীতাংশু নিশ্চয় জানিয়েছিল। পাঁচদিনের দিন সীতাংশু নিজে এসে আমাকে বলেছিল—তুমি তোমার বাবার সঙ্গে জন্মদিনের পরের দিনই ভুবনেশ্বর পুরী চলে গেছ।

বুঝলাম ইচ্ছে করেই দূরে চলে গেলে এবং আমি তোমাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার আগেই আমার দেওয়া অধিকারটা তোমার পায়ের স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া স্যাণ্ডেলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

আমি অনেক নিষ্ঠুর উপায় ভেবেছিলাম।

খোকাকে কেড়ে নেব। একটা মামলা করব ডাইভোর্সের।

ভেবেছিলাম—তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করব। এদিকে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণাকর, ভাবনা বল ভাবনা, মানসিক অবস্থা বল তাই, এমনভাবে আমাকে পোড়াতে লাগল যে, ইচ্ছে হল আত্মহত্যা করব।

এর থেকেও ভয়ঙ্কর ইচ্ছে হয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল—আত্মহত্যার আগে খোকাকে কেড়ে নিয়ে এসে—, না স্বতপা, কল্পনাটা শেষ করতে পারিনি।

বাড়িতে থাকতে পারিনি—কলকাতায় এসেছিলাম।

কলকাতায় এসে—একটা নতুন পথ পেলাম। ওই যা থেকে আমার জীবনে আগুন লেগেছে—যাতে দেশটা জলছে—সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরার পথ। আমাদের পার্টি আসানসোল অঞ্চলে কলিয়ারী শ্রমিকদের নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে তুলেছিল, শক্ত

সংগঠন। সেটাকে ভেঙে দেবার জন্য লড়াই শুরু হয়েছে। লড়াই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নয়; এতকাল পর্যন্ত তাই ছিল বটে, কিন্তু এবার সব বদলে গেছে। এখানে একটা হিন্দী কথা চলন আছে—'পিঢ়ি বদল গয়া'—তা পিঢ়ি বদলে গেছে। পার্টিতে পার্টিতে ঝগড়া। ঝগড়া মানে সত্যিসত্যি লড়াই; হাতিয়ার নিয়ে; টাঙ্গি বল্লম—রিভলবার পর্যন্ত। আমি পার্টির কাছে এই ফ্রণ্টে কাজ করবার জন্য এসেছি। কাজ কেন বলছি, কাজ নয়, লড়াই—দাঙ্গা।

দিন সাতেক আগে প্রথম রিভলভার ছুঁড়ে ওদের একটি হিন্দুস্থানী দাঙ্গাবাজকে মেরে ফেললাম। সে যে কি রক্ত ভল ভল করে করে বেরিয়ে এল। তারপর আর নেশা না করে মনে বল পেলাম না। মদ খাচ্ছি সেদিন থেকে। এবং মরবার জন্য ক্ষিপ্ত জন্তুর মত ছুটে যাবার কল্পনায় খুব উল্লাস অনুভব করছি।

আক্ষেপ আর আমার কিছু নেই।

আক্ষেপ আমার, তোমাকে পেলাম না। না—আরও আক্ষেপ আছে—সে আক্ষেপ সেই বিচিত্র বহু ঝাড়লণ্ঠনে আলোকিত সেই যাত্রার আসরের মত বহু বিচিত্র আদর্শের আলোয় উজ্জ্বল—সমাজ ও পৃথিবীব জন্য।

আর আক্ষেপ—আরও প্রদীপ্ত আলোকোজ্জ্বল যে নতুন আসর পাতার জন্য পৃথিবী-জোড়া বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে—সেটা বুঝি সব মিথ্যে হয়ে গেল।

ঐখানেই থাক্। সন্ধ্যা উতরে গেছে। হারিকেনের আলোয় বসে লিখছি। ওদিকে বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন। আজ রাত্রে একটি ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হবে। বোমা তৈরী করেছি। দূরে বোমা ফাটছে। উঠলাম।

* * *

এতবড় পত্রখানা শেষ ক'রে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে মাটির পুতুলের মত বসে রইল সুতপা। তার সে চেহারা দেখে ভয় পেলেন বিজয়বাবু। তিনি ডাকলেন—সুতপা। মা।

সুতপা বললে—বাবা। কিন্তু তাতে শব্দ হল না। শুধু মুখটা তার নড়ল।

ইনস্পেক্টর বললেন—আমি উঠছি। সুব্রতবাবুর বডি আমরা আন্দাজ করে আইডেন্টিফাই করেছি একটা, কিন্তু সঠিক আইডেন্টিফিকেশন হওয়া খুব শক্ত। আমরা তো বডিগুলো বের করেছি মাটি খুঁড়ে তার ভিতর থেকে। বডিগুলো ডিকম্পোজড্ হয়েও গেছে। তার আগে, মাটিতে পুঁতবার আগে - কুপিয়ে ডিসফিগারও ক'রে দেওয়া।—তবু যদি চান—

সুতপা থর থর করে কেঁপে উঠে দুই হাতে মুখ ঢাকলে। তারপর কেঁদে উঠল। সুতপার বউদি তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বিজয়বাবু উঠে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—মা। সুতপা। মা—

সুতপা দুই হাতে মুখ ঢেকেই বলে উঠল—আমি চাই—তার দেহখানা আমি চাই বাবা। আমি চাই—

চার বৎসর পর। ১৯৭১ সাল।

এই চার বৎসরে সারা দেশ জুড়ে প্রচণ্ড সংঘাত সংঘর্ষ চলেছেই চলেছেই চলেছেই। একটা আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদগার করছে চার বৎসর ধরে। একটা ঘনশ্যাম নিবিড় বন যেন চার বৎসর ধরে নিরন্তর জ্বলছে।

চার বছরে তিন-তিনটে নির্বাচন গেল। শাসন-শৃঙ্খলা জীর্ণ-মরচেধরা শেকলের মত টুকরো টুকরো খান্ খান হয়ে গেল। বামপন্থীরা মিলিত হল, দেশ উচ্ছ্বসিত হল প্রত্যাশায়; চারিদিকে নানান্ অভ্যুত্থান হল। অবনত জাতি শ্রেণী যারা তারা উঠতে চাইল; শোষিত বঞ্চিত যারা, দরিদ্র যারা, তারা উঠতে চাইল। এর উপরে হল সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি। এর মধ্যে পার্টিতে পার্টিতে বিরোধ পরিণত হল বিবদমান দুটো হিংস্র প্রাণীর রক্তাক্ত প্রাণঘাতী সংঘর্ষে।

হত্যা—হত্যা আর হত্যা। খুন। খুন। খুন।

মানুষে মানুষে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়। দলে দলে। পার্টিতে পার্টিতে। রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণ মানুষের আনুগত্য দখল করবে সামরিক শক্তির পরিচয় দিয়ে।

অজয়বাবু জ্যোতিবাবুতে বিরোধ হল। মিনিস্ট্রি ভাঙল। ভেঙে দিলেন অজয়বাবু। জ্যোতিবাবুর দল দাবী জানালে—তারা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবে। বিরোধী হল প্রায় অন্য সব দলেরা।

বাংলাদেশ—যে বাংলাদেশ একটি সবুজ পত্রপল্লবসমৃদ্ধ নিবিড় অরণ্যের মত—সে বাংলাদেশ ওই আগুন-লাগা বনের মতই পুড়তে লাগল। পুড়ছে, বাংলাদেশ একটা আগুন-লাগা বনের মত পুড়ছে।

এরই মধ্যে সুতপার দেখা পেলাম সর্বানন্দপুরে। ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট সেদিন। সুতপা বসেছিল সর্বানন্দপুরে সুব্রতদের মুখুজ্যে-বাড়ির বাহিরের ঘরখানায়। এই ঘরখানাই সুব্রতদের সমাজ-সেবা সমিতির আপিস। সুতপা সমিতির ক'জন কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু এ সুতপা ঠিক সে সুতপা নয়। অন্ততঃ দুজনকে ঠিক এক করে মিলিয়ে নেওয়া যায় না।

সে সুতপাকে আমরা দেখেছি। সুতপার শ্যাম্পু-করা চুল—অত্যাধুনিকা মেয়ে সুতপা। সে সুতপা প্রদীপ্তা, আলোর সঙ্গে তুলনা করলে—বলতে হবে হ্যাজাক লণ্ঠনের মত।

এ সুতপা আশ্চর্য একটি বিষণ্ণ বৈরাগ্য সর্বাঙ্গে মেখে শান্ত হয়ে বসে রয়েছে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস। ১লা আগস্ট।

* * *

বিচিত্র মানুষের মন।

এই মানুষের মন অহরহ গড়া-পেটার মধ্য দিয়ে চলেছে কোন এক অজানা দিগন্তের মুখে। সেইটে তার ধর্মের স্বর্গ, শিক্ষার স্বর্গ; এর আর শেষ নেই। মানুষও কোনকালে সেই স্বর্গে পৌঁছয় না। তাই তার খোঁজারও শেষ নেই, আস্ফালনেরও শেষ নেই। চলতে চলতে অনুভব করে এ পথের শেষে যে স্বর্গই থাক্, তাকে যেন সে ঠিক চায়নি।

রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনের যে স্বর্গে পৌঁছেছিলেন, সে স্বর্গে সীতা ছিলেন না। সীতা

অভিমানভরে প্রস্থান করেছিলেন পাতালে।

কৃষ্ণের ধর্মরাজ্যে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল, যাদব কুলনারীরা অপহৃত হয়েছিল, যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গের দোরে যখন পৌঁছলেন, তখন তিনি একা. চার ভাই, দ্রৌপদী মরে নরকে গেছে।

না, ভুল হল। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিল একটি কুকুর। কুকুর শেষে ধর্মরূপ পরিগ্রহ ক'রে ধর্মের মুখরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের হৃদয় ভরে ওঠেনি; জুড়িয়ে যায়নি। তবুও মানুষের মন এই পথেই সুখ খোঁজে, সান্ত্বনা খোঁজে। এর থেকেও বিচিত্র পবিণতি হয় সেইখানে যেখানে সব থেকে বড হয়ে ওঠে যাকে ভালবাসি তার পরম কামনার স্বর্গভূমিখানি।

সুতপার মন সেই বিচিত্র মন।

সুব্রতব যে স্বর্গকে সত্য বলে মানতে পারেনি, যা নিয়ে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আর শেষ ছিল না, যে সংঘাত-সংঘর্ষে সে নিষ্ঠুরভাবে সকল বন্ধন নিজের হাতে টেনে ছিঁডে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল—সুব্রতব মৃত্যু-সংবাদটা এমনি বিচিত্র ভাবে এসে তাকে যখন আঘাত কবল, তখন সেই আঘাতেব ফলে মুহ্যমান হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তার বউদির কোলে। চেতনা পেয়ে উঠে বউদিকে বলেছিল—এ আমি কি করব বউদি?

কি উত্তর দেবেন বউদি!

উত্তর একটা আছে—সেটা অতি বাস্তব—কিন্তু অতি বর্বব ছাডা এ উত্তব মানুষের মনে আসে না।

উত্তর না পেয়ে নিরুত্তর সংসারেব দিকে তাকিয়ে আবারও কেঁদেছিল সুতপা। অনেক কেঁদেছিল।

বউদি এবার গর্কীকে তার কোলের কাছে এনে দিয়েছিল। বলেছিল--কাঁদিস নে। গর্কীকে কোলে নে। তোর কান্না দেখে ও কত কাঁদছে দেখ।

গর্কীর তখনও বছর পোরেনি। সে কাঁদেনি, হাসছিল। সুতপা তাকে কোলে ক'রে নিয়ে বলেছিল—ওকে গর্কী বলো না, বউদি, শিব্রূ বলো। ওর নাম শিব্রূই হল।

বাবাকে গিয়ে বলেছিল—বাবা, আমি ওর শ্রাদ্ধ করব।

বাপ মেয়ের মুখেব দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন কিছুক্ষণ এবং তাকিয়ে থাকতে থাকতে এত বড় দার্শনিক পণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ মানুষটির দুটি চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এসেছিল গাল বেয়ে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে আত্মসংবরণ ক'রে বলেছিলেন করবে বইকি মা। করা তোমার কর্তব্য।

বিজয়বাবু নিজে মেয়েকে নিয়ে সর্বানন্দপুর এসেছিলেন। এবং শ্রাদ্ধ-শেষে এখানকাব ব্যবস্থা করে মেয়েকে নিয়ে ফিরে গিছলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই সুতপা আবার এখানে এল। এল একটি বৈরাগ্য প্রতিমাব মত। সাদা জমি ফিতেপাড শাডী পরনে, সাদা ব্লাউজ, হাতে দু'গাছি চুড়ি, চুল এলো করা, মুখে একটি বিষণ্ণ করুণ হাসি, সে এখানে থাকবে, সেবা-সমিতি চালাবে, একটি মেয়েদের স্কুল করবে। ছেলেকে মানুষ করবে নিজের মত ক'রে।

আর একটি বিচিত্র কর্ম করলে সে।

মুখুজ্যে-বাড়িতে যে গোপাল-সেবাটি ছিল তার বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন প্রভাময়ী নিজে, তার কিছু বদল করে সেবা সে শাশুড়ীর মতই নিজের হাতে তুলে নিলে।

লোকে অবাক হয়ে গেল।

ভাইয়েরা বউদিরা বিয়ের কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বিজয়বাবু নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন—না।

* * *

সেদিন ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট। ট্রানজিস্টার রেডিওতে বাংলাদেশের প্রোগ্রাম বাজছিল—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, সাতটা বাজছে। সুতপা উঠল সেবা-সমিতির আপিস থেকে। গোপালের আরতি হবে। গোপালের ভোগ হবে। তারপর তাঁর শয়ান হবে। শিবা একটি ছেলের কোলে আকাশের চাঁদ দেখছে। সেবা-সমিতির ভলেন্টিয়ার একটি ছেলে। শুক্লপক্ষ, সামনে রাখী পূর্ণিমা। অ্যামেরিকান স্পেসশিপ অ্যাপোলো ১৫ চাঁদের দিকে যাত্রা করেছে। ছেলেটি শিবাকে বলছে—শিবা আমাদের চাঁদে যাবে। ইণ্ডিয়া থেকে আমাদের পুষ্পক ছাড়বে—পুষ্পক ওয়ান, টু, থ্রি। পুষ্পক ফোর-এ শিবা যাবে। সেখানে গিয়ে নেমেই বলবে—চাঁদমামা আমি আসিয়াছি। তোমার সোনায় বাঁধা আগের উপর তোমার ভাগে দাঁড়াইয়া আছি।

বলতে বলতেই সে থেমে গেল। একটু ভয় পেয়েই যেন কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সে বললে—কে?

দীর্ঘাকৃতি একটি লোক, পরনে তার প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট, মাথায় একটা ফেল্টহ্যাট, পায়ে স্ট্র্যাপ দেওয়া জুতো, লোকটি বাঁ হাতে একটা হাল-আমলের বড় স্যুটকেস অনায়াসে বয়ে নিয়ে বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটি গ্রাহ্য করলে না ছেলেটির কথা। গম্ভীর গলায় বললে—শিবানীদি!

ঘরের মধ্যে আরতির ওখানেই ছিল শিবানী। শাশুড়ী তাকে এনে রেখে গিছলেন—সুতপা তাকে সেই মর্যাদা এবং অধিকারেই রেখেছে। শিবানী সুতপা দুজনেই চমকে উঠল। কে? কে?

সুতপাই প্রশ্ন করলে ঘরের ভিতর থেকে—কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল—আমি সুব্রত।

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে—থমকে দাঁড়াল সুতপা। ফুলপ্যান্ট হাওয়াই শার্ট ফেল্টহ্যাট পরে—ও কে—ও-ই সুব্রত?

এক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল সুব্রত—তুমি? সুতপা?

সুতপা পাথর হয়ে গেল।

কি চেহারা হয়েছে সুব্রতর? জ্যোৎস্না আলোকের মধ্যে মানুষটাকে এই অনভ্যস্ত পোশাকে আশ্চর্যরকম রুক্ষ—বলশালী দেখাচ্ছে। সেই মুখ সেই কণ্ঠস্বর সেই মানুষ—তবু

যেন এ মানুষ সে মানুষ নয়।

সুব্রত তার দিকে তাকিয়ে তাকে ভাল করে দেখে বললে—তুমি বৈধব্য পালন করছ সুতপা? কিন্তু আমি মরিনি। আমি ফিরে এসেছি।"

সুব্রত মরেনি। তার দেহ পাওয়া তো ঠিক যায়নি। ওই চিঠি এবং ওর ব্যাগের জিনিসপত্রের জন্যই পুলিস ভুল ক'বে ওই গলিত দেহগুলোর একটাকে সুব্রতর লাশ বলে মনে করেছিল। সুব্রত গুলিতে আহত হয়েছিল। আহত অবস্থায় কুলীদের আশ্রয় নিয়েছিল—তারাই বাঁচিয়েছিল। বেঁচে উঠে প্রথম সে সন্ন্যাসী হয়েছিল। সংকল্প করেই সে সন্ন্যাস নিয়েছিল। ঈশ্বর-সন্ধানে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

—বদ্রীনারায়ণ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঘুরেছি সুতপা। শাস্ত্র পড়েছি। চার বছরের দুটো বছর ঘুরেছি খুবেছি ঘুরেছি। কিন্তু পাইনি কিছুই। সত্য কথা তোমাকে বলব—মিথ্যা মনে হয়েছে ঈশ্বব ধর্ম শাস্ত্র তীর্থ সব। সব। আবার পৃথিবীর সংসার আমাকে টানলে। অর্থ টানলে, যৌবন টানলে—আবার টানলে—সেই রাজনীতি। ঈশ্বর কাউকে রাজা করে দেন না—রাজা হতে হয়—রাজ্য জয় করতে হয়। সারা ভারতবর্ষের যেখানে গেলাম সেখানেই দেখলাম—মানুষ এতেই পাগল হয়েছে। তার সঙ্গে আমার মনে যোগ দিলে আমার অতীত। তোমাকে পাইনি—তোমাকে পেতে হবে—আব এখানে হেবেছি ইলেকশনে—আমাকে জিততে হবে ইলেকশনে।

একটা দলে পড়ে গেলাম। দুরন্ত দুর্ধর্ষ মানুষের দল। সেও বিচিত্র কথা। পথের ধারে একজন আহত লোককে পেয়েছিলাম। পায়ে গুলি খেয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাব আর ইউ. পি-র বর্ডারে। তাকে কাঁধে করে তুলে আমার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে সেবা করেছিলাম। দুদিন পরই কয়েকজন লোক এল তাব সন্ধানে। তাকে নিয়ে গেল তাদের গাড়িতে তুলে। দিন-পনেরো পর আহত লোকটি সেরে উঠে আমার কাছে এসে বললে—আমাদের সঙ্গে এস।

তারা দুরন্ত লোক, দুর্ধর্ষ মানুষ। তাদের সঙ্গে কাজ করলাম কিছুদিন।

রাইফেলের গুলিতে অনেক দূরের মানুষকে আমি লক্ষ্যভেদ করেছি।

আর্ত চীৎকার করে উঠল সুতপা। তুমি—তুমি—নরহত্যা করেছ?

সুব্রত বললে—তার মুখের পেশী নড়ল না।

কথা হচ্ছিল ঘরের মধ্যে বসে। আর কেউ ছিল না।

সুব্রত বললে—তা অনেকগুলি মানুষকে আমি হত্যা কবেছি। অন্ততঃ পঞ্চাশটা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আমি আর অহিংসায় বিশ্বাস করি না সুতপা। হিংসাই সত্য। প্রকৃতি ওইটেকেই দিয়েছে—দেহের প্রদীপে শক্তির তেলে চুবিয়ে শলতে করে ব্যবহার করতে। ওতেই শিখা জ্বলে। সেই শিখাকে ঘরে লাগাও ঘর জ্বলবে—গ্রাম জ্বলবে—বন জ্বলবে—দেশ জ্বলবে। অহিংসা আজ আমার কাছে ভ্রান্তি। নিছক ভ্রান্তি।

সুব্রত বললে—আমি এখন অনেক অর্থের মালিক। এবং এ অর্থ খুব সৎ উপায়

যাকে বল তাতে উপার্জন করিনি। আমি নতুন করে জীবন আরম্ভ করব। সারা পৃথিবীর পথ আজ আমার পথ। কিন্তু তুমি এসব কি করেছ?

—কি করেছি?

—এই গোপাল-পূজো করছ, এই আমার স্মৃতি-পূজো করছ—

অস্ফুট কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সুতপা—না—না না—। বলো না। বলো না। কি বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি আমি। সেকাল হলে আমি কালাপাহাড় হয়ে সর্বপ্রথম আমার বাড়ির ওই শালগ্রাম শিলা আর গোপাল-মূর্তি দুটোকে জলে ফেলে দিতাম। আমি নতুন ক'রে পলিটিক্যাল পার্টি তৈরী করব। নতুন পৃথিবী। নগ্ন সত্য হবে ভিত্তি। একটা ব্লাড বাথের মধ্যে দিয়ে হবে নতুন দিনের সানরাইজ।

—তুমি মাফ কর আমাকে। আমি আর শুনতে পারছি না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

অট্টহাস্য করে উঠল সুব্রত। সুতপা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ও ঘরে শিব্বা তখন কাঁদছিল।

* * * *

রাত্রি তখন গভীর। আকাশে চাঁদ নেই, অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। শুধু ঝিঁঝিঁর শব্দ শোনা যাচ্ছে। মানুষ ঘুমুচ্ছে। প্রাণীকুল ঘুমুচ্ছে। এরই মধ্যে ঘরের দোর খুলে ছেলেকে বুকে তুলে বেরিয়ে এল সুতপা। কাঁধে একটি ঝোলা। সে পালাচ্ছে। পালাতেই হবে তাকে। ওই যে সুব্রত ফিরে এসেছে—ওই যে নিষ্ঠুর বৃত্রাসুরের মত দুর্দান্ত দুরন্ত নিষ্ঠুর রক্তপিপাসায় অধীর মানুষ—ওর হাত থেকে শিব্বাকে আর তার শ্বশুরকুলের সব পুণ্যের এবং তপস্যার স্পর্শমণির মত এই যে ঠাকুর—একে যে রক্ষা করতেই হবে।

সে পালাচ্ছে। এখান থেকে স্টেশন। সেখানে থেকে অনেক দূরে—অনেক দূরে—অনেক দূরে কোথাও। যেখানে নূতন কালের প্রভাত হবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

শুকসারী-কথা

'শুকসারী-কথা' তারাশঙ্করের পরিণতবয়সের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। বীরভূমের লাল মাটি ও শালবন এবং রাঢ়ের গ্রামীণ সমাজজীবন নিয়ে তারাশঙ্কর উপন্যাস লিখতে ভালোবাসতেন। তাঁর মনের ভাণ্ডারে এ অঞ্চলের উচ্চকোটী ও নিম্নকোটীর নরনারীর জীবন-লীলার অফুরন্ত ঘটনা ও কাহিনী সঞ্চিত ছিল।* তিনি তাঁর চোখে দেখা ও কানে শোনা অনেক কাহিনী নিয়ে উপন্যাস ও গল্প রচনা করেছেন। 'শুকসারী-কথা'ও তার মধ্যে একটি।

চন্দনপুর নামের আড়ালে তিনি তাঁর স্বগ্রাম লাভপুরের ঘটনা ও প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। লাভপুরের দেবী ফুল্লরার মন্দির একান্ন পীঠস্থানের একটি অন্যতম পীঠস্থান।

'শুকসারী-কথা'র আরম্ভ হয়েছে যুদ্ধে মড়কে ঝড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন উচ্ছন্ন হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাদি গাঁয়ের কাহারদের নসুবালাকে নিয়ে। বাঁশবাদি গাঁয়ের নসুবালা মন্দিরের কাছে কুঁড়েঘর বানিয়ে বাস করছে এবং চন্দনপুর ও আশপাশের গ্রামে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। তারাশঙ্কর এ সম্পর্কে লিখেছেন: "আদারবুড়ী ফুল্লরা দেবী এখানকার শ্রেষ্ঠ দেবস্থান। এখানকার লোকে বলে একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। এখানে দেবীর অধরোষ্ঠ পড়েছিল—স্থানের আসল নাম অট্টহাস, তারপর নাম হয়েছিল শ্যামলাবাদ, শ্যামলাবাদ ধ্বংস হলে নাম হয়েছিল চন্দনপুর।...তারপর এখানে কোপাই নদীর ঘাটে একটা উঁচু ঢিপিতে নৌকো লাগত বর্ষায়—আশপাশ থেকে আসত গন্ধ-বণিকেরা, কেনা-বেচা চলত, চাল ধান গুড় কলাই লঙ্কা কুমড়ো। তাই ঢিপিটার নাম হয়েছিল বন্দর ঢিপি। পরে কাশী থেকে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এক সন্ন্যাসী এসে ওই জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা করে দেবীর দর্শন পান। তিনিই মা ফুল্লরাকে প্রকাশ করেন। এই মা ফুল্লরাই নসুবালার আদারবুড়ী—অর্থাৎ আদাড় বা জঙ্গলে থাকেন যে বুড়ী। বুড়ী বইকি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মা, কত তার বয়েস—সে বুড়ী বইকি। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো যে—তার মা—বুড়ী বুড়ী মহাবুড়ী।" ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী' বিংশ খণ্ড, 'শুকসারী-কথা', পৃ. ৭)।

'শুকসারী-কথা'র প্রথম প্রকাশ: প্রথম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৭৪। ডবল-ডিমাই সাইজ, ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত প্রচ্ছদ: শ্রীঅজিত গুপ্ত। পৃ. ৪+২+২৬৭। প্রকাশক: এস. এন. রায়, মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩।

'শুকসারী-কথা' উপন্যাসটি পুস্তক-আকারে প্রকাশের পূর্বে একটি শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'শুকসারী-কথা'র উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ:

"শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু"

* দ্রঃ 'তারাশঙ্কর-রচনাবলী', সপ্তদশ খণ্ড, 'ভূমিকা', শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। পৃ—৵০

পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'শুকসারী-কথা' তারাশঙ্করের আত্ম-অভিজ্ঞতা ভিত্তিক উপন্যাস। স্বগ্রাম লাভপুর এবং আশপাশের গ্রামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে। 'শুকসারী-কথা' পড়লে বোঝা যায়—গ্রন্থকার মনে মনে চিন্তা করে রেখেছিলেন—লাভপুর ও আশপাশের সন্নিহিত অঞ্চলের ঘটনা নিয়ে একটি বৃহৎ কাহিনী লিখবেন। সেই বৃহত্তম ও মহত্তম এবং ক্লাসিকরসে অভিসিঞ্চিত উপন্যাসই হলো 'কীর্তিহাটের কড়চা'। 'কীর্তিহাটের কড়চা'র সঙ্গে 'শুকসারী-কথা'র ক্ষীণ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে 'শুকসারী-কথা' উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে যুদ্ধোত্তর ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরের আধুনিক কালের কথা—'কীর্তিহাটের কড়চা'য় এসে মিশেছে আধুনিকতার সঙ্গে সাতপুরুষের কাহিনী ও ইতিবৃত্তিকা।

'শুকসারী-কথা' অতি মিষ্ট নাম হোলেও এই উপন্যাসের কাহিনী কিন্তু সরল নয়। অতিমধুর নামের আড়ালে তারাশঙ্কর একটি জটিল ও কুটিল কাহিনীর অবতারণা করেছেন 'শুকসারী-কথা'য়।

চন্দনপুরের বড় বাড়ীর বড় তরফের গোপাল চৌধুরী ও শুভেন্দু এবং নবীনপুরের অমর চক্কোত্তি ও তার মেয়ে সীমা এবং বনচাত্‌রা গাঁয়ের গোবিন্দ পাঠকের নাতি ভুবন পাঠকের ছেলে রমেন পাঠক প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্র এসে ভিড় করেছে 'শুকসারী-কথা'য়।

অমর চক্কোত্তি তারাশঙ্করের একটি অদ্ভুত ও বিচিত্র সৃষ্টি। তার সেজ মেয়ে সীমাও বড় কম নয়। সে বিয়ের দিন সাতসকালেই অধিবাসের কাপড়ে থানায় এসে বসলো অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাহ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে। হাঁসুলী বাঁকের নসুবালাও আবার নতুন করে ঘর বানিয়েছে চন্দনপুরে। তার বেয়াই ফটিক দাস। দুজনে মিলে গান বানায়। চন্দনপুর এবং আশপাশের গ্রামে ভাদুর গান গেয়ে নসুবালা ভিক্ষে করে। নসুবালার ভাদুর গান এবং তার রসনা থেকে কারো রক্ষা নেই।

সীমার গৃহত্যাগ নিয়ে সে ও ফটিক দাস গান বানিয়েছে :

"ফটিক দাস মাটি তৈরী করতে করতে সেই সব কথা ভাবছে। নসুর গান তার কানে ঢুকছে না। সেও গান বাঁধছে। কিন্তু মুশকিল হলো যে ফটিক গাইতে পারে না, গলা নেই। না থাক, তবু মন থামছে না। মনের মধ্যে কলি ঘুরছে—

"পুরনো চালের শোন গুণ-মহিমে—
ফাল কাছিতে জমি সেলাই -ছিঁড়তে নারে ভীমে।"

নসুবালার তখন নতুন কলি যুগিয়েছে।

"নতুন কালের তপ্ত খোলায় কনকচুড়ের খই—
ভাদুর আমার মুখ ফুটেছে—ও মনরসনা আমার শুনে যা লো সই।"

নবীনপুরের এক আঁজলা কনকচুড়ের খই ওই মেয়ে! ডাকনাম—কনক।" ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী', বিংশ খণ্ড, 'শুকসারী-কথা' পৃ, ২৬-২৭)।

তারাশঙ্কর বিচিত্র মানুষ হিসেবে অমর চক্কোত্তিকে এঁকেছেন।

এত বাস্তবোচিত এই চরিত্রটি যে—এরকম মানুষকে আমরা অনেকেই শিয়ালদহ কোর্ট বা

ব্যাঙ্কশাল কোর্ট-এ দেখেছি। এই বিচিত্র মানুষটি ও তার সেজ মেয়ে সীমাকে নিয়ে অতি বাস্তব চিত্র কলমের সামান্য কয়েকটি টানে তারাশঙ্কর এঁকেছেন :

"নবীনপুরের অমর চক্কোত্তির মেয়ে—ভাল নাম সীমা। ওই তার কনকচুড়ের ধান। লোকে বলে গেছো মেয়ে—একটা ভাঙা সাইকেলে চড়ে ইস্কুলে আসত। গত বছর পর্যন্ত এসেছে।"

"অমর চক্কোত্তি একালের বিচিত্র মানুষ। নস্থ বলে, না পোলোয়া না খিচুড়ী—ভুনি খিচুড়ী। ওর মধ্যে নাই কি? চক্কোত্তি নয় কি?"

"চক্কোত্তি বামুন—হাঁ তা বটে। কে বলবে নয়? ওদের বংশ চণ্ডীতলার সেবাইত ক'ঘরের একঘর,—পালা পড়লে চান ক'রে কে'টের কাপড় প'রে কপালে সিঁদুরের টিপ্ প'রে চণ্ডীতলায় যায়। ভাগ নিয়ে ঘরে আসে। মাসে আট দিন পালা।"

"ইস্কুলে পড়ে একটা পাস করা লোক, রেজিস্টারী আপিসে দলিল লিখে রোজগার করে বারো মাস। আটঘড়ার শেখজী—আমজেদ আলির সঙ্গে এক তক্তপোশে বসে ওখানে কাজ করে, একসঙ্গে বসে চা খায়, লোকে বলে মদও খায়, কোন কোন দিন রাত্রে একসঙ্গে খায় দায়। শেখ মুরগী রাঁধে। সে অবিশ্যি আঙ্গুলের আড় দিয়ে করে। আবার জেলার কাগজে বেনামী চিঠি লেখে। লোকে তা'রক করে, চক্কোত্তি এমন বসিয়ে লেখে। আর দারোগা হাকিম জমাদার কাউকে ছাড়ে না। ভুবনপুরে যাত্রার দল আছে, সেই দলে আবার এ্যাকটোও করে।"

'বাবাঃ, সে কি তেজ চক্কোত্তি ঠাকুরের। যখন বিশ্বামিত্র সেজে নামে, তখন যত গোলমাল থাকুক আসরে সব চুপ হয়ে যায়। ওরে বাবা "

"—দিনু শাপ—সবংশে নির্বংশ হবি—
অনন্ত নরকে যাবি—আরে রে দুর্মতি।

সে শুনে লোকজনের বুক গুপগুব করে। ' ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী', বিংশ খণ্ড, 'শুকসারী-কথা', পৃ, ২৭)।

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হলো। কিন্তু সীমাকে এবং সীমার বাবাকে বুঝতে সাহায্য করবে।

তারপর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সীমা এবং অমর চক্কোত্তির রক্ষিতা মনোরমা ও ছোট বোন ক্ষমা, রমেন ও শুভেন্দুকে নিয়ে। পার্শ্বচরিত্র হিসেবে সীমার স্কুল-এর দিদিমণিরা এবং থানার দারোগা ও এককালের পুরনো কংগ্রেসকর্মী ভবানীকিঙ্করবাবু ও তাঁর দাদা শ্যামাকিঙ্করবাবু আছেন।

জীবনীমূলক উপন্যাস 'শুকসারী কথা'তে উল্লেখিত ভবানীকিঙ্কর ও শ্যামাকিঙ্করবাবু যে কে আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি। ভবানীকিঙ্করবাবু হলেন তারাশঙ্করের মেজো ভাই। তারাশঙ্করের আত্মজীবনী 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ তাঁর কথার উল্লেখ করেছেন। দুই জায়গায় শ্যামাকিঙ্কর ছদ্মনামের আড়ালে তারাশঙ্কর নিজের কথা বলেছেন। গ্রামের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব ও সম্পর্ক ছিন্ন হবার কথা বলেছেন। ছদ্মনামের আড়ালে তারাশঙ্কর লিখেছেন :

"ভবানীকিঙ্করবাবুর বড় দাদা শ্যামাকিঙ্করবাবু। একথা তাঁর। তাঁর এখন মস্ত খ্যাতি। মস্ত বড মানুষ। আজ আর তিনি শুধু এখানকার মানুষ নন, গোটা দেশের দাবি তাঁর উপর। গোটা দেশ তাঁকে দাবি করে। মস্ত বড লেখক। বাবার চেয়ে এক বছরের বড়। শিবনাথ দের বয়সী। তাঁরই সহপাঠী। গ্রামে তিনি থাকেন না। কখনও কদাচিৎ আসেন। যখন আসেন তখন তাঁর ওখানে লোকেরা যায় দলে দলে। এখানকার লোক, পাঁচখানা গ্রামের লোক ইস্কুলের মেয়েরা দিদিমণিরা ছেলেরা মাস্টাররা। সকলে ছুটে যায়।" ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী', বিংশ খণ্ড, 'শুকসারী-কথা', পৃ. ৬৮)।

তারাশঙ্করের প্রায় মধ্যজীবনের প্রান্তে বসে লেখা 'শুকসারী কথা' উপন্যাসটি অনেক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়। ঘটনার দ্রুত আবর্তন ও নাটকীয়তা – সভ্যলব্ধ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জনসাধারণের এবং সরকারী আমলাতন্ত্রের ও অফিসারদের প্রতি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সুবিধাবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলের চরিত্র-চিত্রণ তারাশঙ্কর অকুতোভয়ে অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। অনেকেই জানেন—তারাশঙ্কর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের Legislative Council-এর এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় পার্লিয়ামেণ্ট-এর 'রাজ্যসভা'র সদস্য ছিলেন। তখনো তিনি নির্ভীক চিত্তে তাঁর দলের মেকী রাজনৈতিক কর্মীদের মুখোশ খুলে দিয়ে সমালোচনা করেছেন। এখানেই মহাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের মহত্ব।

আগেও অনেকবার পূর্ববর্তী 'রচনাবলী'র বিভিন্ন খণ্ডে যে কথা বলেছি সে কথার পুনরুক্তি করছি। তারাশঙ্করের মহাউপন্যাস 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি উপন্যাসের আড়ালে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপন্যাসটি ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

ফরিয়াদ

'ফরিয়াদ' উপন্যাসটিকে তারাশঙ্করের শেষ বয়সের একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-কর্ম ও রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

স্রষ্টা তারাশঙ্কর জীবনের শেষের দিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতই বৃহদায়তন উপন্যাসেব সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট নভেলেট জাতীয় ক্ষুদ্র উপন্যাস রচনা শুরু করেন। 'সপ্তপদী' উপন্যাস রচনার সঙ্গেই এই জাতীয় উপন্যাস রচনার কাজ শুরু হয়।

তারাশঙ্করের প্রতি সমালোচকদের একটি অভিযোগ ছিল—রাঢবঙ্গে আউল-বাউল-বেদে-সাপুড়ে-দরবেশদের কাহিনীই তাঁর রচনায় বেশী উকি দিয়েছে। তিনি অভিজাত সমাজের কথা লিখেছেন বটে—রাঢ়ের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের কথা। তাঁদের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়িষ্ণুতা ও বিগতসর্বস্ব জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি তিনি এঁকেছেন তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে।

কিন্তু কথাটা সত্য নয়। তাঁর রচনায় লালমাটির দেশ রাঢ়ের কথার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা এবং সিউড়ি-বোলপুর-বর্ধমান প্রভৃতি উচ্চকোটীর মানুষদের কথাও স্থান পেয়েছে। তিনি

এসব শহর নিয়েও লিখেছেন বহু রচনা। তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন'-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

'ফরিয়াদ' উপন্যাসটি তারাশঙ্করের মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ প্রথম প্রকাশিত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এটি তাঁর শেষ বয়সের রচনা।

এই শেষের দিকে রচিত উপন্যাসটিতে তারাশঙ্কর কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর দেশের অবস্থা (আরো একটু স্পষ্টভাবে বললে) সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক জীবন কেমন কুটিল জটিল আবর্তের মধ্যে পড়েছিল—তার কথা অনির্বচনীয় ভাষায় হাল্কা চালে তারাশঙ্কর বর্ণনা করেছেন। স্বাধীনতোত্তর সমাজজীবন নিয়ে খুব বেশী উপন্যাস তারাশঙ্কর রচনা করেন নি। তাঁর মন ছিল অতীতের ঐতিহ্য-আশ্রয়ী। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির বয়ন ও রচনা-নৈপুণ্য তাই এত সুন্দর।

আবার যখন তিনি স্বাধীনতা-পূর্ব কি স্বাধীনতোত্তর সমাজজীবনের কথা লিখেছেন, তখন অনেক বিখ্যাত সমালোচক বলেছেন: তারাশঙ্কর একেবারে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে উপন্যাসের কাহিনী সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন।*

'ফরিয়াদ' উপন্যাসটির মধ্যে তারাশঙ্কর যুদ্ধোত্তর ও দাঙ্গাবিধ্বস্ত খণ্ডিত পশ্চিম বাংলার একটি মূল্যবান ও দরদী প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। যে কোনো মহৎ সাহিত্যিকের মানসিকতায় ও সত্যাশ্রয়ী মনে যে সমাজদর্পণের নিখুঁত চিত্র ফুটে ওঠে—তার আর একবার পরিচয় পাওয়া গেল বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্করের শেষ বয়সের রচনা 'ফরিয়াদ'-এ। তিনি নিঃসঙ্কোচে 'ফরিয়াদ'-এ লিখেছেন: "পরের দিন সকালবেলা তিনি খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন—দেখছিলেন কাল রাত্রের হাওড়ার বস্তির ঘটনা সম্পর্কে কি রিপোর্ট বেরিয়েছে। শাক দিয়ে মাছ যেমন ঢাকা যায় না—মাছের চেহারা দেখা না গেলেও যেমন গন্ধে ধরা পড়ে—তেমনি ভাবেই একথা আজ প্রমাণিত যে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তা-বাদের যে ফোড়ং দিয়ে সংবাদ-ব্যঞ্জন পরিবেশন করেন তা থেকে হিন্দুত্বেরই তেলকাঁটার গন্ধ ওঠে। একটু চেষ্টা করলেই কাঁটা বেরিয়ে পড়ে। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'র পুজোকে নামে সর্বজনীন করে তুললেও মিথ্যা এবং সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি থেকে মুক্তি এ জাত পায়নি। 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' বলে ভজন গাইলেও অন্তিম সময়ে গান্ধীজী 'হায় রাম' বলেই বিলাপ করেছিলেন।" ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী', বিংশ খণ্ড, 'ফরিয়াদ', পৃঃ ১)।

তারাশঙ্কর সত্যদ্রষ্টার মত দ্বিধাহীন চিত্তে হিন্দু-মুসলিম মানসিকতার এই বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরেছেন সনাতনীদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই।

স্বাধীনতা লাভের পক্ষকাল পরেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্যে কয়েকটি প্রতিভাবান তরুণ গুণ্ডার হাতে খুন হন। এই কলির দধীচিদের কথা তারাশঙ্করের স্মরণে ছিল বলে মনে হয়। শচীন্দ্রনাথ মিত্র (মৃত্যু ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) ও স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর

মানুষের প্রাণের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। সেই ভয়ঙ্কর দিনের অশ্রুভেজা—বেদনায় হৃদয়-মথিত-করা কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন।

তারাশঙ্কর যখন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর সভাপতি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারই তাঁর জন্যে বডিগার্ড (body guard) নিযুক্ত করেছিলেন তারাশঙ্করের বাসগৃহে। তখন এমন একটা অরাজকতার দিন এসে পড়েছিল—বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষদের হত্যা (যেমন দেশনায়ক হেমন্ত-কুমার বসু ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে) এবং কলেজ স্কোয়ার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভবনে বিদ্যাসাগর ও স্যার আশুতোষের মূর্তি ভগ্ন ও বিচূর্ণ করা হয়। সে সময় বিশিষ্ট লোকদের আত্মরক্ষার জন্য সরকার থেকে দেহরক্ষী দিয়েছিলেন।

'১৯৭১' উপন্যাসের প্রথম কাহিনী 'একটি কালো মেয়ের কথা'। বাংলার খানসেনা ও ইয়াহিয়ার দলের নগ্ন অত্যাচারের এক অভূতপূর্ব আলেখ্য চিত্রিত করেছেন যশস্বী প্রবীণ কথাশিল্পী। এখানে একটি কালো মেয়েকে নিয়ে সীমান্তে দেশভক্ত যুবকদলের হাতে ধরা পড়লো মনস্থর।

যুবকেরা পাকিস্থানী গুপ্তচর সন্দেহে পুলিসের কাছে তাদের ধরে নিয়ে গেল। সে থানায় আহত অসুস্থা ও ধর্ষিতা কালো মেয়েকে নিয়ে জবানবন্দি দিল। 'মনস্থর' ওরফে ডেভিড আর্মস্ট্রং।

পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হামলা—তাদের নানাবিধ অত্যাচার—মার্চের শেষে নরমেধযজ্ঞ এবং যুবতী নারী ও বুদ্ধিজীবী ধর্ষণ ও হত্যার কাহিনী শুনিয়েছেন সুনিপুণ ভাবে। মনে হয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনও এত সুন্দর ও সুস্পষ্ট নয়। একজন সত্যিকারের মহাশিল্পী হৃদয়-নিংড়ানো-বেদনায়-মথিত অন্তরে 'একটি কালো মেয়ের কথা'য় অশ্রুসিক্ত কাহিনী শুনিয়েছেন। তারাশঙ্কর স্বাধীন নবীন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'-এর জন্মলগ্ন দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু এই প্রবীণ খ্যাতিমান কথাশিল্পী বাংলাদেশের মুক্তি যে আসন্ন—তাঁর মানসচোখে দেখতে পেয়েছিলেন।

এখানে কালো মেয়ের কাহিনী খুবই গৌণ। তারাশঙ্করের নিম্নকোটীর মানুষদের প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় একটি কালো মেয়েকে বাংলাদেশের মুক্তিস্নানের প্রতীক হিসেবে নিয়েছেন বলে। তারাশঙ্করের শিল্পীমানসের এবং ব্রাত্য ও মূক এবং নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানব-মানবীর প্রতি দয়া ও ভালোবাসা এবং স্নেহশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায় এই প্রতীক ব্যবহারে। তাছাড়া বাংলাদেশের নরনারী সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অবিভক্ত বঙ্গদেশে তারাশঙ্কর অনেকবারই গিয়েছেন পূর্ববাংলায়। পূর্ববঙ্গের প্রতি তাঁর গভীর দরদ ও ভালোবাসার পরিচয় আছে এই ছোট আখ্যায়িকায়।

পশ্চিমবঙ্গের ভয়ঙ্কর ও অস্থির আগুনজ্বলা দিনগুলির কথা তারাশঙ্কর বলেছেন 'সুতপার তপস্যা'য়।

দেশের রাজনীতি তখন অস্থির। পুরাতন মূল্যবোধকে আজ আর কেউ মর্যাদা দিচ্ছে না। সব কিছু ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। সেই দিনগুলির কথা শুনিয়েছেন তারাশঙ্কর। উগ্র আধুনিকা স্থতপা এবং শান্ত ভদ্র স্থব্রতর জীবনে ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পরিবর্তন নানা ঘটনার আবর্তের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। স্থব্রতর পরিবর্তন খুবই ভয়ঙ্কর। খুবই পরিবর্তন তার হয়েছে। ভয়ঙ্কর হয়ে ফিরে এসেছে।

একেবারে সমকাল নিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছিলেন '১৯৭১' উপন্যাসের তুইটি কাহিনী। দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে এত বাস্তবতার কাছ ঘেঁষে তারাশঙ্কর রচনা করেন নি কোনো গল্প-উপন্যাস। বাস্তবতার ক্ষুরের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন তারাশঙ্কর কিন্তু একটু তাঁর পা টলে নি। এখানেই এই মনস্বী সাহিত্যিকের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।

প্রসিদ্ধ সমালোচক ও বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'স্থতপার তপস্যা' সম্পর্কে স্থবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

"'স্থতপার তপস্যা' তারাশঙ্করের শেষতম উপন্যাস। বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমায় গঙ্গার ধারে একটি প্রাচীন গ্রাম সর্বানন্দপুর। সেই গ্রামের মুখুজ্জে ও দাশগুপ্ত তুই পরিবারের ছেলে ও মেয়ে স্থব্রত মুখার্জি ও স্থতপা দাশগুপ্ত চিন্তায় কর্মে ধ্যানধারণায় বিপরীতপন্থী হয়েও প্রেমজ বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১—আমাদের পরিচিত দশকের কলকাতা, কাটোয়ার গ্রাম, আসানসোলের কয়লাখনি, কংগ্রেসী ও বামপন্থী রাজনীতির তীব্র সংঘর্ষ ও হত্যার রাজনীতি, ধর্মবোধ বিশ্বাস সংস্কারের তিক্ত সংঘর্ষ, পারিবারিক দম্ভ নীচতা, ব্যক্তিগত অসূয়া-বিদ্বেষ—যা-কিছু আজ আমাদের জীবনের সমস্ত শুভকে বিনষ্ট করতে উদ্যত তাদেরই চলন্ত ছবি।"

"খুব স্পষ্ট করে তুজনের বিরোধ লেখক দেখিয়েছেন। পার্টি, রাজনীতি, হত্যার রাজনীতি, অসহিষ্ণু উগ্র পন্থা এসব আমাদের এত পরিচিত যে চিনিয়ে দিতে হয় না। তারই পটভূমিতে লেখক তুজনকে এঁকেছেন।" ('কালের প্রতিমা', ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা —১৯৭৪ পৃ, ২৭)।

"স্থতপার তপস্যা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? হিংসা ও হত্যার রাজনীতি কি শুভবোধকে পরাস্ত করবে? আদর্শবাদী স্থব্রত কি হত্যাকারী হয়ে সার্থকতা লাভ করবে?"

এই প্রশ্ন তারাশঙ্করের শেষতম উপন্যাসের তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, এই প্রশ্ন ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা।" ('কালের প্রতিমা', ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা —১৯৭৪। পৃ, ৩০।)

'১৯৭১' উপন্যাসটি নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিরন্তন সাহিত্যের আসরে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

বিংশ খণ্ড সমাপ্ত